স্বামিজীর পদপ্রান্তে

স্বামিজীর পদপ্রান্তে

(স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের জীবনচরিত)

স্বামী অব্জজানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

বেলুড় মঠ

প্রকাশক :

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

বেলুড় মঠ

প্রথম প্রকাশ :

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৭০

৬ই জানুআরি, ১৯৬৪

স্বামিজীর আবির্ভাব-শতবর্ষ-পূর্তিদিবস

ব্লক-মুদ্রক :

আভা প্রেস

৬বি, গুড়িপাড়া রোড

কলিকাতা-১৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির

বেলুড় মঠ

মুদ্রক :

শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ

অথেন্টিক প্রেস

৪৬, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী বিশ্বের কাছে তাঁহার ভাব ও বাণীকে আবার নূতন করিয়া বহন করিয়া আনিয়াছে। মানুষ নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আর একবার লোকাতীত এই প্রতিভার অগ্নিতে নিজ নিজ দীপগুলি জ্বালিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছে। তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়া দেখিবার এবং নানাভাবে উপলব্ধি করিবার অত্যধিক প্রয়াস সর্বত্রই আজ দেখা যাইতেছে। আমরাও আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার মাধ্যমে—স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিষ্যের জীবনের মধ্য দিয়া, তাঁহার বিরাট সত্তার কিঞ্চিৎ আভাস অনুভব করিতে প্রয়াসী হইলাম। স্বামিজীর জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তিতে তাঁহার পদপ্রান্তে ইহাই আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য।

স্বামিজীর শিষ্যগণ সকলেই আমাদের প্রণম্য। প্রকাশের তারতম্য থাকিলেও, তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রেই স্বামিজীর দিব্যস্পর্শ রহিয়াছে। তবে আপাততঃ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সহিত যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এমন ত্রয়োদশটি সন্ন্যাসি-চরিত্র বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।......

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের গৌরব ইহাতে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।...

১লা জানুআরি, ১৯৬৪ স্বামী বিমুক্তানন্দ

প্রস্তাবনা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরবর্তিকালে স্বামিজীর পদপ্রান্তে সমাগত ত্যাগিমণ্ডলীর জীবন-চরিত বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য। ইঁহাদেরই জীবনকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহ দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের অপূর্ব জীবনবেদের ইঁহারাই ছিলেন জীবন্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। শোনা যায়, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিষ্যের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই নাকি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "পর্বতসদৃশ অচল অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গড়িয়া তুলিব।" স্বামিজীও তাঁহার পদাশ্রিত শিষ্যবৃন্দকে পাইয়া ঐরূপ দৈবপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া, তাঁহাদের জীবনের মাধ্যমে নিজ যুগ-কার্যকে সংসিদ্ধ করিয়াছিলেন। যুগাচার্য স্বামিজীর আবির্ভাব-শতবর্ষ-জয়ন্তীর শুভলগ্নে, তাঁহারই ভাববাহী কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর চরিত্র-চিত্র আমরা অনুধ্যান করিতেছি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার উদ্দেশ্যে।

স্বামিজীর ত্যাগী বা গৃহী, এতদ্দেশীয় বা বিদেশীয়, সকল শিষ্যের জীবনীই স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনার উপযোগী উপাদান, সকলেরই ক্ষেত্রে সমান পাওয়া যায় না। যাঁহার যতখানি সংগ্রহ করা গেল—তন্মধ্যে ত্যাগী শিষ্যদের পুরোবর্তী কয়েকজনের জীবন-চরিত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের ইতিহাসে মহনীয় এই সব জীবনের অবদান অবিস্মরণীয়।

গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত জীবনীগুলির পারম্পর্য নির্ণয় খুব সহজসাধ্য নহে। স্বামিজীর শিষ্যগণের মধ্যে যে দুইজন সঙ্ঘাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের জীবনীই প্রথমে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর যেমন যেমন লেখা হইয়াছে, তেমন তেমনই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কোনপ্রকার উচ্চাবচ বিচার ইহার পশ্চাতে নাই।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠাধীশ পরম ভক্তিভাজন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও উপদেশ লেখককে প্রভূত শক্তি ও

অনুপ্রেরণা দিয়াছে। তাঁহার উৎসাহ পশ্চাতে ছিল বলিয়াই নিতান্ত অক্ষম হস্তেও এই কার্যে হস্তক্ষেপ সম্ভব হইয়াছে।

পূজনীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সুদূর আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত-কেন্দ্রে থাকিয়াও, লেখককে নানা ভাবে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। পাণ্ডু-লিপিরও কিছু অংশ তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকের 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' নামকরণও তাঁহারই ইঙ্গিতে হইয়াছে।

গ্রন্থের উপাদান আহরণের ব্যাপারে লেখককে মুখ্যতঃ মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত ছোট-বড় বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা, অথবা অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী এবং প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের ব্যক্তিগত স্মৃতি-কথা হইতেই উহা সংগৃহীত। শ্রদ্ধাস্পদ যে-সব প্রাচীন সাধু এবং প্রবীণ ভক্ত তাঁহাদের নিজ নিজ স্মৃতি-সঞ্চয়ন হইতে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট লেখকের ঋণ অপরিশোধ্য। স্থানাভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ আর করা হইল না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের আকর গ্রন্থাদি ছাড়াও, অন্যান্য যে-সকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহাদের নাম গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশের প্রাক্‌কালে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে একজনের নামোল্লেখ না করিয়া পারা যায় না, যাঁহার উৎসাহবাক্য ও পরামর্শ লেখককে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রচুর উদ্দীপনা দিয়াছে—তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত সহ-সচিব পূজনীয় স্বামী শাশ্বতানন্দজী।

উপসংহারে বক্তব্য যে, আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা কোন মতেই ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য একখানি আদর্শ চরিতগ্রন্থ-সৃষ্টির দাবী রাখে না। তবে প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে এই গ্রন্থ যদি কোন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-তত্ত্বান্বেষীকে বিন্দুমাত্রও প্রেরণা দেয়, কোন সত্যানুসন্ধিৎসু গবেষককে বা জীবনীকারকে একটুও সহায়তা করে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

ওঁ শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দার্পণমস্তু।

বিবেকানন্দ-আবির্ভাব-তিথি
(পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৭০)
৬ই জানুআরি, ১৯৬৪

অব্জজানন্দ



ভূমিকা

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী-লিখিত)

পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "আমরাও স্বামিজীকে খুব কাছে পেয়ে 'আমাদের স্বামিজী' বলে তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে কোন্ উর্ধ্বলোকের অধিবাসী, সে খেয়াল আমাদের ছিল না। তাই বিয়োগ-কাতর হ'য়ে পড়েছিলাম। তিনি যে কয়েকদিনের জন্য আমাদের কাছে ধরা দিয়ে 'আপনার জন' হয়েছিলেন, তাতেই আমরা ধন্য।" একজন ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষেরই যদি এই উক্তি হয়, তবে সাধারণ মানবের পক্ষে লোকোত্তর বিবেকানন্দ-চরিত্রের মহিমা কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভব করা কত দুঃসাধ্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্বামিজীর অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা ও সহচরগণ তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণেই তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িতেন। শ্রীভগবানের নরলীলার নিত্যসঙ্গী যাঁহারা, তাঁহাদের ঐসব স্মৃতিচিত্র মনে হইলে, স্বল্পশক্তি মানুষের পক্ষে শিবাবতার স্বামিজীকে ধরা বুঝা যে কত কঠিন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

সূর্যের রশ্মি বহুদূর হইতে পৃথিবীকে স্পর্শ করে বলিয়াই মর্ত্যবাসী ঐ অমিত জ্যোতিঃরশ্মির সংবাদ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে গেলেও তাই তাঁহারই পদাশ্রিত শিষ্যবৃন্দের জীবনী-পর্যালোচনা অতি উপযোগী। কারণ ইঁহারা বিবেকানন্দ-ভাস্করের রশ্মিস্বরূপ।

স্বভাবতঃই, স্বামিজীর ত্যাগী শিষ্যগণের জীবনালোকে আমাদের সঙ্ঘ সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। স্বামিজীর এই সব বিশিষ্ট সন্তান যেমনই গুরুগত-প্রাণ ছিলেন, তেমনই স্বামিজী-প্রচারিত ত্যাগ ও সেবার যুগ্ম আদর্শ তাঁহাদের জীবনে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে স্বামিজীর ভাবাদর্শের কোনও না কোন বৈশিষ্ট্য যেন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। ইঁহারা ছিলেন স্বামিজীর শিক্ষা-দীক্ষার জীবন্ত ভাষ্য। লোকান্তরিত এই সকল বিশিষ্ট সাধুর জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে স্বামিজীর ভাবধারার পর্যালোচনা কতকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরগণের অপূর্ব জীবনকথা নানা গ্রন্থাদিতে অল্পবিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামিজীর সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অনেকেরই কোন

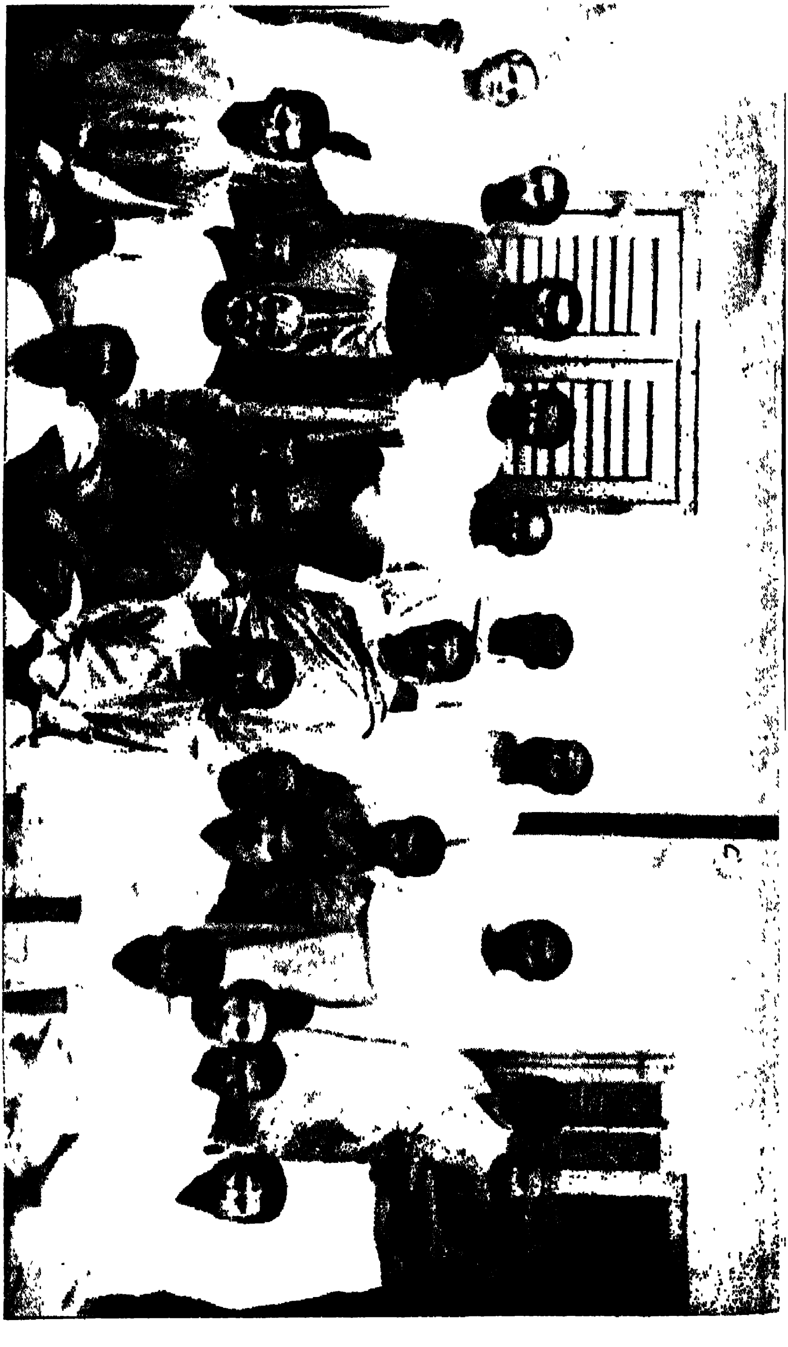
জীবনী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল মহাত্মাদের সম্বন্ধে প্রামাণিক একখানি পুস্তকের অভাব ছিল।

স্বামিজীর আবির্ভাবের পর এক শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই শুভক্ষণে স্বভাবতঃই, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে, বহুতর ভাবে ও ভাষায়, স্বামিজীকে অবলোকনের চেষ্টা এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের প্রয়াস বিশ্বের সর্বত্র দেখা যাইতেছে। এই অবসরে স্বামিজীর ত্যাগী শিষ্যদের জীবনী-প্রকাশন বাস্তবিক সময়োপযোগী হইয়াছে। খুবই আনন্দের বিষয় যে, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ অগ্রণী হইয়া এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। শ্রীমান অব্জজানন্দ-প্রণীত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থ পূর্বোক্ত অভাবের কথঞ্চিৎ নিরসন করিবে সন্দেহ নাই।

স্বামিজীর অলৌকিক জীবনের এক-একটি বিশেষ দিক তাঁহার এক-একজন শিষ্যের চরিত্রে ও কর্মে কীভাবে রূপায়িত হইয়াছে, উহারই মর্মকথা এবং বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনে এইসব ত্যাগী পুরুষের আত্ম-নিবেদনের ইতিহাস প্রকাশ্যমান গ্রন্থখানিতে পাওয়া যাইবে। সহজ সরস অথচ ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া রচিত এই গ্রন্থখানিকে নির্ভরযোগ্য করিতে লেখকের যত্নের ত্রুটি হয় নাই, বুঝা যায়। গ্রন্থখানি স্বামিজীর সর্বলোককল্যাণকর ভাবরাশির প্রতি বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে, বিশেষতঃ যুবকসমাজকে, আকৃষ্ট করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। স্বামিজীর ত্যাগী সন্তানদের এই জীবনীমালা-রচনার উদ্দেশ্য সফল হউক, ইহাই কামনা।

বেলুড় মঠ
১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৩

স্বামী মাধবানন্দ



সূচীপত্র

দুর্ভগো বত ! লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি ।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥

... ...

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসাম্ অবিতৃপ্তদৃশাম্ নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২।৮, ১১



স্বামী শুদ্ধানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দ

"একজন কেউ লিখ্‌তে থাক্‌, আমি বলি।"

আলমবাজার মঠের বড় ঘরটিতে বসিয়া, সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে, স্বামিজী একজন কাহাকেও আদেশ করিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের আদর্শ, কর্মনীতি ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের জীবনধারা সম্পর্কীয় কয়েকটী নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষ তখন।

মূর্তিমান ব্যক্তিত্বের মুখামুখি বসিয়া অগ্নিময় সেই বাণীপ্রবাহকে ধারণ করিতে কেহই সেদিন সাহস পাইতেছিলেন না। পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিতেছেন—আগাইয়া কিন্তু কেহই আসিতেছিলেন না। অবশেষে 'একজন কেউ' স্বামিজীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কাগজ-কলম হাতে লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলেন। যদিও বয়সে অতিশয় নবীন—মাত্র চার-পাঁচদিন হইল মঠে যোগ দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতিটি তাঁহার যথার্থই বিবেকানন্দ-তড়িৎ-শক্তি বহনের উপযোগী বটে! স্বামিজীর পদপ্রান্তে সমাসীন সেদিনের এই 'একজন কেউ' উত্তরকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে যুগাচার্য বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীর জীবন্ত ভাষ্যরূপে সকলের শ্রদ্ধার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি ছিল কর্ম-পরিণত বেদান্তের বাস্তব মূর্তিস্বরূপ। বহু-শাস্ত্রবিদ্‌ শুদ্ধানন্দের জীবনে যে অত্যাশ্চর্য সমন্বয়াদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উহা তাঁহার অনন্যসাধারণ গুরুভক্তি ও অতন্দ্র সঙ্ঘ-সেবারই ফল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিবিস্তৃতির ইতিহাসে স্বামিজীর একনিষ্ঠ এই প্রিয় সন্তানের অবদান এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামিজীর অধিকাংশ গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদক-রূপে এবং তাঁহার ভাবাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে শুদ্ধানন্দজী বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, তথা ধর্মেতিহাসে চির অমর। বাংলাদেশে স্বামিজীর ভাবের প্রচারণা মুখ্যতঃ তাঁহারই অনুবাদ-পুস্তকাদির মাধ্যমে হইয়াছে।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পূর্বনাম সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। সুধীরচন্দ্রের পৈতৃক বাটি ছিল কলিকাতার সার্পেন্‌টাইন্‌ লেনে। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইংরেজী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৯

বঙ্গাব্দের আশ্বিন শুক্লা মহাষ্টমী তিথিতে) সুধীরচন্দ্রের জন্ম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুশীলচন্দ্রও উত্তরজীবনে স্বামী প্রকাশানন্দ নামে স্বামিজীর অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্যরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই সুধীরচন্দ্রের জীবনে ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা যাইত। সাধু-সন্ন্যাসীর নাম শুনিলেই দেখিতে যাওয়া এবং সমবয়সী বন্ধুদের লইয়া নানা ধর্মপুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা তাঁহার বাল্যের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। পড়াশোনাতে মেধাবী ছাত্র বলিয়া তিনি প্রশংসিত ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সিটি কলেজে তিনি এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এইকাল হইতেই তাঁহার ধর্মজীবনের গতি নূতন বেগ সঞ্চয় করিয়া সুনির্দিষ্ট কোন পথের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছিল। কয়েকজন সঙ্গীও তখন এমন জুটিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সাহচর্যে সুধীরচন্দ্রের এই ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। খগেন, কালীকৃষ্ণ, হরিপদ, গোবিন্দ (শুকুল) প্রমুখ সঙ্গীদের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—যাঁহারা পরবর্তিকালে যথাক্রমে বিমলানন্দ, বিরজানন্দ, বোধানন্দ ও আত্মানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশিষ্ট বার্তাবাহী হইয়াছিলেন।[১]

ধর্মবন্ধুদের লইয়া পাঠ, আলোচনা, ভজন, কীর্তনাদিতে সুধীর বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বন্ধু খগেনদের বাড়ীতেই ছিল তাঁহাদের প্রধান আড্ডা। সুধীরদের একটি Debating Club (আলোচনা-চক্র) ছিল। উহাতে ইংরেজী ও বাংলাতে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি অভ্যাসও নিয়মিত চলিত। শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য, আর্যমিশন ইন্‌ষ্টিট্যুশনের পঞ্চানন ভট্টাচার্য তখন বহু যুবককে যোগশিক্ষা দিতেন। সুধীরও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিতই ধরিতেন। যোগাভ্যাস-কালে তাই বেশভূষা ও আহারাদিতে তিনি অতিশয় কৃচ্ছ্রতা পালন করিতেন।

---

১ It was in 1891-92 that a fine cultured group of young men began to frequent the Baranagar Math.... In a way, this group succeeded as leaders the direct disciples of the Master. They were Sudhir Chandra Chakraverty, Kalikrishna Bose, Khagendra Nath Chatterjee, Gobinda Chandra Shukul, Haripada Chatterjee and Sushil Chandra Chakraverty —who took orders to become Swamis Suddhananda, Virajananda, Vimalananda, Atmananda, Bodhananda and Prakashananda respectively.

—*History of the Ramakrishna Math and Mission* (By Swami Gambhirananda)

কোনপ্রকার জামা ব্যবহার না করিয়া, শুধুমাত্র চাদর গায়ে জড়াইয়া নগ্নপদে চলাফেরা করিতেন। এমন কি ঐভাবে জামা-জুতাবিহীন অবস্থায় কলেজেও যাইতেন। তৎকালীন সিটি কলেজের ব্রাহ্ম-সংস্কৃতিতে ইহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে বলিয়া, অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্র নাকি এই কারণে সুধীরকে একবার তিরস্কার করিয়াছিলেন।

খগেন, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত একবার একটি পানসি নৌকায় সুধীরচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান। দক্ষিণেশ্বরেই রাত্রিযাপন হইবে স্থির হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে সারারাত্রি ধ্যানধারণায় তাঁহাদের বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। কালীবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ, লবণ ইত্যাদি সব ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল—সুতরাং খিচুড়ি রান্না করিয়া আহারের বন্দোবস্তও হইয়াছিল। সুধীরের ইহাই সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন।[১] পরের দিন বৈকালে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন।

সংসারের গতানুগতিক চক্রের মধ্যে সুধীরের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কি যেন কিসের সন্ধানে তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতে থাকিল। বৈরাগ্যের প্রেরণায় ইতোমধ্যে তিনি দুইবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। একবার তো পদব্রজে দেওঘর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বুঝি সময় হয় নাই—কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে তাই ফিরিয়াই আসিতে হইয়াছিল। সুধীরের পড়াশোনার ধাত চিরকালের,—ধর্মগ্রন্থাদি পাঠে আরও অধিক ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই, বরাহনগর মঠে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত তিনি পরিচিত হন। বরাহনগর মঠে যোগেন মহারাজের সহিত একান্তে বসিয়া সুধীর ও তাঁহার সঙ্গীরা অনেক

---

১ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্থূল দেহে দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে বিরাজ করিতেন, সেই কালে তাঁহার সহিত চাক্ষুষ মিলন না হইলেও, বিধাতার অলক্ষ্য প্রেরণায়, তখন হইতেই কিন্তু নিজেরও অজ্ঞাতসারে সুধীর শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার একখানি চিঠিতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উহাতে লিখিয়াছেন—"আমার নিজের জীবনের কথা তোমায় আর বিশেষ কি লিখিব? শ্রীশ্রীঠাকুর যখন স্থূল শরীরে বর্তমান ছিলেন তখন অল্প বয়স হইলেও তাঁহার কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহার ছাপা উপদেশও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই।"

(পত্রের তারিখ ১৩, ১১, ১৯৩৭)

প্রসঙ্গাদি করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের অনেকের সঙ্গেই এইকাল হইতে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। উত্তরকালে (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) একটি পত্রে তিনি ব্যক্তিগত স্মৃতি-চারণ করিয়াছেন—

"আমি যখন ১৮৯০ সালে প্রথম বরাহনগর মঠে যাই, তখন তাঁহাকে (স্বামী অদ্বৈতানন্দকে) তথায় দেখিয়াছি মনে আছে। সেদিন গিরিশ ঘোষ ও অভেদানন্দ স্বামী...নানা philosophical discussion করিতেছিলেন —আমি তখন entrance class-এ পড়িতাম—তাঁহার নিকট গিয়া visitor-রা যেমন বসে, খানিক বসিলাম,—বলা বাহুল্য, তাঁহাদের discussion-এর মর্ম তখন আমি ধরিতে পারি নাই—তারপর যখন উঠিলাম, বেশ মনে আছে, গোপালদাদা একটি ঘরে ঢুকিয়া সুরেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি' ১ম ভাগ নামক একটি চটি বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আজ philosophy-র কথা হচ্ছিল—যা হ'ক, এই বইখানা পোড়ো—আর একদিন মঠে এসো।' "

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ। দূর প্রতীচী হইতে বেদান্তের দুন্দুভিধ্বনি সাগরতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে প্রাচ্যের আকাশ-বাতাসকে আলোড়িত করিতে সুরু করিয়াছে মাত্র। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে স্বামিজীর বজ্র-নির্ঘোষ ভারতের দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত করিতেছে—দীর্ঘ নিদ্রার অন্তে ভারতবাসী বুঝি তখন নড়িয়া চড়িয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদেশের প্রায় সকল সংবাদ-পত্রেই তখন স্বামিজীর বেদান্ত প্রচারের বার্তা প্রকাশিত হইত। সুধীরচন্দ্র এই সকল সংবাদ পাঠে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রের কার্যালয় ছিল ধর্মতলায়। পত্রিকা কার্যালয়ের বহির্দেশের দেওয়ালে পত্রিকার নূতন সংখ্যা বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। সুধীরচন্দ্র কলেজের পড়াশোনা একরূপ বন্ধ করিয়া স্বামিজী-সম্পর্কীয় সংবাদ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় এই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কার্যালয়ে ঘন ঘন যাওয়া আসা করিতে থাকেন। যতই স্বামিজীর কথা জানিতে লাগিলেন, ততই মনঃপ্রাণ আশায় আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল—কতদিনে এই পুরুষপ্রবরের সাক্ষাৎ পাইবেন, এই ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। জীবনের কাণ্ডারীকে এখন হইতেই মনে মনে বরণ করিতে লাগিলেন।

সুধীরচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ ইতোমধ্যেই বরাহনগর ও

আলমবাজার মঠে খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। সুধীরও আলমবাজার মঠে জলন্ত পাবকসদৃশ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর ভাবধারার প্রতি উত্তরোত্তর অধিক আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন। মাঝে মধ্যে আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী অদ্ভুতানন্দজীপ্রমুখ কেহ কেহ, সুধীরদের সান্ধ্য-আড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইতেন। আনন্দের হাট বসিয়া যাইত তখন। সন্ধ্যায় নিয়মিত সমবেত ভজন-প্রার্থনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথা আলোচনা চলিত, পরে আবার কোন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে পাঠ হইত। পাঠ ও ব্যাখ্যাদি সাধারণতঃ সুধীরই করিতেন। বন্ধু কালীকৃষ্ণ প্রায় বৎসর দুই হইল (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) বরাহনগর মঠে যোগদান করিয়াছেন—কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সম্প্রতি শ্রীশ্রীমার আদেশে আলমবাজার মঠ হইতে পুনরায় গৃহে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। বাড়ীতে থাকিলেও কালীকৃষ্ণের অন্তর্মুখ প্রকৃতি সংসারকে আমল দিতে পারিতেছিল না কিছুতেই—সদাসর্বদা ধ্যান জপ পাঠ ইত্যাদিতেই রুদ্ধ কক্ষে দিন কাটাইতেছিলেন। এই সময়ে সুধীর প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার কাছে যাইয়া ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন। কালীকৃষ্ণের মুখে বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের নানা কথা, সুধীর তন্ময় হইয়া শুনিতেন।

ইতোমধ্যে সুধীর কিছুদিনের জন্য কাশীধামেও গিয়াছিলেন। তখন স্বামী অদ্বৈতানন্দজী সেখানে তপস্যারত—সুধীর তাঁহার পুণ্য সাহচর্যে বেশ আনন্দেই ছিলেন—কিন্তু সহসা জ্বর হওয়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহা ১৮৯৬ সালের কোনও সময়ের কথা!

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস। পাশ্চাত্যদেশে বেদান্তের বিজয়কেতন উড়াইয়া, স্বামিজী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জন্মভূমি কলিকাতার মাটিতে আজ স্বামিজীর পদার্পণ হইবে—শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাই জন-প্লাবন ছুটিয়াছে। সুধীরের পক্ষেও ঘরে বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না। যাঁহার আশায় এতদিন পথ চাহিয়াছিলেন, আজ তাঁহার দর্শন মিলিবে। অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই সুধীর শিয়ালদহের পথে বাহির হইয়াছেন। ক্রমে স্বামিজীর ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল। বড়ই আশ্চর্য, প্লাটফর্মের যে স্থানে দাঁড়াইয়া সুধীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন, স্বামিজীর গাড়ীটি ঠিক সেইখানে তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া থামিল। চারিচক্ষের মিলন হইল,—সুধীরচন্দ্রের জীবনের গতি বুঝি আজ হইতেই নূতন উদ্যমে, নূতন বেগে প্রধাবিত হইয়া

চলিল। স্বামিজী যুক্ত করে গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর অভিবাদন গ্রহণ করিলেন, আর আকর্ষণ করিলেন জনসমুদ্রের মাঝে অখ্যাত যুবক সুধীরচন্দ্রের হৃদয়টিকেও। "জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকী জয়", "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকী জয়"—এই আনন্দধ্বনিতে গগন ভরিয়া উঠিল। সুধীরও সেদিন প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়াছিলেন।

স্বামিজীকে ট্রেন হইতে নামাইয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট একখানি সুসজ্জিত গাড়ীতে তাঁহাকে উঠানো হইয়াছিল। উৎসাহী যুবকের দল গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই উহা টানিয়া নিয়া চলিয়াছিল, সুধীরও তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে তাঁহাকে সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শিয়ালদহ স্টেশন হইতে রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তায় বর্ণাঢ্য পতাকা, ফুল, লতা-পাতায় সুসজ্জিত নানাবিধ বাদ্য ও সঙ্গীতমুখর শোভাযাত্রাটি একটি তরঙ্গোচ্ছল নদীর মতো বহিয়া চলিতেছিল। স্বামিজীর গাড়ী ক্রমশঃ রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) দিকে অগ্রসর হইবার কালে, সুধীরও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিলেন। রিপন কলেজে গিয়া স্বামিজীর গাড়ী থামিলে—বেশ ভালভাবেই তাঁহার দর্শন হইয়াছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে স্বামিজী এখানে দুই-চারি কথা ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। সেদিনের সেই বিশাল জনসমুদ্র ঠেলিয়া স্বামিজীকে তিনি যে-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সে-রূপের একখানি উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সুধীরের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকালই সযত্নে রক্ষিত ছিল। সে প্রতিকৃতির বর্ণনা তাঁহার নিজের ভাষায় এইরূপ: "মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র।"

কলিকাতায় ফিরিয়া বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাটীতে স্বামিজী অবস্থান করিতেছেন। বন্ধু খগেনের সহিত সুধীর সেই প্রথম দিন বৈকালেই আবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে উপস্থিত হইলেন। স্বামী শিবানন্দজী যুবকদ্বয়কে দ্বিতলে স্বামিজীর কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এরা আপনার খুব admirer"। কিন্তু তখন স্বামিজী তাঁহার গুরুভাইদের সহিত কথাবার্তায় এতই মগ্ন ছিলেন যে সুধীররা আলাপ করিবার সুযোগ মোটেই পান নাই। প্রণাম করিয়াই বিদায় লইতে হইয়াছিল। গুরুভাইদের সহিত স্বামিজীর সেদিনকার একটি কথা

কিন্তু সুধীরের স্মৃতিতে চির-অক্ষয় হইয়াছিল। যোগেন মহারাজকে স্বামিজী বলিতেছিলেন, "দেখ্ যোগে, দেখলুম কি জানিস্?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটিকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্যদেশীয়রা সেইটিকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।"

কয়েকদিন পরে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে স্বামিজীর থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখানেই সুধীরের সঙ্গে স্বামিজীর প্রথম সাক্ষাৎ-কথোপকথন হয়। একদিন সুধীর আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিতেই স্বামিজী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি তামাক খাস্?" অন্য কেহ তখন সেখানে ছিলেন না। সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না।" তাহাতে স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ, অনেকে বলে—তামাক খাওয়া ভাল নয়—আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।" আর একদিন স্বামিজীকে দর্শন করিতে গিয়া দেখেন, তিনি সিংহের ন্যায় ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত নানাবিষয়ে কথাও বলিতেছেন। সুধীরের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়াছে, অথচ সম্মুখে আগাইয়া গিয়া উহা উত্থাপন করিতেও সাহস পাইতেছিলেন না। অবশেষে শরৎবাবুকে তাঁহাদের হইয়া ঐ প্রশ্নটি উত্থাপন করিবার অনুরোধ জানাইতে, তিনিই স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি ছিল এই: "অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষে পার্থক্য কি?" সুধীর শরৎবাবুর পিছনে থাকিয়া স্বামিজীর উত্তর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে স্বামিজী সেদিন যাহা বলিয়াছেন, সুধীরের মানসপটে তাহা চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। স্বামিজী উক্ত প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর না দিয়া বলিয়াছিলেন, "বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সংকল্প করেছি, কত ধ্যান, কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও

অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।" হৃদয়ের সবটুকু আবেগ মিশাইয়া বুঝি স্বামিজী এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। এমন করুণামাখা উক্তি কি মানুষে সম্ভব? সুধীর সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার?"

যাহা হউক, যাতায়াত ও দেখাশুনা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল—অন্তরের টানও তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। বন্ধু খগেনের সহিত আবার একদিন সন্ধ্যার পর সুধীর গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবু স্বামিজীর সঙ্গে যুবকদ্বয়কে বিশেষভাবে পরিচিত করাইবার জন্য বলিলেন, "স্বামিজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।" বেদান্তের কথা শুনিয়াই স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?" সুধীর ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।" স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?" সুধীর বারকয়েক ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "কঠ-উপনিষদ্ পড়েছি।" স্বামিজী সহসা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, কঠটাই বল। কঠ-উপনিষদ্ খুব grand— কবিত্বপূর্ণ।" সুধীর তো মহা ফাঁপড়ে পড়িলেন। যদিও সমগ্র গীতা তখন তাঁহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু উপনিষদ্ ভাল মুখস্থ ছিল না। খুব বিনয়ের সহিত বলিয়া ফেলিলেন, "কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।" স্বামিজী বলিলেন, "আচ্ছা তাই বল।" তখন গীতার একাদশ অধ্যায়স্থ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা" ইত্যাদি অর্জুনকৃত সমগ্র স্তবটি অতিশয় শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিয়া স্বামিজীকে শুনাইলেন। স্বামিজী খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ বেশ।"

ইহার ঠিক পরের দিন বাল্যবন্ধু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে[১] সঙ্গে লইয়া সুধীর পুনরায় স্বামিজীর দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। একখানি পকেট সংস্করণ উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রসন্ন শাস্ত্রী-কৃত) সেদিন পকেটে করিয়া লইয়া

১ প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত। উত্তরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী নামে পরিচিত হন। কৈশোরে সুধীর একবার বৈরাগ্যের আবেগে যখন গৃহ ছাড়িয়া কাশীধাম পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন এই রাজেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

গিয়াছিলেন—যদি আজও আবার স্বামিজী উপনিষদ্ আবৃত্তি করিতে বলেন, এই আশঙ্কায়। স্বামিজীর নিকট সেদিন একঘর লোক। কিন্তু যাহা ভয়, ঠিক তাহাই হইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গই আবার উঠিল। সুধীর তো পকেট হইতে ছোট বইটি বাহির করিয়া কঠ-উপনিষদের গোড়া হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মূর্তিমান উপনিষদের সম্মুখে বসিয়া সুধীর বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের ন্যায় পাঠ করিয়া যাইতেছেন,—স্বামিজী মাঝে মাঝে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভঙ্গিতে উপনিষদুক্ত মন্ত্রগুলির অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যেই যেন ব্রহ্মতেজ সঞ্চারিত করিতেছিলেন। সুধীরের নিজের ভাষায়—"এই দুইদিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামিজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।" স্বামিজীর দ্বারা এইভাবে অনুপ্রাণিত সুধীরের উপনিষদ্-প্রীতি আমৃত্যু ছিল—উপনিষদ্‌কে স্বামিজী যেন তাঁহার রক্তস্রোতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীর কম্বুকণ্ঠের উপনিষদ্ উচ্চারণ সুধীরের হৃদয়তন্ত্রীতে তাই ঝঙ্কার তুলিত চিরকাল। 'স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি'-তে তিনি উত্তরজীবনে লিখিয়াছেন: "বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত বিভিন্ন স্বর লয় ও তালে, তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা—

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।

—মুণ্ডক, ২।২।৫

'সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।'

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥—কঠ, ২।২।১৫

'সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।'

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামিজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন,—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।—শ্বেতাশ্বতর, ২।৫

*   *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥—শ্বেতাশ্বতর, ২।৮

'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।' "

দিন যায়, রাত্রি যায়, সুধীর কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র ভাবনাতে—সমস্ত সত্তাতে স্বামিজী ধীরে ধীরে জুড়িয়া বসিতেছেন। গুজরাটি পণ্ডিতমণ্ডলী সেদিন স্বামিজীর সহিত শাস্ত্র-বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সুধীরও সেদিন মঠে উপস্থিত ছিলেন। অহঙ্কৃত পণ্ডিতগণ বিচারে পরাভব মানিয়াও অবশেষে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "স্বামিজী তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে উঁহার চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে, সেই শক্তিবলেই তিনি নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।" সুধীর বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাতীরে গিয়া পণ্ডিতগণের এ হেন মন্তব্য শুনিয়া বিস্ময়ে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন,—"চক্ষে এ মোহিনী শক্তি স্বামিজীর কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার জন্য যদি কৌতূহল হয়, তবে তাঁহার শ্রীগুরুর

সহিত দিব্য সম্বন্ধ এবং অপূর্ব সাধনবৃত্তান্ত একবার শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা কর—ইহার সন্ধান পাইবে।”

স্বামিজীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর হইতে দুইটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। স্বামিজীর আকর্ষণ ঠেলিয়া সুধীরের পক্ষে আর সংসারে থাকা সম্ভব হইতেছিল না—পড়াশোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইল, আবাসগৃহকে পাতকুয়ার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, কনিষ্ঠ সহোদর সুশীল ইতোমধ্যেই সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে গিয়া যোগ দিয়াছেন। সুধীরের বৈরাগ্য-বহ্নি ইহাতে কিছুমাত্র স্তিমিত তো হয়ই নাই, বরং উত্তরোত্তর উহার দাহ তাঁহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই কালের মানসিক অবস্থা তাঁহার নিজের মুখের বর্ণনায় এইরূপ: “আমার ছোট ভাই স্বামী প্রকাশানন্দ প্রথম মঠে যোগদান করেন। তাঁর সাধু হবার পর বেশ কিছুদিন আমার যে কি অবস্থা গিয়েছে তা বলার নয়। বাড়ী ছেড়ে সাধু হওয়া, কি বাড়ীতে থেকেই ধর্মজীবন যাপন করা—কোনটি আমায় সিদ্ধিলাভের সহায়ক হবে এই চিন্তায় বিষম সংশয়াকুলচিত্তে মাসের পর মাস কাটিয়েছি। মনে ঘোর অশান্তি—কিছুই স্থির করে উঠিতে পারছিলাম না। আলমবাজার মঠে যাতায়াতও নিয়মিত চলছে। এমন সময়ে একদিন একজন সাধুর মুখে শুনলাম, ‘ঐ যে গাজনের সন্ন্যাসী দেখছ, এরাও ঠিক ঠিক করলে যে ক’দিনের জন্যই হোক, সংসারীদের চেয়ে এরা অনেক উঁচুতে।’ এই কথা শোনামাত্রই মনে জোর এতো পেলুম যে, সেই দিনই সাধু হবার সঙ্কল্প ঠিক করে ফেললাম। মনে আর কোনও দ্বিধা থাকল না।”

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল তখন। সুধীর গৃহত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে আসিয়া যোগদান করিলেন। স্বামিজী তখন দার্জিলিং-এ। যাহা হউক, দুই চারিদিনের মধ্যেই স্বামিজী মঠে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী যোগানন্দজী, স্বামিজীর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি. জি. নরসিংহচারিয়া প্রভৃতি। স্বামিজী তো সুধীরকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন—স্নেহভরে কখনও কখনও তাহাকে ‘খোকা’ বলিয়া ডাকিতে থাকিলেন। সুধীরও স্বামিজীর পদপ্রান্তে স্থান পাইয়া ভাবিলেন, এতদিনে তিনি নিজস্ব ঘরে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছেন।

মঠে পুরাতন ও নূতন সাধু-ব্রহ্মচারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। মঠের সকলের জন্য বিশেষ করিয়া নবাগতদের জন্য একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ও কর্মধারা প্রবর্তিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেকেই অনুভব করিতেছেন তখন। স্বামিজীর নবদীক্ষিত সন্ন্যাসি-শিষ্য নিত্যানন্দজী এ সম্পর্কে স্বামিজীকে বলিলেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।" স্বামিজী এই প্রস্তাবে খুশীই হইলেন, এবং মঠস্থ সকলকে তাঁহার কাছে ডাকিতে বলিলেন। সসম্ভ্রমে সকলেই আসিয়া স্বামিজীকে ঘিরিয়া বসিলে, স্বামিজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখতে থাক্, আমি বলি।" কেহই স্বামিজীর সম্মুখে কলম লইয়া বসিতে সাহসী হইতেছিলেন না। যুবক সুধীর 'কতকটা forward ও বেপরোয়া' ছিলেন। যদিও মাত্র চার-পাঁচ দিন হইল তিনি মঠে যোগ দিয়াছেন। নিঃশঙ্ক-চিত্তে কাগজ কলম লইয়া তিনিই আগাইয়া আসিলেন। স্বামিজীও খুব প্রসন্ন হইয়া নিয়মাবলী বলিয়া যাইতে থাকিলেন—সুধীর একাগ্রমনে হুবহু নকল করিয়া লইলেন। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামিজী একটি কথা বুঝাইয়া দিলেন, "দেখ্, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাহিরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে আমাদের স্বভাবতঃই কু-নিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" পরে একে একে নিয়মগুলি সব লেখানো হইয়া গেলে, স্বামিজী সুধীরকে বলিলেন, "দেখ্, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস্ যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।" স্বামিজী-প্রণীত এবং সুধীর মহারাজ কর্তৃক শ্রুত-লিখিত এই নিয়মগুলিই কালে 'বেলুড়মঠের নিয়মাবলী' রূপে পরিণত হয়।

শুদ্ধচিত্ত ত্যাগব্রতী সুধীরকে স্বামিজীই 'ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ' নামে সঙ্ঘভুক্ত করেন, এবং পরে একদিন (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে,—বাংলা ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ) কৃপা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র

চক্রবর্তীর দীক্ষাও ঐ একইদিনে আলমবাজার মঠে ঠাকুরঘরে হইয়াছিল। মহামন্ত্র দান করিবার পূর্বে স্বামিজী শুদ্ধানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে?" শুদ্ধানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন, "কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও নিরাকার ভাল লাগে।"

ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ স্বামিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, "তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।" এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হাতটি নিজ হাতে ধরিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য দুই-চারি কথার পরে স্বামিজী বলিলেন, "······এই মন্ত্রে তোর সুবিধা হবে।"

শরৎবাবুর দীক্ষা কিছু পূর্বে হইয়া গিয়াছে—সম্মুখে দুই একটী লিচু পড়িয়াছিল—স্বামিজী শুদ্ধানন্দকে সেইগুলি লইয়া গুরুদক্ষিণা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দের স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত এক স্মৃতি-প্রসঙ্গ হইতে জানা যায় যে, ১৮৯৮ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে যখন তিনি আলমোড়ায় লালা বদরী শা'র বাড়ীতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর সাহচর্যে থাকিয়া সাধন-ভজনে রত ছিলেন, সেই কালে নিরঞ্জনানন্দজীই তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং অতঃপর তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামিজীর অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বরূপানন্দ তখন আলমোড়াতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের সম্পাদন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত দিনলিপিতে উল্লেখ দেখা যায়, শুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে, নিরঞ্জনানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।

স্বামিজী একদিন শুদ্ধানন্দ প্রমুখ সকল শিষ্যদের ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া নিজের কাছে বসাইয়া সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন—এবং আসন প্রাণায়াম ধ্যান জপ প্রার্থনাদি স্বয়ং শিখাইয়াছিলেন। স্বামিজীর আদেশে অতঃপর স্বামী তুরীয়ানন্দজী এই সকল নবীন সাধকদের অনেকদিন ধরিয়া সাধনানুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। "এইবার এই চিন্তা কর, তারপর এই রকম কর" বলিয়া তুরীয়ানন্দজী স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিজী-প্রোক্ত সাধনপ্রণালী মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

মঠের বড় হলঘরে স্বামিজীকে কেন্দ্র করিয়া একদিন বহু সাধু-ভক্ত মিলিত হইয়াছেন। নানা প্রসঙ্গ চলিতেছিল। হঠাৎ স্বামিজী শুদ্ধানন্দকে নির্দেশ করিলেন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে। নবীন ব্রহ্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া

পড়িলেন এবং শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ হইতে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রায় আধঘণ্টা ভাষণ দিলেন। স্বামিজী এই ভাষণ শুনিয়া শিষ্যকে খুব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর সেদিনের সেই উৎসাহবাক্য স্মরণ করিয়াই পরবর্তী কালে শুদ্ধানন্দজী আবেগ-কম্পিত লেখনীতে লিখিয়াছেন: "আর এরূপ উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা কোথায় পাইব? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, 'I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Every one of you *must* be a giant—*must* that is my word'.। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূর-বীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে—নহিলে চলিবে না।"

স্বামিজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি তখন ছোট ছোট পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া লণ্ডন হইতে ষ্টার্ডি সাহেব প্রকাশ করিতেছিলেন। মঠের সকলেই তখন পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেন। বুড়া গোপাল মহারাজ (অদ্বৈতানন্দজী) ইংরেজী ভাষায় তত অভিজ্ঞ ছিলেন না—অথচ তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে সাহেবদের কাছে কী বলিল, তাহা শুনেন। নূতন ব্রহ্মচারীদের দ্বারা তাই তিনি ঐ সব বক্তৃতাবলী পড়াইয়া উহাদের বাংলায় তর্জমা শুনিতেন। শুদ্ধানন্দও মঠে আসিয়া অবধি অদ্বৈতানন্দজীকে এইরূপ মুখে মুখে স্বামিজীর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ শুনাইতেন। এই উদ্যমে খুশী হইয়া স্বামী প্রেমানন্দজী নূতন ছেলেদের একদিন বলিলেন, "তোমরা স্বামিজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ লিখে ফেল না।" সব ছেলেরাই ইহাতে খুব উৎসাহ পাইয়া নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী বক্তৃতাগুলির অনুবাদ করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজী দার্জিলিং হইতে মঠে ফিরিয়া আসার পর স্বামী প্রেমানন্দজী একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।" পরে ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামিজীকে শুনাও দেখি।" সকলেই ইহাতে সাহস পাইয়া, নিজ নিজ অনুবাদ স্বামিজীকে শুনাইয়াছিলেন।—স্বামিজীও খুব প্রসন্ন হইয়া ঐ

সকল শুনিয়াছিলেন। একদিন স্বামিজীর কাছে শুদ্ধানন্দ একাই আছেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জমা কর না।"

গুরুর আদেশে শিষ্যের মধ্যে নূতন এক শক্তি সঞ্চারিত হইল। অবিলম্বে তিনি ঐ অনুবাদকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে বাংলাদেশে রাজযোগের প্রচার আদৌ তখন ছিল না—স্বামিজীকে এজন্য প্রায়ই আক্ষেপ করিতে শোনা যাইত। তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল বাংলাদেশে যথার্থ রাজযোগ প্রচারিত হউক। তাই শুদ্ধানন্দকে স্বামিজীর এইরূপ আদেশের পশ্চাতে, মনে হয় একটি গভীর তাৎপর্য আছে। শুদ্ধানন্দ নিজেও এই স্মৃতি-প্রসঙ্গে পরে লিখিয়াছেন, "আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামিজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম···রাজযোগের অনুবাদ করিলে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? যাহা হউক স্বামিজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" শুদ্ধানন্দও অতি আশ্চর্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এই অনুবাদের কার্যে। ক্রমে তিনি স্বামিজীর কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থগুলিরও অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীগুরুর ভাব ভাষা ও ভাবনায় তিনি এমনিই প্রভাবিত ছিলেন, তাঁহার অনুবাদকে স্বামিজীর মূল রচনা বলিয়াই মনে হয়। স্বামিজীর রচিত 'The Song of the Sannyasin' -এর কাব্যানুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি'-তে তিনি আশ্চর্য বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যই ইহার তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-প্রচারের ইতিহাসে শুদ্ধানন্দজীর নাম তাই চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের বাণীকে শুদ্ধানন্দজীই পৌছাইয়া দিয়াছেন—এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে।

অদ্ভুত স্মৃতিধর ছিলেন শুদ্ধানন্দ। "ভারতে বিবেকানন্দ"-গ্রন্থে 'গীতাতত্ত্ব'-শীর্ষক স্বামিজীর যে মনোজ্ঞ ভাষণটি সন্নিবিষ্ট দেখা যায়—উহা শুদ্ধানন্দেরই উক্ত শক্তির পরিচায়ক। মঠ তখন বেলুড়ে। সমবেত সকলের কাছে

স্বামিজী একদিন গীতা সম্পর্কে খুব উদ্দীপনাময় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলেই সেদিনে স্বামিজীর বাণী শুনিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর আগ্রহে প্রায় তিন-চারিদিন পরে, শুদ্ধানন্দ হুবহু স্বামিজীর কথাগুলিই লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই 'গীতাতত্ত্ব'। শুদ্ধানন্দের স্মৃতির পৃষ্ঠায় স্বামিজীর প্রতিটি ভাষাই বুঝি স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইত।—শুধু ভাষা কেন? প্রসঙ্গবিশেষে স্বামিজীর মুখচ্ছবিতে যেসব দিব্য ভাবান্তর লক্ষিত হইত, শুদ্ধানন্দের মানসপটে উহাও চিরকালের জন্য চিত্রিত হইত—ঐ সকল উজ্জ্বল চিত্রের ধ্যানে তিনি পরে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। গীতাভাষণরত স্বামিজীর সেদিনের মূর্তিটি তাঁহার মনশ্চক্ষে যে রূপে উদ্ভাসিত হইত, তাহা তাঁহারই ভাষায় ভিন্ন অন্য কথায় প্রকাশ সম্ভব নয়। ঐ স্মৃতিপ্রসঙ্গে তাঁহার উদ্দীপিত ভাষা: "হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে ছবি এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামিজীকে দেখিবার চেষ্টা কর······স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, 'যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।' 'মহাপাপীকে ঘৃণা করো না' এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে —তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।"

ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের দুর্লভ সুযোগ শুদ্ধানন্দের জীবনে প্রচুর মিলিয়াছে। এই কারণেই শাস্ত্রের মর্মার্থসকল তাঁহার নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া গিয়াছিল। একবার ব্রহ্মসূত্র পড়াইতে পড়াইতে স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকল সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর্।" প্রতিটি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝাইয়াই স্বামিজী ক্ষান্ত হইতেন না—ভাষার যথার্থ উচ্চারণের দিকেও বিশেষ জোর দিতেন। শুদ্ধানন্দকে এবিষয়ে একবার বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করিলে সকলেই

শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারে। কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্তরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই এই রকম উচ্চারণ আমাদের এখন এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্ ম্‌া' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্ত্াঁ' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি।" শুদ্ধানন্দকে অনেক সময়ে স্বামিজী সংস্কৃতে চিঠিপত্রও লিখিয়াছেন। আচার্য-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করায় শুদ্ধানন্দের শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ একদেশদর্শিতা দোষ অনুপ্রবেশ করে নাই। স্বামিজীর ভাবাবলম্বনে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও লিখিয়াছিলেন। উহা প্রকাশিত হইলে শাস্ত্রজিজ্ঞাসুদের অশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই। ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাপনাকালে স্বামিজী শুদ্ধানন্দপ্রমুখ শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈত মতেরই পোষক, এ কথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সকল সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণ-স্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য তদ্‌যোগং শাস্তি।' (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯)—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।"

ত্যাগী শিষ্যদের আত্মজ্ঞানের পথে উদ্বোধিত করিতে, এবং তাঁহাদের দেহ-মনের উপযুক্ততা সাধনের প্রতি স্বামিজীর কি কঠোর দৃষ্টি ছিল! কামিনী-কাঞ্চনের লেশমাত্র দাগও প্রিয় শিষ্যদের অন্তরে না লাগে এজন্য তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না। উত্তম আচার্যের লক্ষণই এইরূপ। শুদ্ধানন্দকে যোগ্য অধিকারী তৈয়ার করিতে হইবে বলিয়াই তাঁহার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে আচার্যের প্রখর দৃষ্টি থাকিত। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে যানবাহন বা পথঘাটের সুযোগ সুবিধা বিশেষ ছিল না। একখানি সংবাদপত্র পাইতে গেলেও, তাই বহু আয়াস করিতে হইত। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রটি তখন বিনামূল্যে মঠে দেওয়া হইত। কিন্তু উহা বরাহনগরের একটি বিধবাশ্রম হইতে নিত্য লইয়া আসিতে হইত—কারণ বরাহনগরের পরে উহার বিলি ছিল না। অথচ মঠের তখন অর্থসংস্থানও এমন ছিল না যে

ডাকখরচ দিয়া ঐ পত্র লওয়ার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং পত্রিকা-পিয়ন ঐ আশ্রমের কাগজের সহিত মঠের কাগজখানিও সেখানেই বিলি করিয়া যাইত। নির্ভয়ানন্দের উপর ভার ছিল প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে ঐ কাগজ-খানি বরাহনগর হইতে লইয়া আসা। নির্ভয়ানন্দ একদিন শুদ্ধানন্দকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল, জায়গাটি তাঁহাকে দেখানো থাকিলে, শুদ্ধানন্দও কখনও যাইয়া কাগজ আনিতে পারিবেন। নির্ভয়ানন্দের উপর তখন নানা-প্রকার কাজের ভার ছিল—চাপও ছিল খুব। এদিকে দ্বিপ্রহরে স্বামিজী বেদান্ত পড়াইবার জন্য শুদ্ধানন্দকে ডাকিয়াছিলেন। যাহা হউক শুদ্ধানন্দ মঠে ফিরিয়া শুনিলেন, মহিলাদের আশ্রমে তাঁহার যাওয়া স্বামিজী পছন্দ করেন নাই। সে-কাজের ভার যখন তাঁহার উপর ছিল না, তখন কোনও অজুহাতেই মহিলা-আশ্রমে তরুণ সাধুর যাওয়া উচিত নহে। শুদ্ধানন্দের জীবনে এক মহৎ শিক্ষালাভ হইল। নির্ভয়ানন্দকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, আর কখনও তাঁহার কাগজ আনিতে যাওয়া হইবে না। ত্যাগিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শুদ্ধানন্দের জীবনে এই শিক্ষা আজীবন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলিত দেখা যাইত। উত্তরজীবনে তাঁহার স্বলিখিত উক্তি : "যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও বাজিতেছে—'দেখ্ বাবা ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তাঁরা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে বলছি। আমি সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস্ নে যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করবো, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—। ...তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয় সেইজন্য এইভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভিতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকু ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।"

জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমষ্টিবিগ্রহ স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিয়া শুদ্ধানন্দ এক অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর আশীর্বাদে—তাঁহার অমোঘ শিক্ষাগুণে, শুদ্ধানন্দের জ্ঞানবিচার ও ভক্তি-উপাসনা, এবং কর্মসাধনা ও যোগাভ্যাস, একই ভূমিতে সমান্তরাল গতিতে চলিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে বেলুড়ে মঠবাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় স্বামিজী শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ শিষ্যদের বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—মন্দিরে আরাত্রিকের সময় হইয়াছে। বাবুরাম মহারাজ আসিয়া সকলকে আরাত্রিকে যাইবার জন্য বলিলে, নবীন সাধুরা বড় অপ্রস্তুত হইলেন। একদিকে স্বামিজীর নিকট বেদান্ত-শ্রবণের আকর্ষণ, আর অন্যদিকে মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিক। শিষ্যদের এই দোলায়মান অবস্থা দেখিয়া স্বামিজী বাবুরাম মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতেপোড়া নাড়লে আর ঝাঁঝ পিটলেই মনে করছিস্ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?"

শুদ্ধানন্দের কর্মকুশলতায় স্বামিজীর গভীর আস্থা ছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি অনেক সময়েই তিনি শুদ্ধানন্দকে দিয়া লেখাইতেন। একদিন এই শিষ্যকেই স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন, "দেখ্, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা রিপোর্ট পাঠাবি।" শুদ্ধানন্দ সারা জীবন এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত দিনপঞ্জী অদ্যাপিও মঠে সংরক্ষিত আছে—মঠের ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস এবং স্বামিজী সম্পর্কীয় বহু ঘটনাবলী উহা হইতে জানা যায়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে, স্বামিজী যখন পশ্চিম ও উত্তর ভারত অঞ্চলে প্রচার-সফরে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন কিছুকাল পরে শুদ্ধানন্দও তাঁহার সঙ্গী হইবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। এই পরিভ্রমণকালে প্রায় ছয়মাস শ্রীগুরুর একান্ত সন্নিধি শুদ্ধানন্দের জীবনে এক মহামূল্যবান সঞ্চয়। একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামিজী পাঞ্জাব ও রাজপুতনা ভ্রমণকালীন, শরীরের দিকে নজর রাখিতে—অথচ কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া তপস্যাদি করিতে খুব বলিতেন আমাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ—উহার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা এবং বিশ্বের নানা সমস্যা প্রসঙ্গে স্বামিজীর বৈদ্যুতিক চিন্তাপ্রণালীর সহিত এই প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ, শুদ্ধানন্দের উত্তরজীবনে

সঙ্ঘ-পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী ও ফলপ্রদ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বুঝি বা শিষ্যের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ সাধন করিয়া, সঙ্ঘের অন্যতম ভাবী কর্ণধাররূপে তাঁহাকে গঠন করিবার জন্যই স্বামিজী এইভাবে নবাগত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। শিষ্যের শ্রদ্ধা, মেধা, শাস্ত্রানুরাগ ও বেদান্তপ্রীতি স্বাভাবিকভাবেই আচার্যের প্রসন্নতা অর্জন করিয়াছিল। স্বামিজী একদা শুদ্ধানন্দকে স্নেহভরে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই পণ্ডিত হবি।" স্বামী শুদ্ধানন্দের উত্তরজীবনে এই আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল—গুরুকৃপায় তিনি যথার্থই তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর সহিত উক্ত পরিভ্রমণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, শুদ্ধানন্দের নিজের কথায় এইরূপ:

"১৮৯৭ সালের শেষভাগে যখন আলমবাজার মঠে ছিলাম, তখন স্বামিজীর আহ্বানে আমি ও বিজ্ঞানানন্দ স্বামী পশ্চিমে গিয়াছিলাম। তখন স্বামিজী নানা স্থানে ঘুরিতেছিলেন, সুতরাং কোন্ স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইব তাহা জানা ছিল না। স্বামিজীর নির্দেশমতো আমরা প্রথমে আম্বালায় গিয়া কিছুদিন থাকি। তারপর স্বামিজীর জনৈক গুরুভ্রাতা[1] বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে পাহাড়ে একটি জমি নির্বাচনের জন্য দেরাদুনে লইয়া যান। আমি আম্বালাতেই কিছুদিন থাকিয়া যাই। পরে সংবাদ পাইয়া স্বামিজীর সহিত মিলিত হইবার জন্য লাহোরে গমন করি। কিন্তু স্বামিজী কবে লাহোরে পৌঁছিবেন ইহা আমার ঠিক জানা ছিল না। সুতরাং ষ্টেশনে অপেক্ষা না করিয়া পত্রলিখিত একটি ঠিকানায় চলিয়া যাই। পরে জানিতে পারি যে আমার লাহোর ষ্টেশনে পৌঁছিবার ঘণ্টাখানেক পরেই স্বামিজী তথায় পৌঁছিয়াছেন এবং লাহোরে সনাতনী ও আর্যসমাজী জনসাধারণ স্বামিজীর বিশেষরূপ অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। এদিকে স্বামিজী মনে করিয়াছিলেন তিনি আমাকে ষ্টেশনে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাহা না পাইয়া এতো অভ্যর্থনার গোলমালের মধ্যেও আমার খবর লইবার জন্য আম্বালায় একখানি pre-paid তার প্রেরণ করেন। অবশ্য রাত্রেই স্বামিজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামিজীর আমার প্রতি অহেতুকী

১ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

ভালবাসা দেখিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হই। লাহোরে স্বামিজীর যে-সকল বক্তৃতাদি হয়, তৎসম্বন্ধে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইতে বিস্তারিত পড়িয়াছ। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ লেখা বাহুল্য।

"সংক্ষেপে দুই-একটি কথামাত্র লিখিতেছি। ঐ স্থানে তখন Great Indian Circus কোম্পানীর অধ্যক্ষ circus লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় স্বামিজীর সহিত কুস্তির আখড়ায় কুস্তি করিতেন। বহুকাল পরে স্বামিজীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া তিনি এতো বিহ্বল হন যে, তিনি কি বলিয়া তাঁহার বাল্যবন্ধুকে সম্বোধন করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। স্বামিজী তখন তাঁহাকে পূর্বপরিচিতভাবে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সঙ্কোচ ভঙ্গ করিয়া দেন।

"এখান হইতে দেরাদুনে যাওয়া হয়। তথায় স্বামিজীর শরীর ভাল ছিল না, তথাপি আমাদিগকে[১] সর্বদা বেদান্ত ইত্যাদি অধ্যাপনা করাইতেন এবং বলিতেন আমার এখনও ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর উপযোগী মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি। কিন্তু কি করিব শরীরে উহা সহিবে না। যাহা হউক ওখান হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি আমাদের কয়েকজনকে পদব্রজে সাহারাণপুরে আসিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এইকালে তিনি আমাদিগকে খুব সন্ন্যাস ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। এখানে একটি ঐ দেশীয় ছেলে সামান্য বেতনে আমাদের বাসন প্রভৃতি মাজিত। সে ক্ষত্রিয় জাতীয় শুনিয়া স্বামিজী তাহাকে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা দিবার আশায় সঙ্গে লইয়া রাজপুতনা ক্ষেত্রী পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তাহার উপনয়ন দিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু ছেলেটির অদৃষ্টদোষে স্বামিজীর শুভ ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

"সাহারাণপুর হইতে দিল্লী হইয়া রাজপুতনার আলোয়ার ও জয়পুরে কিছুদিন করিয়া থাকিয়া তথা হইতে স্বামিজীর শিষ্য ক্ষেত্রী-রাজার রাজ্যে যাওয়া হয়। ঐ স্থান জয়পুর হইতে ৯০ মাইল দূরবর্তী। এই-সকল স্থানে স্বামিজী আমাদিগকে নিরামিষ ভোজনের জন্য খুব উৎসাহিত করিতেন।

---

১ গুপ্ত মহারাজ (সদানন্দ), গুড্উইন, সেভিয়ার দম্পতি এবং অচ্যুতানন্দ সরস্বতী নামে স্বামিজীর অনুরাগী জনৈক আর্যসমাজী সাধুও এই সময়ে স্বামিজীর সঙ্গে ছিলেন। স্মরণ থাকা দরকার যে, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজী পূর্ব হইতেই দেরাদুনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সময় সময় বলিতেন, 'দ্বাদশ বৎসর নিরামিষ ভোজন করিতে পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায়।' দিল্লীতে স্বামিজী তাঁহার পূর্বপরিচিত ধনী ব্যক্তির গৃহে না যাইয়া সামান্য অবস্থাপন্ন ভক্ত গৃহে কাটাইয়াছিলেন। আলোয়ারেও তদ্রূপ। এই সকল স্থানে স্বামিজী আমাদিগকে অশ্বারোহণ প্রভৃতিও শিক্ষা করিতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মোট কথা স্বামিজী এইরূপ চেষ্টা করিতেন, যাহাতে তাঁহার ভক্ত বা শিষ্য আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক সর্বপ্রকার শিক্ষা পাইয়া একজন সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ হইতে পারে।

"তোমার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া, তোমাকে সংক্ষেপে স্বামিজীর সহিত আমার পশ্চিম ভ্রমণের কথা কিছু লিখিলাম। পত্রের দ্বারা ইহা বিস্তারিত লেখা অসম্ভব।......"

—অপ্রকাশিত একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত।

(বেলুড় মঠ, ১৪।১।৩৮)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসের প্রাক্‌কালে শুদ্ধানন্দ আলমোড়াতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর সহায়তায় বেশ কিছুদিন ধ্যান-ভজন ও তপস্যাদিতে কাটাইয়াছেন। এই সময়ের স্মৃতি-প্রসঙ্গে তিনি উত্তরজীবনে জনৈক সন্ন্যাসীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"ঐ সময়ে তাঁহার (নিরঞ্জনানন্দজীর) সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত।......এবং আমাকে তপস্যার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কালীকৃষ্ণ মহারাজকে (বিরাজনন্দকে) মঠ হইতে লইয়া আসিয়া, আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকিব এবং কোথাও একান্তে সাধন-ভজন করিব। তিনি আমাকে কালীকৃষ্ণ মহারাজকে লিখিতে বলিয়াছিলেন—আমি লিখিয়াও ছিলাম—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার আসিবার সুবিধা হয় নাই। সেই সময়ে তিনি (নিরঞ্জনানন্দজী) নিজেকে ঠাকুরের কথিত ঈশ্বরকোটির মধ্যে অন্যতমরূপে বলিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ আছে। যাহা হউক ১৮৯৮ সালের বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার সঙ্গে আমি কাশী নামিয়া আসি।" তাঁহার লেখা এই দীর্ঘপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, নামিবার কালে আলমোড়া হইতে কাঠগুদাম পর্যন্ত ৩৭ মাইল পথ তিনি পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন। কাঠগুদাম হইতে অবশ্য উভয়ে ট্রেন ধরিয়াছিলেন। মাদার সেভিয়ার উভয়ের পাথেয় বাবদ পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়াছিলেন তখন, কেবল নিরঞ্জনানন্দজীর জন্য লালা বদরী শা' একটি ঘোড়ারও ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছিলেন কাঠগুদাম পর্যন্ত। পথে শুদ্ধানন্দের শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল —পেটের অসুখের জন্য বেশ কষ্ট ভুগিতে হয়।

কাশীধামে আসিয়া বংশীদত্তের বাগানে শুদ্ধানন্দ পুনরায় নিরঞ্জন মহারাজের সাহচর্যে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় রত হন। বাগানের একটি জীর্ণ দোতলা বাড়ীতে তাঁহাদের আসন হইয়াছিল—শরীর যাত্রা নির্বাহ হইত ছত্রের ভিক্ষায়। শুদ্ধানন্দের উত্তরকালীন স্মৃতিপ্রসঙ্গ: "আমি নিরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে এই বাড়ীতে আড়াই মাস বাস করিয়াছিলাম। নিরঞ্জন মহারাজ একটা নীচের ঘরে থাকিতেন—দোতলার ঘরে আমি থাকিতাম। প্রথমদিন সরকার মহাশয় (বাগানের তত্ত্বাবধায়ক) আমাদিগকে খাওয়ান—পরের দিনেই নিরঞ্জন মহারাজ ও আমি ওখান হইতে এক মাইল দূরে ছত্রে প্রত্যহ যাইতে আরম্ভ করি। পূর্বে অদ্বৈতানন্দজী থাকিতেন—তাঁহার মাধুকরীর জন্য ভিক্ষাপাত্র ছিল। নিরঞ্জন মহারাজ আমার ও তাঁহার জন্য দুইটি ঐরূপ পাত্র এবং রুটি বা ভাত লইবার জন্য ঝুলি যোগাড় করেন—এক এক পয়সা দিয়া দুইটি মাটির থালাও কেনা হয়—তাহাতেই আমরা খাইতাম, আবার ধুইয়া রাখিতাম। মাধুকরী ছত্রে হইত—রুটি ও অরহড় ডালই বেশীর ভাগ পাওয়া যাইত। তখন পাঁচ-ছয়টি ছত্র ছিল—এক-আধটি ছত্রে রুটি ডালের উপর একমুঠা ভাত পাওয়া যাইত—তরকারি না'র মধ্যে। লেবু যোগাড় করিয়া নুনে জরাইয়া, টাকনা দিয়া খাওয়া হইত।"

উল্লিখিত স্মৃতিচারণ সম্বলিত পত্রখানি হইতে আরও জানা যায় যে, কঠিন এই তপশ্চর্যার কালে নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্‌ভজনে শুদ্ধানন্দের জীবনস্রোত তখন খুব আনন্দে বহিয়া চলিয়াছিল—কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার শরীর বিশেষ ভাঙ্গিয়া পড়ায় এই অনাবিল তপস্যার স্রোতে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রমাগত জ্বর ও পিত্ত বমিতে শুদ্ধানন্দের শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়ে—নিরঞ্জনানন্দজী তখন তাঁহাকে লইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মহারাজের পরিচিত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাসকে দিয়া তখন চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু শুধু চিকিৎসায় কি হইবে? উপযুক্ত পথ্যাভাবে চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছিল না—ঘুরিয়া ফিরিয়া বার-বারই জ্বর ও বমি হইতেছিল। আবার নিরঞ্জন মহারাজেরও জ্বর হওয়ায়—তিনি নিজেও তেমন সুস্থ ছিলেন না।

ঐ কালে প্রমদাদাস মিত্র সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জন মহারাজের পথ্যের জন্য একটি টাকা দিয়াছিলেন। কাল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমদাদাস মিত্র প্রদত্ত ঐ একটি টাকার মূল্যই কিন্তু সেদিন অপরিসীম ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, এই কাশীধামেই, স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য চারুবাবুর—উত্তরকালে যিনি স্বামী শুভানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন, শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। চারুবাবুই তখন শুদ্ধানন্দের জন্য নিজ ব্যয়ে পথ্যাদি প্রস্তুত করাইয়া পীড়িত গুরুভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিরঞ্জনানন্দজীরও চিন্তার ভার অনেকখানি লাঘব হইয়াছিল। চারুচন্দ্র কিন্তু তখনও স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নাই—উহা আরও অনেক পরের ঘটনা। তবে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর পবিত্র সান্নিধ্য ও প্রভাব এবং শুদ্ধানন্দের তপোময় জীবন-স্পর্শ চারুচন্দ্রকে তাঁহার উত্তর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। শুধু চারুচন্দ্রই নহে, কাশীতে কেদার নাথ মৌলিক নামে আর একজন ভাবের ভাবুকের সহিতও শুদ্ধানন্দের সৌহার্দ্য হয়। এই কেদারনাথই পরবর্তী কালে স্বামিজীর বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী অচলানন্দ বা 'কেদার বাবা'।

প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দ তখনও কাশীধামে জীবিত—শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গাদির সুযোগ হইয়াছিল। স্মরণ থাকা দরকার যে, এই ভাস্করানন্দের সঙ্গে বহু বৎসর পূর্বে একদা স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল—কিন্তু তখন তিনি স্বামিজীকে "ছেলেমানুষ" ভাবিয়া উপযুক্ত অভ্যর্থনা করেন নাই। দীর্ঘকাল পরে, শুদ্ধানন্দকে কাশীধামে পাইয়া এবং স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য জানিয়া তাঁহাকে খুবই আদর-যত্ন করেন। শুদ্ধানন্দের দুইটি হাত ধরিয়া স্বামী ভাস্করানন্দ অনুনয় বিনয় করিয়া বলেন—একটিবার স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে। নিরঞ্জনানন্দজীকেও স্বামিজীর গুরুভাই জানিয়া, ভাস্করানন্দ স্বামী সমাদরের সঙ্গে একদিন ভোজন করান এবং তাঁহার নিকটেও স্বামিজীর সহিত আর একবার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ দেখান। নিরঞ্জনানন্দজী স্বামিজীকে এই মর্মে এক পত্রও লিখিয়াছিলেন—কিন্তু পরস্পরের আর দেখাশোনা ঘটানো সম্ভব হয় নাই। স্বামিজী পরে বেলুড় মঠে শুদ্ধানন্দের মুখে ভাস্করানন্দের এই আগ্রহের কথা সবিশেষ শুনিয়া খুব বিনয় সহকারে একখানি সংস্কৃতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজী আমেরিকা হইতে ফিরিবার পরে, তখন কাশীধামে আসিয়াছিলেন। সারদানন্দজী সেই কালে শুদ্ধানন্দের ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শুদ্ধানন্দকে বুঝাইয়া তপস্যা হইতে ফিরাইয়া মঠে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তপস্যায় বিরত করিতে পারেন নাই। শুদ্ধানন্দের তৎকালীন তপশ্চর্যা এতো কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ছিল যে, প্রচণ্ড মশার উৎপাতও অম্লানমুখে সহ্য করিতেন। তাঁহার মুখে গায়ে মশা দংশনের চিহ্ন দেখিয়া, সারদানন্দজী জোর করিয়া তিন টাকা দিয়া তাঁহার জন্য, চারুবাবুর দ্বারা একটি মশারি কিনিয়া দিয়াছিলেন।

শুদ্ধানন্দের স্বাস্থ্যের কিন্তু অবনতিই হইতে থাকিল—ক্রমাগত জ্বর হইতে থাকায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত মঠেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মঠ তখন নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়া বাড়ীতে। নিরঞ্জনানন্দজী মাদার সেভিয়ারকে লিখিয়া, শুদ্ধানন্দের পাথেয় এবং তাঁহার জন্য একজোড়া জুতা কিনিবার খরচও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দ মঠে ফিরিয়া আসিলেও, নিরঞ্জনানন্দজী কিন্তু কাশীধামেই রহিয়া গেলেন।

শুদ্ধানন্দের সাধনার জীবনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর প্রভাব ও অবদানের কথা, তিনি উত্তর জীবনে নিজেই বার বার বলিতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী (শশী মহারাজ) প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ সহচরগণের জীবনের ছাপও তাঁহাতে প্রচুর বিদ্যমান ছিল। সাধুজীবনের শৈশবাবস্থায়, জ্বলন্ত হোমশিখার ন্যায় এই সকল মহাপুরুষদের অভিভাবকত্ব—তাঁহাদের সস্নেহ লালন-পালন-শাসনই শুদ্ধানন্দকে উত্তরোত্তর সুযোগ্য বিবেকানন্দ-ভাববাহীরূপে পরিণত করিয়াছে। শুদ্ধানন্দের লেখনীতে ব্যক্ত একটি পুরাতন স্মৃতি এখানে প্রকাশ করিলে, আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের গূঢ় মর্ম সহজেই অনুভব হইবে। শুদ্ধানন্দের একটি অপ্রকাশিত পত্রের অংশ এইরূপ: "আমার জ্বর ছাড়িবার পর খুব ক্ষুধা হইত—আমি আটখানা রুটি খাইতে চাহিতাম। তিনি (নিরঞ্জন মহারাজ) বলিতেন, 'চারখানার বেশী খাইতে পাইবে না তোমার শরীর ভাল নয়।' আমি বলিতাম, আমরা বরাবর আটখানার কম রুটি খাই না। একদিন ঐরূপ জোরাজুরি করিবার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি মান্দ্রাজে এখনই শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে) চিঠি লিখিতেছি—তাহাতে তোমার কথাও লিখিয়া দিতেছি, সুধীর আটখানা রুটি খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি

করিতেছে।' ” যেন কোনও অবুঝ বালকের প্রতি স্নেহময়ী জননীর শাসন-বাক্য। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিয়া এই অপূর্ব ঘটনার মাধুর্যকে ও ভাব-মূল্যকে লঘু করা উচিত নহে। বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের রহস্য অনুসন্ধান-কারীকে প্রথমেই জানিতে হইবে—ইহার মূল ভিত্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি, বাংলা ১৩০৫-এর ১লা মাঘ হইতে স্বামিজী-প্রকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' স্বামী ত্রিগুণাতীতা-নন্দজীর সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শ্যামবাজারে ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে শ্রীগিরীন্দ্র মোহন বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে তখন ইহার কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 'উদ্বোধন' তখন পাক্ষিক পত্র ছিল।[১] স্বামিজীর ইচ্ছানুযায়ী শুদ্ধানন্দ এই 'উদ্বোধন' পরিচালনায় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহকারী—শুধু সহকারী নহে, ত্রিগুণাতীত মহারাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার অনূদিত স্বামিজীর বাংলা 'রাজযোগ' তখন হইতেই উদ্বোধনে প্রকাশিত হইতে থাকে।

মঠে তখন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ছাড়াও প্রাচীন ঋষিকুলের আদর্শে বিদ্যার্থীরাও থাকিতে পারিত। স্মরণ থাকা দরকার যে মিশনের বিদ্যার্থিভবন বা ছাত্রাবাস তখন অন্যত্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বামিজীর নিয়মাবলী-অনুমোদিত বিদ্যার্থি-আশ্রম সম্ভবতঃ মঠেই সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। শুদ্ধানন্দের উপরেই উহার ভার ন্যস্ত ছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুন শেষ হইয়া আসিল। সহসা স্বামিজী একদিন প্রিয় শিষ্য শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। যথা-আদেশ পঞ্জিকা আনীত হইলে, স্বামিজী অতি নিবিষ্ট মনে স্বয়ং উহার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া উল্টাইয়া কী দেখিলেন—পরে নিজের কাছেই আবার পঞ্জিকাখানি রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুখচোখ দেখিয়া শিষ্যের মনে হইয়াছিল, বুঝি কোন বিশেষ কাজের জন্যই তিনি একটি তারিখ নির্বাচন করিতে চাহিতেছেন। হায়, তখন কে-ই বা জানিতেন যে ইহা তাঁহার মহাযাত্রার জন্য দিন নির্ধারণ? শুদ্ধানন্দের মনেও ক্ষণকালের জন্য এ-চিন্তার উদয় হয় নাই। এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে, ৪ঠা জুলাই, ১৯০২, স্বামিজী মর্ত্যলীলা সংবরণ

১ বাংলা ১৩১৪ সনের মাঘ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে পরিণত হয়।

করেন। আচার্যের স্থূল অদর্শনে অন্তরঙ্গ শিষ্যের বক্ষে কি যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সবই আছে, শুধু নাই তিনি—সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম তপস্যা সব কিছুরই প্রেরণার উৎসমুখ যেন অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্বামিজী অপ্রকট হইয়াছেন বটে, কিন্তু শুদ্ধানন্দ অনুভব করিলেন তাঁহার মহাশক্তি সকলের অলক্ষ্যে সমগ্র সঙ্ঘের মধ্যে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। বার বার মনে পড়িয়া যায়, স্বামিজী আলমোড়া হইতে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমুদয় কাজটা চুরমার হয়ে যাবে।······স্মরণ রেখো আমার সন্তানদের নিকট আমি অধিক প্রত্যাশা করি।"

এদিকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্তকেন্দ্রের ভার লইয়া আমেরিকা চলিয়া গেলে, 'উদ্বোধন'-এর পরিচালনায় এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। ১৯০২-এর ডিসেম্বর তখন। ত্রিগুণাতীতানন্দজীর অশেষ তপস্যা ও অক্লান্ত শ্রমের ফলেই 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশ এতদিন সম্ভব হইয়াছে। দ্বারে দ্বারে তাঁহাকে রীতিমত ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এইজন্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং সারদানন্দজী ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—শেষ পর্যন্ত 'উদ্বোধন' বন্ধ করিতে হইবে কিনা এই চিন্তায়। উদ্বোধনের প্রথমাবধি শুদ্ধানন্দ উহার সম্পাদনায় ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে সাহায্য করিতেন। উদ্বোধনের সেই দুর্দিনে তাই শুদ্ধানন্দের উপরই তাঁহারা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। স্বামী সারদানন্দজী অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে সর্বদাই সহায়তা করিয়াছিলেন। অতঃপর দীর্ঘ দশ বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধন' সম্পাদনা করেন। ক্রমে ৩০ নং বোসপাড়া লেনে ভাড়া বাড়ীতে এবং পরে বাগবাজারে ১২-১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে উহার কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। গোপাল নিয়োগী লেনের জমিতেই সারদানন্দজীর প্রচেষ্টায়, পরে "শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই 'উদ্বোধন'-এর স্থায়ী কার্যালয় হয়। এখানে বিশেষ স্মরণীয় যে শ্রীশ্রীমা এই বাড়ীতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে শুভ পদার্পণ করেন—এবং ইহাই তাঁহার কলিকাতার আবাসে পরিণত হয়।

স্বামিজীর অগ্নিময়ী বাণী ও রচনাসমূহের অনুবাদ ও প্রকাশের দিকে

এইকালে শুদ্ধানন্দ একাগ্র দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া স্বয়ং অতিমূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধাদি 'উদ্বোধন' পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই সব ওজস্বিতাপূর্ণ রচনা কোনদিন সঙ্কলিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইলে দেশের ধর্ম-সাহিত্য প্রভূত সমৃদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। স্বামী সারদানন্দজীও এইকালে স্বয়ং লেখনীধারণ করেন এবং বর্তমান যুগের ভাগবত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশ করিতে থাকেন। তখনকার 'উদ্বোধন'-এর আর এক স্মরণীয় গৌরব—শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কে বাংলার ঘরে ঘরে পরিবেশন। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধানন্দের করস্পর্শে 'উদ্বোধন' নবীনজীবন লাভ করিয়াছিল—জাতির সাংস্কৃতিক উদ্বোধনে 'উদ্বোধন' যথার্থই সেদিন এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'উদ্বোধন'-এর ইতিহাসে ইহা এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। 'উদ্বোধন' হইতে স্বামিজীর রচনাবলীর গ্রন্থাকারে প্রকাশও, শুদ্ধানন্দেরই অক্ষয়কীর্তি।

ইতোমধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে শুদ্ধানন্দ বেলুড়মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী (Trustee) নিযুক্ত হইয়াছেন। মঠের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজী শুদ্ধানন্দের কর্মদক্ষতার উপর অপরিসীম আস্থা রাখিতেন। একদা সারদানন্দজীর বিনা অনুমতিতে ও অজ্ঞাতে মিশনের সেবাসংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। যথাকালে উহা প্রকাশিত হইলে, সারদানন্দজী অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তখন বলা হইল যে মঠ হইতে উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার অনুমোদন আনিতে একজন কর্মীর অনেকটা সময় যাইত, তাই উহা শুদ্ধানন্দ স্বামীকে দেখাইয়া সংবাদপত্রে পাঠানো হইয়াছে। সারদানন্দজী তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, "সুধীর যদি দেখে দিয়ে থাকে, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।" তরুণ সন্ন্যাসী শুদ্ধানন্দ সমগ্র সঙ্ঘ-পরিচালনার ক্ষেত্রে সারদানন্দজীর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরে যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কার্য করিতে থাকেন।

শুদ্ধানন্দের কর্মপরিধি কেবলমাত্র সঙ্ঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বাংলার যুবকগণের প্রাণে, স্বামিজীর ভাবের বীজ উপ্ত করিবার জন্যও তাঁহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কলিকাতার যুবকগণ স্বামিজীর তিরোধানের পর তাঁহার আদর্শকে পরিবহনের জন্য যে বিবেকানন্দ সমিতি (Vivekananda

Society)[1] প্রতিষ্ঠা করেন—উহার মূলেও স্বামী সারদানন্দজীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং শুদ্ধানন্দের কর্মোদ্যম বিদ্যমান। বস্তুতঃ শুদ্ধানন্দই ছিলেন উক্ত সমিতির প্রাণস্বরূপ।

শ্রীগুরুর পুণ্যনাম বহনকারী এই সমিতিকে যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রয়োজনবোধে এ-জন্য তিনি সময়ে সময়ে নানা অসুবিধার মধ্যেও কলিকাতায় থাকিয়া ইহার সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নবীনদের মধ্যে স্বামিজীর ভাব যাহাতে অনুপ্রবেশ করে ইহার জন্য তিনি প্রাণ খুলিয়া অবাধে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিতেন এবং পাঠ, আলোচনা ও প্রসঙ্গাদি করিয়া অলক্ষ্যে উহাদের প্রাণে বিবেকানন্দ-তড়িৎ সঞ্চার করিতেন। তদানীন্তন কলিকাতার যে সব তরুণ এই সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পরে অনেকেই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আবার যাঁহারা সংসারেই থাকিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রাণে সংসার-জ্বালা নিবারণের অমোঘ প্রলেপ লাগিয়াছে শুদ্ধানন্দের শুদ্ধ সঙ্গগুণে। যুবক সঙ্গীদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ও স্বামিজীর স্মৃতিকথা বলিতে বলিতে মাতিয়া যাইতেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কঠ উপনিষদের উচ্চ ভাবরাশিকে সরল ও সহজ করিয়া ছেলেদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল শুদ্ধানন্দের। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব', 'পূর্ণচন্দ্র' প্রভৃতি ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক নাটক হইতে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এইসব আলোচনাচক্রে নিত্যযোগদানকারী কেহ যদি সাংসারিক কোনও বাধায় একদিন অনুপস্থিত থাকিয়াছে—সংসার বিরাগী এই সন্ন্যাসী নিজে পায়ে হাঁটিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইতেন। তৎকালীন এই যুবকগোষ্ঠীর একজনের জীবনসন্ধ্যায় স্মৃতিচারণ এইরূপ :

"তখন সমবয়স্ক যে কয়জন যুবক আমরা যেতাম; সকলকেই তিনি এমন

---

১ স্বামিজী-রচিত সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতা এবং সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ সংকলন 'বীরবাণী' এই বিবেকানন্দ সোসাইটির উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। ইদানীং প্রকাশিত 'স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বিবেকানন্দ সোসাইটি' পুস্তিকাতে কিছু পুরাতন স্মৃতি এবং শুদ্ধানন্দজীর কয়েকখানি উদ্দীপনাময় পত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

আপনার করে নিতেন যে, সন্ধ্যার পরে ও ছুটির দিনে সোসাইটিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গলাভের বা তাঁর মুখের কথা শোনবার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারতাম না কিছুতেই। আমরা যারা যেতাম, বেশীর ভাগই নিম্নবিত্ত। সংসারের নানা অভাব-অভিযোগে জীবনে হতাশা ও নৈরাশ্য এসে গিয়েছিল। তখন এইভাবে এমন একজন প্রেমিক সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভে আমরা এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের মনে প্রাণে বাস্তবিকই নতুন অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আরও বেশী সময় পাবার আকাঙ্ক্ষায়, আমাদের কেউ কেউ সোসাইটিতেই রাত্রিবাস করতে লাগল।"

গুরুগতপ্রাণ শুদ্ধানন্দ এই বিবেকানন্দ সোসাইটিকে কতখানি প্রাণ দিয়া স্নেহ করিতেন তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার দুই একখানি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। উক্ত সোসাইটির জনৈক কর্মীকে একবার মধুপুর হইতে লিখিয়াছিলেন, "সোসাইটিতে এমন ধর্মভাবের তরঙ্গ তোল যাহাতে উহা 'বিবেকানন্দ' নামের যোগ্য হয়। একটা দুটো লোকও যদি সোসাইটির contact-এ এসে মানুষ হতে পারে, সেও মঙ্গল।" কাশী হইতে লেখা তাঁহার আর একটি চিঠির অংশ: "খুব উৎসাহ করিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর নাম লইয়া কাজ করিয়া যাও—নিরুৎসাহ হইও না—গীতায় ভগবানের কথা মনে করিও 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' আমি সময় সময় তোমাদিগকে বা তোমাদের কাজের criticise করি বলিয়া কিছু মনে করিও না। জানিও এবং বিশ্বাস করিও তোমাদের এবং সোসাইটির সংক্রান্ত সকলকেই প্রাণের সহিত ভালবাসি। সোসাইটির জন্য যে এতটুকু কার্য করে, সে ও, ঠাকুর-স্বামিজী যে মহান্ কার্যের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছে, জানিয়া উৎফুল্ল হই।"

গুরুভ্রাতা বাল্যসখা বিরজানন্দ ওদিকে মায়াবতী হইতে স্বামিজীর জীবনী ও রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন—তাঁহার অক্লান্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে স্বামিজীর সুবৃহৎ জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, রচনাবলীও ভাগে ভাগে বাহির হইতেছে। জীবনীর পাণ্ডুলিপি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গুরুভ্রাতাকে শুদ্ধানন্দ কতই না উৎসাহপূর্ণ চিঠি দিতেন—কত মূল্যবান পরামর্শও দিয়াছেন। একখানি পত্রে বিরাজনন্দকে লিখিয়াছিলেন,

"যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বৃহদাকার জীবনীগুলি বাহির করিতেছ, অপর কেহ যে এইরূপ করিতে পারিত জানা নাই।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বেলুড়মঠে সাতদিনব্যাপী মহাসম্মেলন হয়। ইহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম সাধুসম্মেলন। মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়—অনেক আলোচনাও হয়। ঐতিহাসিক এই মহাসম্মেলনের পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার পশ্চাতে শুদ্ধানন্দেরই বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ক্রিয়াশীল ছিল। মহাসম্মেলনের বিবরণীতে তাই লিপিবদ্ধ দেখা যায়: "It was solely through the unbounded enthusiasm and the unremitting labours of Swami Suddhananda that the idea of the convention materialised". (*Report of the Convention*).

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট। মঠ ও মিশনের ভিত্তিভূমিই বুঝি সেদিন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পর হইতে উহার গুরুভার দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া যিনি স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, আজ তিনি লোকান্তরিত। স্বামী সারদানন্দজীর মহাপ্রয়াণে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হইল। তাঁহার সুযোগ্য সহকারী স্বামী শুদ্ধানন্দের উপরই তখন সাধারণ-সম্পাদকের কর্মভার ন্যস্ত হইল। এইকাল হইতে সুরু করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে মাঝে ১৯৩০-এর মার্চ হইতে এক বৎসর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি বিশ্রাম লইয়াছিলেন—তখন এ-দায়িত্ব স্বামী বিরজানন্দের উপর অর্পিত ছিল।

শুদ্ধানন্দজীর সম্পাদকতা-কাল মঠ-মিশনের ইতিহাসে সত্যই একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই কালের মধ্যে বহুতর জটিল পরিস্থিতির যেমন উদ্ভবও হইয়াছে, শুদ্ধানন্দজীর অসামান্য পরিচালন ক্ষমতাগুণে তেমন-ই ঐ সকলের দ্রুত সুসমাধানও হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন মিশনের বৈষয়িক ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তখন তদানীন্তন সাধারণ-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সাধুত্ব, মনীষা, স্থৈর্য ও কর্মকুশলতা মিশনকে উহার স্বীয় মর্যাদায় এবং স্বকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকিতে যথেষ্টই সহায়তা করিয়াছিল।

শুদ্ধানন্দজীর দৈনন্দিন জীবন ছিল অধ্যাত্মসাধনা ও নিষ্কামকর্মের আদর্শে

অনুস্যূত। সাধারণ-সম্পাদকের কঠিন কর্তব্য নিত্যনিয়মিত সুষ্ঠুভাবে পালন করার পরেও তাঁহার স্বাধ্যায় ও ধ্যানধারণাদির জন্য সময়াভাব কোনদিন দেখা যায় নাই। মঠ ও মিশনের এত দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াও সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য তিনি প্রত্যহ একঘণ্টা করিয়া দুইবার শাস্ত্র-অধ্যাপনা করিতেন। ঠাকুর-স্বামিজীর জীবনালোকে গীতা,উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা তাঁহার মুখে শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেই হৃদয়ে-মনে সত্যই এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করিতেন। মঠের প্রত্যেক সাধু-ব্রহ্মচারী যাহাতে নিষ্কামকর্মের সাথে সাথে জ্ঞানবিচার ও আত্মচর্চায় মনোযোগী হয়, এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। উপনিষদ্ আলোচনায় সাধুদের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যানটিকে সরল সংস্কৃত নাটকে রূপান্তরিত করিয়া সাধু-ব্রহ্মচারীদের দ্বারা মঠে কয়েকবার অভিনয় করাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠের সাধুদের শাস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বামী প্রেমানন্দজী যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন—মুখ্যতঃ উহা শুদ্ধানন্দেরই ঐকান্তিক আগ্রহে।

সমগ্র সঙ্ঘের এত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, তিনি প্রতিদিন অতি সহজভাবেই বেশ কিছু সময় নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশায় কাটাইতেন। শুদ্ধানন্দজীর নিরভিমানিতা ও সরলতা তাঁহার চরিত্রে এক অপূর্ব মাধুর্য আনিয়া দিয়াছিল। নূতন ব্রহ্মচারীদের অনেক সময়ে সমবয়সী বন্ধুর ন্যায় ডাকিয়া বলিতেন, "এস হে, কিছু চর্চা করা যাক্।" শোনা যায় এই 'চর্চা' কথাটি স্বামিজীর নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। গল্পচ্ছলে ভগবৎ-প্রসঙ্গকে স্বামিজী নাকি 'চর্চা' বলিতেন। শুদ্ধানন্দজী তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ কত 'চর্চা'ই করিতেন। এইসব চর্চায় যাঁহাদের যোগ দিবার সুযোগ হইয়াছে, আজীবন তাঁহারা সেই বালকস্বভাব নিরহঙ্কার সাধুপুরুষের সঙ্গ-মাধুর্য স্মরণ করিবেন সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ অন্ততঃ দুই একজনেরও কিছু স্মৃতিকথা এখানে প্রকাশ করিলে উল্লিখিত মন্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। মঠের লোকান্তরিত জনৈক প্রবীণ সাধুর একখানি ব্যক্তিগত পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃতি:

"পূজনীয় সুধীর মহারাজ যতদিন শরীরে ছিলেন, তাঁর অমায়িক পবিত্র জীবন, সরল অকপট ব্যবহার, স্বামিজীর আদর্শে ও ছাঁচে ঢালা, আড়ম্বরহীন, অল্পে

সন্তুষ্ট,উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন, যে কেহ মঠে এসেছে—সাধু ব্রহ্মচারী ভক্ত গৃহস্থ কাহাকে যে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে নাই, তো জানিনা।

"তিনি ছিলেন মঠের যুবা বৃদ্ধ সকলেরই centre of attraction, তা তিনি যেখানেই যান বা থাকুন না কেন। অমন সহজ সরলভাবে—স্বামিজী ও ঠাকুরের ভাব সম্পুটিত করে শাস্ত্র নিহিত জ্ঞান বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা এ পর্যন্ত অন্য কাহারও মধ্যে দেখি নাই। মহারাজদেরও তিনি ছিলেন Book of reference। পূজা পাঠ—এদিকেও তাঁর আন্তরিক অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। আড়ম্বরহীন প্রাণস্পর্শীভাবে অনুষ্ঠানই ছিল তাঁর পূজাদির মূলমন্ত্র।

"অতএব আমার কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আকর্ষণের বস্তু। দেখা হলেই তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে সঙ্গ না করলে মঠে যাওয়া যেন বৃথাই মনে হইত। বোধ হয় তাঁর সংস্পর্শে যে কেহ এসেছেন, শতকরা একশত জনের মধ্যে একশত জনই ঐ কথা বলবেন। তাঁর নিজের নিজত্ব ঠাকুর ও স্বামিজী,—এবং তাঁদের আদর্শের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ছিল বলে মনে হয় না। তিনি জীবনের কার্যভার ও আদর্শের দ্বারা স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলীন করে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার এই হচ্ছে অন্তরের ভাব—ইহা প্রকাশ করা দায়। কারণ উহা অনুভবের বিষয়।.......... ....আমার কাছে তিনি ছিলেন ভাববস্তু।"

আরও একটি অনুধ্যান এখানে প্রকাশযোগ্য—ইহাও মঠের অপর একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর একখানি ব্যক্তিগত চিঠি হইতে সংগৃহীত। তিনি লিখিয়াছেন —"পরম পূজ্যপাদ সুধীর মহারাজের স্মৃতি: একটি কথাই বার বার মনে হয় তাঁর কথা স্মরণ হলে—ভালবাসা—সকলের শুভ হোক এই ইচ্ছা যেন মূর্ত হয়ে তাঁর ভেতর দিয়ে প্রকট হয়েছিল। অমন অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে এত আপনার করে নিতে পারেন এ-রকমটা বড় দেখা যায় না। বিশেষ করে, যুবকদের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু।............তাঁর উপদেশের কথা—সৎপথে থাকবে, তোমরা বিদ্যার্থী, সত্য ও ব্রহ্মচর্য সর্বদা পালন করবে, নিষ্ঠার সঙ্গে জপধ্যান করবে।.........ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য করতে বলতেন।"

মাত্র দুইটি সহজ সরল মর্ম-আলোড়নকরা স্মৃতি-অনুধ্যানকে আমরা

এখানে উল্লেখ করিলাম—এমন আরও কতো হৃদয় জুড়িয়া শুদ্ধানন্দজী বিরাজ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? কোন প্রকার সম্মানের দাবী কদাপি কাহারও নিকট তাঁহার ছিল না—ছোট-বড় সকলেরই কাছে তিনি সমান ছিলেন। যে-কেহ নিঃসঙ্কোচে সকল সময়েই তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন—শুদ্ধানন্দজীর দ্বার ছিল প্রাচীন নবীন সকলেরই জন্য অবারিত। গোপন বলিয়া কোন কথা তাঁহার অভিধানে ছিল না। বালকের ন্যায় সরল হৃদয়ে তিনি সকল কথা বলিতেন। নিজের কোন ভ্রম বা ত্রুটি তিনি অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন—এমনকি অতি অপরিণতজ্ঞান কোন কনিষ্ঠের কাছেও। কাহারও কোন দুঃখবেদনার কথা শুনিলে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িতেন—যতক্ষণ না সাধ্যমত উহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ স্বস্তি পাইতেন না। শ্রীগুরুর অনন্ত হৃদয়বত্তাই যেন শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহুধা প্রসার ও পরিবৃদ্ধির মূলে শুদ্ধানন্দজীর সাধনা ও ত্যাগের পরিসংখ্যান করা সত্যই দুঃসাধ্য। শুধু তাহাই নহে তিনি ছিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জীবন্ত ইতিহাস। তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে মিশনের ঢাকা কেন্দ্র স্থায়ী হইয়াছে। ছোট বড এমন আরও বহু কেন্দ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহারই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'রামকৃষ্ণ মিশন' বলিতে শুদ্ধানন্দজী সত্যই বুঝিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন বা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার। মিশনের জনহিতকর সকল কর্মোদ্যমের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই তিনি জানিতেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচার। অন্যথায় কর্ম ভোগের কারণ হয়, যোগের নহে। ছোট বড় সকল কর্মে শুদ্ধানন্দের এই শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু কর্মীদের কাছে একটি চিরকালের দিগ্‌দর্শন। মনে পড়ে, একদা রামকৃষ্ণ মিশনের রেঙ্গুনস্থ তদানীন্তন বৃহৎ কর্মকেন্দ্র সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তিনি নীরব থাকিলে, ওখানকার সাধু-ব্রহ্মচারীরা উদ্বিগ্ন বোধ করিয়াছিলেন। "মহারাজ, এখানকার এই হাসপাতাল—আমাদের কাজকর্ম-সেবাদি দেখে আপনার কেমন লাগলো, আমাদের খুব জানতে ইচ্ছা হয়,"—এইরকম জিজ্ঞাসিত হইলে শুদ্ধানন্দজী খুব আবেগভরে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "চমৎকার! তোমাদের এইসব কাজ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুর স্বামিজীর প্রচারের জন্যই হয়, তবে তার চেয়ে কল্যাণকর ভাল কাজ আর কী হতে পারে?"

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, আবার বলিয়াছিলেন, "দেখ স্বামিজীর কৃপায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, আমাদের সব কর্ম—তা' রিলিফ্ই হোক, স্কুল-কলেজই হোক, বা ডাক্তারখানা-হাসপাতালই হোক, অথবা বক্তৃতা দেওয়া-ক্লাশকরা, যা'ই হোক, সবই হচ্ছে ভগবদ্-উপাসনা,—তাঁরই মহিমা প্রচার। মিশনের প্রত্যেকটি কাজের ভাব হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যক্ত করা। লোকে যেন আমাদের কাজকর্ম দেখে আমাদের দিকে নয়,—ঠাকুর স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর স্বামিজীকে প্রকাশ করাই আমাদের জীবন,—আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন। আর তা' যদি না হয়—তা' হ'লে বাপু, এইসব কাজ, তা' যত বড়োই হোক, আর যা-ই হোক,—স্বামিজীর কাজ নয়, ঠাকুরেরও মিশন নয়।"

সঙ্ঘ-পরিচালনায়, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ন্যায় বিশাল ধর্ম-সংস্থায় শুদ্ধানন্দজীর ন্যায় স্থিতধী পুরুষের সুদক্ষ নেতৃত্ব ভাবী সঙ্ঘনায়কগণের কাছে চিরদিনই স্মরণীয় ইতিহাস হইয়া থাকিবে। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অভ্যন্তরেই নহে, বাহিরেও উচ্চ আদর্শের পতাকাবাহী তদানীন্তন কলিকাতার একাধিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে তিনি নানাভাবে শক্তি ও প্রেরণা জোগাইতেন। কলিকাতার এমনই একটি প্রতিষ্ঠানের জনৈক সঞ্চালককে লেখা শুদ্ধানন্দজীর (১৬।৫।২৯-এর) এক চিঠি হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। শুদ্ধানন্দজীর পরিচালন-দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতা ও বিশ্লেষণ-শক্তির কিছু আভাস ইহাতে মিলিবে। বেলুড় মঠ হইতে তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন: "মূল কথা এই, ভিতরের প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতির অভাব হইলে religious society-র ভিতরও এই সব আইন-কানুন ভোটাভুটির ব্যাপার আসিয়া পড়ে। আসল যে-কারণে লোকে কোন ধর্ম সমাজের সভ্য হয়, অর্থাৎ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' তাহা আর স্মরণ থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ভিতর সদ্বুদ্ধি দিন এবং কামিনী, কাঞ্চন, প্রভুত্ব-স্পৃহা প্রভৃতির মোহ হইতে রক্ষা করুন।" শুদ্ধানন্দজীর এই সতর্কবাণী শুধু সেই যুগে নহে—সর্বকালের যে-কোনও ধর্ম-সংস্থার জন্যই সত্য।

শুদ্ধানন্দজীর স্বাস্থ্য কোনকালেই তত সবল ছিল না। দীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রমে শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। ১৯৩৪-এর মার্চ। অবশেষে

অবসর মিলিল,—বিরাজনন্দজী সাধারণ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন নিরিবিলিতে থাকিয়া সাধন-ভজনের জন্য মে মাসে হিমালয়ের কোলে শ্যামলাতালে গিয়াছিলেন—সঙ্গে বিরাজনন্দজীও ছিলেন। বহুকাল ব্যবধানে দুই বন্ধু একান্তে একত্রবাস করার সুযোগ লাভ করিয়া কতই না আনন্দিত হইয়াছিলেন—কত পুরাতন স্মৃতির প্রসঙ্গ চলিত। কর্ম-কোলাহল হইতে দূরে আসিয়া শুদ্ধানন্দজীর মন স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্জগতে বিচরণ করিতে লাগিল। এইভাবে ছয়মাসকাল উভয় গুরুভ্রাতা একত্রে বেশ শান্তিতে কাটাইয়াছেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুআরি, বেলুড়মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-শত-বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হইল। ঐদিন অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গনে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে অনেক মনীষী ব্যক্তি আলোচনা করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজীই ঐ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘ-পরিচালনার সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়াও শুদ্ধানন্দজীর শারীরিক উন্নতি আশানুরূপ হইতেছিল না। ১৯৩৭-এর প্রথম দিকে মৃদু পক্ষাঘাতেও আক্রান্ত হইলেন। যাহা হউক চিকিৎসা-পথ্যাদির ফলে অচিরেই সুস্থ হইয়াছিলেন। শরীর যেমনই থাকুক, তিনি সদানন্দেই থাকিতেন। সর্বোপরি তাঁহার সন্ন্যাসিসুলভ সহজ নিঃশঙ্কচিত্ততা সাধু-ব্রহ্মচারী সকলকে মুগ্ধ করিত। জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি সহসা একদিন প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা মশাই, আপনি সব ছেড়ে গেরুয়া পড়লেন কেন?" সাদাসিধা উত্তর হইল, "সকলকেই তো এই জগৎ ছেড়ে যেতে হবে। গৃহে থাকলে ওপারের ডাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য।"

গুরুগতপ্রাণতাই ছিল সমগ্র শুদ্ধানন্দ-চরিত্রের মূল উপাদান। স্পষ্টই তিনি বলিতেন, "সামান্য ইংরেজী পড়ে আমরা সব বিষয়ে সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামিজীর বাক্যে আমার কখনই অবিশ্বাস হয় নি। কারণ তাঁর কথা শ্রবণমাত্রই ধ্রুব সত্য বলে দৃঢ় ধারণা হ'ত।" আশ্চর্য গুরুর আশ্চর্য শিষ্য! অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধার বলেই যে তিনি দুর্বিজ্ঞেয় শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে অনায়াসে অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহারও অজস্র ইঙ্গিত আমরা

তাঁহার পরবর্তিকালের নানা উক্তির মধ্যে পাই। স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতিতে শুদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন, "তাঁহার বাক্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এক নূতন আলোক পাইলাম। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ—এই কথা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, এখন এই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বামিজীর অপার দয়া ......। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর— আমি তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝতে পারিনি—ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।' "

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন স্নানান্তে কিছুক্ষণ বসিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" পাঠ করা শুদ্ধানন্দের আজীবন অভ্যাস ছিল। এই সূত্রে এখানে মনে পড়ে, পাটনা হইতে আগত জনৈক জিজ্ঞাসু যুবককে পরবর্তী-কালে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন,—"দেখ 'কথামৃত' খুব পড়বে। ঠাকুরের নিজ মুখের কথা সব—খুব জাগ্রত গ্রন্থ। একটি ঘটনা শোন। পূর্ণর মনে খুব অশান্তি—একদিন ঠিক করেছেন যে সেদিনই তিনি suicide করবেন। স্নান-টান সেরে ready হয়ে এসেছেন—ভাবছেন একটু কথামৃত পড়ে, যে-পৃষ্ঠাটি প্রথম পড়বেন, তাতে ঠাকুরের যা কথা আছে, সেটি নিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করবেন। কথামৃত খুলেই পড়ছেন, সেই পৃষ্ঠাটি, যেখানে আছে—'ঠাকুর পূর্ণর জন্য চিন্তা করিতেছেন।' ব্যস্ অমনি সব change হয়ে গেল। তাঁর মনে হল, ঠাকুরই তো ভাবছেন আমার জন্য। পূর্ণর suicide করার সঙ্কল্প ত্যাগ হল।"

গুরুবাক্যে অবিচল বিশ্বাস এবং তাঁহার আদর্শে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণই শুদ্ধানন্দের জীবনে এক অনুপম সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। শোনা যায়, তাঁহার পূর্বাশ্রমের ঘনিষ্ট পরিচিত কোন গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তি মঠে আসিয়া একবার তাঁহাকে ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ হে সুধীর, উঁচু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও, তুমি কিনা শেষে এক কায়েত্‌কে গুরু করলে?" বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত না হইয়া শুদ্ধানন্দ সজল চক্ষে জবাব দিয়াছিলেন, "কায়েত্ কি বল্‌ছিস রে ভাই? আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে, হায় তিনি চাঁড়ালের ঘরে কেন এলেন না!" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া আসিয়াছিল। ধন্য গুরুভক্তি!

ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ যুগাচার্য বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্য শুদ্ধানন্দ! একদা স্বামিজীর নিজমুখেই তিনি শুনিয়াছিলেন,—"গুরু কাকে বলা যায়? যিনি তোমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি দেখতে পান এবং তারা ভূতকালে তোমাকে কিভাবে নিয়মিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিকে চালাবে অর্থাৎ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।"

প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা এমন একটি ইতিবৃত্ত স্মরণ করিতেছি, যাহাতে শুদ্ধানন্দের বিচার-বুদ্ধিতে সারদানন্দজী কত অগাধ ভরসা রাখিতেন, সে-পরিচয় যেমন আরও একবার মিলিবে, তেমনই সেই সঙ্গে শুদ্ধানন্দের অন্তর-রাজ্যেরও এক অলক্ষিত দিক উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। আমরা তাঁহার অপরিমেয় মাতৃভক্তির দিকটিকেই ইঙ্গিত করিতেছি এখানে। শ্রীশ্রীমা লীলাসংবরণ করেন ২১ জুলাই, ১৯২০। জননীর অদর্শনের পরে ভক্ত-হৃদয়ে সংরক্ষিত তাঁহার দিব্য কথাসমূহ সঙ্কলন করার প্রয়োজনীয়তা সকলের প্রাণেই অনুভূত হইতে থাকে এবং মায়ের একনিষ্ঠ সেবক অরূপানন্দের উদ্যোগে "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" তখন সংগ্রথিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই তখন অরূপানন্দকে শক্তি দিয়াছিল। অন্তরালের কাহিনী কিন্তু আরও অনেক। মায়ের শ্রীমুখের কথা প্রকাশের পূর্বে, প্রসঙ্গচিত্রগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হওয়া দরকার। তাই প্রস্তাব হইল, উক্ত সঙ্কলনের সমগ্র পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিবেন, শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানবরিষ্ঠ সারদানন্দজী স্বয়ং। সারদানন্দজী কিন্তু সম্মত হইয়াছিলেন এক সর্তে, "সুধীরও যদি আমার সঙ্গে থাকে, তবেই আমাব দ্বারা সম্ভব হবে।" তাহাই হইয়াছিল— উদ্বোধনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে সারদানন্দজীর ঘরে ঐ পাণ্ডুলিপি পাঠ হইত—শুদ্ধানন্দসহ সারদানন্দজী একত্রে বসিয়া ঐ অমিয়-কথা তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেন, আবশ্যকস্থলে সংশোধনাদির উদ্দেশ্যে মন্তব্যও করিতেন। উল্লেখ বাহুল্য, তাঁহাদের উভয়ের সাগ্রহ অনুমোদনের পরে, "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এখানে স্মরণীয়, শুদ্ধানন্দ ঐ সময়ে একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "স্বামিজী বলেছেন, ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। আমি দেখছি, মায়ের এক একটা কথা নিয়ে হাজার হাজার পুস্তক তৈরী হতে পারে।" জ্ঞানী মাতৃভক্তের মুখে এই উক্তি গভীর তাৎপর্য-দ্যোতক।

এই সূত্রে এখানে উল্লেখ্য, স্বামিজী একদিন শিষ্য শুদ্ধানন্দকে লইয়া জননী সকাশে গিয়াছেন। স্বয়ং মাতৃচরণে আভূমি প্রণাম নিবেদন করিয়া, শিষ্যকেও প্রণাম করিতে আদেশ করেন। শুদ্ধানন্দ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই স্বামিজী র্ভৎসনা করিয়াছিলেন, "ও কি ? মাকে কি করে প্রণাম করতে হয় এখনও জানলি না ? এই ছ্যাথ্ কেমন করে করতে হয়।"—এই বলিয়া স্বামিজী ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শুদ্ধানন্দও তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুকে অনুসরণ করিয়া মাতৃচরণে পতিত হইলেন। সেদিন স্বামিজী নিজ প্রিয় শিষ্যের জ্ঞানলাভের জন্য করজোড়ে জ্ঞানদায়িনী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞ শুদ্ধানন্দের জীবনেতিহাসে ইহাও এক অনন্যসাধারণ ঘটনা।

একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আশা করি। আপাতঃদৃষ্টে কিছু কৌতুকাবহ মনে হইলেও, শুদ্ধানন্দের তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা কীরূপ ধরা দিয়াছিলেন তাহার একটু আভাস এই ঘটনায় মিলিবে। উদ্বোধনের কর্মী শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ স্নেহভাজন। নানা অছিলায় মায়ের কাছে সদাসর্বদাই তিনি যান—মায়ের দ্বার তাঁহার এই স্নেহগর্বিত সন্তানটির জন্য অবারিতই থাকিত। শুদ্ধানন্দ একদিন চন্দ্রবাবুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চন্দ্র, তুমি মার কাছে সর্বদা গিয়ে প্রসাদ খাও ; আমি একটি কথা বলি—তুমি মাকে বলতে পারবে ?" চন্দ্রবাবু সগৌরবে জবাব দিলেন, "কেন বলতে পারব না ?" শুদ্ধানন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি মাকে বলতে পারবে—'মা আমি মুক্তি চাই' ?" চন্দ্রবাবুর আর ধৈর্য সহিল না ; বলিলেন, "দাঁড়ান, আমি এক্ষণি বলে আসছি।" ঘটনার পরবর্তী অংশের বর্ণনা এখানে আর না করিলেও চলিবে। যাহা হউক, চন্দ্রবাবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে প্রসাদই চাহিয়াছিলেন—উহা লইয়া সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; অনেক চেষ্টাতেও মুক্তি চাহিতে পারেন নাই—ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

শুদ্ধানন্দজীর হৃদয় মথিত করা ভাবে ও ভাষায় আঁকা অনবদ্য একখানি মাতৃ-আলেখ্য আমরা তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় লেখা একটি চিঠির মধ্যে পাইয়া থাকি। চিঠিটির তারিখ ১৭ই জানুআরি ১৯৩৮—মহাপ্রয়াণের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে। মায়ের জীবন-চরিত দেশে বিদেশে অনেকে রচনা করিয়াছেন—

নানা দৃষ্টিকোণ হইতে মায়ের কতো মূর্তিই আজ আমাদের অবলোকনের সুযোগ হইয়াছে! কিন্তু শুদ্ধানন্দজীর পত্রপটে অঙ্কিত মায়ের ঐ সরল ছবিখানির তুলনা মেলে না—অনেক কারণেই উহা অদ্বিতীয়। চিঠিতে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃ-প্রশস্তি: "শ্রীশ্রীমা মা-ই বটে, সাক্ষাৎ জগজ্জননী। অমন সহনশীলতা, মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা তাঁতেই সম্ভব। বাহিরে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গৃহকর্মে, কুটুম্ব ও আশ্রিত জনের সেবায় ব্যাপৃতা থাকিতেন—তাঁহার করুণা ও স্নেহলাভে পাত্রাপাত্রের বিচার ছিল না। মনুষ্য,—জীবজন্তু পর্যন্ত কেহই তাঁহার স্নেহ ও করুণালাভে বঞ্চিত হইত না। তিনি অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। মাথায় সর্বদা দীর্ঘ ঘোমটা থাকিত। পবিত্রতার বিগ্রহরূপিনী মাকে ভারতীয় নারীর আদর্শ দেখাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কত আর বলিব—এক কথায় তিনি মা—সকলের মা—সত্যকার মা ছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাববিগ্রহ জননী সারদাদেবী শুদ্ধানন্দজীর বোধদৃষ্টিতে কোথায় অবস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অজস্র চিন্তায় ও বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে। জনৈক জিজ্ঞাসু, মন স্থির হইতেছে না বলিয়া তাঁহার কাছে আক্ষেপ করিয়া নিজের নানা দুর্বলতার কথা একদা জানাইয়াছিলেন। অস্থির মনকে শান্ত করিবার এক আশ্চর্য সহজ ঔষধ, শুদ্ধানন্দজী সেই জিজ্ঞাসুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি সরল কথায় তিনি চিঠিতে জবাব দিয়াছিলেন, "জপের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ও মা-ঠাকুরাণীর মূর্তি চিন্তা করিও, তাহা হইলে সহজে মন স্থির হইবে।" আত্মজ্ঞ পুরুষের সহজ উপলব্ধি-উৎসারিত সহজ উপদেশ এইরূপই হইয়া থাকে।

১৯৩৭-এর ফেব্রুআরিতে শুদ্ধানন্দজী সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসরের এপ্রিলেই বিধাতার চক্র আর একবার আবর্তিত হইল। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৮। সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রমে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। অতঃপর ১৮ই মে হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দজী সমগ্র মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষপদে বৃত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের পরে, স্বামিজীর শিষ্য তিনিই সর্বপ্রথম এই আসন গ্রহণ করিলেন। শুদ্ধানন্দ মহারাজ সঙ্ঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ হইলেন। সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নূতন মঠাধীশের নেতৃত্বে আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগোদ্দীপ্ত অনাড়ম্বর প্রেমপূর্ণ জীবন সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু হায়, সঙ্ঘ-বিধাতার নির্বন্ধ রোধ করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। কে জানিত যে মাত্র ছয়মাস যাইতে না যাইতেই তাঁহার এখানকার কার্য শেষ হইয়া যাইবে? যাহা হউক, অতি স্বল্পকালের হইলেও, শুদ্ধানন্দজীর অধ্যক্ষতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধু-ভক্তদের হৃদয়ে একটি স্থায়ী গভীর রেখা রাখিয়া গিয়াছে।

হৃদয় ও মস্তিষ্কের এমন সমীকরণ—যেমন শুদ্ধানন্দজীর জীবনে প্রকাশ পাইয়াছিল, দ্বন্দ্বময় সংসারে সত্যই তাহা বিরল। স্বামিজীর আশীর্বাদেই তাঁহার জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। অদ্বৈত-বেদান্তের বিচারে ও সাধনায় অহর্নিশ নিযুক্ত আছেন, অথচ সংসারের অতি তুচ্ছ দুঃখ-বেদনাও নিজের সবটুকু হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছেন। দরিদ্র ছাত্র বা অভাবগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তির অবাধ গতি ছিল তাঁহার কাছে। এমন কি নিজের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পর্যন্ত উহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।—ইহাতেই তৃপ্ত হইতেন। স্বামিজী একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটী কোটী ধ্যানের চেয়ে বড বলে বুঝতে পারবে।" গুরুকৃপায় শুদ্ধানন্দজীর জীবনে সেবার এই উচ্চ আদর্শ যথার্থই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মঠের নবীন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের কাছে তিনি যেন স্নেহময় পিতার মতন ছিলেন। প্রাচীনদের ছিলেন যেন সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কিছুদিন ধরিয়া তিনি রক্তচাপের আধিক্যে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি দর্শনার্থী অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর তৃষ্ণা মিটাইতে কখনও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। অথচ গুরুর অভিমান লইয়া নহে। একদা জনৈক ভক্তিমান যুবক তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া বহুদূর হইতে আসিয়া মঠে বাস করিতেছে—প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়, তাঁহার চরণ-প্রান্তে আসিয়া প্রাণের আর্তি নিবেদন করে। একদিন সন্ধ্যায় শুদ্ধানন্দজীর সমীপে উপবিষ্ট থাকাকালেই, নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) আসিয়া সঙ্ঘ-গুরুর চরণে প্রণত হইলেন। নিরভিমান শুদ্ধানন্দজী আচার্যের আসনে বসিয়াও সরল বালকের মতো সেদিন বলিয়া উঠিলেন—"দেখ নির্মল, এই ছেলেটি আমার নিকট হতে দীক্ষা নিতে এসেছে। ভেবেছে—আমি প্রেসিডেন্ট।……দেখ বাপু, আমার নিজেরই

কিছু হল না! তোমরা এখন দীক্ষাদি দাও।” ঘটনাটি আপাতঃদৃষ্টে সামান্য মনে হইলেও, জগতের ধর্মেতিহাসে অভিমান-রাহিত্যের এক পরাকাষ্ঠা নজির হিসাবে স্মরণীয়। শাস্ত্রোক্ত ‘অভিমান-সুরাপান’ আর ‘প্রতিষ্ঠা-শূকরীবিষ্ঠা’-বোধ এইরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। অলক্ষ্যে আরও একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতও এই ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। যে-নির্মল মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধানন্দজী একদা বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা এখন দীক্ষাদি দাও’,—বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে সেই স্বামী মাধবানন্দকে উত্তরকালে গুরুর আসনে বাস্তবিকই বসিতে হইয়াছিল। শুদ্ধানন্দজীর মুখোচ্চারিত একটি ক্ষুদ্র প্রাসঙ্গিক উক্তিও, কালে সত্যে পরিণত হইয়াছিল—ইহা এক অনবদ্য গূঢ় ইতিহাস, শুদ্ধানন্দজীর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টৃত্বেরও পরিচায়ক। তাঁহার অত্যাশ্চর্য নিরভিমান ভাগবতী জীবনের তুলনা বিরল। জনৈক তরুণ একদা তাঁহার আত্মচরিত জানিতে চাহিলে, জিজ্ঞাসু সেই যুবকটিকে তিনি লিখিয়াছিলেন—“স্বামিজী ও তাঁহার গুরু ভ্রাতাগণের উপদেশ ও স্মৃতিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।”

শিষ্যপ্রতিম এক যুবককে একটি পত্রে লিখিয়াছেন—“ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার দেহ মন ভেঙ্গে চুরে নূতন করে গড়ে দিন। তুমিও ঠাকুরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন তাঁতে তন্ময় হয়ে যাই, dilute হয়ে যাই। আমার স্নেহাশীর্বাদ, প্রেমালিঙ্গন ও জীবনে মরণে অনন্ত অনন্ত ভালবাসা জানিবে।” অভিমানশূন্য এমন দরদী শুভার্থী জগতে বেশী আসেন নাই।

অনুপম দরদঢালা আর একখানি বিস্ময়কর পত্র: “তোমার বাড়ীর খবর কতক অবগত হলাম। আবার লিখেছ, ‘আপনাকে এসব জানিয়ে দুঃখের ভাগী করব না।’ তুমি কি জান না আমি তোমার সুখ-দুঃখের সকল কাহিনী শুনতে চাই—দুঃখ দূর করতে না পারি, একটু আহা উহু তো করতে পারি। তোমার হাত পা কেউ বাঁধেনি, তুমি নিজের হাতপায়ে দড়ি নিজে বেঁধেছো। ভয় কি? দিনকতক সখ করে বন্ধনে থাক-না—যখন সখ চলে যাবে, বন্ধন খুলে বেরিয়ে পড়বে।...আমার কথায় একটু বিশ্বাস করো—নির্জনে বসে ভগবানকে খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করো—সব গোল চুকে যাবে।...”

সহানুভূতি ও সাহস, প্রেম ও শক্তি, বিনয় ও বীর্য—পত্রের প্রতি ছত্রে সমান ভাবে অভিসিঞ্চিত। ব্যক্তি শুদ্ধানন্দের অগাধ হৃদয়ের পরিচয় এখানেই।

১৮ই অক্টোবর হইতে প্রবল জ্বর, হিক্কা এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি জটিল উপসর্গ দেখা দিলে, তিনি চিকিৎসকগণকে স্বয়ং জানাইয়া দিলেন, "আর ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই! এখন শুধু ভগবানের নাম শুনবো।" একজন অন্ধ নারী এইকালে দীক্ষাপ্রার্থিনী হইলে, মহারাজের শরীর অসুস্থ বলিয়া সেবকগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু কী আশ্চর্য অনুকম্পা! ২০শে অক্টোবর—অর্থাৎ দেহত্যাগের মাত্র তিন দিন পূর্বে, বঞ্চিতা এই অন্ধ নারীর কথা অতিশয় সমবেদনার সহিত তিনি শুনিয়াছিলেন। আর্তভক্তের অন্তর-বেদনায় লোকহিতব্রতী সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যাতেও ব্যথা অনুভব করিয়াছেন।

বিগত কয়েকমাস যাবৎ তিনি সর্বদাই ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' বা অন্য কোন শাস্ত্রাদি পাঠশ্রবণে রত থাকিতেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশেষে ২৩শে অক্টোবর (১৯৩৮), পূর্বাহ্ন ৮টা ৪০ মিনিটে, শ্রীশ্রীস্বামিজীর অন্তরঙ্গ সন্তান শুদ্ধানন্দ তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত ধামে প্রয়াণ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

শুদ্ধানন্দজী ছিলেন স্বামিজীর বাণীসমূহের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মঠের নিয়মাবলীতে স্বামিজীর প্রতিটি উক্তির তিনি ছিলেন সজীব ভাষ্য। "এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত।"—নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ স্বামিজীর এই বাণী ছিল শুদ্ধানন্দজীর মূলমন্ত্রস্বরূপ। সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের ধ্যান জ্ঞান তপস্যা। যখন 'উদ্বোধন' সম্পাদনার কাজে অধিক রাত্রি জাগিয়া লিখিতে ও প্রুফ্ সংশোধনাদি করিতে হইত—তখন রাত্রি দুইটা পর্যন্ত উন্নিদ্র চোখে কাজ করিয়াও, তিনি "কালীপূজা করার আনন্দ" উপভোগ করিতেন। তাঁহার চোখে কর্ম আর উপসনার কোনও ভেদরেখা আদৌ ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক চিন্তায় ও আচরণে স্বামিজীর ভাবগুলিই যেন ফুটিয়া উঠিত। তীর্থপর্যটনে কখনও কখনও গিয়াছেন বটে—এমন কি মানসসরোবর পর্যন্তও গিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই বলিয়া, তাঁহার জীবনে তপস্যার পরিমাণ কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সাধনা বা তপস্যা

সম্পর্কে তাঁহার ভাবটি বড়ই তাৎপর্যময়। তাঁহার স্বলিখিত একখানি পত্রের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতির মধ্যে ইহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। জনৈক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুকে তিনি লিখিতেছেন, "...সাধনা জিনিষটাই হচ্চে, মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে environment-এর struggle। উন্নতি করিবার সুতরাং দুইটী উপায় আছে। এক বলপূর্বক environment ছাড়াইয়া নূতন অনুকূল environment-এ আপনাকে অবস্থাপিত করা, অথবা ঐ environment-এর ভিতরে থাকিয়াই যথাসাধ্য উহার সহিত struggle করিয়া আভ্যন্তরীণ বলবীর্য সংগ্রহ করা। নতুবা যদি environment-এ গা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য।"

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন এবং মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে সর্বপ্রযত্নে সহায়তা করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, বেদান্তবিজ্ঞানের এই চরম সত্যই শুদ্ধানন্দজী তাঁহার শ্রীগুরুর নিকট লাভ করিয়াছিলেন। শুধু স্বীয় জীবনে ইহার অনুশীলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অপরের হৃদয়েও এই তত্ত্বকে দৃঢ়মূল করিয়া দিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা কত আন্তরিক, কত তীব্র শুভেচ্ছা-মাখানো থাকিত, তাহা জনৈক বিদ্যালয়-শিক্ষককে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের কিছু অংশ পাঠ করিলেই অনুভব হইবে। লিখিয়াছিলেন, "তুমি ছাত্রদের উপর যে সকল দোষারোপ করেছ, একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখলে বুঝবে—সে দোষ ছাত্রদের নহে—তোমাদের, অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রধান দোষ। স্বামিজী একবার শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'Education is the unfoldment of the divinity which is already in man'। আর শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের ভিতর sleeping Brahman-কে কেন জাগরিত করতে পারছেন না, এই ভেবে বিরলে অশ্রুবিসর্জন করা।"

মধ্যাহ্ন-ভাস্করকে অবলোকন করা এক দুঃসাধ্য প্রয়াস। কিন্তু উহার প্রতিবিম্বের দিকে দেখিয়া সূর্য-মহিমার কিঞ্চিৎ আভাস সহজেই অনুমিত হয়। শুদ্ধানন্দপ্রমুখ প্রতিচ্ছায়ার মধ্য দিয়া না দেখিলে, অলৌকিক বিবেকানন্দ-চরিত্রও সাধারণের নিকট দুষ্প্রবেশ্য। স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে নিত্যকালের জন্য মিলিত হইয়াছেন সত্য, তথাপি অলক্ষ্য প্রেরণারূপে এই বিরাট সঙ্ঘের সর্বত্রই তিনি আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন।



স্বামী বিরজানন্দ

স্বামী বিরজানন্দ

"......কিন্তু আমি কি জানি যে বলবো ?"

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হইল—"আচ্ছা দাঁড়িয়ে এইটেই বলবি যে আমি কিছু জানি না। 'আমি কিছু জানি না' এইটা বলাই তো মস্ত বড় শিক্ষাদান। আমি সব জানি—এই ভাব হচ্ছে অজ্ঞান।"

তরুণ শিষ্য তখনও গুরুর নির্দেশ মানিবার মতো দৃঢ়তা পাইতেছেন না।

আচার্য বলিয়া চলিলেন—"দেখ্ নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস্ তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস্ তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি।"......

এইবার সকল সংশয় ভয় তিরোহিত হইল। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিজ জীবন আহুতি দিতে শিষ্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের বিদ্যুৎ-বাণীতে তাঁহার দেহের শিরায় শিরায় রক্তস্রোত যেন নূতন গতিতে ছুটিতে থাকিল। শিষ্যের সমগ্র উত্তরজীবন শ্রীগুরুর কণ্ঠোচ্চারিত এই বাণীরই সাকার বিগ্রহস্বরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লোকগুরু বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী বিরজানন্দের বৈরাগ্য-দীপ্ত জীবন তাই ত্যাগ ও সেবার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় প্রেরণা-স্বরূপ,—তপস্যা ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ। বর্তমান শতকের প্রাগর্ধে যে-সকল মহাপুরুষ তাঁহাদের যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মময় জীবনের সুষম বিকাশ সাধন দ্বারা সনাতন ধর্ম সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, বিবেকানন্দ-শিষ্য বিরজানন্দের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ স্মরণার্হ।

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিরাজনন্দের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন তদানীন্তন কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক। ত্রৈলোক্যনাথের পৈতৃক আবাস ছিল চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে। কালীকৃষ্ণের পিতামহ রামরতন বসু কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া, সিমলা পল্লীতে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই সিমলা পল্লীতেই স্বামিজীরও পূর্বাশ্রমের পৈতৃক বাসভবন ছিল। বাল্যকালে এই রামরতন বসুর বাড়ীতে স্বামিজীর খেলাধুলার স্থান ছিল। কালীকৃষ্ণের কাকা অমৃতলাল বসু ছিলেন স্বামিজীর সহপাঠী। স্বামিজীর শৈশবের নানা

দুরন্তপনার একটি ছিল—পল্লীর কোন গৃহাঙ্গনে সঙ্গীদের লইয়া চাঁপাগাছে দোলাদুলি করা। উক্ত গৃহের জনৈক বৃদ্ধ পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই আশঙ্কায় "চাঁপাগাছে বেহ্মদত্যি আছে, চড়িস্‌নি ঘাড় মটকে দেবে" বলিয়া দুরন্ত শিশুর দলকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অন্যান্য ছেলেদের সব ভয় পাইতে দেখিয়া বিলে (স্বামিজীর বাল্যনাম 'বীরেশ্বরের' অপভ্রংশ) বলিয়াছিল—"ও বুড়োর কথা শুনিস্ কেন? বেহ্মদত্যি থাকলে কবে আমাদের ঘাড় মটকে দিত।" কালীকৃষ্ণের পিতামহ রামরতন বসুই ঘটনোক্ত এই বৃদ্ধ।

পুত্র ত্রৈলোক্যনাথকে রামরতন ডাক্তারি পড়াইতে পড়াইতেই বিবাহ দিয়াছিলেন। আহিরীটোলার বনিয়াদী মিত্র বংশের শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারীর কন্যা শ্রীমতী নিষাদকালী দেবী বিপত্নীক রামরতনের পুত্রবধূরূপে আসিয়া বসু-গৃহকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী মিত্র ছিলেন একজন উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন সাধক লোক। বৃহৎ সংসারের শত ঝামেলা স্কন্ধে বহন করিয়াও অতিশয় নিষ্ঠার সহিত একলক্ষ জপ তিনি প্রত্যহ করিতেনই। মিত্র মহাশয়ের ধীর সংযত শৃঙ্খলাপ্রিয় ও নিয়মনিষ্ঠ জীবন কালীকৃষ্ণকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার মুখে তাই অনেকবার শোনা যাইত—"আমাকে ভয়ানক influence করেছিল মাতামহের দিক থেকে। ঠাকুরদা আশ্চর্য লোক ছিলেন।...এমন practical লোক কখনও দেখিনি।"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন, মঙ্গলবার (২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন সকাল ৮টায় ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নবজাতকের পিতামহ রামরতন আনন্দে "কালী কালী" বলিয়া উঠেন। প্রার্থনা করেন "মা ওকে দীর্ঘজীবী কর—ওর দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক।" মাতামহ বিনোদবিহারীও স্বীয় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করেন "কৃষ্ণ নারায়ণ হরি! ও মানুষের মতো মানুষ হোক, ভক্ত হোক।" পিতামহ ও মাতামহ উভয়েরই নিজ নিজ আরাধ্যদেবতাকে মনে পড়িবে, তাই শিশুর নাম স্থির হইয়াছিল কালীকৃষ্ণ।

নবজাত শিশুর কয়েকটি বিচিত্র প্রকৃতি জন্মের পর হইতেই দেখা গিয়াছিল। শিশু মাতৃস্তনে মুখ দিত না। রাত্রে শিশুর চোখে ঘুম নাই—

ঘুম পাড়াইতে গেলেই কাঁদিয়া উঠে। শিশু দিনের বেলায় ঘুমায়, আর সারারাত্রি বাড়ীর কাহারও না কাহারও কোলে চড়িয়া আকাশের চাঁদ দেখিতে চায়। বাড়ীর লোককেও তাই পালাক্রমে রাত্রি জাগিতে হইত। মাতৃস্তন্যবিহীন শিশুর জন্য দুধের ব্যবস্থা হইল—পিতামহ একটি দুগ্ধবতী গাভী নাতির জন্য কিনিয়া দিয়াছিলেন।

বালকের আগমনের পর হইতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি নানাভাবে সূচিত হইতেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ মহিষাদল রাজস্টেটের চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া অর্থ ও যশঃ অর্জন করিতে লাগিলেন। পরে অবশ্য তিনি এই কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসকতা করিতে থাকেন। কিছুকাল তিনি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে (লিলি কটেজে) গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং এই কালে সম্ভবতঃ সেখানেই তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী নিষাদকালী দেবী অশেষ ভক্তিমতী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুত্রের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সন্ন্যাসী পুত্রের মুখে উত্তরকালে শোনা যাইত—"আমি বরাবরই মার বড় নেওটা ছিলুম।" নিষাদকালী দেবীর একটি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল যে, তিনি সংসারের সকল কিছু করিতেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য অনাসক্তির সহিত। তাই পুত্র বড় হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহিলে এই জননীই তাঁহার প্রেরণাদাত্রী হইয়াছিলেন। বৈরাগ্যপথযাত্রী পুত্রকে তিনি পশ্চাতে টানেন নাই, বলিয়াছিলেন—"আমি কেন তোমার ধর্মপথে বাধা দেব বাবা ? আমার কোন আপত্তি নাই।" মায়ার সংসারে এ-হেন জননী কয়জনই বা আছেন ? স্বামীর মৃত্যুর পর নিষাদকালী দেবীও সংসার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া বৃন্দাবনধামে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তথায় ভজন-সাধন লইয়া অতিবাহিত করেন। ১৯৪২ সালে প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে এই ধর্মপ্রাণা মহিলার দেহত্যাগ হয়।

কালীকৃষ্ণের বাল্যশিক্ষা চলে পিতৃবন্ধু হেমবাবুর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ট্রেনিং একাডেমিতে। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এইখানেই পড়েন। পরে রিপন স্কুলের ছাত্র হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল নয় বৎসর। পরে এই স্কুল হইতেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতোমধ্যে তাঁহার

পিতা নারিকেলডাঙ্গায় বাড়ী করিয়াছেন। পড়াশুনায় কালীকৃষ্ণ খুবই অধ্যবসায়ী ছিলেন। তবে কেবলমাত্র বিদ্যালয়গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা আবদ্ধ ছিল না—উহার পরিধি নানাদিকে বাড়িয়া চলিয়াছিল। বহুপ্রকার হাতের কাজ, শিল্পকলা, রন্ধন, উদ্যানচর্চা ইত্যাদিতে অতি বালক-বয়সেই তিনি সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উত্তরজীবনে তিনি কখনও কখনও কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন—"আমি বরাবরই খুব practical ছিলুম, যখন যা ধরতুম তা করতুম।" কালীকৃষ্ণের স্বভাবের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল অতিশয় শিষ্টাচার ও মধুরতা,—ফলে সহপাঠীরা কেহই এই প্রিয়দর্শন কোমল প্রকৃতির ছেলেটিকে না ভালবাসিয়া পারিত না।

কৈশোর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে কালীকৃষ্ণের অন্তরের প্রসুপ্ত ধর্মজিজ্ঞাসার সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল—মন ও বুদ্ধিতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিল। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠ তখনও চলিতেছে। এইকালে খগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে অতিশয় তেজস্বী ও প্রতিভাধর এক সহাধ্যায়ীর সাহচর্য কালীকৃষ্ণের জীবন-গতিকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে এই খগেন্দ্রনাথই স্বামিজীর অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ। ক্রমে ক্রমে সমভাবের ভাবী সহপাঠিদের লইয়া কালীকৃষ্ণদের একটি দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ততদিনে তাঁহারা সকলেই কলেজে পড়িতে সুরু করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে সেদিনের সেই তরুণ দলটি একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই দলেরই সুধীর চক্রবর্তী, সুশীল চক্রবর্তী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি যুবকগণ উত্তর জীবনে যথাক্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ হইয়াছিলেন। সুধীর সিটি কলেজে পড়িতেন এবং বাকী সকলেই রিপন কলেজের ছাত্র।

এই যুবকগোষ্ঠীর কঠোর নীতিপরায়ণতা আদর্শনিষ্ঠা ও সদাচার সর্বকালের ছাত্রসমাজের নিকটেই দৃষ্টান্তস্বরূপ। সকলে মিলিত হইয়া সদালোচনা, ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ ও ধ্যান-চিন্তাদি সাহায্যে নৈতিক জীবন গঠনের দিকে প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। খগেনদের পটলডাঙ্গার বাড়ীতেই ছিল ইঁহাদের প্রধান আড্ডা। নানা ভাবের সাধু-সাধকদের নিকটও ইঁহারা যাতায়াত করিতেন।

ধর্মসভা বা কীর্তনাদির সংবাদ পাইলেও সেখানে যাইয়া জুটিতেন। কলিকাতায় তখন মহিমা চক্রবর্তীর সাধন-ভজনের প্রণালী খুব প্রচারিত হইতেছে। ইনি একবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দলের খুব নামডাক যুবকদের মধ্যে। খগেনের উৎসাহে কালীকৃষ্ণ, সুধীর প্রভৃতি তরুণরাও কিছুদিন সেখানে ঘোরাফেরা করিলেন। আরও কতজনের কাছে কত উপদেশের জন্য ছোটাছুটি চলিতে থাকিল। প্রস্তুতিপর্ব এইভাবেই চলিয়াছিল।

কালীকৃষ্ণ পিতার সংগৃহীত গ্রন্থাদির মধ্যে ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্তের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত', 'তত্ত্ব প্রকাশিকা', এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত-'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ', বইগুলি পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। নির্জনে একাকী এখন হইতেই ঐ-সব ভাবে ধ্যান-ধারণাদি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজা-আরাধনা-ধ্যান-প্রার্থনাদিতে কালীকৃষ্ণ অধিক সময় কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তিমূলক গীত ও পদাবলীতে নবীন সাধকের মন বিভোর হইয়া থাকিত।

সহসা দারুণ ঝড় উঠিল। কালীকৃষ্ণ ও খগেনের মনে তীব্র বৈরাগ্য। দুই বন্ধু গৃহত্যাগ করিয়া কোন পর্বত-গুহায় কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় জীবনপাত করিবেন স্থির হইয়াছে,—নিছক দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করিবেন। 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখিয়া বৈরাগ্যের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। গৃহ ছাড়িবার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বরাত্রিতে কালীকৃষ্ণ খগেনদের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। কথা ছিল, এই বাড়ী হইতেই গভীর রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতে যাত্রা করিবেন। প্রতিবেশী নন্দবাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য,—সাধন-ভজনশীল বলিয়া খগেন তাঁহাকে খুব মান্য করিতেন। হঠাৎ নন্দবাবু রাত্রিতে খগেনের ঘরে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। নন্দবাবু বলিলেন, "তোমরা নাকি দু'জনে সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে? আমি দর্শন করলুম এতে তোমাদের বিপদ ও অমঙ্গল হবে।" নন্দবাবু সাধক লোক বলিয়া তাঁহার কথা বালকদ্বয় বিশ্বাস করিলেন। বৈরাগ্যের সঙ্কল্প আপাততঃ ত্যাগ করা হইল। কালীকৃষ্ণ গৃহে ফিরিলেন। কালীকৃষ্ণদের বাড়ী তখন নারিকেলডাঙ্গায়। ত্রৈলোক্যনাথ বসবাসের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এখানে নূতন বাড়ী করিয়াছিলেন।

তরণী এইভাবেই বহিয়া চলিতেছিল—নানা বিপরীত স্রোতে বিভিন্নমুখী

বাতাসের বেগে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আগাইয়া-পিছাইয়া, এদিক-ওদিক করিতে করিতে ছুটিতেছিল। এই সময়ে কলিকাতার পথে পথে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কালীকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধুরা জানিতে পারিলেন যে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কাঁকুড়গাছি যোগোত্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব হইবে। কালীকৃষ্ণ, খগেন প্রভৃতি সকলে ঐদিন সকালে নির্দিষ্ট শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া কাঁকুড়গাছির উৎসবে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র দত্তের ১১নং মধু রায় গলি হইতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

ইহার পর হইতে তাঁহাদের কাঁকুড়গাছি যোগোত্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইল এবং রামবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। রামবাবুও এই অসাধারণ উৎসাহী ভক্ত-যুবকদের পাইয়া অতি সমাদরে নিকটে টানিয়াছিলেন,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহাদের লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন। যোগোত্থানের অনেক টুকিটাকি কার্য, এমনকি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার ভার পর্যন্ত এই যুবকদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। বালকরা কলিকাতার পথে পথে ভিক্ষা করিয়া—চাল পয়সাদি সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের ভোগরাগ চালাইয়াছিলেন। এমনিভাবে নৌকার গতিমুখ নূতন দিকে ফিরিল।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কার 'শ্রীম' (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) বা মাষ্টার মহাশয় তখন রিপন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক। ধীর স্থির এই অধ্যাপকটির প্রতি কালীকৃষ্ণদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবসর-কালে অধ্যাপক মহাশয় যখন কলেজের ছাদে চিলেকোঠায় গিয়া নির্জনে বসিয়া সংগৃহীত রোজনামচা হইতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' মহাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিতেন, কালীকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গীরা তখন কেহ না কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। অবশেষে একদিন আলাপ হইল,—আলাপ প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতায় পরিণতি লাভ করিল। কালীকৃষ্ণ একদিন একা একা মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অতি স্নেহভরে কালী-কৃষ্ণকে নিজের খুবই কাছে মাদুরের উপর বসাইয়া অধ্যাপক নানা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত করেন শুনিয়া একদিন মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "দেখ ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হ'লে তাঁর যে-সব শিষ্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন তাঁদের সঙ্গ করতে হয়। বরাহনগর মঠে যাবে,—দেখবে সেখানে তাঁর ত্যাগী

সন্তানেরা সর্বস্বত্যাগ করে কি ভাবে জীবনযাপন করছেন। গৃহস্থ হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক represent (প্রকাশ) করতে পারবে না।" আবার এ-কথাও পর্যন্ত মাষ্টার মহাশয় কালীকৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন, "সাধুদের স্থানে শুধু হাতে যেতে নাই। অন্ততঃ এক পয়সারও কিছু নিয়ে যাবে।" তরুণীর গতিবেগ এইবার আরও বৃদ্ধি পাইল।

কালীকৃষ্ণ, খগেন, হরিপদ ও কুঞ্জ নামে আর একটি বন্ধু—চারজনে যুক্তি করিয়া একদিন কলেজ হইতে পলাইয়া বরাহনগর মঠের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়াইলেন। কালীকৃষ্ণের আয়ত-দীপ্ত চক্ষু দুইটিতে সেদিন যেন বিদ্রোহের বহ্নিজ্যোতিঃ ফুটিয়াছিল। খগেনের বাড়ীতে কলেজের বই খাতা রাখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ চলিতে লাগিলেন। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ঠাকুরের জন্য জিলিপি কিনিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণের সেদিনের স্মৃতি তাঁহার নিজ মুখের ভাষায় এইরূপ :

"গরমী কাল। বেলা সাড়ে দশটা থেকে রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে, পথ ঠিক না জানার দরুণ আমরা প্রায় দুপুর একটার সময় বরাহনগর মঠে হাজির হলুম। তখন সকলে বড় ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। জেগেই ছিলেন। শশী মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বুড়ো গোপাল মহারাজ, যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ, খোকা মহারাজ, সারদা মহারাজ ও দক্ষ মহারাজ—এঁরাই তখন মঠে ছিলেন মনে পড়ে। আমরা প্রণাম করবার পর সকলে আদর করে বসিয়ে 'কোত্থেকে আসছো—কি কর, কোথায় থাক, মঠের কথা কি করে জানলে' ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমাদের বৃত্তান্ত শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁদের দেখে আমাদেরও এক নূতন revelation (জ্ঞানোদয়) হল। মনে হতে লাগলো জগৎ ছাড়া কোথায় যেন এসেছি। ঐ তো পুরনো এঁদোপড়া বাড়ী, ভাঙ্গা দরজা-জানলা, কিন্তু সেখানে যেন একটা জমজমাট আধ্যাত্মিক ভাব গমগম করছে। তাঁদের চেহারাও যেন এক একটি burning flame (জলন্ত আগুন)। মঠে খুব সাদাসিদে ভাব। ভুঁয়ে মাদুর পাতা, আসবাবপত্র কিছু নাই বললেই চলে। হলঘরের দেওয়ালে মা-দুর্গা, কালী, Christ (খ্রীষ্ট) প্রভৃতির ছবি টাঙ্গানো দেখলুম। এক একটি ছবির নীচে হাতে লেখা motto (বাণী) সব, যথা 'মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'

(অষ্টাবক্র গীতা)। স্বামিজী তার ছ'মাস আগে পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে গেছেন। তাঁরা বললেন, 'তোমরা যদি কিছুদিন আগে আসতে তো তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত।' চারটার সময় ঠাকুরঘর খোলা হ'লে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে আমরা সেদিন বিদায় নিলুম। তাঁরা সকলে বললেন, 'এখানে মাঝে মাঝে আসবে'।"

বরাহনগর মঠের এই দিনটি কালীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনকে এতই তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল যে এ-স্মৃতি তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উজ্জ্বলিত ছিল। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে, অন্তিম বয়সের দিনগুলিতেও কখনও প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি এই দিনটির কথা অতিশয় আবেগের সঙ্গে বলিতেন। দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও এইরূপ বলিতেছিলেন, "আমরা গিয়ে কোথায় যেন একটা নতুনরাজ্যে পড়লুম—everything (সবকিছু) আশ্চর্য লাগল। ......এঁদের life (জীবন) দেখে, কথাবার্তায় খুব deep imperession (গভীর রেখাপাত) হ'লো—নতুন light (আলো) যেন পেলুম—নতুন জগৎ।"

এখন হইতে তাঁহাদের বরাহনগরে যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিল। কলেজের ছুটি পাইলেই কালীকৃষ্ণ বরাহনগরে চলিয়া আসিতেন এবং কয়েকঘণ্টা মঠে কাটাইতেন। কালীকৃষ্ণের অঙ্কে খুব ভয় ছিল—হিসাবে কাঁচা ছিলেন। শশী মহারাজের সঙ্গে একদিন পড়াশোনার কথা হইতেছিল—সম্ভবতঃ তিনি বালক কালীকৃষ্ণের মনের ভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। কালীকৃষ্ণের আত্মস্মৃতি এ-প্রসঙ্গে এইরূপ: "শশীমহারাজ আমাদের পাঠ্য বিষয়েও নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। পড়াশোনা এড়াতে মঠে আসছি কিনা দেখতেন। একদিন আমায় ধরেছেন। আমি গোড়া থেকেই তাঁকে বলে রাখলুম, 'অন্য সব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেবল অঙ্কের প্রশ্ন করবেন না—ওতে আমি বড় কাঁচা।' শশী মহারাজ বললেন, 'তুমি গ্রীষ্মের বন্ধের দেড়মাস এখানে এসে থাকো। আমি এমন অঙ্ক শিখিয়ে দেব যে ফেল করবার ভয় থাকবে না।' আমি বললুম, 'বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'" পিতার অনুমতি লইয়া কালীকৃষ্ণ সত্যই গরমের বন্ধ হইতেই বই-খাতার দপ্তরসহ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—গণিত শিখিবেন। আসিতেই তো সকলে মহা-আনন্দিত। কালীকৃষ্ণও এতদিনে বুঝি স্বধামে পৌছিলেন—আহ্লাদে আটখানা হইয়া ঠাকুরসেবায় ও সাধুসঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। মঠের নানা খুঁটিনাটি কাজ—জল আনা, ফুল তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদিতে

শশীমহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়ভাবে কাটিয়া যাইত। একটানা একটা নেশার ঘোরে যেন দেড়মাস কাটিয়া গেল—বই খাতা যেমন দপ্তর-বাঁধা ছিল তেমনিই পড়িয়া থাকিল। অভিনব গণিত-শিক্ষাই বটে! কলেজ খুলিলে বাধ্য হইয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল,—মন কিন্তু বরাহনগরের সেই পুরাতন জীর্ণ মঠ-বাড়ীতেই থাকিয়া গেল।

পড়াশোনায় কালীকৃষ্ণ আর মন দিতে পারেন না—সংসারের কিছুই ভাল লাগে না। অহর্নিশ বুকে যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটেই শিখদের একটি নির্জন বাগান ছিল। বাগানের মধ্যে পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে একা একা আপন মনে ধ্যান-চিন্তায় সময় কাটাইতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়িবার ঘরে বসিয়া পড়াশোনার পরিবর্তে সাধন-ভজন চলিতে থাকিল। পুত্রের অস্বাভাবিক উদাস মতি-গতি মাতা-পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। অজানা কোন আশঙ্কায় তাঁহাদের বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ধৈর্যহারা হইয়া একদিন জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন,—"তোর আসল ভাবটা কি বল্ দেখি।" মুখচোরা অতিশয় শান্ত ছেলেটি, সেদিন কিন্তু পিতার সম্মুখে একবারও ঢোক গেলে নাই। সুস্পষ্ট অথচ বিনীতভাবে জবাব দিয়াছিল, "আমার আর পড়াশুনা করতে ভাল লাগছে না, ভগবানকে লাভ করবার জন্যে বেশী সময় সাধন-ভজনে কাটাই।" পুত্রের জবাবে পিতাও কিন্তু বিচলিত হন নাই। বলিয়াছিলেন, "সংসার আর ভগবান একই সঙ্গে দুটো হয় না। সংসারে উন্নতি করতে হ'লে মন দিয়ে লেখা পড়া কর, আর যদি ভগবানই লাভ করতে চাও তবে সব মন প্রাণ দিয়ে সাধন-ভজনে ডুব দাও। তুমি কোন্‌টা করবে তা ঠিক কর। বেশ করে ভেবেচিন্তে দেখ, তোমায় তিন দিন সময় দিচ্ছি।" তিন দিন পরে কালীকৃষ্ণ পিতাকে জানাইয়াছিলেন, "ভগবান লাভ করবার জন্যই আমি চেষ্টা করব আমি ঠিক করেছি···আমার মনে হয় এ-পথে আমার খুব সাহায্য হবে যদি আমি বরাহনগর মঠে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের কাছে থাকি।" পুত্রের এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে পিতাও বলিলেন, "উত্তম কথা। ধর্মজীবন যাপন করতে হ'লে গর্ভধারিণীর মত লওয়া আবশ্যক। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই এতে জানবে। চার ছেলের একজন যদি ধর্মজীবন যাপন করে, তো আনন্দেরই কথা"।

পুত্রের সঙ্কল্পে জননীও নির্ভীক-হৃদয়ে সম্মতি দিয়াছিলেন এ-কথা আগেই

উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে বলিয়াছিলেন, "তিনটে দিন আর থেকে যাও, তারপর যাবে।" যাহা হউক, জননীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া যথাকালে মাতা-পিতার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া কালীকৃষ্ণ বরাহনগর মঠের পথে পা বাড়াইলেন। জননী স্বহস্তে এলামাটির রঙে ব্রহ্মচারী পুত্রের জন্য কাপড় ছুপাইয়া দিয়াছিলেন,—আর মঠে ঠাকুর-সেবার জন্য নানা প্রকার মিষ্টান্নাদিও তৈয়ারী করিয়া পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণের বয়স তখন সতেরো —তবে দেখিতে আরও ছেলেমানুষ।

ইংরাজী ১৮৯১ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার নিজ-সন্তানগণ ব্যতীত কালীকৃষ্ণই প্রথম যুবক যিনি সর্বস্বত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচরগণের সঙ্গে বরাহনগর মঠে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দজীর একখানি পত্রের (২৩।৬।১৯১৪ সালে লিখিত) কয়েকটি ছত্র বিশেষ স্মরণীয়। অতিশয় আবেগ-মধুর ভাষায় প্রেমানন্দজী কালীকৃষ্ণকে লিখিয়াছিলেন—"কালীকৃষ্ণ চলো এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের পৌঁছাতে হবে প্রভুর কাছে। তুমিই তো বরাহনগরের মঠে ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত ৷ দেখিতে দেখিতে কতদিন কেটে গেল বল দেখি!"

বরাহনগরে মূর্তিমান-বৈরাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে কালীকৃষ্ণের ত্যাগোজ্জ্বল নবীন জীবন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকিল। মঠের সর্বপ্রকার কাজে কালীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন—সাধারণ কাজকর্ম হইতে সুরু করিয়া ঠাকুর-সেবা পর্যন্ত সকলকার্যে। মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাধন-ভজনেও ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন। কখনও কখনও স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হইয়া বা একাকী দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটীতলায় অথবা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদিও করিতেন। সন্ন্যাসিগণের ব্যক্তিগত সেবার সুযোগও তিনি যেরূপভাবে বা যে-দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সঙ্ঘজীবনে আজও দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছে, এবং চিরকালই থাকিবে। তাঁহার অপূর্ব সেবা-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া স্বামী সারদানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন,—"এ-ছেলেটা কে রে, মায়ের মতো সেবা করে?" বরাহনগর মঠের স্মৃতি-কথা বলিতে গিয়া উত্তরজীবনেও তিনি অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

বরাহনগরে আসিবার কিছুদিন পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও রামলালদাদার সঙ্গে কালীকৃষ্ণ একবার গয়া, বোধগয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শনেও গিয়াছিলেন, এ-কথা তাঁহার নিজ-মুখের উক্তি হইতে জানা যায়।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সঙ্কল্প করেন। স্বামী সারদানন্দজী এই উপলক্ষে কয়েকজন ভক্তসঙ্গে পূজার জিনিসপত্র লইয় জয়রামবাটী যাইবেন। কালীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"কি রে কালীকৃষ্ণ, যাবি তো চল্ আমাদের সঙ্গে।" কালীকৃষ্ণের প্রাণে কী এক অজানা আনন্দের চমক জাগিল—তাঁহার বহু-অপেক্ষিত সুযোগ! বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, হরমোহন মিত্র, যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও কালীকৃষ্ণদের এই দলে ছিলেন। বর্ধমানের পথে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-জন্মভূমি কামারপুকুর হইয়া সকলে মাঠের আলপথে জননী-সকাশে জয়রামবাটীতে পৌছিয়াছিলেন।

বালক কালীকৃষ্ণের চিবুকে হাত দিয়া মা চুম্বন করিলেন। মূর্তিমতী করুণার সাক্ষাৎ স্পর্শে তরুণ তাপসের হৃদয়মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীশ্রীমার অভিপ্রায়মতো দুর্গাপূজার ন্যায় তিন দিন ধরিয়া মহা সমারোহে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন হইল। কালীকৃষ্ণ বয়সে বালক বলিয়া অতি স্বাভাবিক-ভাবেই মার অতি নিকটে যাইতে পারিয়াছিলেন এবং টুকিটাকি নানা কাজে মার ফাইফরমাইস খাটিতেন। মাঝে মাঝে যাইয়া কামারপুকুর দর্শনও কয়েকবার করিয়া আসিয়াছিলেন। কামারপুকুরের তখনকার স্মৃতি তিনি নিজে এইভাবে বলিতেন: "সেখানে (কামারপুকুরে) থাকাকালে এক অপূর্ব পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দের ভাবে পূর্ণ হয়ে থাকতুম এবং ঠিক ঠিক বোধ করতুম—**We are treading on holy ground** (আমরা পুণ্যভূমির ওপর বেড়াচ্ছি) সেই পর্ণকুটীরের কি মোহিনী শক্তি। যেন **tangible, vibrant with spirituality** (প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিকতায় মুখরিত), যেন পৃথিবী ছাড়া বোধ হত।"

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার অপার্থিব স্নেহছায়ায় কয়েকদিন কাটাইয়া তাহারা আবার বরাহনগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মাতৃ-সান্নিধ্যের এই পুণ্যস্মৃতি-প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি প্রাণস্পর্শীভাষায় লিখিয়াছিলেন—"শূন্য হৃদয় নিয়ে বরাহনগর মঠে ফিরে এলুম। শূন্য হৃদয়ই বা বলি কেমন করে? মায়ের অপার্থিব ভালবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম। মার কথা যা সামান্য

শুনেছিলুম তাতে কে জানতো যে মা এরকম মা—এ রকম করে মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হ'তেও আপনার করে নেবেন? বাড়ীর মাকে তো খুব ভালবাসতুম ও তিনিও কত ভালবাসতেন—কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার—মা।"

জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া সারদানন্দজী এবং কালীকৃষ্ণ ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে লাগিলেন। সেইকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর তত্ত্বাবধানে কালীকৃষ্ণ কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে কিছুকাল চিকিৎসার্থ কাটাইয়াছিলেন। নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত তখন প্রায়ই তিনি গিরিশবাবুর গৃহে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গাদি শুনিতেন। যাহা হউক, নিরঞ্জন মহারাজের স্নেহ-যত্নে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত, প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর চিকিৎসাধীনে কালীকৃষ্ণের শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল। ইহা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগের কথা। মঠ ততদিনে আলমবাজারে উঠিয়া আসিয়াছে। কালীকৃষ্ণ আলমবাজার মঠে চলিয়া আসিয়া পূর্বের ন্যায় আবার ঠাকুরের এবং মঠস্থ সাধুদের সেবায় লাগিয়া গেলেন। বরাহনগরের মতো আলমবাজারেও কালীকৃষ্ণের দিন ভজন-সাধন-সেবায় খুব আনন্দে কাটিতে থাকিল।

এইকালেই তিনি গোপালের মাকে সেবা করিবার সুযোগও মাঝে মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন। গোপালের মা তখন কখনও কখনও মঠে আসিয়া দুই-চারিদিন করিয়া বাস করিতেন। গোপালের মাকে তিনি প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন গৃহত্যাগের পূর্বেই। কামারহাটিতে গোপালের মার বাড়ীর স্মৃতি—তাঁহার গোপালগতপ্রাণতা, কালীকৃষ্ণের জীবনে যেন গাঁথিয়া গিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে পরে এইরূপ বলিতেন, "সেই পুরানো এঁদোপড়া ঘরটি যেন ভগবদ্ভাবের স্পন্দনে পরিপূর্ণ একটি মন্দির বলে মনে হ'তে লাগলো, যেন ঠাকুর ওখানে জলজ্যান্ত বিরাজ করছেন।… তাঁর গোপালগতপ্রাণতা, কঠোরতা, বৈরাগ্য, সরলতা, সকলকে গোপাল বলে ডাকা—যেন সাক্ষাৎ মা যশোদা!"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। আলমবাজার মঠের জীবন কালীকৃষ্ণের মনঃপ্রাণকে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরিয়া দিলেও তাঁহার শরীর কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মাঝে মাঝে জ্বরভাব বোধ করিতেন—কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীমা তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যানবাটীতে. কালীকৃষ্ণ একদিন মাকে প্রণাম

করিতে আসিয়া তাঁহারই আদেশে নীলাম্বর বাবুর বাগানে রাত্রিবাস করিয়াছেন। স্বামী যোগানন্দজী তখন মায়ের প্রধান সেবক। ত্রিগুণাতীত মহারাজও জননীর সেবা করেন। গোলাপ মা ও যোগীন মা মায়ের সঙ্গেই আছেন। প্রত্যুষে মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া কালীকৃষ্ণ পুনরায় ফিরিবেন। মাকে প্রণাম করিতেই, মা অতিশয় করুণা-নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, তোমায় দেখে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হ'ল। তোমার কেমন গোলগাল শরীরটি ছিল, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখন কী চেহারা হয়ে গেছে! ওরা সাধু ফকির মানুষ, তোমায় কি-ইবা খাওয়াবে। তুমি কিছুদিন বাড়ী গিয়ে থাকো—সেখানে ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর পথ্যাদি করে শরীরটা সারিয়ে নাও।" জননীর মুখে এ-হেন আদেশ শুনিয়া কালীকৃষ্ণের তো মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কালীকৃষ্ণ নীরব। মা পুনরায় বলিলেন, "তাই কর বাবা। তাতেই ভাল হবে।"

কালীকৃষ্ণের বুক ব্যথায় মুচড়াইয়া উঠিল—দুই চক্ষে অশ্রু নামিয়া আসিল। দ্রুত মায়ের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া নির্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্যামিনী মা ও কালীকৃষ্ণের অন্তর-বেদনা অনুভব করিতেছিলেন,—কিন্তু আদেশ তথাপি প্রত্যাহার করেন নাই। গোলাপ মাকে বলিলেন, "আহা কালীকৃষ্ণের শরীর দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। তাই বাড়ী গিয়ে ভাল খেতে দেতে বললাম। তাতে তার মনে কষ্ট হল ভেবে আমারও চোখে জল আসছে।"

এদিকে কালীকৃষ্ণের বেদনাহত হৃদয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তি প্রদানের উপায়ও বিধাতা করিয়া দিলেন। যোগানন্দ মহারাজ নানা প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে পরের দিন সকালে পুনরায় মার নিকট পাঠাইলেন এবং মায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিতে শিখাইয়া দিলেন। জননী প্রসন্না হইয়া বালক কালীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মা তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিয়া সাধনপ্রণালী উপদেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমার বরাভয় করস্পর্শে চিত্তে বল আসিল—দৃঢ় সংকল্প করিলেন, বাড়ী গিয়া মায়ের নির্দেশ মতো জপ-ধ্যান পূজা-পাঠ লইয়াই কাটাইবেন।

তখন বর্ষাকাল ছিল। মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া সন্ধ্যার দিকে কালীকৃষ্ণ আলমবাজার মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মঠ হইয়া বাড়ীতেই

ফিরিয়া যাইবেন। আকাশভরা মেঘ, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল—ভরা গঙ্গা কুয়াশাঢাকা। কালীকৃষ্ণ নৌকায় চড়িলেন—মা নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া সন্তানের দিকে অপলক নেত্রে দেখিতেছিলেন। পুত্রের গায়ে কত ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল, জননী বুঝি তাহাও গণিতেছিলেন, স্বয়ং বৃষ্টিতে ভিজিয়া। এ-দৃশ্য কালীকৃষ্ণের মানসপটে অক্ষয় স্মৃতি হইয়া থাকিল।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাদের নারিকেলডাঙ্গার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবননাট্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্কে ইহা একটি দৃশ্যান্তর। বাড়ীর সেবা-যত্ন ও পথ্যাদির ফলে তিনি উত্তরোত্তর সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধ্যান-ধারণা, জপ-পূজা, স্বাধ্যায়াদি লইয়া মাতিয়া গেলেন। জপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে একলক্ষ আট হাজার পযন্ত উঠিযাছিল। ধ্যান-জপান্তে মনের নানা ভাবকে গানের আকারে বাঁধিয়া রাখিতেন—এইভাবে কয়েকশত গান রচিত হইয়াছিল। বাড়ীর কাহারও সহিত মেলামেশা করিতেন না—অধিকাংশ সময়েই ঘরের দরজায খিল লাগাইয়া রাখিতেন। কেবল খগেন, হরিপদ, সুধীর, সুশীল প্রভৃতি ধর্মবন্ধুরা আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও মঠের কথাবার্তা বলিতেন। বন্ধুরাও আবার কালীকৃষ্ণকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন—প্রত্যহই বৈকালে তাঁহারা আসিয়া জুটিতেন। কিন্তু ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা শোনার সময়ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাত্র আধ ঘণ্টায দাঁড়াইযাছিল। কারণ ইহাতেও ধ্যান-জপের বিঘ্ন বোধ করিতে লাগিলেন—বিশেষ, নির্দিষ্টসংখ্যক জপের অসুবিধা অনুভব করিতেন।

কখনও কখনও আলমবাজার মঠ হইতে সাধুরা—বিশেষতঃ শরৎ মহারাজ কালীকৃষ্ণের খোঁজ খবর লইতে আসিতেন। বাবুরাম মহারাজ, খোকা মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ এবং সারদা মহারাজ একাধিকবার কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

এমনই ভাবে প্রায় ১৪।১৫ মাস একটানা কাটিয়া গেল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ পুনরায় অস্থির হইয়া উঠিল। কালীকৃষ্ণের অন্তরের বৈরাগ্য আবার তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মনের অবস্থা জানাইয়া শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটীতে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রের প্রতি ছত্রে সংসার-বিরাগী বালকের হৃদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সংসার যেন তাঁহাকে গ্রাস

করিতে চাহিতেছিল—ভীত সন্তান তাই সরল প্রাণে জননীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া উহা লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি এইরূপ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা

১৪ আশ্বিন, সোমবার ১৩০২
৩৯নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা

পরম পূজনীয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু,
মা—

আপনার শ্রীচরণে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন।.........মা আপনাকে আমি প্রায় চিঠিপত্র লিখি না, তাহার কারণ আপনিই জানেন। এবার বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়া ভয়ে ভয়ে আপনার সম্মুখে আসিয়াছি। মনে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজয়রামবাটী যাইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব ও মনের ব্যথা যদি ঘৃণা লজ্জা ভয় ত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আপনার কাছে খুলিয়া বলিব। কিন্তু আপনার প্রতি টান না থাকার দরুণ এবং ইহাই ম্যালেরিয়ার সময় বলিয়া যাইতে সাহস হইল না। অন্তরের ব্যথা অন্তরেই রহিল, তাহা চিঠিতে প্রকাশ করিব কীরূপে? আপনাকে সকলেই অন্তর্যামিনী বলে, তবুও আপনি যদি তা না জানেন, তা আমারই অদৃষ্ট। আর যদি সকলই জানেন তাহলে দুঃখ দূর করেন না কেন, আমি কি করে জানিব? আপনি দয়াময়ী শুনিয়াছিলাম।...আপনিও বলিয়াছিলেন, "একি পাষাণময়ী মূর্তি পেয়েছ?" যাহা হউক আমার অবস্থাগুলি আপনাকে জানাইলে আপনি নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন জানি, কিন্তু কি করিব, আমার বড় ভয় হয়—ভবিষ্যৎ যেন আমায় গ্রাস করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। মা, তোমাকে না জানাইলে আর কাহাকেই বা জানাইব? কে আমায় অভয় শান্তি দিতে পারিবে? আর আপনাকে বলিলেও আপনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ না করেন—কি করিব, জানিব অদৃষ্ট বা কর্মফল।

মা, আমার যাহাই হোক আর নাই-ই হোক, মরিলেও তোমাকে কি দোষ দিতে পারি? আপনি আমায় বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন বটে, 'বাড়ীতে

থাকিয়া তাহাকে ডাকিলে আরও শীঘ্র উন্নতি হইবে' বলিয়া কতই অভয় আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাহা হইল না বলিয়া কি, সেই যে আপনি উপরে উঠিয়া গিয়া আমার জন্য কতই কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা কি মরিলেও ভুলিতে পারিব? একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিতে গঙ্গার উপর নৌকায় বৃষ্টি হওয়াতে, আপনি ব্যাকুল হইয়া ছাদে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া, আমার গায়ে কত ফোঁটা জল পড়ে দেখিবার জন্য নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন, তাহাও কি জন্মে ভুলিতে পারিব? মা, আপনি তখন আমায় ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি দেখিয়া মায়ায় ব্যথিত হইয়া ও অন্যান্য কারণে বাড়ী গেলে সুখে থাকিব ভাবিয়া বাড়ী আসিতে বলিলেন ও কত কৃপা করিলেন। আমিও বাড়ী আসিয়া প্রথম বৎসরটি আপনার কথা মত খুব সাধনে কাটাইলাম। তখন আমার একটুও সময় বৃথা নষ্ট হইত না। তখন আমি দিনের মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা ও ৮৫ হাজার জপ করিতাম। কিন্তু এক্ষণে ৫।৬ ঘণ্টা ও ত্রিশ হাজার জপও হয় না। তখন বেশী জপ করিতাম বলিয়া মনের কেমন তেজ ছিল, কিন্তু এখন অত্যন্ত পতিত হইয়া গিয়াছি, মন অতিশয় দুর্বল, কত রকম আসক্তিতে নাচাইতেছে ও ধর্মভাব যেন একেবারে লোপ পাইতেছে। মা, এইরকম ভাবে যদি আর দুই চার বৎসর থাকি ত আপনি দেখিবেন যে আমি কি হইয়া যাই। ......

মা, প্রায় দেড় মাস গত হইল আমি একদিন বাগবাজারে গিয়াছিলাম, তখন যোগেনবাবুর[১] শরীর শোধরাইবার জন্য বৃন্দাবন যাইবার ভারী ইচ্ছা হইয়াছিল। আমাকে বলিলেন, 'আমার সেবার জন্য সঙ্গে যাইবার একজন লোক পাইতেছি না, তুমি যদি যাও তাহা হইলে আমি যাই।' আমি যাইতে স্বীকার করিলাম ও মনে করিলাম যে, যোগেনবাবু যতদিন পশ্চিমে থাকিবেন তাঁহার সঙ্গে থাকিব, পরে যদি উনি কলিকাতায় ফেরেন তাহা হইলেও আমি পশ্চিমেই থাকিয়া যাইব। মনের এই অভিপ্রায় আমি বাড়ীতে বলায়, বাবা ও মা উভয়েই আমাকে যাইতে দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং আমার যাইবার জন্য যা যা দরকার তাহা মা সমস্তই দিতে চাহিলেন। কিন্তু এখন যোগেনবাবুর ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাঁহার পশ্চিমে যাইবার তেমন ইচ্ছা নাই। মা, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি

১। স্বামী যোগানন্দ। মঠের সন্ন্যাসিগণ তখনও পূর্বাশ্রমের নামেই পরিচিত হইতেন।

এখন একলাই বৃন্দাবনে যাই। সেখানে বাবুরামবাবু[১] ও সুবোধবাবু[২] আছেন, বলরামবাবুর কুঞ্জে থাকিবার জন্য খাইবারও কোন কষ্ট নাই। আমি তাহাদের কাছে থাকিলে কোন কষ্ট হইবে না। এবং এখন দুই এক বৎসর পশ্চিমে একলাও থাকিব না। যদি বাবুরামবাবু বা সুবোধবাবু কলিকাতায় চলিয়া আসেন তাহা হইলেও মঠের অন্য কেহ যিনি পশ্চিমে থাকিবেন, তাহার কাছে গিয়া তাহার সঙ্গেই থাকিব। মা, আমার উদ্দেশ্য ঘোরাঘুরি বা সন্ন্যাসী সাজা তো নহে,—যেখানেই হোক একটা জায়গায় রহিলাম, দুটি খাইতে পাইলাম ও মনে কোন ব্যাঘাত না পাইয়া সাধন করিতে পারিলাম। ......আপনি ভয় করিবেন না যে ছেলেমানুষ কোথায় যাইবে, হয়তো খুব কষ্ট পাইবে। এইখানেই বা কি কম কষ্ট পাইতেছি। এতদিন সহ্য করিলাম আপনাকে কিছুই বলি নাই। আপনি জিজ্ঞাসা কবিলে 'ভাল আছি' মাত্র বলি। যতই সহ্য করিতেছি ততই দেখি ইহারা আমাকে গ্রাস করিতে চায়।......মঠের বারজন আমা অপেক্ষা কম বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন। তবে এই কথা সত্য যে তাঁহাদের সহিত আমার তুলনাই হয় না। মা এখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। .. . ...

মা আপনি আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমি দিনরাত সাধন-ভজন করিতে পারি, মনের যত কুপ্রবৃত্তি সব একেবারে নাশ হ'য়ে যায়, বিশেষত যাতে আপনার শ্রীচরণে সদা সর্বদা আমার অচলা ভালবাসা-ভক্তি হয়।

মা আমি তোমার অতি অকৃতি সন্তান। দেখুন মা, একজন লোক যদি অন্য কাহারো কাছ থেকে যত্ন আদর পায় তাহলে তাহার প্রতি স্বভাবতই একটা টান বা ভালবাসা পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি মানুষ হ'য়ে এসে আমাদের কত অভাবনীয় যত্ন, আদর, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, দয়া করিলেন, তবুও পাপ মন আপনাকে ভালবাসিতে পারিল না। ছেলে বিদেশে থাকিলে মার জন্য কতই তার ভাবনা হয়, মাকে দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুলতা হয়। কই আমার তো মার কাছ থেকে অন্তর থাকার জন্য কখনই কষ্ট বোধ হয় না। মা, আপনি আশ্বাস দিয়াছেন 'হবে হবে'। মা, তাহা ক্রমে ক্রমে হবে, না হঠাৎ একদিন হবে? ক্রমে ক্রমে হইলে ত

১। স্বামী প্রেমানন্দ।

২। স্বামী সুবোধানন্দ

এতদিনে (২।৩ বৎসরে) একটুও হোত। মা, নিজগুণে দয়া করুন। মঠে যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন কে আর তাঁহার কৃপা ভিন্ন নিজের জোরে সংসার-ত্যাগ করিয়াছেন? আপনার যদি কৃপা থাকে তাহা হইলে অতি অকিঞ্চন যে আমি, আমিও কি সন্ন্যাসী হইতে পারিব না?

মা, খেলাৎ[1] আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আপনার অসাধ্য কি?' তাহাতে আপনি বলিয়াছিলেন, 'আমার অসাধ্য তিনি'। কিভাবে আপনি বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না—কিন্তু সারদাবাবুর[2] মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি[3] আপনার বিষয় বলিয়াছেন,—

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটী কৃষ্ণ কোটী রাম হয় রয় যায়॥'

আপনি মনে করিলে সকলই করিতে পারেন, কেন করেন না আপনিই জানেন। আপনি যদি বোঝেন যে আমার বাড়ীতে থাকিলে ভাল হইবে, আপনি মনে করিলে আমার যদি বাহিরে মন্দ হয় সেটাকেও কি যাতে ভাল হয় তাহা কি করিতে পারেন না? আপনি সকলই জানেন ও বোঝেন তাতে বেশী আর কি লিখিব? যা ভাল বিবেচনা করেন বলিয়া পাঠাইবেন। আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় রহিলাম, যত শীঘ্র হয় বলিবেন। আপনার শরীর এখন কেমন আছে বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইবেন।

মা আপনার
অতি অকৃতী সন্তান
কালীকৃষ্ণ

বালক বৈরাগীর মিষ্ট আবদার মাখানো আর্তি মাতৃ-হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারে নাই। প্রার্থনায় সাড়া মিলিয়াছিল—শ্রীশ্রীমা অনুমতি পত্রে লিখিয়াছিলেন:

১। বাল্যবন্ধু খেলাৎ চট্টোপাধ্যায়।
২। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীকালী

জয়রামবাটী

সন ১৩০২, ২০শে আশ্বিন।

চিরজীবেষু—

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ পরে—

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার কষ্ট হইতেছে শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া ৺গোবিন্দ জীউ দর্শন করিতে পারিলেই ভাল। তোমার পিতামাতার সম্মতি লইয়া ৺গোবিন্দ জীউ দর্শনে যাইবে। বিজয়, খগেন, সুশীল, খেলাৎ, শশী, ফণী, হরিপদ, কানাই প্রভৃতিকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। তোমার মাতাকেও আমার আশীর্বাদ জানাইবে।

মাতাঠাকুরাণী

পত্রে জননীর অনুমতি লাভ করিয়া কালীকৃষ্ণ আর কালবিলম্ব না করিয়া আলমবাজার মঠে গিয়া সকলের সহিত দেখাশোনা করিয়া সোজা জয়রাম-বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি হোক",—জগজ্জননীর এই অমোঘ আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া বৃন্দাবনের পথে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর। তরুণ পরিব্রাজকের মনে আনন্দের অবধি নাই আজ। যাত্রাকালে মাকে আবার এক পত্র লেখেন—যদিও পত্র লেখা শেষ করেন কাশীতে পৌঁছিয়া। পত্রখানি পড়িলে, তাহাই ধারণা হয়। সরল আনন্দোচ্ছল বৈরাগ্যেরই প্রতিচ্ছবি ইহা। কালীকৃষ্ণের পত্র :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

৪ঠা কার্তিক

পরম পূজনীয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু—

মা, আপনার শ্রীচরণে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। মা আপনার বিশেষ কৃপায় আমি আজ গৃহত্যাগ করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা যদিও কাঁদিতে লাগিলেন, তবুও আমার ভবিষ্যতে যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার জন্য কত আশীর্বাদ করিলেন। আমার

বাড়ীর মা যদি এমন না হইতেন তাহা হইলে কি আমি এমন হইতে পারিতাম ?······আপনার কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করি যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়,—আপনি তাহাকে আশীর্বাদ করুন যেন তাহার মনে শাস্তি হয়।

মা, তোমার ছেলে এখন একলা। তাহাকে ভবের নানা বিপদ বিসম্বাদ হইতে রক্ষা করিয়া তাহার সহায় হউন। মা আপনার অপার করুণা—কেবল অবিশ্বাসের জন্য কতই ভাবিয়া মরি। মা, আপনাকে যেন কখনই না ভুলি। সদা-সর্বদা যেন আপনার ধ্যান মনন করিতে পারি। মা, তুমি ছাড়া যেন আমার জীবনে অন্য কিছুই না উদ্দেশ্য হয়—আর কিছু দাও না দাও, আপনার শ্রীচরণে যাহাতে আমার অচলা প্রাণঢালা ভালবাসা ভক্তি হয় তাই করিয়া দিতে হইবে।

আমি আপনার অনুমতি পাইয়া কি পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। মা, আমার ভার সমস্ত তোমার উপর দিলাম। তুমি মা, আমায় হাত ছাডা করিও না—তাহা হইলে আমি পডিয়া যাইব। যে পথে যেভাবে গেলে আমি শীঘ্র শীঘ্র আপনার শ্রীচরণে প্রস্ফুটিত হইতে পারি আপনি সেই দিকে আমায় জোর করিয়া লইয়া যাইবেন। মা আমায় তোমাময় করিয়া রাখ।

মা, আমি মঙ্গলবার সকালবেলা শ্রীশ্রীকাশীধামে আসিয়া পৌছিয়াছি। গোপাল দাদার[১] কাছে বংশী দত্তের বাটীতে আছি। এখানে গোপালদাদা আমায় খুব যত্ন করেন, কোন কষ্ট নাই। মা, এখানে আট দশদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে, তারপর রাখালবাবু[২] ও যোগেনবাবুর[৩] কথামত কাশী হইতে অযোধ্যা দর্শন করিয়া পরে বৃন্দাবনে যাইব। এবার আপনার জগদ্ধাত্রী পূজা দেখিতে পাইলাম না। মা, আশীর্বাদ করুন যাহাতে আপনার শ্রীচরণে আমার অচলা ভালবাসা ভক্তি হয়।

মা, আপনার স্নেহের
কালীকৃষ্ণ

পুনশ্চ :—মা, আমি রাখালবাবু ও যোগেনবাবুর কথায় গেরুয়া বসন পরিয়াছি।

১। স্বামী অদ্বৈতানন্দ।
২। স্বামী ব্রহ্মানন্দ।
৩। স্বামী যোগানন্দ।

কাশীধামে স্বামী অদ্বৈতানন্দজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও কয়েকজন সন্তান ব্রহ্মানন্দজী, যোগানন্দজী, শিবানন্দজী, অভেদানন্দজী প্রমুখ ত্যাগী মহাত্মাদের পুণ্য সঙ্গে কালীকৃষ্ণ পরমানন্দে পুনরায় আপন ভাবে ডুবিতে থাকিলেন। কাশীধামেও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী একটি পত্র আসিয়াছিল। কালীকৃষ্ণকে মা লিখিয়াছিলেন :

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্ ১৩ই কার্তিক
জয়রামবাটী

শ্রীমান কালীকৃষ্ণ—

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার পূজনীয়া মাকে এবং তোমাকে আমি আশীর্বাদ করিলাম। তোমাদের নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিও। শ্রীমান গোপালকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশল লিখিতে বলিবে।……জগদ্ধাত্রী পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে শরৎ ও আরও কয়েকজন ছেলেরা আসিয়াছে … …। তুমি কোন তীর্থ আপনি দেখিলে আমাকে সকল লিখিয়া পাঠাইবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও। সাবধানে থাকিও, তাঁহার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিও। এবং মধ্যে মধ্যে আমায় পত্র দিয়া সুখী করিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়িনী
মাতাঠাকুরাণী

পুনশ্চ :—

গোপালকে শরতের প্রণাম জানাইও এবং তুমি তাহার ভালবাসা জানিও।

কাশীতে মাধুকরী ভিক্ষায় কালীকৃষ্ণ বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় একমাস এইভাবে কাশীবাস করিয়া তিনি বৃন্দাবন ধামে আসিলেন। পথে অযোধ্যা দর্শনাদিও করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' তখন স্বামী প্রেমানন্দজী অবস্থান করিতেছিলেন। কালীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহারই নিকটে ছিলেন। একই ঘরে বাবুরাম মহারাজের পবিত্র সঙ্গে বৃন্দাবনবাসের এই দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়া কালীকৃষ্ণ আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। বহু-আকাঙ্ক্ষিত ধ্যান-ভজনাদিতে আবার তিনি ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে মাসাধিককাল তপস্যাদির পরে বাল্যবন্ধু খগেন্দ্রনাথ (বিমলানন্দ)-কে লিখিত একটি চিঠিতে তাঁহার তদানীন্তন মানসিক ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পত্রের এক জায়গায় কালীকৃষ্ণ লিখিয়াছিলেন—"তথাকথিত 'গৃহসুখ' এবং প্রিয় বন্ধুগণের সাহচর্য ছেড়ে আমি এখন অন্য সীমায়! ভগবৎ দর্শনের একমাত্র আশা নিয়ে এই পুণ্যতীর্থে এসেছি। অনিত্য সাংসারিক কোন ঝঞ্ঝাট আর নেই। কষ্ট এবং কৃচ্ছ্রতাকে গ্রাহ্য করি না। একমাত্র দৃষ্টি আত্মার নবজন্ম। আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপা!" মাধুকরী ভিক্ষা, তপস্যা এবং ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাদিতে দিন বেশ আনন্দেই কাটিতে লাগিল। জপধ্যানের মাত্রা তখন এত প্রবলভাবে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে রাত্রে কালাবাবুর কুঞ্জের ছাদে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতে করিতে অনেকদিন গায়ের উপর দিয়া কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তবুও আসন ছাড়িয়া উঠেন নাই। বৃন্দাবনে স্বামী প্রেমানন্দজীর পুণ্য সাহচর্যে এইভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড কঠোরতার ফলে তাঁহার শরীরের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল—ক্রমে বেশ দুর্বল হইয়া পড়েন। এই তপস্যা-কালের স্মৃতি কালীকৃষ্ণ আজীবন অতিশয় আবেগের সহিত স্মরণ করিতেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তখনও সংসার ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করেন নাই। শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামেই তখনও তিনি পরিচিত। উত্তর-প্রদেশের এটোয়া শহরে তখন তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত। প্রেমানন্দজী কালীকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহারই নিকটে চলিয়া গিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ছিল, কালীকৃষ্ণের জন্য বায়ু-পরিবর্তন ও চিকিৎসা-পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করা। হরিপ্রসন্ন মহারাজের আদরযত্নে ও ব্যবস্থাপনায় কালীকৃষ্ণ অল্পদিনেই আবার সারিয়া উঠিয়াছিলেন।

পুনরায় বৃন্দাবন। ১৮৯৬ সালের শেষাশেষি এক বিশেষ শুভ সংবাদ বাবুরাম মহারাজ ও কালীকৃষ্ণকে বাংলার দিকে আকৃষ্ট করিল। খবর আসিল, স্বামিজী শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। স্বামিজীর আকর্ষণ দুর্নিবার। তাঁহারা বাংলা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন এবং কলিকাতার পথে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনাও করিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তারকেশ্বর হইয়া বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান আঁটপুরে কয়েকদিন কাটাইয়া তাঁহারা ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে আলমবাজারের

মঠে আসিয়া পৌছিলেন। স্বামিজী ইহার কয়েকদিন পূর্বেই পৌছিয়া গিয়াছিলেন।

এতকাল যাঁহার পথ চাহিয়া কালীকৃষ্ণ দিন কাটাইতেছিলেন—যাঁহাকে এতদিন শুধু ধ্যানই করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই সহিত চাক্ষুষ মিলন হইল। স্বামিজী কালীকৃষ্ণের কথা ইতিমধ্যে মঠের গুরুভ্রাতাদের নিকট শুনিয়াছেন। তাই কালীকৃষ্ণ স্বামিজীকে প্রথম দর্শন করিয়া প্রণাম করিবামাত্র—"ওঃ এই ছেলেটি বুঝি," বলিয়া সস্নেহে তিনি কালীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইলেন। স্বামিজীকে প্রথম দর্শন করিবার পর তাঁহার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল তাহা কালীকৃষ্ণ নিজে এইভাবে পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—"সেই সম্মোহন চক্ষু—যার কথা শুনেছিলাম ও আমেরিকার কাগজে cuttingএ পড়েছিলুম! তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। কি অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা nonchalant ভাব, a dazzling personality! আমার first impression—ভালবাসা, ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব।

"সে সময় স্বামিজীর গায়ের রং বেশ টকটকে ফরসা ছিল। মুখখানা যেন সর্বদাই একটা অপূর্ব ভাবে ও তেজে অগ্নিবর্ণ দেখাতো। যেন চোখা চোখি হ'লে চোখ ঝলসে যাবে, চাওয়া যেত না। তিনি যখন ভিতর বাড়ীর ছাদে কৌপীন মাত্র পরে আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সিংহের মতো ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতেন তখন মনে হ'ত, যেন আধ্যাত্মিক জগতের নেপোলিয়ান, তাঁর পদক্ষেপে যেন দুনিয়াটা slipping from under his feet, যেন টলমল করছে। মনে হ'ত যেন একটা মহাশক্তির স্ফুরণ অনবরত হচ্ছে ও ফেটে পড়ছে।"

কিছুদিনের মধ্যেই স্বামিজী কালীকৃষ্ণকে এবং আরও তিনজনকে[১] সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে স্বামিজী ও তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতাগণের সন্ন্যাসগ্রহণোপলক্ষে বরাহনগর মঠে যে বিরজা-হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল[২], তাহার পর ইহাই প্রথম বিরজা হোম। ইহা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের কথা। স্বামিজীর

১ সুশীল (প্রকাশানন্দ), কানাই (নির্ভয়ানন্দ) এবং যোগেন চাটুয্যে (নিত্যানন্দ)।

২ জানুআরি, ১৮৮৭ খ্রীঃ।

আদেশে তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য শ্রীশরৎ চক্রবর্তী মহাশয় সন্ন্যাসপ্রার্থীদের আত্ম-শ্রাদ্ধাদি কার্যে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী অনুষ্ঠেয় পূজা ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ সহকারে হোমাগ্নি প্রজ্জালিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-দীক্ষান্তে স্বামিজী কালীকৃষ্ণের নূতন নাম দিলেন—স্বামী বিরজানন্দ।

আলমবাজার মঠে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক সন্ন্যাস-যজ্ঞের স্মৃতি বিরজানন্দজীর মানসপটে চিরসমুজ্জ্বল ছিল—স্বামিজীর সেদিনের অপূর্ব জ্যোতিঃঘন মূর্তি তাঁহার চিত্তে আজীবন উদ্ভাসিত ছিল। যতিশ্রেষ্ঠ স্বামিজীর সেদিনকার রূপ ভাষায় বর্ণনার নহে। বিরজানন্দজীর স্মৃতিচিত্র এইরূপ: "তাঁর স্বতঃপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল হোমাগ্নির উজ্জ্বল প্রভায় অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল, যেন সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা নরবিগ্রহ ধারণ ক'রে সমাসীন! আমাদের সন্ন্যাস-দীক্ষা দান ক'রে স্বামিজীর সে কি আনন্দ! বোধ হয় গৃহস্থের নবজাত পুত্র সন্তান হলেও এত আনন্দ হয় না।"

নবীন সন্ন্যাসী-চতুষ্টয়কে স্বামিজী সেদিন প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন,—"তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।" বিরজানন্দ-প্রমুখকে দেখাইয়া বিবেকানন্দরূপী মূর্তিমান সন্ন্যাস সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "এরা ব্রহ্মচর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে।"

গোপালের মা কয়েকদিন পরে মঠে আসিয়া নবীন সন্ন্যাসীদের দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইয়াছিলেন। 'বিরজানন্দ' নামটি শুনিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আহা বেশ নামটি হয়েছে, ঠিক নাম হয়েছে—বিরজানন্দ—বেজার নেই।"

আচার্য বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের জীবন-নাট্যে নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমন্বিত আদর্শে শিক্ষা ও সাধন চলিতে থাকিল। স্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবা করিবার দুর্লভ সৌভাগ্যও এইকালে তাঁহার হইয়াছিল। শ্রীগুরুর নিকট "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" মন্ত্র লাভ করিয়া কিছুকাল পরে তাঁহারই আদেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার ভার লইয়া বিরজানন্দজী দেওঘরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় দেওঘরে সেবাকার্য অতিশয় সুশৃঙ্খলভাবে

সম্পাদিত হইয়াছিল। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সহিত এই সময়ে দেওঘরে তাঁহার পরিচয় হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী অতিশয় স্নেহভরে বিরজানন্দকে তখন শাস্ত্রাদি পড়াইতেছিলেন। আলমবাজার মঠবাড়ীর উপরে উঠিবার সিঁড়ির নীচে নিরালায় এককোণে বসিয়া তিনি শাস্ত্রপাঠ করিতেন—হরি মহারাজ সিঁড়ি দিয়া ওঠা নামার সময়ে আসিয়া তাঁহার কাছে বসিতেন এবং পাঠ বুঝাইয়া দিতেন। হরি মহারাজের সহিত এই সময় হইতেই যে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, বিরজানন্দের উত্তরজীবনে তাহার প্রভাব বড় কম নহে। হরি-মহারাজ-প্রসঙ্গে এইকালের স্মৃতি তাঁহার মনে উঠিলে প্রায়ই বলিতেন, "আলম-বাজার মঠে এসে হরি মহারাজ খুব অন্তর্মুখ ভাবে থাকতেন। পরিব্রাজক জীবন শেষ করে তিনি মঠে আসবেন যখন কথা হচ্ছে, তখন শশী মহারাজ একদিন আমায় বললেন, 'দেখবি কেমন সিদ্ধ মহাপুরুষ'। হরি মহারাজকে প্রথম প্রথম খুব সমীহ করে চলতুম—কিন্তু তিনি তাঁর স্নেহ ভালবাসায় আমাকে এমন করে নিয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাঁর সঙ্গ ও কথাবার্তায় আমার সমস্ত অবসর সময় কাটাতুম।"

মঠে তখন শাস্ত্রালোচনা, বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি পাঠের মাধ্যমে শাস্ত্রব্যাখ্যা ইত্যাদি নিয়মিত হইত। স্বামিজীর নির্দেশে সমবেত সাধুমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় প্রতি রবিবারেই পালাক্রমে এক এক জনকে কোন একটি বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ করিতে হইত। বিরজানন্দের ভাষণ হরি মহারাজের বিশেষ প্রিয় ছিল—তাঁহার বাচনভঙ্গির তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। একবার বলরাম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি আলোচনা-সভায় কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই বিরজানন্দের সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনিয়া স্বামিজীও খুব খুশী হইয়াছিলেন।

১৮৯৮-এর ফেব্রুআরিতে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল। পরে বেলুড়ের বর্তমান স্থায়ী মঠ ঐ বৎসরের ৯ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯-এর প্রথমভাগেই বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে ঢাকায় প্রচারকার্যের জন্য স্বামিজী মনোনীত করেন। প্রকাশানন্দ প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিরজানন্দ স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। নানাভাবে ইতস্ততঃ করিয়া স্বামিজীর নিকট অবশেষে সানুনয়ে বলিলেন, "সাধন-ভজন কিছুই করলুম না, ভগবানকে এখনও উপলব্ধি করতে পারলুম

না, আমি কি বক্তৃতা কোরব?" স্বামিজী বুঝাইয়া বলিলেন, "তুই তো আচার্যের অভিমান রেখে বলবি নি, সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা কাজ করিস্, বক্তৃতাও সেই ভাবে করবি।"

স্বামিজী তখন কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। বিরজানন্দকে সেইখানেই ডাকাইয়া আনিয়া উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিরজানন্দ প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইতেছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আচার্যের নির্দেশ মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে ঐ-বিষয়ক কথোপকথনটি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই হৃদয়স্পর্শী। বর্তমান প্রবন্ধের সূচনাতেই আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

কয়েকদিন পরে মঠে স্বামিজী একদিন ঠাকুরঘরে গিয়া নিজে অনেকক্ষণ ধ্যান-পূজাদি করিলেন এবং বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে কাছে বসাইয়া, তাঁহাদের মাথায় হাত রাখিয়া খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাস কর্, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে। জানবি সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টি শরীর।" স্বামিজী সেদিন তাঁহার এই শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে শুধু "শক্তি-সঞ্চার" করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই—বিরজানন্দকে আরও কিছু বিশেষ দিয়াছিলেন। উপযুক্ত প্রার্থীকে মন্ত্রদীক্ষাদানের অধিকারও বিরজানন্দকে সেদিন তিনি প্রদান করেন,—কী মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়াছিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বিরজানন্দ ধর্মগুরুর আসনে বসিয়াছেন ১৯৩৮-এর শেষে। কিন্তু জগদ্গুরু স্বামিজী কর্তৃক তিনি বহু পূর্বেই ঐ আসনের জন্য মনোনীত হইয়া থাকিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহারই নিকট হইতে যথাযোগ্য "চাপরাশ" লাভ করিলেন, ইহা সত্যই এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। বিরজানন্দের নিজহাতে-লেখা ব্যক্তিগত দিনলিপিতে এই ঘটনাটির সবিস্তার উল্লেখ—আমাদের কাছে খুবই প্রেরণাপ্রদ। স্বামিজীর অভয় করস্পর্শে শক্তিমান গুরুভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন। সেদিন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুআরি।

কিছুকাল পরে প্রকাশানন্দকে স্বামিজী মঠে ডাকিয়া পাঠাইলে বিরজানন্দ একাকীই ঢাকায় প্রচারকার্যে রত থাকিলেন। ঢাকা ব্যতীত ময়মনসিংহ ও বরিশালে অতি দক্ষতার সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর-গাম্ভীর্য ও প্রশান্ত-বিনম্র চরিত্রে সকলেই আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন। বরিশালে তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের অতিথিরূপে তাঁহারই বাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন। অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে অবস্থানকালে নিত্য বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, অনেক আদর্শবাদী যুবক তাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে, বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ নারায়নগঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামে ভক্তচূড়ামণি নাগ মহাশয়ের ভবনে গিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিদ্বয়কে পাইযা নাগ মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা ছিল না—নাগ-ভবন একটি উৎসবমণ্ডপে পরিণত হইয়াছিল। নাগ মহাশয়ের সাহচর্য বিরজানন্দ মঠে ও কাঁকুড়গাছিতে পূর্বেও লাভ করিয়াছিলেন। এবার ভক্তপ্রবরের জন্মভূমি দর্শন করিয়া আরও তৃপ্ত হইলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কার্য হইতে মঠে ফিরিয়া এবার বিরজানন্দ মনঃপ্রাণ ঢালিয়া স্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অহর্নিশ অমানুষিক পরিশ্রমে স্বামিজীর শরীর তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। চিকিৎসাদির সুবিধার জন্য তিনি কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দজীও (হরি মহারাজ) তখন সেইখানেই ছিলেন। একই ঘরে সকলে থাকিতেন। বিরজানন্দের ঐকান্তিক অনুরাগ-ময় নিখুঁত সেবায় স্বামিজী খুবই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। দিনের বেলায় সেবায় নানা কাজে এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। রাত্রেও উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র কাটাইতেন—স্বামিজী কখন কি কাজে ডাকিবেন! কিন্তু তথাপি তিনি ক্লান্তিহীন ছিলেন—গুরুসেবার তৃপ্তিতে হৃদয়-মন তাঁহার ভরিয়া থাকিত। হরি মহারাজ একদিন রাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই রাত্রে ঘুমোস্ না?" বিরজানন্দ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "না, ঘুম পায় না।" হরি মহারাজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ক্লান্ত বোধ করিস্ না?" সসঙ্কোচে জবাব দিয়াছিলেন, "কই, না তো।" এইভাবে একাদিক্রমে তিন মাস তিনি রাত্রে ঘুমান নাই।

চিকিৎসকগণের পরামর্শানুযায়ী স্বামিজীর আর একবার সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হইল। ১৯শে জুন ১৮৯৯, মঠে তাঁহাকে লইয়া একটি গ্রুপ ফটো তোলা হইয়াছিল। বিরজানন্দ স্বামিজীর জন্য রান্নায় নিরত ছিলেন—স্বামিজীর ডাকাডাকিতে ছুটিয়া আসিয়া ফটোর জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। রান্নার কাজে যেমন অবস্থায় ছিলেন, অমনই দাঁড়াইয়া গেলেন—গায়ে কোন জামা

পরিবার অবসর হয় নাই। স্বামিজীর সহিত ফটো তুলিবার পর পুনরায় যখন কাজে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চোখ ফাটিয়া জলধারা নামিয়া আসিয়াছিল। পরের দিন কলিকাতা বন্দর হইতে স্বামিজী দ্বিতীয়বার আমেরিকার পথে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। সঙ্গে হরি মহারাজ এবং ভগিনী নিবেদিতাও চলিলেন।

স্বামিজীর নির্দেশমতো বিরজানন্দ অতঃপর হিমালয়ের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কর্মিরূপে প্রেরিত হইলেন। মায়াবতীর জন্য স্বামিজী তাঁহাকে ইতঃপূর্বেই মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরজানন্দ তখন সবিনয়ে জানাইয়াছিলেন, "যে কয়দিন আপনি এখানে আছেন, আপনার কাছে থাকি, তারপর যাব।" স্বামিজীও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। বিমলানন্দ এবং বুড়োবাবাও (সচ্চিদানন্দ) বিরজানন্দের সহিত মাযাবতীর যাত্রী হইয়াছিলেন।

স্বামিজীর শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস্ সেভিয়ার নামক ইংরেজ দম্পতির উৎসাহ-উদ্যম ও অর্থানুকূল্যেই মায়াবতীর কাজ আরব্ধ হইয়াছিল। মিসেস্ সেভিয়াবকে স্বামিজী মাতৃ-সম্বোধন করিতেন—তাই তিনি সকলেরই নিকট মাদার সেভিয়ার নামে পরিচিতা। মিশনের ইংরাজী মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' অদ্বৈত আশ্রম হইতেই প্রকাশনের সব বন্দোবস্ত হইয়াছে—স্বরূপানন্দ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া পূর্বেই মায়াবতী চলিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর নির্দেশে হিমালয়ের কোলে গুরুভ্রাতাগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন—তাঁহারই অভীপ্সিত কর্ম-সাধনায়। সকলে মিলিয়া অদম্য উৎসাহ ও অনলস প্রচেষ্টায় স্বামিজীর বড সাধের অদ্বৈত-বেদান্তের সাধন ও প্রচারের এই আদর্শ কেন্দ্রটি গড়িয়া তুলিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। সমবেত শক্তি নিয়োগের ফলে আশ্চর্য গতিতে কাজ চলিতে থাকিল। সহসা ক্যাপ্টেন সেভিয়ার কঠিন পীডায় আক্রান্ত হইয়া মায়াবতীতে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীগুরুর সেবায় নিবেদিত একটি মহাপ্রাণ হিমালয়ের বুকে চিরবিশ্রাম লইল। ইহা ১৯০০ সালের অক্টোবরের ঘটনা। স্বামিজী তখনও ইয়োরোপে।

ডিসেম্বরের গোডায় স্বামিজী মঠে ফিরিয়া আসিলেন। একবার মায়াবতীতে গিয়া শোকবিহ্বলা মাদার সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হইলেন। সেই সময়ে মায়াবতী যাইতে হইত কাঠগোদাম স্টেশন হইতে ৬৫ মাইল পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা ডাণ্ডীতে। স্বামিজী তারযোগে জানাইলেন

তিনি ২৯শে ডিসেম্বর (১৯০০), কাঠগোদাম পৌছিবেন। তাঁহার সঙ্গে মঠের আরও দুইজন সন্ন্যাসীও থাকিবেন—গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ এবং শিষ্য সদানন্দ। বিরজানন্দ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বহুকষ্টে প্রয়োজনীয় ডাণ্ডী কুলী সব সংগ্রহ করিলেন এবং মাত্র দুই দিনে ৬৫ মাইল দুর্গম পার্বত্য পথ পায়ে হাঁটিয়া, ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টায় কাঠগোদামে পৌছিয়া গেলেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৯শে, ভোর ৫টায় স্বামিজীর ট্রেন আসিল।

বিরজানন্দকে দেখিয়া স্বামিজী খুব খুশী হইলেন। অপর্যাপ্ত এই সময়ের মধ্যে যেভাবে লোকজন জুটাইয়া লইয়া এত দীর্ঘপথ হাঁটিয়া বিরজানন্দ কাঠগোদামে উপস্থিত হইযাছেন, তাহা শুনিয়া স্বামিজী পরম স্নেহ ও আহ্লাদে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বাঃ বাঃ, এই তো ঠিক আমার চেলা।"

স্বামিজীকে লইয়া এই দুর্গম দীর্ঘ পার্বত্য পথে চলিতে বিরজানন্দ ভীষণ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্যই ছিল অধিক চিন্তার কারণ—স্বামিজীর গায়ে তখনও জ্বর জ্বর ভাব। যাহা হউক স্বামিজী ডাণ্ডীতে চলিলেন। দলের আর সকলে আগে-পিছে, কেহ হাঁটিয়া, কেহ ঘোড়ায়, চলিতেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে আসিয়া স্বামিজী খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিন ১৭ মাইল গিয়া একটি ডাক বাংলোয় রাত্রি যাপন করা হইল। দ্বিতীয় দিন পথে সহসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল—বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যেই কোনমতে স্বামিজীকে লইয়া যাত্রিদল আগাইয়া চলিলেন। গন্তব্য ডাকবাংলো তখনও অনেক দূরে। এদিকে স্বামিজীর ডাণ্ডীবাহকেরা চা-তামাক খাইবার অছিলায় ডাণ্ডী নামাইয়া বিশ্রাম করিতে চাহিল—স্বামিজী তো তাহাদের পরম বন্ধুর মতো অনুমতি দিয়া বসিলেন। বালকস্বভাব স্বামিজীর কাণ্ড দেখিয়া বিরজানন্দ মহা ভাবনায় পড়িলেন। কারণ পাহাড়ী কুলীদের প্রকৃতি তাঁহার খুব ভালই জানা ছিল,—উহারা একবার বসিলে, আর উঠানো কঠিন। যাহা আশঙ্কা ছিল, ঘটিলও তাহাই। পাহাড়ে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে—এদিকে প্রবল বর্ষণ আর তুষারঝঞ্ঝা। অগত্যা একটি পাহাড়ী দোকানে স্বামিজীকে লইয়া বিরজানন্দ সেই রাত্রি যাপন করা স্থির করিলেন। বরফ পড়ার জন্য দারুণ ঠাণ্ডা—জীর্ণ কুটীরটির মধ্যে আগুন জ্বালানোর ফলে ধোঁয়ায়

ধোঁয়াময়। উহা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ রাত্রি—অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর।

স্বামিজী বালকের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শিবানন্দজীকে বলিলেন, "কালীকৃষ্ণ না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু তারকদা, তুমি তো বুড়ো, তুমি কোন্ আক্কেলে আমায় এই দুর্যোগের মধ্যে পাহাড়ে নিয়ে এলে?" আবার বিরজানন্দকেও তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই আমাকে কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ায় যেতে না দিয়ে কেন মায়াবতী যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলি?"

বিরজানন্দ তো বিবেকানন্দেরই চেলা! নীরবে সব তিরস্কার শুনিলেন, পরে বিনীতভাবে বলিলেন, "কিন্তু দোষ তো আপনারই। আপনাকে তো বারণ করেছিলাম,—আপনি কুলীদের ডাণ্ডী নামাবার অনুমতি দিয়েই তো এই বিভ্রাট ঘটালেন। এখানে ওরা এত দেরী না করলে আমরা যে করেই হোক ডাকবাংলোয় পৌছে যেতুম।"

শিষ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া স্বামিজী তখনই শিশুর মতো শান্ত হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "আচ্ছা, যা হবার তা হয়েছে। বকেছি, কিছু মনে করিস্‌নি। বাপও তো ছেলেকে বকে। আয় এখন যতটা পারা যায় রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যাক।"

রাত্রি কিন্তু বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটিল। পাহাড়ী দোকানদারের তৈয়ারী শক্ত মোটা রুটি চিবাইয়া সে রাত্রির আহার সমাপন হইল। নানা প্রসঙ্গে রাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিরজানন্দ স্বামিজীকে বলিলেন, উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিতেছে। এই সন্ধ্যারাত্রি এইভাবে কাটানো যেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বামিজী শুনিয়া একটু চিন্তামগ্নভাবে হাসিলেন।

শতাব্দী-সন্ধির এই ঘটনা-চিত্রটি, বিরজানন্দের জীবনে অনেক কারণেই পবিত্র ও ভাবদৃপ্ত। উত্তরকালে জীবন-সন্ধ্যাতেও কোনও সূত্রে বা প্রসঙ্গে এই পুণ্য-স্মৃতিকে যখন তিনি অপরের কাছে প্রকাশ করিতেন—তখন সেখানে উপস্থিত থাকিবার ও সেইকালে তাঁহার উজ্জ্বল মুখচ্ছবিখানি দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা অনুভব করিয়াছেন। এই রকমই একজনের স্মৃতি কথা:

"১৯৫০-এর মার্চে মহারাজজী পাটনা আসেন। মহাপুরুষ মহারাজ (শিবানন্দজী) একদা যে তক্তাপোশটিতে শুয়েছিলেন, সেই তক্তাপোশখানিই আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল, মহারাজজীর শোবার জন্য। কিন্তু গদি করা যায় কি দিয়ে? শুকনো খড দিয়ে ওদেশের মতো একরকম গদি বানিয়ে দিয়েছিলাম—মহারাজের বিছানার তলায় পাতবার জন্য। সকালে একদিন প্রণাম করতে গেছি—জিগ্যেস করলাম, 'মহারাজ, আপনার বিশ্রামের কোনও অসুবিধা হয়নি তো? বিছানাটি কি শক্ত বোধ হচ্ছিল?' মহারাজ অমনি হেসে জবাব দিলেন, 'না না। খুব সুন্দর নরম বিছানা। আমি বেশ ঘুমিয়েছি।' আমি তখন ভরসা পেয়ে ধীরে ধীরে বললাম যে, শুকনো খড দিয়ে ঐ গদি তৈরী করা হয়েছে তাঁরই জন্য। এই কথা শুনেই তো ভারী খুশী তিনি। বললেন, 'তুমি তো খুব resourceful হে! দেখ, আমারও একটা ঘটনা এ রকম আছে। তোমারটা তো বেশ simple ব্যাপার,—কিন্তু আমারটা খুব serious। স্বামিজীকে নিয়ে মায়াবতী যাচ্ছি—একটা ঝুপড়িতে রাত কাটাতে হয়। দারুণ তুষারপাত হচ্ছিল। তুষার-ঝড় এতো হচ্ছিল যে, মহাপুরুষ মহারাজ দোরে পিঠ লাগিয়ে সারা রাত বসে কাটিয়েছেন। তখন কোথায় বিছানা, কোথায় বালিশ! আবোল তাবোল এটা-সেটা যা' কিছু হাতের কাছে ছিল, তা'ই সব জড়ো করে একটা চাদরে মুড়ে বালিশ তৈরী করে স্বামিজীর মাথার নীচে দিয়েছিলাম। আমি তো সারা রাত বসে পাহারা দিয়ে কাটালাম। স্বামিজী পরের দিন ভোরে বলছেন—দেখ্, কাল বেশ ঘুমিয়েছি।...তারপর ঐ অদ্ভুত বালিশের কথা যখন শুনলেন, তখন যে কী খুশী! বলেছিলেন, 'কালীকৃষ্ণ তুই তো খুব resourceful দেখছি।'"

পরের দিন ১২ ইঞ্চি বরফের উপর দিয়া সকলে আবার যাত্রা শুরু করিলেন। স্বামিজী তখন খুবই প্রফুল্লভাবে বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। এই রাত্রি একটি ডাকবাংলোতে যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহার পরের দিন বরফ অনেক গলিয়া গিয়াছিল। এইদিন ২১ মাইল চলিতে হইয়াছিল। শেষের দিকে স্বামিজী কিছু পথ বিরজানন্দের কাঁধে ভর দিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন। শিষ্যের স্কন্ধে নিজের দেহভার ন্যস্ত করিয়া চলিতে চলিতে বলিয়াছিলেন, "দেখ্, আগে বিশ পঁচিশ মাইল হাঁটা আমার কাছে

কিছুই ছিল না। এখন কি রকম দুর্বল হয়ে গেছি। এইটুকু হাঁটতে কত কষ্ট বোধ হচ্ছে।" কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "দেখ্ বাবা, এখন তো জীবনের শেষে এসে পৌছুচ্ছি।" বিরজানন্দের বুক কাঁপিয়া উঠিল। যাহা হউক, এইভাবে পথ চলিতে চলিতে পঞ্চম দিনে (৩রা জানুআরি, ১৯০১) স্বামিজী মায়াবতী আশ্রমে আসিয়া পদার্পণ করিযাছিলেন। বরফের জন্য পথে আটক না পড়িলে অবশ্য একদিন আগে পৌছিতে পারিতেন।

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামিজী মাত্র দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন। বিরজানন্দের মনে এই দুই সপ্তাহের স্মৃতি চিরদিনই উজ্জ্বল হইয়া ছিল। মায়াবতীতে স্বামিজী সকলকে কতই না উদ্দীপনা ও আনন্দ দিযা গিয়াছিলেন। হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে শ্রীগুরুর এমন একান্ত সন্নিধি তাঁহার সমগ্র অধ্যাত্ম জীবনে এক পরম সম্পদ। এইকালের স্মৃতিকথা বলিতে বলিতে তাই তাঁহাকে অভিভূত হইযা পড়িতে দেখা যাইত।

একদিন বিরজানন্দ স্বামিজীর নিকট নির্জনে কিছুদিন একান্ত তপস্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামিজী অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "কঠোর তপস্যা করে শরীর নষ্ট করিস্‌নি। দেখ্ না, আমরা কঠোর করে করে শরীর ভেঙ্গে ফেলেছি। তাতে কি লাভ? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে তোরা শেখ্। তা ছাড়া কতক্ষণ আর ধ্যান করবি? পাঁচ মিনিট, এমন কি এক মিনিট যদি মন স্থির হয় তো যথেষ্ট। তার জন্যে সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত কিছুক্ষণ জপধ্যান করা দরকার। বাকী সময় শাস্ত্রপাঠ এবং লোকহিতকর কাজ নিয়ে থাকতে হয়। আমার শিষ্যেরা তপস্যার চেয়ে কাজের দিকে বেশী ঝোঁক দেবে এই আমি চাই।" দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া বিরজানন্দ তথাপি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আপনি যা বলেছেন তা' ঠিকই। তবুও চরিত্রবল ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যার একান্ত প্রয়োজন আছে, অন্যথায় নিষ্কাম কর্মও ঠিক ঠিক করা সম্ভবপর হয় না।" বিরজানন্দ এই কথা বলিয়া স্থানান্তরে গেলে, স্বামিজী উপস্থিত অন্য সকলকে বলিলেন, "কালীকৃষ্ণ যা বলেছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যান ধারণা এবং সন্ন্যাসীর মুক্তজীবনের কি আর তুলনা আছে? এটাই যে সন্ন্যাসজীবনের প্রধান গৌরব তা কি আমায় বলতে হবে রে! আমারও এক সময় অমনি করে দিন কেটেছে—একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে

দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-সব কি সুখের দিনই গেছে! যদি সর্বস্ব দিয়েও আবার সেই দিন ফিরে পাওয়া যেত, তাতেও রাজী আছি।"

যাহা হউক, বিরজানন্দ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়াবতীতে থাকিয়া শ্রীগুরুর আকাঙ্ক্ষিত ধ্যান ও কর্মের সমন্বিত আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে বেদীতে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া নিয়মিত পূজা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া স্বামিজী খুব প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার নির্দেশ ছিল এই আশ্রমে শুধু অদ্বৈতভাবেরই চর্চা হইবে। ফুল ধূপ দীপ প্রভৃতি উপচারে দ্বৈতভাবের উপাসনা স্বামিজীর তাই ভাল লাগে নাই। বিমলানন্দ ও বিরজানন্দ ছিলেন অদ্বৈত আশ্রমে এই ঠাকুরের আসন বসাইবার প্রধান উদ্যোক্তা। স্বামিজী যদিও তৎক্ষণাৎ ঠাকুরঘর তুলিবার নির্দেশ দিলেন না, তথাপি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে কাহারও দেরী হইল না। বিরজানন্দ খুবই লজ্জিত হইলেন। স্বামিজীর অভিপ্রায়মতো ঠাকুরঘর ইত্যাদি করিয়া আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চার রীতি তখন হইতেই অদ্বৈত আশ্রমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।[১]

মায়াবতীর ছোট হ্রদে শীতকালে বরফ জমিত। বিরজানন্দ ঐ বরফ সংগ্রহ করিয়া একদিন আইসক্রীম তৈয়ারী করিয়া স্বামিজীকে খাওয়াইলেন। স্বামিজী খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। মায়াবতীতে স্বামিজীর জন্য রান্না বিরজানন্দই করিতেন। একদিন আহার দিতে বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী বালকের ন্যায় অধীর হইয়া সেবককে বকিতে গিয়া দেখেন, বিরজানন্দ রান্নাঘরে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তিনি নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলেন। পরে খাবার দেওয়া হইলে ছোট শিশুর মতো অভিমান করিয়া বলিলেন, "যা নিয়ে যা, খাব না।" সেবক বিরজানন্দ স্বামিজীর বালকস্বভাব ভালই জানিতেন। কাজেই বিচলিত না হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর অভিমানও ক্রমে কোথায় চলিয়া গেল,—ধীরে ধীরে খাইতে আরম্ভ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "এখন বুঝেছি কেন এত রেগে গিয়েছিলুম। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল।"

---

১ 'স্বামী বিমলানন্দ'-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বামিজীর নামিবার দিন স্থির হইয়া গেল। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে কুলী সংগ্রহ করা খুব কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামিজী তো অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বিরজানন্দ একদিন হাসিয়া বলিলেন, "যদি লোক না-ই পাওয়া যায় আমরাই আপনার ডাণ্ডী বয়ে নিয়ে যাব।" স্বামিজী সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "তোরা বুঝি আমাকে খাদে ফেলে দিতে চাস্?"

অবশেষে কুলী ইত্যাদি সংগ্রহ হইল। এবার অন্যপথে টনকপুর ও পিলিভিত হইয়া স্বামিজীর নামিবার পথ স্থির হইল। সদানন্দকে ডাকিয়া স্বামিজী বলিলেন, "দেখ, এবার বিধি-ব্যবস্থার সব ভার কালীকৃষ্ণের উপর। ওর মাথা ঠাণ্ডা এবং হৈ-চৈ করে না। ও যা যা বলবে তাই আমাদের শুনতে হবে।"

যাত্রাপথে ডিউরী ডাকবাংলোতে বিরজানন্দ ভাত রান্না করিতে গিয়া মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন—হাঁড়ির তুলনায় চাল অনেক বেশী হইয়াছে। ফুটন্ত হাঁড়ি কিছুতেই সামলানো যাইতেছে না—চাল এখনও অর্ধসিদ্ধ। হঠাৎ স্বামিজী এক উপায় বলিয়া দিলেন, "এক কাজ কর্। হাঁড়িতে ঘি ঢেলে মুখ ঢেকে দে, সহজেই সেদ্ধ হয়ে যাবে, খেতেও বেশ লাগবে।" স্বামিজীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করায় বিরজানন্দ রক্ষা পাইলেন—সকলেই বেশ আনন্দ করিয়া খাইয়াছিলেন।

পিলিভিতের কাছে আসিয়া স্বামিজী হঠাৎ ডাণ্ডী হইতে নামিয়া বিরজানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আয়, তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।" প্রিয় শিষ্যকে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘোড়ায় চড়িবার কৌশল ইত্যাদি সব শিখাইলেন। পরে বিরজানন্দকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া, নিজেও আর একটি ঘোড়ায় চড়িয়া, চাবুক মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তুইও এই রকম কর্।" সেনাপতির আদেশ মাত্র সৈনিক বিরজানন্দের অশ্ব চকিতের মধ্যে দ্রুত ধাবমান হইল।—এমনই ভাবে তিনি আমৃত্যু সেনাপতিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। "তুইও এই রকম কর্"—সেনাপতির এই আদেশমন্ত্র বুঝি বিরজানন্দের হৃদয়তন্ত্রীতে চিরদিনই অনুরণিত হইত। তাঁহার সমগ্র জীবনে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

পিলিভিতেই স্বামিজী ট্রেন ধরিলেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে স্থূলচক্ষে ইহাই শেষ মিলন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বিরজানন্দ কেদার-বদরী তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারী জ্ঞান ছিলেন সঙ্গী। বদরীনাথের ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধ্যানপ্রিয় বিরজানন্দের অন্তর্মুখিনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এই তীর্থপরিক্রমায় সম্বল ছিল মাত্র পাঁচটি টাকা।

তীর্থাদি দর্শন করিয়া ফিরিবার পরে অদ্বৈত আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ রূপায়নের কাজে তিনি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করিলেন। মায়াবতী হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর, তথা স্বামিজীর সঙ্কল্পিত আদর্শানুযায়ী বেদান্তের বহুল প্রচারের জন্য বিরজানন্দ, মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের সহিত পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচারের জন্য তিনি বাহির হইলেন। সেই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশের নানা জায়গায় নানা চরিত্রের লোকের সংস্পর্শে আসিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব কিভাবে ধীরে ধীরে শান্তিকামী মানুষকে যথার্থ কল্যাণের পথে অনুপ্রেরিত করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তিনি আশায় উদ্দীপিত হইয়াছেন। আবার ভারতীয় সমাজের অতি নিকৃষ্ট দিকের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে। শিক্ষিত ধনী-সমাজেরও জঘন্য মূর্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। একদিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, আতিথেয়তা, সরলতা—আবার কোথাও গালাগালি অপমান। এমন কি জুতা মারিবার ভয়ও কেহ কেহ দেখাইয়াছিলেন। সমদর্শী বিরজানন্দ মান-অপমান উভয়কেই সমান হজম করিয়াছেন।

এই পরিভ্রমণকালে মথুরা, বৃন্দাবন, কনখল, হরিদ্বার তীর্থাদিও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় কনখল সেবাশ্রমও কিছুকাল পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে। এই সেবাশ্রমের জন্য বিরজানন্দও অর্থভিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হৃষীকেশের ঝাড়িতে কিছুকাল ধ্যান-চিন্তায় কাটাইয়াছিলেন। হৃষীকেশের জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় বিরজানন্দের মনে পুনরায় গভীর তপস্যার আকর্ষণ বোধ হইয়াছিল।

গুজরানওয়ালাতে অদ্বৈতবাদী সাধু স্বামী হংসরাজের সহিত বিরজানন্দের দেখা হইয়াছিল। তাঁহার নিকট স্বামিজীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি কাগজের

টুকরা দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। কাগজটিতে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল, "আজ হইতে স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী স্বামী হংসরাজ নামে খ্যাত হইলেন।" করাচীতে বুড়োবাবা (সচ্চিদানন্দ) ও সুরেশ্বরানন্দের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত পোরবন্দর হইয়া দ্বারকা দর্শন করিয়া আসিলেন। পরে জুনাগড় ও গিরনার হইয়া বিরজানন্দ আমেদাবাদে আসিলেন। তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতা ও উদার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শত শত লোক উপকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রচার সফরের ফলে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের গ্রাহক-সংখ্যাও আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—এমনকি অনেক মুসলমানও গ্রাহক-তালিকা-ভুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি এই কার্যব্যপদেশে যখন আমেদাবাদে, তখন আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় তারে স্বামিজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইলেন। ক্ষত-বিক্ষত বক্ষ লইয়া তিনি মায়াবতীতে ফিরিয়া গেলেন। প্রায় দশমাস পরে আবার হিমালয়ে। কিন্তু এবার চতুর্দিকই অন্ধকার ঠেকিতেছিল।

স্বামিজীর শরীর কিছুকাল ধরিয়াই খারাপ চলিতেছিল। চার পাঁচজন সেবক অহর্নিশ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বামিজীর কিন্তু বিরজানন্দের সেবা-ই অধিক মনোমত ছিল। একদিন সেবকগণকে বলিয়াছিলেন, "তোরা এতজনে মিলে ঠিকমতো সব করতে পারছিসনি, কালীকৃষ্ণ একা সব কাজ করে ফেলতো।" মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের নিকট স্বামিজী পত্রও লিখিয়াছিলেন, মায়াবতীর কাজের বিশেষ ক্ষতি না করিয়া বিরজানন্দকে যদি তাঁহার ব্যক্তিগত সেবার জন্য ছাড়া সম্ভব হয় তো তাহাকে যেন অবিলম্বে মঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু হায়, স্বামিজীর শরীর যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে—ইহা তখন কে-ই বা জানিত! বিরজানন্দ তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কাজে পরিভ্রমণ করিতেছেন আর তাহার ফলও খুবই সম্ভাবনাময় ছিল। সুতরাং মাদার ও স্বরূপানন্দ সানুনয়ে স্বামিজীকে জানাইয়াছিলেন, বিরজানন্দ মায়াবতীর কাজ ত্যাগ করিলে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর খুবই ক্ষতি হইবে। বিরজানন্দকে স্বামিজীর উক্ত পত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানানো হইয়াছিল না। কিন্তু মায়াবতীতে ফিরিয়া স্বামিজীর এই ইচ্ছার কথা বিরজানন্দের আর অগোচর থাকিল না। ক্ষোভে বেদনায় বিরজানন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

মর্মান্তিক এই সংবাদ তাঁহার হৃদয়-মনকে এককালে নিষ্পেষিত করিয়া দিল। কর্মের সকল উৎসাহ কোথায় বিলীন হইল। জগৎ শূন্য মনে হইতে লাগিল।

কর্ম হইতে বিরতি লইয়া কিছুকাল তিনি ধ্যান-ভজনে কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। আশ্রমের কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি কুঠিয়ায় থাকিয়া একান্ত চিত্তে সাধনায় মগ্ন হইলেন। তখন প্রত্যহ পনেরো-ষোল ঘণ্টা জপ-ধ্যান করা তাঁহার অতি স্বাভাবিক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইকালে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বেলুড় মঠ হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন (১৮।১০।১৯০২)—

"স্বামিজীর ভৌতিক শরীর গিয়াছে কিন্তু তাঁহার মহাশক্তি জগতে জাজ্বল্যমান। উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া কার্য করিবে। তুমি তাঁহার আশীর্বাদ পাইয়াছ, তোমার কল্যাণ হইবেই। তাঁহার কার্যে সহকারী হইবার বাসনা কর, ইহাপেক্ষা অধিকতর সদুদ্দেশ্য এ-জীবনে আর কি হইতে পারে?··· সিদ্ধিতে সন্দিহান হইও না। স্থির বিশ্বাসে ভজন কর। তিনিই সকল সাহায্য করিবেন এবং কি কর্তব্য জানাইয়া দিবেন।"

একটানা সাত-আটমাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অতিরিক্ত কঠোর ধ্যান-ধারণার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি কিছু কিছু শারীরিক অবসাদ বোধ করিতে লাগিলেন। এইকালে কুঠিয়ার বাহিরে কোথাও, এমনকি আশ্রমে পর্যন্ত আসিতেন না। দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া মনকে আরও তীব্রতর করিয়া, শারীরিক অন্তরায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু দৈহিক ক্লান্তি বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। এমনই ভাবে আরও কয়েকমাস কাটিল বটে—কিন্তু মস্তিষ্কের দুর্বলতা বড়ই পীড়িত করিয়া তুলিল। জপ-ধ্যানের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করিয়া দিবার ফলেই এই প্রতিক্রিয়া ভোগ—ইহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। অবশেষে সকলের পরামর্শে মায়াবতী হইতে নামিয়া মঠে চলিয়া আসাই স্থির করিলেন। মঠে আসিবার পথে বৃন্দাবনে হরি মহারাজের পবিত্র সঙ্গে কয়েকদিন কাটাইয়া আসিলেন।

বেলুড় মঠে রাজা মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) তাঁহার জন্য বড়ই ভাবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা ও সকলপ্রকার পথ্যাদির ব্যবস্থা হইল—কিন্তু কিছুতেই কিছু উপকার দেখা গেল না। তিন-চার মাসেও কোন ফল

পাওয়া গেল না। শরীরের অবসাদ ও মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বাড়িয়াই চলিল। মঠের সন্ন্যাসিগণ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজা মহারাজের অনুমতি লইয়া বিরাজনন্দজী জয়রামবাটীতে এই সময়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস তখন।

সন্তানের শীর্ণ দেহ দেখিয়া জননী ব্যথিত হইলেন, কিন্তু অন্তর্যামিনী ইহাও বুঝিলেন যে এ-ব্যাধি দেহের নহে, উহার কারণ অন্যত্র। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?" বিরজানন্দ উত্তর দিলেন—"সহস্রারে। কেন না ওখানে ধ্যান করতেই ভাল লাগে। খুব আনন্দ পাই।" শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"করেছ কি, বাবা? ও যে শেষ অবস্থার কথা—পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।" ভবরোগবৈদ্যের বিধান অমোঘ। মাতৃ-নির্দেশে চলিয়া বিরজানন্দের দেহমন ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে থাকিল—পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব হইল না।

অতঃপর মঠে ফিরিয়া তিনি তদানীন্তন মঠাধীশ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ব্যক্তিগত সেবা এবং চিঠিপত্রাদি লিখিবার কার্যে কিছুকাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর রাজা মহারাজের আস্থা এতই গভীর ছিল যে, চিঠিপত্রাদি সই করাইয়া লইতে গেলে, প্রায়ই মহারাজজী বলিতেন—"তুমিই সই করে দাও।" বিরজানন্দ তদনুরূপই করিতেন। এই সময়ে রাজা মহারাজের খুব কঠিন টাইফয়েড হয়—বিরজানন্দ প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলে শিমুলতলায় বায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন—বিরজানন্দও সঙ্গী হইয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে আমেরিকার প্রচারকার্যে ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে সাহায্য করিবার জন্য বিরজানন্দের স্যান্ ফ্রান্সিস্‌কো যাওয়ার প্রস্তাব হয়। রাজা মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বিরজানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইতে বারবার চেষ্টা করিতেছেন। বিরজানন্দের নানা ওজর আপত্তির কোনটাই বুঝি আর টেকে না! যাহা হউক শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠানো গেল না।

বিরজানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এইকালে একবার জয়রামবাটী

গিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানীর সহিত কথা প্রসঙ্গে একদিন যখন তিনি একটু আক্ষেপের সুরে বলিতেছিলেন—"মা, সাধন-ভজন তো কিছুই হ'ল না। কিছুই উপলব্ধি হ'ল না, ঠাকুরের দর্শন পেলুম না, কি হবে?" মা অমনই অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ একটি উত্তর দিয়া সন্তানের চিত্তকে আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া দিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন—"বাবা, আর কত সাধন-ভজন করবে? ঠাকুরের দর্শন তো পেয়েছ।" তাঁহার এইবারকার মাতৃসকাশে অবস্থানকালে আরও একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই যে, অধ্যাত্মজীবন-যাপনেচ্ছু উপযুক্ত প্রার্থীকে, পাত্রভেদে দীক্ষা দিবার মন্ত্র ও সাধনপদ্ধতি ইত্যাদি শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে গুরুরূপী যে বিরাট মহীরুহ, অগণিত তাপিতকে শান্তি প্রদান করিবে, স্বয়ং জগদম্বাই উহার অঙ্কুরকে এইকালে উন্মেষিত করিয়া দিলেন।

ইহার পর তিনি কিছুকাল পূজনীয় হরি মহারাজের পবিত্র সঙ্গলাভ এবং তপস্যার জন্য কনখলে ছিলেন। একান্ত অনুরাগ ও তদ্‌গত-চিত্তে পুনরায় তপস্যায় রত হইলেন—কনখল সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে নিভৃতে জপধ্যানাদিতে তিনি ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। মাধুকরী ভিক্ষায় দেহযাত্রা নির্বাহ হইত। হরি মহারাজের অগ্নি-স্পর্শে বিরজানন্দের বৈরাগ্য উত্তরোত্তর সন্দীপিত হইয়া প্রাণ-মনকে আলোকিত করিতে থাকিল। কিন্তু আকস্মিক একটি সংবাদ তাঁহার সঙ্কল্পকে আর একবার বিঘ্নিত করিল—নিরবচ্ছিন্ন নিরুদ্বেগ তপস্যায় সহসা ছেদ পড়িল। গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দ নৈনীতালে হঠাৎ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার স্থলে অদ্বৈত আশ্রমের কর্মভার লইয়া তাঁহাকে পুনরায় মায়াবতীতে চলিয়া যাইতে হইল।

১৯০৬ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত-বিরজানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষে ইহা যথার্থই একটি স্মরণীয় পর্যায়। মায়াবতী আশ্রমের সেই অর্থসঙ্কটময় দুর্দিনে বিরজানন্দের ন্যায় মিতব্যয়ী, পরিচালনকুশল, ধৈর্যবান, সহিষ্ণু অধ্যক্ষের নেতৃত্ব বড়ই প্রয়োজন ছিল। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় আশ্রম ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইল এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রচারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। স্বরূপানন্দ-প্রকল্পিত স্বামিজীর সমগ্র গ্রন্থাবলীর পাঁচ খণ্ডের সঙ্কলন ও প্রকাশের সুকঠিন দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থাবলী (Complete Works of Swami Vivekananda)

ব্যতীত স্বামিজীর সুবৃহৎ ইংরেজী জীবনী (Life of Swami Vivekananda By His Eastern & Western Disciples) চারিখণ্ডের সম্পাদনা ও মুদ্রণ স্বামী বিরজানন্দের আর এক মহৎ কীর্তি। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কি কঠোর পরিশ্রমই তাঁহাকে তখন করিতে হইয়াছিল। স্বামিজীর জীবনীর পাণ্ডুলিপি সারদানন্দজীকে সংশোধন করিয়া দিবার জন্য পাঠাইলে তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীস্বামিজীর জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা যতদূর সাধ্য দেখিয়া দিব। সংশোধন করিবার ভার লইলাম—কিন্তু বিশেষ কিছু add করিতে পারিব কি না বলিতে পারি না।···তোমার নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তুমি overwork করিয়া শরীরটাকে একেবারে ভাঙ্গিও না। তুমি গেলে মায়াবতী আশ্রমটি উঠিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।...শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় ভাল রাখুন ইহাই প্রার্থনা।" শ্রীগুরুর আশীর্বাদে অত্যাশ্চর্য এক অলৌকিক শক্তিতে তিনি যেন শক্তিমান হইয়া ঐ দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতির নিকট ইহা সত্যই তাঁহার এক চিরস্মরণীয় অবদান।

গঙ্গাধর মহারাজ (অখণ্ডানন্দজী) স্বামিজীর নব প্রকাশিত এই ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি মাত্র পাঠ করিয়াই বিরজানন্দকে যে আবেগোচ্ছল চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও এখানে স্মরণ না করিয়া পারা যায় না। মহুলা হইতে লেখা ঐ পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল (তারিখ, ১ ফেব্রুআরি, ১৯১৩):

"প্রিয় শ্রীমান্ বিরজানন্দ,

অনেকদিন হইল "Life" vol. I আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি এবং যতক্ষণ পাঠ করি রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীকে যেন দেখিতে পাই। সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই কাশীপুরের বাগান প্রভৃতির কথা পড়িতে পড়িতে হুবহু সেই সকল চক্ষের সামনে আসিয়া পড়ে। ধন্য Mother! ও ধন্য স্বামিজীর Eastern & Western Disciples! যাঁহাদের বহুকালের আন্তরিক যত্নে আজ আমরা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর "Life" সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম। তোমাদের সকলের ঐকান্তিক যত্নের ফলে এবং শ্রীমতী Mother-এর অসীম ভক্তির জোরেই শ্রীশ্রীস্বামিজী নিজেই তোমাদের

"Life"-এ তাঁহার spirit সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়াছেন!!! তোমাদের সমবেত চেষ্টা ও অচলাভক্তির ফলে যেন শ্রীশ্রীস্বামিজীকে সর্বদা তোমাদের এই বইখানির মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

"তবে একটি কথা এই যে, ১ম খণ্ড পড়িয়া ২য় খণ্ডের জন্য আরও ৪ মাস বিলম্ব প্রায় অসহ্য বোধ হইবে। কবে আবার 2nd volume পাইব বলিয়া দিন গণিতে থাকিলাম। Mother-কে আমার হইয়া বলিও যে, অদ্বৈত আশ্রম হইতে এই যে শ্রীশ্রীস্বামিজীর "Life" বাহির হইল, ইহার তুলনা নাই। কেবলমাত্র এই একটি কাজের জন্যই "অদ্বৈত আশ্রমের" গৌরব অক্ষুণ্ণ ও চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিল! ২য় vol. বাহির হইবামাত্রই যেন আমাকে মনে পড়ে। আর তাহা কি নাগাদই বা বাহির হইবে, তাও লিখিয়া জানাইবে।"

প্রকাশমান স্বামিজীর জীবনী পড়িয়া শুদ্ধানন্দজী তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন—"যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বৃহদাকার জীবনীগুলি বাহির করিতেছ, অপর কেহ যে এইরূপ করিতে পারিত আমার জানা নাই।" স্বামিজীর ভাবধারা প্রচারের ফলে দেশ-বিদেশে আজ যে এত আলোড়ন, উহার মূলে যে নিভৃত অতন্দ্র সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে তাহা হয়তো এখনও অনেকেরই জানা নাই। স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর খণ্ডবিশেষ পাঠ করিয়া অভেদানন্দজী যে সুন্দর পত্রটি বিরজানন্দকে লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি পংক্তিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "স্বামিজীর Memorial Edition-এর translated part অতীব সুন্দর হইতেছে। East and West যতদূর দেখিয়াছি—beyond criticism। তাঁহার অমূল্য জ্ঞানরত্ন জগৎকে বিলাইয়া বাস্তবিকই জগৎকে ধনী করিতেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এ একটা মস্ত কাজ হচ্ছে—lecture ফেক্‌চারের চেয়ে অনেক উচ্চতর কাজ। It was reserved for you—a Sannyasin with infinite patience and calmness as well as unflinching zeal.।"

ইতোমধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে বিরজানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাষ্টী (Trustee) নির্বাচিত হইয়াছেন।

মায়াবতীর অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর লইয়া পুনরায় সাধন-ভজনে ডুবিয়া যাইতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাদার সেভিয়ারের সহায়তায় হিমালয়ের

নিভৃত একটি অরণ্য-অঞ্চলে উক্ত উদ্দেশ্যে যে ছোট আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার সাধন-জীবনের বহুল স্মৃতি-পূত শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রম। পাহাড়ীদের নিকট এই অঞ্চলের নাম ছিল শ্যাঁলা। নির্জন এই পার্বত্য বনভূমির পরিবেষ্টনী সত্যই মনকে অন্তর্মুখ করিয়া তোলে। পর্বতের ঢালে ক্রমান্বয়ে তিনটি হ্রদ বা 'তাল'—একদিকে অত্যুচ্চ চিরতুষারাবৃত নাগাধীশ, আবার অপর দিকে পাঁচ হাজার ফুট নীচে সবুজ সমতল। শ্যাঁলাকে 'শ্যামলা'-য় রূপান্তরিত করিয়া এবং উহার সহিত শ্যামল প্রতিচ্ছবিময় 'তাল'-কে সংযুক্ত করিয়া বিরজানন্দ এই বনাঞ্চলের নূতন নামকরণ করিয়াছেন শ্যামলাতাল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হইতে পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর এই আশ্রমেই তিনি তপস্যাদিতে অতিবাহিত করেন। ক্রমে এই আশ্রমসংলগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কঠোর সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর জীবনী-গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পাদন ও প্রকাশনের কার্যও তিনি এই শ্যামলাতালে বসিয়াই সম্পন্ন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পাঁচমাস তিনি দক্ষিণ ভারতে তীর্থাদি দর্শন এবং সিংহল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

বিরজানন্দের মানসিক গড়ন ছিল আজীবন তপোময়। যখন তিনি সঙ্ঘের অতি উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন—তখনও ইহার ব্যত্যয় কেহ দেখে নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার এই তপোনিষ্ঠা, অপরাপর জীবনকেও তপস্যায় উদ্বুদ্ধ করিত;—সমীপাগত আরও বহুজন এই কৃচ্ছ্রতাময় ত্যাগের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ সঙ্ঘের জনৈক প্রবীণ সাধুর স্মৃতি হইতে লব্ধ একটি সঞ্চয়ন: "বিশ্বরঞ্জন মহারাজ বলেছিলেন, তিনি যখন কাশীতে তপস্যায় ছিলেন, তখন দু'বেলা মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন। সেই সময়ে পূজনীয় কালীকৃষ্ণ মহারাজ তীর্থদর্শনে সেখানে যান এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে সেখানে তপস্যারত দেখে খুব সুখী হন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ তাকে একটি কথা বলেন, 'দেখ বিশ্বরঞ্জন, মন্দিরে বিনা সেবায় প্রত্যহ প্রসাদ গ্রহণে প্রতিগ্রহ হয়। তাতে দাতাদের পাপের স্পর্শ হয়ে থাকে।' সেই থেকে মহারাজেরই নির্দেশে বিশ্বরঞ্জন মহারাজ ঠাকুর সেবার জন্য নিত্য ফুল তুলে মালা গেঁথে দিতেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের মর্মন্তুদ সংবাদ তিনি এই শ্যামলাতালেই পাইয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই, ৪ঠা শ্রাবণ (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) জগজ্জননী স্বধামে প্রয়াণ করেন। হিমালয়ের একান্ত জীবনের মাঝে এই প্রচণ্ড আঘাত মাতৃগতপ্রাণ সন্তানের বক্ষে কী দুঃসহ হইয়াছিল তাহা খুব সহজেই অনুভব করা যায়। বিরজানন্দের সমগ্র জীবনই ছিল মা-ময়। মায়ের কথা বলিতে বলিতে আশেপাশের সব কিছুই তিনি ভুলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে তাঁহার স্বলিখিত স্মৃতিকথার কিয়দংশ 'উদ্বোধন'-পত্রের শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্তরের গভীর ভাব-সমন্বিত মাতৃপ্রশস্তি গানে ও কবিতায় তিনি মাঝে-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের স্মৃতি হইতে জানা যায়: একবার ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত তিনি মাকে জয়রামবাটী রাখিতে গিয়াছিলেন—বর্ধমানের পথে মা পাল্কীতে গিয়াছিলেন। গরুর গাড়ীতে গেলে মায়ের তত্ত্বাবধান ঠিক ঠিক হইবে না, এই আশঙ্কায় বর্ধমান হইতে জয়রামবাটী পর্যন্ত দীর্ঘ গ্রাম্য পথ মায়ের পাল্কীর আগে আগে দৌড়িয়া দৌড়িয়া চলিয়াছিলেন। কোন চটিতে মায়ের পৌছিবার অনেক আগেই তাঁহারা পৌছিয়া গিয়া মায়ের জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। তখন বালক বয়স, সবে মাত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। একটি চটিতে মা পূজাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নভোগ নিবেদন করিবেন—বালক কালীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন, কায়স্থ দেহে ঠাকুরের জন্য রন্ধিত অন্ন স্পর্শ করা উচিত হইবে কিনা। মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—"হাঁ তুমি আন, তাতে কিছু দোষ হবে না।"

মায়ের সম্পর্কে এমন কত স্মৃতিই তাঁহার হৃদয়ের মণিকোঠায় রক্ষিত ছিল। মায়ের অহেতুকী স্নেহ-ভালবাসার প্রসঙ্গে বিরজানন্দ আবেগবিজড়িত ভাষায় তাই লিখিয়াছিলেন—"কী অহেতুকী কৃপা, অহেতুকী ভালবাসা! যে না পাইয়াছে, যে মাকে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে মঠ ও মিশনের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের পরে তপস্যারত বিরজানন্দকে পুনরায় কর্মমুখর জীবনে ফিরিয়া আসিতে হয়। মঠ ও মিশনের পরিবর্ধমান কর্মের যথাযথ তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বয়ঃপ্রধান সঙ্ঘ-পরিচালকগণকে সহায়তা করিবার জন্য যে কার্যনির্বাহক পরিষদ

(Working Committee) গঠিত হইয়াছিল বিরজানন্দ উহার কর্মসচিব (Secretary) মনোনীত হইলেন। কর্মসচিবের গুরুদায়িত্ব বহনে তিনি নানাভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেও, সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দজীর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল না। সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাদের (ঠাকুরের সন্তানদের) পরে সব চেয়ে প্রাচীন, তোমাকেই এই কমিটির সেক্রেটারী হতে হবে।" বিরজানন্দের অন্তর্মুখী প্রশান্ত ব্যক্তিত্বই তাঁহাকে সকলের এত আস্থাভাজন করিয়াছিল। কার্যনির্বাহক পরিষদের এই সচিব-মনোনয়ন প্রসঙ্গে মঠ ও মিশনের ইতিহাস হইতে একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য: "Swami Virajananda was chosen as Secretary for his great seniority and efficiency as also for the suavity of his temper and his detatched outlook....For his past career he commanded everybody's respect. (*History of the Ramakrishna Math and Mission* by Swami Gambhirananda.)

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারকার্যের জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইবার প্রস্তাব আর একবার হয়। তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী বহুভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া মোটামুটি সম্মতও করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামলাতাল হইতে মহাপুরুষজীকে তিনি লিখিলেন, "ঠাকুর, মা, স্বামিজীর নিকট প্রার্থনা করিতে বসিয়া এই নবারব্ধ কাজের জন্য কোনই প্রেরণা পাইতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার আমেরিকায় যাওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়।"

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বিরজানন্দ তাঁহার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও শান্ত বিচারবুদ্ধি দ্বারা সঙ্ঘ-পরিচালনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ-সম্পাদক শুদ্ধানন্দজীর পাশে পাশে থাকিয়া তিনি তাঁহার কর্মভার অনেকাংশে লাঘব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কালে উদ্বোধন কার্যালয় তথা বাগবাজার মঠ ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পরিচালনভারও বিরজানন্দকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শুদ্ধানন্দজীর অসুস্থতার দরুন মঠ ও মিশনের সাধারণ-সম্পাদকের দায়িত্বও এক বৎসর বিরজানন্দের উপর ন্যস্ত ছিল।

অতঃপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলে বিরজানন্দজীকেই মঠ ও মিশনের সাধারণ-সম্পাদকের কর্মভার স্থায়িভাবে

গ্রহণ করিতে হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী মহোৎসব তাঁহার সম্পাদকত্বকালেই অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আহূত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ হইতে বিরজানন্দজীর একটি হৃদয়স্পর্শী বাণী পঠিত হইয়াছিল। শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনায় ও সমাপ্তিতে মঠে যে দুইটি সাধু-সম্মেলন হইয়াছিল—উহাতে তাঁহার স্বলিখিত অভিভাষণদ্বয় সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সম্মুখে সত্যই এক নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরেরই ২৩শে অক্টোবর স্বামী শুদ্ধানন্দজীর তিরোধান হইলে সঙ্ঘ-পরিচালকগণ সমবেতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে বিরজানন্দজীকেই সঙ্ঘের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য বারবার আকুল আহ্বান জানাইতে থাকিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। শ্যামলাতাল হইতে তিনি মঠাধীশরূপে ১১ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে পদার্পণ করেন।

স্বামী বিরজানন্দজীকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিতে হইয়াছিল। অসংখ্য কর্মব্যস্ততা, সমগ্র সঙ্ঘের বহুতর সমস্যারাশি, অগণিত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুর নানাবিধ ধর্মজিজ্ঞাসা এবং নিজের দৈহিক অসুস্থতা-বার্ধক্য ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁহার অত্যাশ্চর্য প্রশান্ত স্বভাবকে একদিনের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। তপস্যা ও কর্মের একটি মাধুর্যময় সমন্বয় বিরজানন্দজীর জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়া রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝা যেভাবে বারবার প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে সেইকালে তাঁহার ন্যায় স্থিতধী পুরুষের অধিনায়কত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পক্ষে সত্যই শ্রীভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ।[১]

মঠাধ্যক্ষের গৌরবমণ্ডিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, দেশ-বিদেশের কত

১ "Swami Virajananda......besides having his spiritual training at the feet of the Holy Mother, had served Swami Vivekananda personally, and had long worked in the Math and Mission in various important capacities. All these qualifications marked him out as an outstanding personality. As a matter of fact, he proved to be a most successful President whom God spared sufficiently long to leave his impress on the organisation and all its members as also on innumerable lay devotees whom he initiated.

শত মানুষের পূজা-সম্মান লাভ করিয়াও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনধারা ছিল অতিশয় অনাড়ম্বর ও কৃচ্ছ্রতাময়। গাম্ভীর্যপূর্ণ মধুরতা, পৌরুষব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব এবং ধীর-প্রশান্ত নিরভিমানিতা ছিল বিরজানন্দজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উজ্জ্বল আয়ত চক্ষের স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি সমীপাগত সকলকেই গভীর-ভাবে আকৃষ্ট করিত। ধর্মগুরুরূপে তিনি সহস্র সহস্র নরনারীর আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিচালিত করিয়াছেন। নিজের বার্ধক্য-ব্যাধি-পীড়া ও শরীর-ধারণের জন্য অপরিহার্য বিশ্রামটুকু পর্যন্ত দিনের পর দিন প্রসন্নচিত্তে উপেক্ষা করিয়া, ব্যথিত ক্লিষ্ট সংশয়ার্ত মানুষের দুঃখ-বেদনার কাহিনী তিনি শুনিয়াছেন —তাহাদিগকে যথার্থ পারমার্থিক শান্তির পথে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, 'গুরু'র অভিমান তাঁহার জীবনে এক তিলও স্থান পায় নাই। তিনি বলিতেন—"আসল গুরু সচ্চিদানন্দ। তিনি অন্তরে রয়েছেন। তিনি শুদ্ধবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে শ্রেয়ের পথে সর্বদা চালিত করছেন। তিনি শুদ্ধবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে যখন যেটি দরকার করিয়ে নেন।...গুরুর এই আসল স্বরূপ সর্বদাই শিষ্যের মধ্যে আছেন। গুরুর স্থূল দেহের অদর্শনের পরও এর অভাব হয় না।"

এই প্রসঙ্গে জনৈকের একটি প্রাণস্পর্শী স্মৃতিচারণ এখানে প্রকাশযোগ্য : "...অর্বাচীনের মতো মহারাজকে (বিরজানন্দজীকে) জিগ্যেস করেছিলাম, 'মহারাজ আপনার শরীর এখন এতো খারাপ ১০১°/১০২° জর হচ্ছে। অথচ আপনি সেই সকাল ন'টা থেকে বেলা দু'টো-আড়াইটে পর্যন্ত দীক্ষার জন্য বসেন। এতো strain করা ঠিক হচ্ছেনা। মহাপুরুষ মহারাজ তো শেষের দিকে বিছানায় বসেই একসঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিতেন। আপনিও মহারাজ ঐ রকম করুন না কেন?' আমার এই কথা শুনে তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'ঠাকুর এই শরীরটাকে দিয়ে যাকে এবং যে-ক'জনকে যে-টুকু কৃপা করবেন—তা' তো আমাকে করতেই হবে, রে বাপু! Then why should I be in hurry ?'"

He lived till 1951, though the first half of his regime was full of calamities due to war, starvation and political instability. It was indeed a blessing for the organisation that it had at the helm such a cool and level-headed monk to direct its spiritual life during that critical period."—*History of the Ramakrishna Math and Mission* by Swami Gambhirananda.

সঙ্ঘনায়ক বিরজানন্দজী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তাকে লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যখনই যেখানে তাঁহার পদার্পণ হইয়াছে—জাতিধর্মনির্বিশেষে পুরুষ-নারী, বালক-বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে—স্ব স্ব ভাব অনুযায়ী শান্তি ও সান্ত্বনা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। "নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস্ তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস্ তবে এখনই মুক্ত হয়ে যাবি", শ্রীগুরুর এই আদেশ বোধ হয় বিরজানন্দজীর হৃদয়-কন্দরে অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইত—পরার্থব্রত তাই এমন উজ্জ্বলভাবে তাঁহার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঙ্ঘের বহুল পরিবিস্তারই ইহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য।

সঙ্ঘাধ্যক্ষ হইবার কিছুকাল পর হইতেই বিরজানন্দজীর হৃদ্‌রোগ এবং যকৃতের পীড়া দেখা দেয়। অথচ কর্মের বিরাম ছিল না। মঠ-মিশনের নানা দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত থাকিলেও সঙ্ঘ-পরিচালনের বহুবিধ খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাঁহার সতর্ক সক্রিয় দৃষ্টি সর্বদাই জাগরূক থাকিত। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনেও সঙ্ঘনায়ক বিরজানন্দজীর ছিল ঐকান্তিক লক্ষ্য। তাঁহার নিরভিমান নেতৃত্বের এক অতি আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল। সঙ্ঘগুরু হইয়াও সকল সন্ন্যাসি-সেবকের শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে তাঁহার যে গৌরববোধ ছিল তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। নিজেরই সন্ন্যাসি-শিষ্যদের ইংরাজীতে উপদেশ প্রদানকালে তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "As the chief monastic servant of the monastic servants who compose our *Sangha,* I am bound by love, no less duty bound, to serve you all, however physically incapacitated I may be—to the last breath of my life." । মর্মস্পর্শী এই কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দ-শিষ্য বিরজানন্দের একটি মনোরম আলেখ্য সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীগুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিল বিরজানন্দজীর জীবন-ব্রত। তাই উত্তরজীবনে তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক বাক্যে যেন স্বামিজীর আদেশ ও ইচ্ছাকে পূর্ণ রূপ দিবার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিই অভিব্যক্ত হইত। স্বামিজী-প্রকল্পিত সঙ্ঘের কর্মধারার তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও

বাহক। স্বামিজীর ধ্যানের ভারত বুঝি তাঁহারও ধ্যানে ধরা দিয়াছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উপরই সমগ্র বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করিতেছে —"The Salvation of the world depends on the regeneration of India"—স্বামিজীর এই বাণীকে তিনি ভারতের সর্বত্র বহন করিয়া ফিরিয়াছেন। শ্রীগুরুর আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মানসচক্ষে যেন বাস্তব রূপ ধারণ করিত। স্বামিজীর জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে বেলুড়ে আজ যে 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' সংস্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে—প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও বহুদিন পূর্বে বিরজানন্দজী একটি বক্তৃতায় দিয়াছিলেন—"I am sanguine enough to hope that before long my beloved Master's dream of a rejuvenated India will be fulfilled. A few years back, no one could think that a magnificent temple in memory of Sri Ramakrishna would quickly rise on the bank of the Ganges at Belur as directed by Swamiji. And the Mission is taking steps to establish a residential College there—perhaps as the nucleus of the University—foreshadowed by his prophetic vision."—"আমি সুনিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, আমার প্রিয়তম আচার্যের জাগ্রত ভারতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই। বেলুড়ে গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত স্বামিজী-প্রকল্পিত এই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের কথা কয়েক বৎসর পূর্বে কে-ই বা ভাবিতে পারিতেন! মিশন আজ তো সেখানে আবাসিক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও করিতেছেন —সম্ভবতঃ দ্রষ্টা আচার্যের ভাবদৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরই কেন্দ্ররূপে।"

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বেলুড়ে বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠ নামে যে সুবৃহৎ শিক্ষাতীর্থ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে—উহার ভিত্তি-মূলে যাহাদের সক্রিয় আশীর্বাদ অভিসিঞ্চিত, বিবেকানন্দ-সহচর বিরজানন্দ তাঁহাদের অন্যতম—অন্যতম কেন, প্রধানতমই। স্বামিজীর শিষ্যা মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডের নামও এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বামিজীর ভাবাদর্শে রামকৃষ্ণ মিশনের এই বিপুল শিক্ষা-উদ্যোগ যাঁহার কর্মনৈপুণ্যে ও সাধনায় বাস্তব রূপ লইতে পারিয়াছে—বিরজানন্দজীর অফুরন্ত উৎসাহদান ও প্রেরণাই তাঁহাকে এই কর্মের শক্তি জোগাইয়াছে। বিরজানন্দজী

প্রায়ই বলিতেন, "উপেনের[১] ঘাড়ে স্বামিজী চেপেছেন।" প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই বিরজানন্দজী তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়া আসিয়াছেন—"তুমি যে কলেজের জন্য এতো চেষ্টা করিতেছ ইহা দেখিয়া আমি খুবই প্রীতিলাভ করি। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর ইচ্ছায় কাজটি দাঁড়াইয়া যায় তো সকলেরই আনন্দ।"

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুআরি, স্বামিজীর পুণ্য আবির্ভাব-তিথিতে মঠাধীশ বিরজানন্দজীর করস্পর্শ মাথায় লইয়াই, রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রথম কলেজ 'বিদ্যামন্দির', উহার ভিত্তি-গর্ভে আসিয়া প্রথম দাঁড়াইয়াছিল। পরে ১৯৪১-এর ৪ জুলাই, স্বামিজীর মহাপ্রয়াণ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যারম্ভ হয়। তখনও শ্যামলাতাল হইতে বিরজানন্দজীর আশীবাণী তারবার্তায় আসিয়াছিল: "Craving Thakur's and Swamiji's Grace and blessings for its brilliant success with my prayers."—"ইহার উজ্জ্বল সফলতার জন্য ঠাকুর ও স্বামিজীর কৃপা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আমার প্রার্থনাও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিল।"

একদা স্বামিজী তাঁহাকে কাছে বসাইয়া মাথায় হাত দিয়া খুব আশীর্বাদ করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—"বিশ্বাস কর্ তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে। জানবি সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টি-শরীর।" বিরজানন্দজীর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে স্মরণীয় এই ঘটনাটি এইভাবে লিপিবদ্ধ দেখা যায়: "In the Thakurghar he advised to look upon the Sangha collectively as Sri Ramakrishna. He has entered into our Sangha."। সঙ্ঘনেতা বিরজানন্দজী এই গুরু-বাক্যটি প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মরণ রাখিতেন—অন্যের হৃদয়েও ইহা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। সঙ্ঘকে তিনি যথার্থই শ্রীরামকৃষ্ণের সমষ্টিবিগ্রহভাবে দেখিতেন, তাঁহার অসংখ্য আচরণের মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। বহু-শাখায়িত সুবিস্তৃত এই সঙ্ঘের মূল শ্রীরামকৃষ্ণ—ইহার সমস্ত প্রাণরস ঐ মূল হইতেই সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাতেই সঞ্জীবিত থাকিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-

১ স্বামী বিমুক্তানন্দ (উপেন মহারাজ)।

সঙ্ঘকে তাই ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ একটি বৃক্ষ বলিয়া তিনি প্রায়ই উপমা দিতেন।[১]

সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের জন্য বেলুড় মঠের অনুরূপ আর একটি পৃথক মঠ স্থাপনা স্বামিজীর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। গত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীশ্রীমার শতাব্দী-জয়ন্তী বৎসরে স্বামিজী-প্রকল্পিত এই মঠই 'শ্রীসারদা মঠ' নামে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠার মূলে বিরজানন্দজীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহই শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের ত্রৈবার্ষিক সাধু-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি স্বামিজীর উক্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর এই নারী-মঠের বাস্তব রূপ গ্রহণের নিশ্চয়তা সম্পর্কেও তাঁহার দৃঢ় ধারণা ব্যক্ত করেন। ঐ ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "I am sure, nothing will be wanting or will stand in the way to make the Women's Math a grand success."। তারপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সারদা-আশ্রমবাসিনী কয়েকজন ব্রতধারিণীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁহার আশীর্বাণীটিও বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ও তাৎপর্যময় বলিয়া এ-প্রসঙ্গে খুবই স্মরণযোগ্য। ঐ বাণীতে তাঁহার প্রাণস্পর্শী উক্তি এইরূপ: "শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামিজীর অশেষ কৃপায় তোমরা যে আজ এক উদ্দেশ্যে, এক ব্রতে, এক কর্মধারায় একত্রিত হলে, এই অভাবনীয় ঘটনাটির কথা ভেবে আমি প্রাণে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করছি। আমার জীবদ্দশায় যে ইহা সম্ভব হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। অবশ্য আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করতুম স্বামিজীর যে আন্তরিক ইচ্ছা—মেয়েদের মধ্যেও ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ আনয়ন

১ "The mighty tree of the Ramakrishna Order, which we of this generation have been privileged to watch growing under our eyes and which we in our own way have been privileged to water and nourish—this tree is putting forth new shoots, day after day, in the shape of increasingly useful institutions for the service of man....It is the cherished aim of the Ramakrishna Mission to serve humanity like the tree....a tree with root at the top and branches at the bottom. These various institutions bearing the name of Sri Ramakrishna, which we see sprouting up and flourishing around us, have their root all above in Him, and so long as they draw sustenance from that source, they are sure to prosper and grow from more to more."—An address at Ramakrishna Math, Madras.

করা, তা একদিন সফল হবেই।" সঙ্ঘের পরিবিস্তৃতির ইতিহাসে এমন অসংখ্য ঘটনার সহিত বিরজানন্দজীর কর্ম-সাধনা সম্পৃক্ত হইয়া আছে।

সুদীর্ঘকাল হিমালয়ে কাটাইবার ফলে স্বামী বিরজানন্দজীর হিমালয়ের উপর একটি প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ হইবার পরেও তিনি বৎসরের কয়েক মাস হিমালয়ের ক্রোড়ে শ্যামলাতাল আশ্রমেই কাটাইতেন। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় চিকিৎসকগণ তাঁহার পাহাড়ে থাকা অনুমোদন করিলেন না। ফলে জীবনের শেষ এক বৎসর পঁচিশ দিন তিনি একটানা বেলুড় মঠেই কাটাইয়াছেন। অসুস্থ অবস্থায় মঠে থাকা-কালেও তাঁহার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন খুব অল্পই হইত। নানা জটিল উপসর্গ আসিয়া বার্ধক্য-জীর্ণ দেহটিকে ঘিরিয়া ধরিতে থাকিল। রোগের দারুণ যন্ত্রণা দিনের পর দিন তিনি অসাধারণ ধৈর্য ও প্রসন্নতার সহিত সহ্য করিয়াছেন। হাস্যদীপ্ত চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইত জরা-ব্যাধি তাঁহার দেহকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বামিজীর গৃহী শিষ্য শ্রীশরৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানি পত্রের প্রতি ছত্রে তাঁহার দেহবোধরহিত নির্ভীক সন্ন্যাসি-মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে লিখিয়াছেন—"জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় স্বামিজীর জয়! প্রতি নিশ্বাসে বল। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা! তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি, শরীর কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা! ওয়া গুরুজী ফতে!"

বিরজানন্দজীর ধমণীতে বিবেকানন্দ-তড়িৎ কিরূপ সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিমান ছিল—তাহা তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার কথা শুনিলে তো অনুভব হইতই; —তাঁহার দৈনন্দিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পত্রব্যবহারেও উহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইত না। উদাহরণ হিসাবে এখানে কিছু পত্রাংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে—যাহার প্রতি ছত্রে যেন বিবেকানন্দই উঁকি দিতেছেন—বুঝি বা এ-লেখনী সেই-লেখনীই মনে হইবে। জনৈক যত্ন-কাতর যুবককে লিখিত :

"বীর হওয়া চাই—সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু করতে পারবোনা, তুমি করে দাও এ-সব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোন কালেই কিছু হবে না। উপদেশ তো তোমায় যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সে-সব যদি পালন না করতে পার তো কেউ তোমায় কিছু করিয়ে দিতে পারবে না। তোমায় যে-সব পত্র দিয়েছি, তা বারবার পড়বে ও সেই

মতো চলতে চেষ্টা করবে। ঠিক ঠিক ধর্মলাভ বড় কঠিন কথা,—সকলের হয় না। ভিজে অসার কাঠ হলে ঠাকুরও তার দিকে ফিরে চাইতেন না।" (তারিখ, ২৬।১১।৪০)। স্নেহ-করুণার সঙ্গে সঙ্গে তেজ-শক্তির কী অপূর্ব সমন্বয় !

আর একখানি পত্রের কিছু অংশ। বাংলা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পঠভূমিকায় ইহার উপজীব্য বিষয়। বেলুড় মঠের প্রবীন পরিচালক মহারাজকে লেখা এই চিঠিখানিতে তত্ত্বদর্শী বিরজানন্দের গভীর প্রেমসত্তাটির সহিতও ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটিবে—আর স্বামিজীরই ভাব-ভাষা তাঁহারই শিষ্যের লেখনীতে আবার দেখিয়া উচ্চকিত না হইয়াও পারা যাইবে না।

উদ্ধৃতি : "এবারও মঠে ঘটে ও পটে ৺পূজার আয়োজন হচ্ছে জেনে সুখী হলুম।······আমার মনে হয় ৺পূজাতে এবার একান্ত অপরিহার্য অনুষ্ঠানের অঙ্গগুলিমাত্র বজায় রেখে ঠিক পূজা বাবদ যতদূর সম্ভব কম খরচ করে (আন্দাজ ২০০।৩০০ টাকা) বাকী টাকা মঠে আগত যত সংখ্যাই হোক না কেন, দুঃস্থ বুভুক্ষু অনাথ আতুরদের খাওয়ানোতে ব্যয় করলে ভাল হয়। কেউ যেন না নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। শুধু খিচুড়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করতে হবে। তাতেই শাক সবজি যা কিছু দেবে।······ওই খিচুড়ী মায়ের সামনে হাণ্ডা হাণ্ডা করে বিরাট ভোগ দিয়ে, তারপর উহা অকাতরে তাঁর সংহার মূর্তি এই চলমান শ্মশানদের, এই সর্বহারা নারায়ণদের পরিবেশন করতে হবে। এবার মা এই ভাবেই পূজা গ্রহণ করবেন ও আমাদের পূজা সার্থক হবে। মঠের সাধুরা, বড় লোক, ভদ্রলোক, ভক্ত সব ওই খিচুড়ী প্রসাদ পাবে। No special। ঠাকুরও বলেছিলেন হাঁড়ী হাঁড়ী ডাল ভাত খাব। এই তো তার সময়। এই সব অনশনক্লিষ্ট দুর্গতদের যদি তিনদিনও আমরা পরিতোষ পূর্বক খাওয়াতে পারি, অন্নবস্ত্র দিতে পারি, আমার বিশ্বাস, ঠাকুরের, মার, স্বামিজীর তার চেয়ে পরম প্রীতিকর কাজ আর কিছু হতে পারে না। দুঃস্থ নারায়ণদের বর্তমানের এই ভীষণ হৃদয়বিদারক ছবি বোধ হয় স্বামিজী কল্পনাই করতে পারেন নি। অতএব আমার ইচ্ছা যে, পূজার তিনদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঐরূপ খিচুড়ী যেন সমাগত সব দুঃস্থ বুভুক্ষুদের পেটভরে খাওয়ানো হয়।······"

বিবেকানন্দেরই অনন্ত জীবপ্রেমের অনুরণন পত্রের ছত্রে ছত্রে। অগাধ

জ্ঞানের সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তখন উহার প্রকাশ এইরূপই হয়। তরঙ্গায়িত জ্ঞানেরই নাম প্রেম।

কোনও অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুকে আবার যখন অতি অন্তরঙ্গভাবে নির্দেশ দিতেছেন—সে-পত্রের স্বাদ আবার ভিন্নতর। ভিন্নতর,—কিন্তু উহার বর্ণে বর্ণে গাঙ্গেয় স্নিগ্ধতা। একখানি চিঠি: "তুমি নিয়মিত জপধ্যান করছো জেনে প্রীত হলুম। তাঁর জন্য যে কাঁদতে পারে সে তো মা ধন্য—সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোক হোক। প্রাণের আবেগই আসল কথা। প্রেমাশ্রু গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র। তাতে মনের সমস্ত ময়লা কেটে যায়, ভগবানে অনুরাগ বাড়ে, তাঁর কৃপা হয়। তুমি মা প্রাণভরে খুব তাঁকে ডেকে যাও, তাঁকে অন্তরের অন্তরে রেখে তাঁর প্রেমময় রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকো। সংসারের সুখ দুঃখ মায়া মমতা তুচ্ছ করে তাঁর প্রতি টান অনুরাগ যাতে দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তাই করবে, তা' হলেই পরম সুখ শান্তি আনন্দ পাবে। এই জন্মেই তাঁকে লাভ করে ধন্য হবে, জন্ম মৃত্যুর পারে যাবে। প্রার্থনা করি তাঁর শ্রীচরণে তোমার ঐকান্তিকী প্রেমাভক্তি হোক।"

আবার অনধিকারী পলায়নপর ব্যক্তির জন্য তাঁহার উপদেশ সম্পূর্ণ বাস্তব-ধর্মী। উপযুক্ত আচার্যের লক্ষণই এইরূপ। এ-রকম ক্ষেত্রেও, তাঁহার প্রত্যেক উক্তির মধ্যে স্বামিজীর কঠোর কর্মপরায়ণতার ঝঙ্কার শোনা যাইত। জনৈককে একবার পত্রে লিখিয়াছেন—"তুমি যে-সব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছ ও-সকলের সময় এখন তোমার নয়। আগে খাওয়া পরার ব্যবস্থা কর—তারপর ওসব হবে। খালি পেটে ধর্ম হয় না। তুমি এমনি ন্যালাখেবলা যে গয়ায় শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে সোনার আংটীটি হারিয়ে এলে! এ-রকম হলে কি জীবনে কোনও উন্নতি হয়—সংসারই কর বা ধর্মই কর।"

বিরজানন্দজীর চরিত্র বিবেকানন্দ-উপাদানে গঠিত ছিল বলিয়াই—স্বামিজীরই জ্ঞান-প্রেম-কর্মের অনুরণন অনুভব হইত তাঁহার সর্ব চিন্তায় ও বাক্যে।

কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকমণ্ডলী মহারাজজীর আশ্চর্য সহনশীলতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। দুঃসহ শারীরিক কষ্টের মধ্যেও হাসিমুখে তিনি বলিতে পারিতেন—"আমার ভাববারই বা কি আছে? আমার উপর তাঁর অশেষ কৃপা—না চাইতেই সব দিয়েছেন। এখন আবার

সময় হলে না চাইতেই কোলে উঠিয়ে নেবেন।" রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও ভক্ত দর্শনার্থীদের প্রতি করুণা প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। একটি-আধটি সুমিষ্ট কথা বা ক্ষণিকের স্নেহদৃষ্টি দিয়াও কত শত তাপিত প্রাণে শান্তি দিয়াছেন। এমন কি যখন মুখে কথা বলিতেও পারেন নাই—দৈহিক ক্লান্তি বা নানা কর্ম-ব্যাপৃতির জন্য সমাগত জিজ্ঞাসুদের প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাতই করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখনও কিন্তু সকলের জন্য কল্যাণচিন্তার বিরাম ছিল না। আকাঙ্ক্ষানুরূপ কথা বলার সুযোগ না পাইয়া জনৈক যুবক সন্তান একবার আক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পত্রে জানাইলে—তিনি জবাবে লিখিয়াছিলেন: "কথা কওয়াটাকেই আমি মস্ত ব্যাপার বলে মানিনা। জানবে, তোমরা দূরেই থাক আর নিকটেই থাক, আমার দীক্ষিত প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি ঠাকুর মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই—তাদের শুভ চিন্তা করি। তুমি মনে কোন খেদ বা দুঃখ রেখো না।" (তারিখ, ১১.৫.৪৫)

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুদের বিভিন্ন জটিল সমস্যাবলীর সমাধান তিনি অতি সহজ সরলভাবেই করিতেন—স্বীয় জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতারাশির আলোকে যে কোন সমস্যার সু-সমাধানে তাঁহার এক অপূর্ব দক্ষতা দেখা যাইত। "পরমার্থ প্রসঙ্গ" পুস্তকই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় অনূদিত হইয়া তাঁহার এই উপদেশ-সকলন দেশবিদেশের অসংখ্য ধর্ম-পিপাসুকে পরমার্থ-পথের প্রেরণা দিতেছে। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ "Towards the Goal Supreme" নামে আমেরিকা হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্রীড়াক্লান্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, মাতৃগতপ্রাণ বিরজানন্দজীও তেমনই চিরবিশ্রামের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব-শতবার্ষিকী তখন সমাসন্ন ছিল। উৎসবের অর্থ-ভাণ্ডারে মাতৃপূজার জন্য সর্বপ্রথম মহারাজজীরই দান গৃহীত হয়। অর্থের রসিদটিকে পরম ভক্তিভরে মাথায় স্পর্শ করিয়া সেবককে আদেশ দিয়াছিলেন যেন উহা তাঁহার শিয়রে বালিশের তলায় রাখিয়া দেওয়া হয়—কারণ ইহা দ্বারা মাকেই স্মরণ হইবে। "মা ডেকে নাও, ডেকে নাও," অথবা "হে প্রভো, হে মা"—তাঁহার এই অস্ফুট স্বগত মিনতি কখনও কখনও নিকটবর্তী সেবক-

দিগকে চকিত করিত। তাহাদের বুঝিতে বাকী থাকিত না, চিরবিশ্রামের দিন আগতপ্রায়।

জীবনের শেষ তিনটি সপ্তাহ যেন মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুতিপর্ব, সম্পূর্ণ অনাহারে, এমনকি জলবিন্দুটুকুও গ্রহণ না করিয়া, বুঝি অগণিত ভক্তের শেষ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই ধীর-অচঞ্চল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় তিনি শয্যায় অপেক্ষমান ছিলেন। দলে দলে আবালবৃদ্ধ নরনারী নিঃশব্দে অশ্রু-জলের অর্ঘ্য লইয়া শেষ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাযাত্রার নানা ইঙ্গিত সেবকগণকে কিছুকাল পূর্ব হইতেই দিয়াছিলেন। অবশেষে ৩০শে মে, ১৯৫১ (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীমার চিহ্নিত সন্তান, যুগাচার্য স্বামিজীর প্রিয় সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ মহাসমাধিযোগে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরমিলিত হইলেন।

"অতীতের স্মৃতি" গ্রন্থে[১] তপঃপূত এই মহাজীবনের পূর্ণ আলেখ্য অতি মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পদানুবর্তী মানব মহনীয় এই জীবন হইতে সংসার-পথের বহু মূল্যবান পাথেয় সংগ্রহ করিবেন সন্দেহ নাই। "তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরাপর পার্ষদগণের প্রত্যক্ষ সহযোগ এত নিবিড়ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল যে তাঁহাকে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরগণেরই একজন বলিয়া মনে হইত। বস্তুতঃ বরাহনগর মঠের জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিশিখা যে জীবনসমূহকে সাক্ষাৎভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিল, স্বামী বিরজানন্দের দেহাবসানের সহিত তাহাদের আর কোনটিই অবশিষ্ট রহিল না। সেই বহুমানিত অগ্নিশিখার শেষ রশ্মিটি বিদায়ের ক্ষণে নিশ্চিতই তাই সকলের মনে একটি গভীর বেদনা ও শূন্যতাবোধ জাগাইয়া গিয়াছে।"[২]

---

১ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-লিখিত, বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অভয়ানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

২ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-লিখিত "স্বামী বিরজানন্দ" (উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৩৫৮)।

স্বামী বিমলানন্দ

"কালচক্র ফিরিতেছে অথবা কেহ উহা ফিরাইতেছে? সিদ্ধকবি গাহিয়াছেন—'চল্‌তি চাক্কি সব কোই দেখে, কীল ন দেখে কোই'—চক্র ফিরিতেছে, ইহাই সকলে দেখিতেছে; কিন্তু যাহাকে ধরিয়া, যাহার জোরে ফিরিতেছে, তাহাকে কেহ দেখিতেছে না। বেদোপনিষৎ বলেন—তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা না থাকাতেই মানবের পরিবর্তনমুখে এত দুঃখ-যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারের সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া ঐ চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু হৃদয়-শোণিত দান করিতে পারে এমন বীরহৃদয় কয়টি নয়নগোচর হয়? বিরল হইলেও ভগবৎকৃপায় তদ্দর্শন অপ্রাপ্য নহে। ঐরূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয়ে নব বল সঞ্চারিত হইয়া নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে উত্তেজিত করে। এস পাঠক, অদ্য আমরা পরলোকগত ঐরূপ একটি জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।"—যাঁহার জীবন-চরিত্র আলোচনার মুখবন্ধে স্বয়ং স্বামী সারদানন্দজী এইরূপ লিখিয়াছেন, তিনি স্বামিজীর অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানগণের পরে সর্বপ্রথম যে কয়েকজন ত্যাগী যুবক স্বামিজীর আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন, বিমলানন্দ পূর্বাশ্রমে ছিলেন সেই যুবকগোষ্ঠীরই দলপতি। তাঁহার এই দলেরই একজন—উত্তরজীবনে স্বামিজীর অন্যতম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্য, একদা বিমলানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তাঁহার সহানুভূতি, ভালবাসা ও সদুপদেশে তিনি বহু বালক ও যুবকদিগকে সৎপথে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গ এবং উপদেশ না পাইলে অনেকের জীবনগতি যে অন্য পথে যাইত—এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুলোক বিদ্যমান আছে।" যে বিশেষ ত্যাগী যুবকমণ্ডলীকে লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বহুতর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেই আদর্শনিষ্ঠ উন্নতচরিত্র বৈরাগ্যবান বিবেকানন্দ-অনুবর্তিগণের বাল্যসখা ও প্রিয় নেতার জীবন, সঙ্ঘের ইতিহাসে আদরণীয় এবং প্রেরণাপ্রদ হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। ভগবৎপদে সমর্পিতপ্রাণ এই নীরব-সাধক বিমলানন্দ চিরকালই স্মরণার্হ হইয়া থাকিবেন।

হাওড়া জেলায় জগৎবল্লভপুর থানার বাগাণ্ডা গ্রামে নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে বিমলানন্দের জন্ম—তাঁহার পূর্বনাম খগেন্দ্রনাথ। এই গ্রাম তখন



স্বামী বিমলানন্দ

হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিতা শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ধর্মপ্রাণ ভগবৎ-ভক্ত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরে আন্দুলে বাস করিতেন এবং কলিকাতার পটলডাঙ্গায় ক্যাথিড্রাল মিশন লেনেও নিজস্ব বাড়ীতে মাঝে মধ্যে াকিতেন। রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের রাজসরকারে প্রথমে ইঞ্জি-নিয়ার এবং পরে ঐ সরকারেরই প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজারের পদে চট্টো-াধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল অতিশয় সুনামের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষয়িক ায়িত্ব ও সাংসারিক সমস্যাদির মধ্যেও তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠার ন্যূনতা কদাপি কহ দেখেন নাই। শোনা যায়, বিষয়কর্মের চাপে যদি কোনদিন তাঁহার গবদ্-বন্দনা বা সন্ধ্যা-আহ্নিক যথাকালে সম্পন্ন করিতে না পারিতেন, সারাদিন পবাসে থাকিয়া গভীর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া পূজা অর্চনা সারিয়া তবে জল হণ করিতেন। খগেন্দ্রনাথ এই বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র—:রেজী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম। খগেন্দ্রনাথের ননীও তাঁহার পিতারই মতো আদর্শনিষ্ঠ ও ভক্তিমতী ছিলেন। ত্রের ধর্মে মতি হউক, ইহাই ছিল জননীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—পুত্রকে সারী করিবার বাসনা কোনদিনই তাঁহাতে দেখা যায় নাই। নানা াকতাপে জর্জরিত থাকিয়াও, ঈশ্বরের পাদপদ্মকেই সংসারের একমাত্র র জানিয়া পুত্র খগেন্দ্রনাথকে অনুরূপ শিক্ষা ও প্রেরণা দিতেন। তাপিতার সদ্গুণ পুত্রের জীবনে যথার্থই সংক্রমিত হইয়াছিল। তবে রিতাপের বিষয় যে পিতার স্বাস্থ্যহীনতাও পুত্র বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত য়াছিলেন।

বালক খগেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, বন্ধুপ্রীতি এবং মাধুর্যমণ্ডিত আচার-চরণ তাঁহাকে সকলের নিকট খুবই আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। য়াবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব গুণগুলি এতই বৃদ্ধি পাইতেছিল যে কলিকাতার ান কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশিকা-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তিমত একটি তরুণদল গড়িয়া উঠিয়াছিল। খগেন্দ্রনাথের দৃঢ় চরিত্রবল, ানুরাগ, সপ্রেম ব্যবহার, আর সংগঠনী প্রতিভাই ছিল এই দলসৃষ্টির মূল রণা। কোথাও কোন সাধু-ভক্তের সন্ধান পাইলেই খগেন্দ্রনাথ সেখানে তেন। তাঁহাদের দলের যুবকদের ভিতর তখন উচ্চতর জীবনগঠনের া একটি নিয়মিত প্রচেষ্টা ছিল—ব্রহ্মচর্য পালন ও ধর্মালোচনাদির উপরই

তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কি করিয়া ঈশ্বরানুভূতি লাভ হইবে, ইহাই ছিল প্রত্যেকের একমাত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

খগেনের সঙ্গীদের মধ্যে তাঁহারই খুড়তুতো ভাই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ও অন্যতম ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই হরিপদই স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বোধানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সহায়তার দিক হইতে বিচার করিলে, খগেন্দ্রনাথের নায়কত্বে সংগঠিত এই ক্ষুদ্র যুবক-দলটির অবদান সত্যই অনবদ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিবিস্তৃতির ইতিহাসে সেদিনের এই যুবকগোষ্ঠী এককভাবেই একটি বিশেষ গৌরব-অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে—এ-কথা অনস্বীকার্য। সেই হিসাবে খগেন্দ্র-নাথের জীবনী-আলোচনার একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনও আছে।

নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী খগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা নিয়মিত ধ্যান-ভজন করিতেন। সহপাঠী ধর্মবন্ধু কালীকৃষ্ণদের একখানি বাগানবাটী ছিল। নির্জন সেই বাগানে বন্ধুদের লইয়া ধর্মচর্চা ও ধ্যানধারণাদিতে অনেকদিন তাঁহারা কাটাইতেন। আহারাদি করিতেও কোনও কোন দিন বাড়ীতে যাইতেন না—নিজেরাই বাগানে রন্ধনাদি করিতেন। কাশীপুরের মহিমা চক্রবর্তী তখন কলিকাতায় খুব খ্যাতনামা সাধক। কাশীপুরেই তাঁহার সাধন-চক্র বসিত—অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু অনেক শিক্ষিত যুবক এই চক্রে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। মহিমাবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনও পাইয়াছিলেন, এ কথা 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠে জানা যায়। মহিমাবাবুর দলের লোকেদের একটি বাহ্যিক লক্ষণ ছিল যে তাঁহারা মাথায় লম্বা রুক্ষ চুল রাখিতেন। তাঁহাদের সাধনপ্রণালীরও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যে শঙ্খনিনাদ ও একতারা সহযোগে ওঁকার গান তাঁহারা নিয়মিত করিতেনই। খগেনও তদানীন্তন ভাবস্রোতে পড়িয়া মহিমাবাবুর দলে যাওয়া আসা করিতেন এবং তাঁহাদের অনুকরণে মাথায় লম্বা চুল রাখিতে সুরু করিয়াছিলেন। সকালে এবং সন্ধ্যায় বাড়ীতে নিজের ঘরে ধূপধুনা জ্বালাইয়া, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শঙ্খ বাজাইতেন ও একতারায় ওঁকার গান করিতেন। যখন যেখানেই কোন সাধকের ঠিকানা পাইতেন, খগেন তখনই সেখানে ছুটিতেন। নবীনচন্দ্র রায় নামে কর্তাভজা-পন্থী জনৈক সাধকের নিকটও কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া-ছিলেন। নবীন রায় কর্তাভজা হইলেও স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিতেন না।

নানা প্রকার সাধন-ভজন-চর্চাদি করিলেও মেধাবী খগেন্দ্রনাথের পড়া-শোনায় অবহেলা দেখা যাইত না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরিক্ষায় কৃতিত্বের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শোনা যায় তিনি মাসিক পনের টাকা বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। প্রবেশিকার পরে রিপন কলেজেই এফ্. এ. পড়িতে থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে এই কাল হইতেই তাঁহার ধর্মজীবনের গতিবেগ নূতন পথে নূতন ছন্দে ছুটিতে সুরু করিয়াছিল—জীবনের লক্ষ্যও উত্তরোত্তর সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। কালীকৃষ্ণ, সুধীর, হরিপদ, সুশীলপ্রমুখ বন্ধুদের সহিত সম্পর্ক যেন আরও নিবিড় হইতে থাকিল—খগেনের আশ্চর্য ধর্ম-প্রাণতার প্রভাব তাঁহার বন্ধুরাও হৃদয়ে অনুভব করিতেন। বাল্যজীবনের স্মৃতি-প্রসঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ) একবার লিখিয়াছেন, "কলেজ বন্ধ হইবার পর প্রতিদিন আমরা একত্রিত হইতাম এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত ধর্মবিষয়ক চর্চা করিতাম। কিরূপে ধর্মানুভূতি হইবে ইহাই আমাদের দলের প্রত্যেকের একমাত্র প্রাণের কামনা ছিল। এই সময়ে খগেনের ভালবাসা, বুদ্ধি ও মন্ত্রণা আমাদের সকলকেই তাহার প্রতি বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা সে সময়ে অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে অতি অল্পই বুঝিতাম; তবে যতটুকু বুঝিতাম ততটুকু চেষ্টা করিতাম। প্রাণে যেমন উঠিত তেমনি ধ্যান-ভজন করিতাম।" এই উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যে খগেনের বাল্যসঙ্গীদের ঐকান্তিক ধর্মজিজ্ঞাসা ও সাধন-ভজনের বাস্তব পরিচয় যেমন আছে, তেমনই খগেনেরও উন্নত চরিত্রবল ও সপ্রেম নেতৃত্বের একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র পাওয়া যায়।

সহাধ্যায়ী কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতে সুরেশচন্দ্র দত্ত-সঙ্কলিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। খগেন ও কালীকৃষ্ণ এই বইগুলির মাধ্যমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রথম জানিয়া-ছিলেন। খগেনের পিতার একটি ইটখোলা ছিল ভদ্রকালীতে। একবার বন্ধুবান্ধবদের লইয়া একখানি বড় নৌকায় চড়িয়া তাঁহারা ভদ্রকালী বেড়াইতে গিয়াছিলেন—ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়া সেখানে পঞ্চবটীতে ধ্যান-ধারণাদিতে রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। ভাণ্ডার হইতে চাল, ডাল, লবণ, হাঁড়ি, কাঠ ইত্যাদি ভিক্ষা লইয়া নিজেরাই রন্ধনাদি করিয়া আহার করিয়াছিলেন। পরের দিন বৈকালে তাঁহারা কলিকাতায় নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন।

সুধীর, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি বন্ধুরাই সেদিন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবতঃ খগেনের ইহাই সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন।

একবার খেয়াল হইল, সংসার ত্যাগ করিয়া সাধন-ভজন লইয়াই জীবন কাটাইবেন—বন্ধু কালীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া খগেন ঠিক করিলেন হিমালয়ে চলিয়া যাইবেন। ডায়মণ্ড হারবারে খগেনের এক আত্মীয় থাকিতেন —সেখানে দুইটি সংসারবিরাগী বালক দিন পনেরো একান্তবাস করিলেন। লোটা কম্বল সবই সংগ্রহ হইল—বৈরাগ্যের ভাবটিকে আরও উদ্দীপিত করিবার জন্য একদিন যাইয়া ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্যলীলা" অভিনয়ও দেখা হইল। গৃহত্যাগ করিবার দিন-ক্ষণ স্থির হইয়া গেল—আপাততঃ দার্জিলিং-এর দিকেই যাওয়া হইবে। কালীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বরাত্রে খগেনদের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। দুই বন্ধু নিশাবসানের অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় গভীর রাত্রিতে নন্দবাবু নামে জনৈক প্রতিবেশী আসিয়া খগেনের জানালায় করাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকেন। নন্দবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য—সাধন-ভজন করেন। নন্দবাবু জানাইলেন যে তিনি অলৌকিক কোন উপায়ে তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়াছেন। আরও বলিলেন যে এখন তাঁহারা গৃহত্যাগ করিলে অমঙ্গলই ডাকিয়া আনা হইবে। খগেন এই ভদ্রলোককে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে তাঁহার সেই এক কথায়, তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। সে যাত্রা সংসার ছাড়িয়া যাওয়া হইল না।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব হইবে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া খগেন্দ্রনাথ একদিন ১১নং মধুরায়ের গলিতে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের গৃহে যাইয়া উৎসবের সব অনুসন্ধান লইয়া আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খগেনের ও তাঁহার বন্ধুদের আনন্দের অবধি রহিল না। যথানির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা কাঁকুড়গাছিতে উৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন। এইভাবে রামবাবুর স্নেহদৃষ্টিতে পড়িয়া খগেন ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্রমেই কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের খুব ঘনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠিলেন—এমন কি প্রতি শনি ও রবিবার তাঁহারা কাঁকুড়গাছিতেই কাটাইতে থাকেন। রামবাবুর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে খগেনরা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। খগেনের এই দলটি তখন কাঁকুড়গাছি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজাদির সর্বপ্রকার ভার নিজেরাই সানন্দে বহন করিতেন।

রিপন কলেজে অধ্যয়নকালেই খগেনের জীবনের এক ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন হইয়াছিল। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"কার 'শ্রীম'—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন ঐ কলেজের সর্বজনমান্য অধ্যাপক। খগেন প্রায়ই লক্ষ্য করেন তাঁহাদের এই অধ্যাপক মহাশয় অবসর সময়ে কলেজের ছাদের উপরে চিলা-কোঠায় চলিয়া যান, আর সেখানে চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া কি দেখেন ও অন্য একটি খাতায় খুব অভিনিবেশ সহকারে কি সব লেখেন। কৌতূহলী খগেন একদিন সাহস করিয়া অধ্যাপককে অনুসরণ করিলেন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে পড়িয়া গেলেন। খগেন আবিষ্কার করিলেন, তাঁহাদের এই অধ্যাপকই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অতি আদরের 'মাষ্টার'। ক্রমে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে খগেনের ঘনিষ্ঠতা খুবই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। মাঝে মধ্যে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতেও যাতায়াত সুরু হইল। খগেনের দলের আর আর ছেলেরাও এইভাবে খগেনের মাধ্যমেই শ্রীম-র সাহচর্যে আসিয়াছিলেন। খগেন ও তাঁহার বন্ধুরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পান করিতেন। একদিন তিনি অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু এই ছেলেদিগকে বলিলেন, "দেখ ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তাঁর যে সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন তাঁদের সঙ্গ করতে হয়।" আবার কথায় কথায় ইহাও ইঙ্গিত করিলেন যে, ভগবান লাভের জন্য সর্বস্বত্যাগের আবশ্যক হয়। বলিলেন, "যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তো একদিন বরাহনগর মঠে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য-মণ্ডলী থাকেন, সেখানে যাও।" মাষ্টার মহাশয়ের কাছে এইভাবেই প্রেরণা লাভ করিয়া সহাধ্যায়ী কালীকৃষ্ণ ও আর একজন বন্ধুকে লইয়া খগেন্দ্রনাথ একদিন কলেজ হইতে পদব্রজে বরাহনগর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর আশ্চর্য তিতিক্ষা ও তপস্যাময় জীবন খগেন্দ্রনাথকে দারুণ আকৃষ্ট করিল। উত্তরোত্তর এই আকর্ষণ বর্ধিত হইতে থাকে এবং বরাহনগর মঠে যাতায়াতও বাড়িয়া চলিল। সুযোগ পাইলেই বন্ধুদের লইয়া মঠে আসিয়া সাধুসঙ্গ, ধ্যান-জপ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবার জন্য কিছু না কিছু কাজ করা এখন হইতে খগেন্দ্রনাথের একটি নিয়মিত অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল।

খগেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল অতিশয় সংগোপনে ও নীরবে। ১৮৯১-র শেষে বা ১৮৯২-র প্রথম দিকে বন্ধু সুশীলসহ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য দর্শনে যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তখনই, বা পরে অন্য কোন সময়ে জননী মহামন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান করিয়া খগেন্দ্রনাথকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের নিকট এই সংবাদ তিনি বহুকাল গোপনেই রাখিয়াছিলেন—যদিও পরে জানা গেলে যে তাঁহাদের দলের অনেকেই কোন না কোন সময়ে গিয়া মাতৃচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

খগেন্দ্রনাথ এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, পরে সেই রিপন কলেজেই বি. এ. পড়িতে থাকেন। মনে হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বি এ. পরীক্ষার পূর্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাল্যকাল হইতেই অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া শরীর তাঁহার কৃশ ছিল, এখন উহা আরও অপটু হইয়া পড়িল। খগেন্দ্রনাথকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অবশেষে পড়াশোনা ছাড়িতে হইয়াছিল। গৃহে থাকিয়া সর্বপ্রযত্নে শরীরের উন্নতির জন্য ব্যবস্থাদি করাই চিকিৎসকদের পরামর্শ ছিল। কিন্তু কার্যতঃ ঘটনাচক্রের গতি অন্যরূপে আবর্তিত হইল,—এই কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া খগেন্দ্রনাথ ভাবী সন্ন্যাস-জীবনের মহত্তর ও দৃঢ়তর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। ধ্যান-ধারণা, সৎগ্রন্থাদি পাঠ ও বন্ধুদের লইয়া ধর্মপ্রসঙ্গাদিতেই তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। ভগবচ্চিন্তায় অধিকতর মনোনিবেশ করায় এবং বরাহনগর মঠের সর্বত্যাগী ভগবৎ-প্রেমিকদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়া খগেন্দ্রনাথের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে গেলে সংসারসুখকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই কর্তব্য।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি। ভারতের আকাশ বাতাস স্বামিজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বের সর্বত্র উড্ডীন করিয়া, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—বজবজে জাহাজ হইতে নামিয়া ট্রেনে কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিতেছেন ৬ই ফেব্রুআরি। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ স্বামিজীর শুভাগমনকে সগৌরবে নানাভাবে প্রচার করিতেছে। দেশের যুবকগণ

যে যেখানে ছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। খগেন্দ্রনাথের পক্ষেও সেই আলোড়নের তরঙ্গকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তাঁহার রুগ্ন জীর্ণ দেহ লইয়া ভাবিতেছিলেন, সত্যই কি স্বামিজীর অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন? যাঁহাকে এতকাল শুধু মনশ্চক্ষেই দেখিয়াছেন, বাস্তবিক চর্মচক্ষে কি তাঁহার দর্শন মিলিবে?" খগেন্দ্র প্রাণে প্রাণে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, বিধাতার অলক্ষ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বল খগেন্দ্রনাথও সহস্র জনমণ্ডলীর প্রবল প্লাবন ঠেলিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছিলেন—শুধু দর্শন নহে, কলিকাতার উৎসাহী বন্ধুদের সহযোগিতায় স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া গাড়ীটিকে ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজ ভবন পর্যন্ত টানিয়াও আনিয়াছিলেন। স্বামিজীকে যতদিন চক্ষে দেখেন নাই, ততদিন ছিল এক প্রকারের আকর্ষণ, কিন্তু তাঁহাকে দর্শনের পর হইতে খগেন যেন বক্ষে কী এক অভূতপূর্ব টান অনুভব করিতে থাকিলেন। এ টান সত্যই ঘরছাড়ার টান।

রিপন কলেজে স্বামিজীর অভিনন্দন-অনুষ্ঠানের শেষে খগেন বাড়ী ফিরিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হইল না। কোন মতে আহারাদি সারিয়া পুনরায় সেই দুপুরেই, বন্ধু সুধীরকে সঙ্গে লইয়া পিতার টমটমে চড়িয়া বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাটীতে, যেখানে স্বামিজীর অবস্থানের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ যাত্রান্তে মাত্র কিছু পূর্বে স্বামিজী এই বাটীতে পৌঁছিয়াছেন—পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন তখন। বাহিরের কাহাকেও তখন তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইতেছিল না। কিন্তু আগ্রহশীল ব্যাকুল যুবকদ্বয়ের সৌভাগ্যের তুলনা নাই—স্বয়ং স্বামী শিবানন্দজী খগেন ও সুধীরকে সঙ্গে করিয়া স্বামিজীর নিকট লইয়া গেলেন। শিবানন্দজী পরিচয় করাইয়া বলিলেন—"এরা আপনার খুব admirer"। স্বামিজী তখন যোগানন্দজীর সহিত পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিতেছিলেন, "দেখ্ যোগে, দেখলুম কি জানিস্? সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে।

বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই খেলা হচ্ছে মাত্র।" স্বামিজীকে ঘিরিয়া এবং তাঁহার আশেপাশে আরও কয়েকজন দর্শনার্থী ও সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। খগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুটি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া অতি ধীরে মেঝেতে উপবেশন করিলেন। স্বামিজীর আয়ত দৃষ্টি হঠাৎ খগেনের উপর পড়ায়, স্নেহমাখা স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।" শিবানন্দজী উত্তর দিয়াছিলেন, "এটি অনেকদিন থেকে chronic dyspepsia-তে ভুগছে।" ইহাতে স্বামিজী আবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের বাংলা দেশটা বড় sentimental কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia।" স্বামিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনে এই ভাবেই পরিচয়াদি হইয়াছিল। খগেনরা অতঃপর প্রণামাদি সারিয়া সেদিনের মতো গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা কি এক অজ্ঞাত অননুভূত বিদ্যুদাকর্ষণ দেহের প্রতি তন্ত্রীতে বোধ করিতে থাকিলেন। খগেনের মনে হইতে লাগিল, এ আশ্চর্য পুরুষ কে? এমন মানুষ তো পূর্বে কখনও দেখেন নাই তিনি! পরবর্তিকালে এই প্রথম দর্শনের স্মৃতি বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন —"The first sight of Swamiji, the peculiar brightness of his face, his lustrous yet soft and sweet eyes, at once carried into my heart an overwhelming sense of satisfaction that I had come to a man the like of whom I had never seen before."— প্রথম দর্শনে স্বামিজীর অসাধারণ উজ্জ্বল মুখকান্তি আর দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ মাধুর্যময় চক্ষুদুইটি তাঁহার প্রাণকে এক গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া দিয়াছিল, যেন এমন এক পুরুষের সন্নিধানে তিনি পৌঁছিয়াছেন যাঁহার মতো পূর্বে আর কাহাকেও তিনি দেখেন নাই। গভীর সেই আত্মতৃপ্তিকে সুন্দর শক্তিশালী ভাষায় তিনি আর একবার প্রকাশ করিয়াছেন: "I only saw on the first day the few sparks that shot forth into our range of vision from a soul aglow with fire of divine love and wisdom."— অর্থাৎ, "অধ্যাত্ম জ্ঞান ও ভক্তির উজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা হইতে বিচ্ছুরিত কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্রকেই আমাদের সীমিত দৃষ্টির দ্বারা সেই প্রথম দিনে দেখিয়াছিলাম।" খগেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ কাব্যময় প্রকাশভঙ্গী সত্যই অতুলনীয়। প্রচণ্ড ঐ বহ্নি-স্পর্শে নিজ জীবনকে পরে এমনই প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে তিনি পারিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর অলোক-

সামান্য শক্তিকে এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।

স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের দিন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ তেজোদৃপ্ত রূপে ও ব্যক্তিত্বেই শুধু খগেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার তৃণাপেক্ষা সুনীচ বিনয় এবং অনন্যসাধারণ গুরুভক্তিতেও খগেন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আপাতবিরুদ্ধ এই উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন —অধ্যাত্মপথের একটি নূতনতর পরিচয় তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটি স্মৃতি তাঁহার চিত্তে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, উত্তরজীবনেও উহা বলিতে বলিতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের দিনের সেই ঘটনাটি এইরূপ: জনৈক জিজ্ঞাসু সেদিন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, ঠাকুরের সম্পর্কে প্রদত্ত স্বামিজীর কোন ভাষণ কেন কোথাও প্রকাশিত দেখা যায় না। স্বামিজী অকুণ্ঠিত ভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"হাঁ, আমিই ঐ সকল প্রকাশ করিতে দেই নাই—কারণ, আমি ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি নাই। আমার প্রভু কাহাকেও অথবা কোন বস্তুকে কখনও নিন্দা করেন নাই। কিন্তু আমি তাঁহারই সন্তান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে বক্তৃতাকালে, আমেরিকাবাসীর কাঞ্চনাসক্তির সমালোচনা করিয়াছি। আর সেইদিন হইতেই আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে, আমি এখনও তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলিবার যোগ্য হই নাই।" এই নিরভিমানিতা—এই অপূর্ব গুরুভক্তি স্বামিজীর পক্ষেই হয়তো সম্ভব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য অনুরাগীর অকৃত্রিম পূজা যে ব্যক্তি নিয়ত লাভ করিতেছেন, এ-হেন দীনতা তাঁহার পক্ষে কীভাবে সম্ভব, ইহা খগেন্দ্রনাথ যুক্তিবিচারে পাইতেছিলেন না। আবার ভাবিতেছিলেন, এতবড় মহাপুরুষের মস্তক যে গুরুর চরণে এমন বিনত, না জানি সেই আশ্চর্য গুরুর জীবনও কতখানি মহনীয়! খগেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, তাঁহার সেদিনের অন্তরের ভাবটি বড় সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। স্বামিজীর ঐ উক্তি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন: "These words were really startling to us for more than one reasons. Here was a man who was being idolized, nay actually worshipped by so many, and this man in their very presence confessing his inability to represent his *guru!* 'What an unpretentious

man is before us' said we to ourselves. 'What a wonderful man must his *guru* have been to occupy such a high place in the heart of this great man!"

স্বামিজী যখন যেখানে অবস্থান করিতেন—বরাহনগরে, গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটীতে বা আলমবাজার মঠে, খগেন্দ্রনাথ সেইখানেই ছুটিয়া যাইতেন। কলিকাতার যে যে স্থানে স্বামিজীর বক্তৃতাদি হইত সেই সেই স্থানেও নিয়মিত যাইয়া তাঁহার বাণী শুনিতেন। মোট কথা স্বামিজীকে দর্শন করিবার একটি সুযোগও তিনি স্বেচ্ছায় হারাইতেন না। তবে স্বামিজীকে ঘিরিয়া সর্বদাই এত দর্শক ও জিজ্ঞাসুর ভিড় লাগিয়া থাকিত যে ক্ষীণস্বাস্থ্য খগেন লোক ঠেলিয়া স্বামিজীর খুব নিকটে গিয়া মনের আশ মিটাইয়া সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ইহাতে মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ থাকিলেও স্বামিজীর শক্তিপ্রদ বাণী ও উপদেশ দূর হইতে শুনিয়া এবং তাঁহার জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়াই খগেন অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয়-মনের এমনই ভাবান্তর হইতে থাকিল যে স্বামিজীকেই তাহার জীবন-তরণীর কর্ণধাররূপে বরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর কিছু দেখিতেছিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং অগণিত লোকজনের সহিত অনর্গল দেখাশোনার চাপে স্বামিজীর শরীর অকস্মাৎ তখন অসুস্থ হইয়া পড়ে। ফলে লোকের ভিড়ও ধীরে ধীরে কমিতে বাধ্য হইল। বিধাতার বিধানে খগেন্দ্রনাথ এতদিনে একটু নিরালায় স্বামিজীর কাছে বসিবার সুযোগ পাইলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তখন। খগেন আর কালক্ষেপ করা মোটেই উচিত মনে করিলেন না। মাতা-পিতার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ ও অনুমতি লইয়া খগেন্দ্রনাথ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সংসারত্যাগী খগেন্দ্রনাথ এতদিনে তাহার চিরঈপ্সিত আশ্রয়ে—স্বামিজীর পদপ্রান্তে আসিয়া শরণ লইলেন। স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায় বলিতে হয়—"এইরূপে খগেন্দ্রনাথ যেদিন সংসার হইতে বিদায় লইলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পুত্র গৈরিকধারী, মুণ্ডিতমস্তক, যতি বিমলানন্দও সেইদিন জন্মগ্রহণ করিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' তাঁহারই স্থানে সংসারে প্রবেশ করিলেন।"

স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ করিয়া বিমলানন্দ তাঁহারই নির্দেশ মতো ধ্যান-

জপ শাস্ত্রচর্চা ও নানাবিধ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তখন মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণকে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেন। স্বামিজীর আদেশে বিমলানন্দও ব্রহ্মবিদ্ তুরীয়ানন্দজীর কাছে শাস্ত্রাদি পড়িতে লাগিলেন। বিমলানন্দের অধ্যাত্মজীবন-বিকাশের পথে ইহাও এক স্মরণীয় ঘটনা।

ক্রমে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। মঠে শ্রীগুরুর পবিত্র সান্নিধ্যে বিমলানন্দ যথার্থই বিমল আনন্দে কাটাইতেছিলেন। মঠের পীড়িত ভাইদের সেবায় বিমলানন্দের ঐকান্তিকতা তখন সত্যই আদর্শস্বরূপ ছিল। লোকাভাবে কাহাকেও অতিরিক্ত শ্রম করিতে দেখিলে, নিজেই তিনি তাহার কাজ কাড়িয়া লইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। যাহা হউক কিছুকাল পরেই নবপ্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের জন্য বিমলানন্দকে স্বয়ং স্বামিজী মনোনীত করিলেন। বিরজানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সহিত বিমলানন্দও মায়াবতীর কর্মিরূপে প্রেরিত হইলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্বামিজী বিমলানন্দের ইংরেজী ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে পাইয়া মায়াবতী হইতে প্রকাশমান 'প্রবুদ্ধ ভারত' (Prabuddha Bharata) -পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগ বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বামী স্বরূপানন্দ তখন ঐ পত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বুকের রক্ত সিঞ্চন করিয়া এই অদ্বৈত আশ্রম গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তিনিই আশ্রমের প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। বিমলানন্দ ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। সকল গুরুভ্রাতা একত্রে মিলিয়া একাগ্র নিষ্ঠা লইয়া স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত এই বেদান্ত-প্রচারকেন্দ্রের সর্বৈব উন্নতির জন্য ব্রতী হইলেন। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে শ্রীগুরুর আদিষ্ট কর্মে ও ধ্যানে বিমলানন্দ সত্যই প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বিমলানন্দ পরে মায়াবতীর প্রধান ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার এবং সহকারী সম্পাদকের কার্যভারও লইয়াছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রে তাঁহার রচনাদি তখন যথার্থই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—স্বামিজীর কৃপালব্ধ জ্ঞানই তাঁহার লেখনীমুখে এতদিনে প্রকাশিত হইতে থাকিল। হিমালয়ের পার্বত্য আবেষ্টনীতে বিমলানন্দের অন্তর্মুখ মন সর্বদাই উচ্চগ্রামে উন্নীত থাকিত—বিশুদ্ধ জল-হাওয়ায় শরীরেরও বেশ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এক সময়ে

বিশেষ কোন কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে একবার নামিয়া মঠে আসিতে হয়—তখন সকলে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন বিমলানন্দ এইরূপ সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর ভাব প্রচার করিতে পারিবেন।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পর স্বামিজী যখন মায়াবতীতে গিয়াছিলেন (জানুআরি, ১৯০১), বিমলানন্দ তাঁহার বহুআকাঙ্ক্ষিত গুরুসেবার সুযোগ পুনরায় কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলেন। যদিও স্বামিজী মাত্র সপ্তাহ দুই মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি বিমলানন্দ মনের সাধ মিটাইয়া হিমালয়ের পুণ্য পরিবেশে আচার্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

বিমলানন্দের উদ্যোগে বিরজানন্দপ্রমুখ কয়েকজনের উৎসাহে অদ্বৈত আশ্রমে একটি ছোট ঠাকুর-ঘর ইতোমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং নিয়মিত ফুল-ধূপ-দীপ সহকারে অর্চনাদিও সেখানে হইত। স্বামিজীর অভিপ্রায় ছিল, অদ্বৈত আশ্রমে সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবেই শ্রীভগবানের ধ্যান-চিন্তা হইবে—দ্বৈতভাবের উপাসনাদির কোন প্রচলন সেখানে না করা। সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমের ঠাকুর-ঘর দেখিয়া তিনি আদৌ প্রীত হন নাই। স্বামিজীর অনভিপ্রেত বুঝিয়া, তখন হইতেই অদ্বৈত আশ্রমে দ্বৈতভাবের পূজাদি তথা ঠাকুর-ঘর ইত্যাদি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিমলানন্দই ঠাকুর-ঘরের প্রধান উদ্যোগী থাকায়, এই ব্যাপারে বেশ কিছুদিন মনোব্যথা বোধ করিয়াছিলেন এবং সংশয়ান্বিত হইয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয় দোলায় বিমলানন্দের মন তখন দুলিতেছিল। অবশেষে সন্তানের এই মানসিক দ্বন্দ্ব জননীই দূর করিলেন—পত্রোত্তরে বিমলানন্দকে মা লিখিলেন: "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।" ১৫ই ভাদ্র ১৩০৯, অর্থাৎ ৩১শে আগষ্ট, ১৯০২ তারিখে জয়রামবাটী হইতে লিখিত মাতাঠাকুরাণীর এই পত্র মায়াবতীতে বিমলানন্দের হাতে পৌছিয়াছিল ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২। জগজ্জননীর এই আশ্বাসে বিমলানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা সকলেই চিরতরে নির্দ্বন্দ্ব হইলেন—তাঁহাদের বেদান্তবিদ্ আচার্যের মনোগত ভাবটিও এইবার ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও ভাবের দিক হইতে খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। যাহা হউক ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, স্বামিজীর মর্ত্যলীলার অবসান হওয়ায়, বিমলানন্দের ভাগ্যে আর স্থূলভাবে গুরুদর্শন সম্ভব হয় নাই।

১৯০১-এর শীতে গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দের সহিত বিমলানন্দ হিমালয় হইতে নামিয়া কিছুদিন ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে এলাহাবাদে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে বেদান্তের উপর দুইটি বক্তৃতা তিনি ইংরেজীতে প্রদান করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ প্রকাশ্যভাবে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। তাঁহার গভীর তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় এই ভাষণ দুইটিতে পাওয়া গিয়াছিল—বেদান্ত-বিজ্ঞানকে এমন সরস-সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ না করিয়া পারে নাই। এলাহাবাদের জনসাধারণ তাহার বৈদগ্ধ্য ও সাধুতায় এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাঁহাকে খুবই অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এলাহাবাদে বিমলানন্দের স্বাস্থ্য পুনরায় অবনতির দিকে যাইতে থাকায় শীতের শেষেই মায়াবতী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয় গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দ কর্তৃক কনখলে তখন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামিজীরই আদেশ শিরোধার্য করিয়া এই সেবাশ্রমের জন্ম, তাই ইহার প্রতি বিমলানন্দেরও অনুরক্তি খুব স্বাভাবিক ছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় কনখল সেবাশ্রমের জন্য তাই সুচিন্তিত একাধিক আবেদন তিনি লিখিয়াছিলেন।

মায়াবতীতেও বিমলানন্দের স্বাস্থ্যের কিন্তু কিছুই উন্নতি দেখা যাইতেছিল না, বরং ক্রমশঃ খারাপই হইতেছিল। অবশেষে বাধ্য হইয়াই বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শে মায়াবতীর সকল কর্মভার ত্যাগ করিয়া তিনি মঠে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে ওয়াল্টেয়ারে গমন করেন। সমুদ্রতীরের জলবায়ু তাঁহার শরীরের অনুকূল হইতে পারে, এই আশায় কিছুদিন ওয়ালটেয়ারেই কাটাইলেন, পরে মাদ্রাজে চলিয়া আসেন। মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পবিত্র সাহচর্যে ও স্নেহ-যত্নে বিমলানন্দের মানসিক উন্নয়ন যথেষ্ট হইলেও, শারীরিক উন্নতির লক্ষণ কিন্তু তেমন আশাপ্রদ হইল না। যাহা হউক, চিকিৎসা ঔষধ ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত হইল—বেশ কয়েক মাস তিনি মাদ্রাজেই বিশ্রাম লইলেন। এদিকে ব্যাঙ্গালোরে তখন মিশন-কার্যের বেশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বিমলানন্দের বাল্যবন্ধু স্বামী আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) তখন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। আত্মানন্দের স্বাস্থ্যও তখন অত্যধিক পরিশ্রমে ভগ্নপ্রায়। প্রিয়

সুহৃৎ ও গুরুভ্রাতার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সংবাদ বিমলানন্দকে বিচলিত করিয়া তুলিল। —নিজের অসুস্থতা ভুলিয়া আত্মানন্দের কাজে সহায়তা করিতে ব্যাঙ্গালোরে ছুটিয়া চলিলেন। ব্যাঙ্গালোরে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া আত্মানন্দকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে থাকেন এবং সহরের নানাস্থানে ধর্মালোচনা ও সভা ইত্যাদি করিয়া বেদান্তপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিমলানন্দকে পাইয়া আত্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হইল বটে—কিন্তু শরীরকে এইভাবে অবহেলা করায় বিমলানন্দের স্বাস্থ্য পুনরায় খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রুগ্নদেহে আবার মান্দ্রাজেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

মান্দ্রাজে অবশ্য এবার বেশ কঠিন নিয়ম ও বিধি-নিষেধ মানিয়া চলায় এবং চিকিৎসকগণের নির্দেশমতো ঔষধ-পথ্যাদি নিয়মিত ব্যবহার করায় বিমলানন্দ একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড এক আঘাত এই মান্দ্রাজে বসিয়াই তিনি পান: স্বামী স্বরূপানন্দ নৈনিতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন ১৯০৬। অন্তরঙ্গ বিয়োগব্যথায় বিমলানন্দ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন—কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস ও ভগবৎ-ভক্তির গুণে অচিরেই আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্বাস' সম্পর্কে বিমলানন্দের স্বকীয় ভাবটি সত্যই স্মরণযোগ্য। ভাবটি এতই মৌলিক ও শক্তিপ্রদ যে ইহার উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তাঁহার উক্তি: "বিশ্বাস ভাব-প্রবণতার একটি আকস্মিক উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধিমত্তার কোন চমকপ্রদ প্রকাশ নহে। জীবনের কঠিন ঘটনাবলীর সম্মুখে কর্পূরবৎ ঐ সব হাওয়ায় বিলীন হয়। প্রকৃত বিশ্বাস অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অটল শক্তিরূপে অবস্থিত। ইহা সুদীর্ঘ নীতি-নিষ্ঠার ফল। জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যেও বিশ্বাসীর প্রত্যেক চিন্তা ও কার্যে ইহা প্রকটিত হয়। পরমার্থ সৎবস্তুর সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্তর্দৃষ্টিবলে অনুভূত হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। বাক্য-মনাতীত ব্রহ্মসত্তায় যাঁহার যতখানি বিশ্বাস আছে, তাঁহার জীবনের মূল্যও ঠিক ততখানিই। যেমন যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের গতিও ঠিক সেই মতোই। বিশ্বাস-বলে সত্যই অসম্ভব সম্ভব হয়।[১]" সত্যই বিমলানন্দের জীবনে এই 'বিশ্বাস' যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

১ **Prabuddha Bharata** (April, 1900)

মান্দ্রাজ হইতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বিমলানন্দ বেলুড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার শেষ মঠ-বাস। ইতোমধ্যে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ও স্যান্‌ফ্রান্সিসকো হইতে বারবার অনুরোধ আসিতে থাকিল—বিমলানন্দকে বেদান্ত-প্রচারকরূপে বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য। কিন্তু জীর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া এই গুরু দায়িত্ব বহন অসম্ভব বুঝিয়া, তিনি আমেরিকা যাইতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক, মঠে থাকিয়াও তিনি মঠবাসী সাধুগণকে বিভিন্ন কার্যে সহায়তা করিতে ছাড়িতেন না। শরীরও মোটামুটি ভালই চলিতেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে মাদার সেভিয়ার মঠে আসিয়া, বিমলানন্দের স্বাস্থ্য দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, এবং বিমলানন্দও তাঁহার সহিত আবার মায়াবতী ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। এইবার মঠে থাকাকালে তিনি দুই এক জায়গায় ধর্মপ্রসঙ্গাদিতে যোগদানও করিয়াছিলেন। 'বেহালা হিতকারী সভা'য় প্রদত্ত তাঁহার ইংরেজী ভাষণ বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। পূর্বাশ্রম আন্দুলেও শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বেলুড় মঠের সমস্ত সন্ন্যাসিমণ্ডলীসহ যোগদান করিয়াছিলেন। গৃহে পিতা-মাতার দর্শনলাভ করিয়া খুব আনন্দও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে হিমালয়ের আকর্ষণে বিমলানন্দ পুনরায় মায়াবতীর কর্মী হইয়া আসিলেন। মায়াবতীর অধ্যক্ষ তখন স্বামী বিরজানন্দ। অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী (Complete Works) প্রকাশনের কার্য পূর্ণ উদ্যমে সেই সময় চলিতেছিল। বিমলানন্দ নিজের শরীর ভুলিয়া এই মহৎ কার্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। শুভানুধ্যায়ীদের আপত্তি না শুনিয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীরটি এইবার চিরতরে নষ্ট করিলেন। জীবনদেবতা স্বামিজীর চরণে বিমলানন্দ তিলে তিলে নিজেকে আহুতি দিয়া চলিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে বিমলানন্দের একটু একটু জ্বর হইতে থাকিল—অবশেষে ফেব্রুআরিতেই চিকিৎসকগণ তাঁহার দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ আবিষ্কার করিলেন।

চিকিৎসকগণ বিমলানন্দকে শরীরের ও মস্তিষ্কের পূর্ণ বিশ্রাম দিতে পরামর্শ দিলেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতার পীড়ায় অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন—চিকিৎসা ঔষধপথ্য ও সেবাদির বন্দোবস্ত এবং তদ্বির স্বয়ং করিতে থাকিলেন। বিমলানন্দ কিন্তু টুকিটাকি নানা কার্য নিজ হাতে

করিয়া, অন্যকে সহায়তা করিতে মোটেই বিরত হইতেছিলেন না। অনুনয়-বিনয় সহকারে ইহাতে আপত্তি জানাইলে বা কোনপ্রকার নিষেধ করিলে অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন, "আমার শরীর যখন আর সারিবে না নিশ্চয়, তখন কেন আমি তোমাদের যতটুকু সাহায্য করিতে পারি, ততটুকু না করি? ঐরূপ করায় মনের প্রীতি, আনন্দ নিশ্চয়ই পাইব। তবে কেন বাধা দাও?" হৃদয়বান সন্ন্যাসীর অপূর্ব বিচারে, সেবার অনবদ্য আদর্শে সকলে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় নীরব হইতেন। দীর্ঘ রোগভোগেও ক্ষণের জন্য তাঁহার ম্লান মুখ কেহ দেখেন নাই—কোন অভিযোগ বা বিরক্তির লেশমাত্রও কথায় বা চিন্তায় প্রকাশ পায় নাই। তিতিক্ষার জলন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া বিমলানন্দ সহাস্যে ব্যাধি-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। শ্রীগুরুর অভয় করস্পর্শ অনুক্ষণ তিনি অনুভব করিতেন। তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান ছিল যে রোগ শোক সকলই দেহের, তিনি অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মা। দেহের বিনাশ যে অতি আসন্ন, ইহা তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াও বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করেন নাই। শরীরত্যাগের মাত্র এক সপ্তাহ তখন বাকী—হঠাৎ বলিলেন, "আর বড় বেশী দিন দেরী নাই। আমার শরীর কিন্তু প্রত্যূষে যাইবে। রাত্রিতে নহে।" আবার একদিন আশ্রমস্থ সকল সাধু-ব্রহ্মচারীকে কিছু খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। অতঃপর শয্যাশায়ী থাকিয়াই একদিন জনৈক ব্রহ্মচারীর দ্বারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী দুই-এক রকম খাবার প্রস্তুত করাইয়া সাধুসেবা করাইলেন—কত না আনন্দ ও তৃপ্তি সেদিন তাঁহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সেবাযত্ন ও চিকিৎসায় ক্রমে বিমলানন্দের জর ছাড়িল বটে—কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। পরমারাধ্য শ্রীগুরুর সহিত নিত্যমিলনের আনন্দ-চিন্তায় তিনি উত্তরোত্তর নীরোগ বোধ করিতে থাকিলেন—দুবলতা ভিন্ন কোন রোগই তখন তাঁহার দেহে বস্তুতঃ ছিল বলিয়া কাহারও বোধ হইত না। ২৩শে জুলাই (১৯০৮) রাত্রি ২টা পর্যন্ত এইরূপই চলিয়াছিল—ঔষধ ও দুগ্ধ যথানিয়মে পান করিলেন। রাত্রি ৪টা হইতে মনে হইল তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন—অতি শান্ত চরণে বুঝি মহানিদ্রাই তাঁহার চোখে নামিয়া আসিতেছিল। চক্ষুর্দ্বয় মাঝে মাঝে মেলিতেছিলেন—এক আশ্চর্য প্রশান্তি ও উজ্জ্বলতায় মুখশ্রী অধিকতর দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ভোর ছয়টা নাগাদ অস্ফুটে 'ওঁ ওঁ ওঁ' এইরূপ তিনবার উচ্চারণ করিয়া বিমলানন্দ অনন্তকালের জন্য স্ব-স্বরূপে বিলীন

হইলেন। শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী বিরজানন্দ প্রিয়তম গুরুভ্রাতা ও আবাল্য সঙ্গীকে মহাযাত্রার ক্ষণে আর একবার ডাকিলেন—কিন্তু কোন সাড়া মিলিল না, বিমলানন্দ চিরনীরব হইলেন। যতি বিমলানন্দ পাঞ্চভৌতিক দেহ ছাড়িয়া অনন্ত জীবন লাভ করিলেন। মায়াবতী আশ্রমের পাদদেশে প্রবহমান দুই পার্বত্য নদীর সঙ্গমস্থ উপলাকীর্ণ তটভূমিতে তাঁহার দেহ অগ্নিতে অর্পিত হইল। হিমালয়স্থ প্রয়াগভূমিতে প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সম্মুখে গুরুভ্রাতৃগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বিমলানন্দের পরমধামের যাত্রাপথকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ-শিষ্য বিমলানন্দের জীবন সর্বতোভাবেই তদীয় আচার্যের অনুবর্তী ছিল। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বিত আদর্শে উহা গঠিত ছিল—আর এই আশ্চর্য সমন্বয়ানুভূতি তিনি তাঁহার শ্রীগুরুর অলৌকিক জীবন হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর ভাব ও বাণী বিমলানন্দের দৃষ্টিতে কতখানি স্বচ্ছ হইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারই দুই-একটি উক্তি স্মরণ করিলে বেশ উপলব্ধি হয়। তাঁহার স্বানুভূত স্বামিজীর আদর্শ এইরূপ :

"This is the very core of Swamijis teaching—the Selfhood of all—the Divinity of man. And this is, I am fully convinced, the key to his wonderfully versatile nature. He was a lover of all, because he was a *jnani.* And here I must tell you that the fatal illusion under which I had long laboured that *jnana* and *bhakti* are destructive of each other, dispersed in the presence of Swamiji as darkness before the Sun. Swamiji was a tremendous worker because he was a *bhakta* and *jnani.* The tremendous energy that shook the whole world and is still at work awakening many a slumbering soul to its innate Divinity, instilling life into dead bones, bringing sunshine in the darkness of despair and love in dry, arid souls—this tremendous energy owes its origin to his realization of *Brahman* in all. Here too, I must tell you that the fatally erroneous idea that *karma* is antagonistic

to *jnana and bhakti* is dispelled at once by the life of Swamiji."[১] অর্থাৎ, "আত্মতত্ত্ব বা মানুষের দেবত্বের উদ্বোধনই স্বামিজীর সমগ্র শিক্ষার সার কথা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে স্বামিজীর আশ্চর্য উদার প্রকৃতির মূল রহস্যও ইহাই। তিনি জ্ঞানী বলিয়াই এতবড় বিশ্বপ্রেমিক। আর এ কথাও সত্য বলিতেছি যে জ্ঞান ও ভক্তি যে পরস্পরবিরুদ্ধ আমার বহুকাল-পোষিত এমন মারাত্মক ধারণাও, স্বামিজীর কৃপাতেই বিদূরিত হইয়াছে—যেমন সূর্যের উদয়ে সকল অন্ধকারের বিলয় হয়। স্বামিজী মহা কর্মযোগী ছিলেন, কারণ তিনি একাধারে ভক্ত ও জ্ঞানী। যে মহাশক্তি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল এবং আজও যাহা বহু বহু নিদ্রিত আত্মাকে অন্তর্নিহিত দেবসত্তায় জাগ্রত করিতেছে, মৃত অস্থিতে জীবন সঞ্চার করিতেছে, হতাশার অন্ধকারে সূর্যালোকের প্রভা আনিতেছে ও শুষ্ক উষর প্রাণে প্রেম সিঞ্চন করিতেছে—সে শক্তির মূল তাঁহার ঐ সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। একথা আবার স্পষ্ট বলিতেছি যে কর্ম হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধী, এমন সর্বনাশা ভ্রান্তি স্বামিজীর জীবনের স্পর্শে মুহূর্তেই আমা হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে।"......স্বামিজীর ভাবাদর্শের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ অনুভবের ভাষাতেই সম্ভব—বিমলানন্দের প্রাণের ভাষা ইহা। উল্লিখিত কথাকয়টিকে আবার বিমলানন্দের আত্মচরিত কথনও বলা যাইতে পারে। স্বামিজীর এই প্রিয় শিষ্যের স্বল্পায়ু জীবনটি বিচার করিয়া দেখিলে উৎসর্গীকৃত একটি পুষ্পের ন্যায় পবিত্রতা ও প্রেরণার প্রতীক বলিয়া নিশ্চিতই মনে হইবে। ব্যাসকল্প স্বামী সারদানন্দজী শুদ্ধ-সুন্দর এই জীবনকে স্মরণ করিয়াই 'উদ্বোধন'-পত্রে স্বয়ং একদা লিখিয়াছিলেন—"আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরানুরক্ত শিষ্যের এই হৃদয়ের শোণিত দান—এই প্রশংসা-স্বার্থ-বিরহিত অযাচিত প্রেমার্পণ—এই লোকচক্ষু-বহির্ভূত, আড়ম্বরবর্জিত নিঃশব্দ হৃদয়ের পূজার কথা—মানব, তুমি কি বুঝিতে পারিবে? বুঝিবার চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে? হট্টগোলের জগতে মিথ্যা গোলযোগই লোকে করে ও বুঝে। বিমলানন্দ মূর্খের ন্যায় বৃথোদ্যমে শরীরপাত করে করুক—এস, আমরা যাহা করিতেছি তাহাই করি!"

---

১ *Vedanta* **Kesari** (**February 1928**)



স্বামী স্বরূপানন্দ

স্বামী স্বরূপানন্দ

বেলুড়ের মঠ তখন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া বাড়িতে। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। স্থায়ী মঠের জন্য নূতন জমি সবে কিছুদিন হইল কেনা হইয়াছে,—একটি পুরাতন জীর্ণ বাড়ী মাত্র সেখানে আছে। কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য ভক্ত—ধীরামাতা, নিবেদিতা ও জয়া সেখানে থাকেন। স্বামিজী একদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের এই নূতন জমিতে আসিয়া ধীরামাতাপ্রমুখকে দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "We have made an acquisition to-day",—"জান, আজ আমরা একটি রত্ন লাভ করেছি।" সদ্য আগত জনৈক যুবককে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া স্বামিজীর এই আনন্দোচ্ছ্বাস। যুগাচার্য বিবেকানন্দের রত্নকল্প এই সন্ন্যাসি-শিষ্যই স্বামী স্বরূপানন্দ। জ্ঞানে ও কর্মে, তপস্যায় ও তত্ত্বদর্শিতায়, স্বরূপানন্দের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যথার্থই একটি মহামূল্য সম্পদবিশেষ। স্বামিজীর উল্লিখিত মন্তব্যটি নিছক একটি উচ্ছ্বাস-উক্তি নয়, আধিকারিক শিষ্যের প্রতি উহা ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের অমোঘ আশিস্‌-বচন। স্বরূপানন্দের স্বল্পায়ু উত্তরজীবন ইহারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

পূর্বাশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজী ১৮৭১ সালের ৮ই জুলাই, কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-পূজা ছিল, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্‌ভক্তির বীজ তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত ছিল। বৈষ্ণব ভাবধারায় বর্ধিত হওয়ার ফলে, বিনয় ও পরদুঃখকাতরতা অজয়হরির চারিত্রিক সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। আবার গৃহ-পরিবেশের প্রভাবগুণে এই ধারণাই তাঁহার আশৈশব ছিল যে, জগতের প্রতিপালক পিতা শ্রীভগবানই মানুষের পাপপুণ্য সুখদুঃখের নিয়ামক। সংসারের জটিল ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহার শৈশবের এই ধারণাকে উত্তরোত্তর পরিশোধিত করিয়া, অবশেষে অদ্বৈত-তত্ত্বের চরম অনুভূতিতে তাঁহাকে উপনীত করিয়াছিল। কিশোর অজয়হরি একদিন জনবহুল রাজপথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, দরিদ্র এক বৃদ্ধা চোখের জল মুছিতেছে আর রাস্তার ধূলি হইতে একটি একটি করিয়া একমুঠা চাউল খুঁটিয়া তুলিতেছে। জনৈক পথচারীর ধাক্কায় বৃদ্ধার হাতের পাত্রটি পড়িয়া

গিয়া, এত কষ্টের চাউলকণা-কয়টি আবার পথের ধুলায় মিশিয়া গেল। মর্মন্তুদ এই দৃশ্যটি তরুণের বুকে সেদিন এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল। অজয়হরি বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি বসে বসে কি করছেন? এইসব ঘটনাকে কেন তিনি রোধ করছেন না!" সংসারের বাস্তব চিত্রগুলি যতই তাঁহার চক্ষে ধরা দিতে থাকিল, ততই তিনি অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন, এই জগতের মূল রহস্য জানিবার জন্য। দুঃখবিরোধময় এইসব ঘটনাপ্রবাহ তরুণ অজয়হরিকে জগদতীত সত্যের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু অন্তরের বেদনা শরীরের উপরও প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল। সুস্বাস্থ্যের সুখও তাই তিনি কখনও জানিতে পারেন নাই।

অজয়হরির এইকালের অবস্থা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "The Master as I saw Him" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাংলায়[১] এইরূপ: ......এই ধরণের দুটি-তিনটি ঘটনা একবছর ধরে তাঁকে এমন অন্তর্যাতনের মধ্যে রাখল যে, স্বাস্থ্য গেল নষ্ট হয়ে—আর কখনও ভাল স্বাস্থ্য কাকে বলে জানেননি। কিন্তু এই আলোড়ন থেকে তিনি জীবন সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় লাভ করলেন, তা' শান্তি দিল তাঁকে।.........তিনি দেখলেন, এই যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখে থাকি,—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিচার-অবিচারের স্বপ্ন-মাখা এই যে জগৎ-বোধ—এর মূলে রয়েছে আমাদের অজ্ঞান ও অহং। এই মায়াকে জয় করবেন—তিনি স্থির করলেন, প্রত্যয় ও প্রজ্ঞাকে অধিকার করবেন,—বিপরীত বোধসমূহের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি লাভ করে, হিন্দু যাকে মুক্তি বলে সেই স্থায়ী অভেদ চেতনার জগতে উন্নীত হবেন।

"এরপর থেকে সর্বোচ্চ অবস্থালাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন। অতঃপর যে কয়েক বৎসর তিনি পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা এমন কি পরবর্তী বিভিন্ন মঠজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনা অপেক্ষা কঠোরতর ছিল—তা' নানা সূত্রে বোঝা যায়। বহুদিন পরে আলমোড়ায় যখন আমি তাঁর কাছে ভগবদ্‌গীতা পড়েছি, তখন তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম—কী দারুণ তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে ঈশ্বরপ্রেম!"

১ শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু-কৃত 'নিবেদিতা লোকমাতা' হইতে তর্জমা গৃহীত।

অজয়হরি আশৈশব বিদ্যানুরাগী। নিজ প্রতিভাবলে উচ্চশিক্ষা, উন্নত নীতিবোধ এবং মার্জিত রুচির অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল—বৈদিক ধর্ম ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাই তাঁহার উৎসাহ ছিল অপরিসীম। পল্লীর যুবকগণকে একত্রিত করিয়া নৈতিক জীবন গঠনে এবং নানাবিধ সদনুষ্ঠানে প্ররোচিত করিতে তাঁহার উদ্যম তদানীন্তন সমাজে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ-বিষয়ে তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরবর্তিকালে যাঁহার মনীষা ও দেশহিতৈষণা সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। "ভাগবত চতুষ্পাঠী" নামক একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাঁহারা জনসাধারণের জন্য শাস্ত্রচর্চা ও দর্শন-ব্যাকরণাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীতে সুপণ্ডিত সংস্কৃত-অধ্যাপকগণ ইঁহাদেরই প্রযত্নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনহিতকর এইসব কার্যের ব্যয়নির্বাহ হইত—ভিক্ষা ও চাঁদায় লব্ধ অর্থ হইতে। ছাত্র-সমাজের মধ্যে উচ্চ আদর্শের পরিবিস্তার—তজ্জন্য নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগার পরিচালনাও এই চতুষ্পাঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'ডন' (Dawn) নামে একখানি মাসিকপত্রও অজয়হরির সম্পাদনায় এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থও উল্লিখিত বহুবিধ কার্যে ব্যয়িত হইত। পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, অজয়হরির অনুপ্রেরণায় সতীশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ডন সোসাইটি (Dawn Society) প্রতিষ্ঠিত হইলে, 'ডন' পত্রিকা এই সমিতি দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে।[১] তৎকালীন সমাজে আদর্শবাদী 'ডন'-এর প্রভাব সর্বজনবিদিত। ভারতের জাতীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই 'ডন' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অজয়হরি যতদিন গৃহত্যাগ না করিয়াছেন, ততদিন সতীশবাবুর সহিত তিনিও 'ডন' পত্রের যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন।

---

১ Originally, the Dawn was published as an organ of the Bhagavat Chatuspathi, but later it became an organ of the Dawn Society and still later, an organ of the Swadeshi Movement or resurgent Indian Nationalism. The journal was founded by Satish Chandra Mukherjee in 1897 in collaboration with his friend Ajoyhari Banerjee who inspired the former to undertake such a work.

(*The Origins of the National Education Movement*—by Prof. Haridas Mukherjee and Prof. Uma Mukherjee.)

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। বেদান্তের শক্তিপ্রদ বার্তা বিশ্বের দিকে দিকে প্রচার করিয়া স্বামিজী ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে) তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিত্য দলে দলে লোকসমাগম হইতেছে। কতজন কত উদ্দেশ্যে, কত জিজ্ঞাসু কত জিজ্ঞাসা লইয়া স্বামিজীর নিকট আসিতেন। অধ্যাত্মপিপাসু কেহ আসিলে স্বামিজী আহ্লাদে মাতিয়া উঠিতেন, তাঁহারাও শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিতেন। তখন গ্রীষ্মকাল—বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। একদিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে আগত দর্শনার্থীরা ভিড় করিয়া মঠের হলঘরে বসিয়া আছেন—প্রসন্নোজ্জ্বল আয়ত দৃষ্টিতে স্বামিজী সকলকেই দেখিতেছেন এবং নানা প্রসঙ্গাদি করিতেছেন। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সকলেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যসুখ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল—ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হইল। একে একে সকলেই স্বামিজীর চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন—কৃশকায় জনৈক যুবক কিন্তু বাহিরে গেলেন না। তাঁহার বয়স অনুমান ছাব্বিশ হইবে—চোখে মুখে তীক্ষ্ণ মেধার ছাপ। যুবক স্বামিজীর পদপ্রান্তে আসীন হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। শিষ্যের সরল ঐকান্তিকতায় আচার্য মুগ্ধ হইলেন। এই ভাবেই যুবক অজয়হরি স্বামিজীর কৃপাদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিলেন। গুরু-শিষ্যের ইহাই প্রথম মিলন।

অজয়হরির বৈরাগ্যের অনল উত্তরোত্তর এতই তীব্র হইয়া জ্বলিতে থাকিল যে তাঁহার নিকট সামাজিক সর্বপ্রকার কর্তব্যই যেন দুশ্ছেদ্য বন্ধন বলিয়া মনে হইতেছিল। ইতঃপূর্বে তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন। অন্তরের ও বাহিরের উভয় টানে পড়িয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—অন্তরের আকর্ষণই দুর্নিবার বেগে তাঁহাকে অনুপ্রেরিত করিতে থাকিল। স্বামিজী একদিন তাঁহার সংসারত্যাগের ব্যাকুলতা পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করতে পারবে তো? সাপের মুখে যেতে বলবো, অগ্ন্যুদ্গারী তোপের মুখে যেতে বলবো—নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিচারমাত্র না করে অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাই করতে হবে। সুখাভিলাষী হলে হবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখতে পাবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করে বিসর্জন করতে হবে। 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—জেনে ত্যাগ করতে হবে। 'গুরুদেবো' 'আত্মদেবো'

হইয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' জীবন যাপন করতে হবে। পারবে তো ? জেনে শুনে অগ্রসর হও—নতুবা এখনও নিরস্ত হয়ে সংসারে পরিবারাদি নিয়ে যেমন সদ্‌ভাবে এতদিন কাটাচ্ছিলে, সেইভাবে আমৃত্যু থাক।" শ্রীগুরুর মুখে কঠিন উক্তি—বৈরাগ্যবান শিষ্য তথাপি অবিচল রহিলেন। শীর্ণদেহে কি যেন অমিত তড়িৎ-তরঙ্গ বহিতে থাকিল—অজয়হরি সর্বান্তঃকরণে সন্ন্যাস বরণই মনস্থ করিলেন।—স্বামিজীও সানন্দে তাঁহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

অজয়হরির কয়েক সপ্তাহ মঠবাস হইয়া গিয়াছে। অবশেষে একদিন তাঁহার বহুবাঞ্ছিত শুভদিন সমাগত হইল। 'জগদ্ধিতায়' স্বামিজী তাঁহাকে ভগবৎপদে উৎসর্গ করিলেন। স্বামী সারদানন্দজীর অনবদ্য ভাষায় সে ঘটনার বর্ণনা এইরূপ: "অমাবস্যার নিশা অবসানপ্রায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত জগৎ অধিকার করিয়া ক্ষণেকের জন্য মানবের অস্থির মনকে স্বীয় প্রভাবে স্থির করিয়া ভগবৎপ্রেমের পবিত্র নীরে আপ্লুত করতঃ বর্তমান। গুরু বিরজাহোম সমাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শঙ্করাদি ভারতের যাবতীয় আচার্য ও ঋষিকুলপবিত্রীকৃত জ্ঞান-বৈরাগ্যে সমুজ্জ্বল, গৈরিকবসনে শোভিতকায়, মুণ্ডিতশির, ভস্ম ও তিলকে শোভিতললাট শিষ্যও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। স্বামিজী সচ্ছিষ্যকে সস্নেহে উঠাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামী স্বরূপানন্দ নবীন জীবন লাভ করিয়া প্রফুল্লমুখে মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। দেখিলেন উষার রক্তিমচ্ছটায় পূর্বগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে, স্বামিজী তানপুরা মিলাইয়া অপূর্ব স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারতি আরম্ভ হইয়াছে।"[১] স্বরূপানন্দ স্বয়ং তাঁহার ব্যক্তিগত দিনলিপিতে এই দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিলেন,—লিখিলেন, "On 29th March, 1898, Tuesday, A. H. B. became Swarupananda"—আজ ২৯শে মার্চ, ১৮৯৮, মঙ্গলবার অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপানন্দে নবজীবন লাভ করিল।

---

১ 'প্রবাসী', (ফাল্গুন, ১৩১৩)-তে স্বামী সারদানন্দজী লিখিত 'স্বামী স্বরূপানন্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বরূপানন্দকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়া স্বামিজী কতখানি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার একটিমাত্র উক্তিতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রবন্ধারম্ভেই উল্লেখ করা হইয়াছে, স্বরূপানন্দকে পাইয়া যেন তিনি এক মহা মূল্যবান রত্নলাভ করিয়াছেন, আনন্দাতিশয্যে এইরূপ উক্তি করিতেছেন। অন্তর্দ্রষ্টা আচার্যের এই ধারণা শিষ্যের জীবনে যথার্থই সত্য হইয়াছিল ইহা সন্দেহাতীত। স্বরূপানন্দের রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য স্বামিজীর ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁহার জন্য মঠের সাধারণ আহারের অতিরিক্ত বিশেষ বন্দোবস্তও স্বয়ং স্বামিজী করিয়া দিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বরূপের শরীর খারাপ। ডাল চচ্চড়ি সইবে না। একটু দুধের বন্দোবস্ত করে দাও।"

স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণের চারদিন পূর্বে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যা কুমারী মার্গারেট নোবেলকে স্বামিজী ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া ভারতের কার্যের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে নিবেদিতপ্রাণা মার্গারেট তখন ভগিনী নিবেদিতা। স্বরূপানন্দকেই স্বামিজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন নিবেদিতাকে বাংলা শিখাইবার জন্য। স্বরূপানন্দের দিনলিপি হইতে জানা যায়, স্বামিজীর আদেশে তিনি ২৮শে এপ্রিল (১৮৯৮) সকাল হইতে নিবেদিতাকে বাংলা পড়াইতে সুরু করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভগিনী নিবেদিতার অধ্যাত্মজীবনে ধ্যাননিষ্ঠ স্বরূপানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড় কম নহে। তিনি শুধুমাত্র বাংলাভাষার শিক্ষকই ছিলেন না—নিবেদিতাকে অন্তর্জীবনের সাধনাতেও বহুভাবে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন। পরবর্তিকালে ভগিনী স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আলমোড়ায় তাঁহার গীতা পাঠকালে, ভগবৎপ্রেমকে দারুণ তৃষ্ণার সহিত কেন তুলনা করা হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষায় আমি ষোল আনা মন দিয়া ধ্যানের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। তাঁহার এই সহায়তা না পাইলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অবসর একেবারে বিফল হইয়া যাইত।"[১]

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "The Master as I Saw Him" গ্রন্থে স্বরূপানন্দের প্রতি হৃদয় উজাড় করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—বিশেষতঃ ভগিনীর এই

১ ভগিনী নিবেদিতার *The Master as I saw Him*-গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দ-কৃত অনুবাদ "স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" দ্রষ্টব্য।

উক্তিগুলি স্বরূপানন্দ-চরিত্র অনুধাবনের সহায়ক হইবে ভাবিয়া। বাংলা তর্জমায়[১] উহা এইরূপ :

"আমার মহা সৌভাগ্য, এই সময়ে আমি প্রতিদিন বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে তরুণ সন্ন্যাসী স্বরূপানন্দকে পেয়েছিলাম, যার ফলে আমার চতুর্দিকে যে ঘনীভূত ভাব ও অনুভূতির রাজ্য বর্তমান ছিল তার অনুধাবনে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলাম; একাজ সম্ভব হয়েছিল স্বরূপানন্দ ও আচার্যদেবের মনের সংযোগপথে আসতে পেরেছিলাম বলেই, যেমন দর্পণ-সংকেতের কালে বৃহৎ দর্পণ ও ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে অবস্থিত কেউ সংকেতের ভাষা বুঝিতে পারে।"

নিবেদিতার বহু চিঠিতেও স্বরূপানন্দের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। এমন একখানি চিঠিতে[২] তিনি লিখিয়াছেন—"স্বামিজীকে বাদ দিলে স্বরূপানন্দ হলেন তিনজন বাঙালীর একজন, যাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে আমি গর্বিত।" (পত্রের তারিখ ৭ আগষ্ট, ১৮৯৮)

স্বামিজীর প্রিয় ভক্ত ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এবং মাদার সেভিয়ার আলমোড়াতে আছেন তখন। কলিকাতার গরমে স্বামিজীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না, তাই তাঁহারা স্বামিজীকে খুবই অনুনয়বিনয় করিতেছিলেন আলমোড়ায় যাইবার জন্য। স্বামিজী অবশেষে যাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, "তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ আমার সঙ্গে চলুক। স্বরূপের শরীর খারাপ—সেও চলুক।" তদনুযায়ী ১১ই মে (১৮৯৮) বুধবার স্বামিজীর সহিত স্বরূপানন্দও আলমোড়ার পথে যাত্রা করিলেন। এই দলে তুরীয়ানন্দজী ও সদানন্দ ছাড়া নিবেদিতা, জয়া, ধীরামাতা প্রভৃতিও ছিলেন। কলিকাতাস্থ আমেরিকান কন্সাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসনও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ১৬ই মে স্বামিজী সদলে আলমোড়ায় পৌছিলেন।

আলমোড়ায় লালা বদ্রী শাহের "টমসন্ হাউস" নামক বাংলোতে স্বামিজী অবস্থান করিতেছেন। স্বরূপানন্দ এইকালে শ্রীগুরুর অতি নিকট সাহচর্যে বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়া, জীবন-পথের প্রচুর পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত বা অন্যবিধ বহু সমস্যাবলী স্বামিজীর দিব্যজীবন সহায়ে

১ ও ২ শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু-প্রণীত 'নিবেদিতা লোকমাতা' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আশ্চর্যভাবে তিনি সমাধান করিয়া লইতেছিলেন। স্বামিজীর সহিত তাঁহার এই কালের কথাবার্তার কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও,[১] সম্পূর্ণভাবে কখনও প্রকাশিত হইলে দেশের এক মহৎ কল্যাণ হইতে পারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বর্তমান ধর্মান্দোলনের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে ভাবোদ্দীপক অপূর্ব চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য স্বরূপানন্দ এইভাবেই লাভ করিয়াছিলেন। এই যুগধর্মসাধনের পন্থা সম্পর্কে বলিতে বলিতে স্বামিজী একদিন স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন, "Our method is easily described. It simply consists in reasserting the national life......The national ideals of India are Renunciation and Service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself."—"খুবই সহজ পন্থা আমাদের। এক কথায় বলা চলে জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন। ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই দুই ধারাকে ঠিক রেখো, বাকী সব আপনা-আপনি হবে।" নব্যভারতের মন্ত্রগুরুর নিজ মুখে উচ্চারিত এই উক্তি স্বরূপানন্দকে নূতন করিয়া জাতীয় আদর্শবোধে উদ্বোধিত করিয়াছিল ঠিকই। তাঁহার উত্তরজীবনে ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আলমোড়ায় অবস্থান-কালে দুইটি দুঃসংবাদ স্বামিজীকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিল। প্রথম খবর, উটকামণ্ডে প্রিয় অনুচর গুড্‌উইনের দেহত্যাগ, আর দ্বিতীয়, মান্দ্রাজের মহা কর্মি-ভক্ত রাজম্ আয়ারের আকস্মিক মৃত্যু। রাজম্ আয়ার স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদনা ও পরিচালনা করিতে-ছিলেন। ১৮৯৬-এর জুলাই হইতে এই 'প্রবুদ্ধ ভারত' নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু মে (১৮৯৮) মাসেই আয়ারের লোকান্তর গমনে 'প্রবুদ্ধ ভারত' জুন সংখ্যার পরে আর প্রকাশের কোন উপায় থাকিল না। আয়ারের বিয়োগব্যথা স্বামিজীর প্রাণে তাই দ্বিগুণ হইয়া বাজিয়াছিল, কারণ বেদান্ত প্রচারের এতবড় একটি সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, এই প্রচণ্ড আঘাতে স্বামিজীর চিন্তারাশি যে নূতন গতিপথে ছুটিয়াছিল, উহা

---

১ *Prabuddha Bharata*, (Sept. 1898) দ্রষ্টব্য।

তৎপ্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনে সত্যই একটি ঐতিহাসিক ফল আনয়ন করিল। বেদনাহত স্বামিজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেভিয়ার, তুমি ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করবে বলেছিলে। বাংলার জলবায়ু ও গ্রীষ্ম তোমার সহ্য হওয়া অসম্ভব। অতএব তুমি আলমোড়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রটি চালাবার ভার গ্রহণ কর না কেন? কাগজখানার তিন হাজারের উপর গ্রাহক হয়েছে। আমারই পরামর্শে ওর প্রথম মুদ্রণ এবং ক্রমে এই পত্র বেদান্ত-প্রচারের একটা বিশেষ যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ইচ্ছা নয় যে ওটা বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও আমি তোমাকে দিচ্ছি। স্বরূপানন্দের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দের ও তোমার সাহায্যে সে অনায়াসেই এ কাজ চালাতে পারবে।" বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার ধর্মচক্র নবোদ্যমে আবার আবর্তন সুরু করিল। স্বামিজীর আদেশকে সেভিয়ার আশীর্বাদরূপে মাথা পাতিয়া লইলেন। আলমোড়া হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশের ব্যবস্থা হইল—স্বরূপানন্দই উহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীও অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

১৮৯৮-এর আগষ্ট হইতে স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' নব-কলেবরে আত্মপ্রকাশ করিল। আলমোড়ার 'টমসন হাউস'-এ উহার কার্যালয় পুনঃসংস্থাপিত হইল। বর্তমান সংখ্যায় 'To the Awakened India' নামে ইংরেজী কবিতাকারে, স্বামিজী একটি আশীর্বাণী প্রেরণ করিয়া-ছিলেন।[১] ঐতিহাসিক এই আশিস্-কবিতাটি স্বামিজীর অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম। গুড্‌উইনের মৃত্যুতে তাঁহার স্মরণে রচিত স্বামিজীর বিখ্যাত কবিতা 'Requiescat in Peace'ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন—স্বামী সারদানন্দজীর 'The Outlook of Indian Monism' এবং একটি স্মরণীয় শোকবার্তা পাওহারী বাবার মহাসমাধি। "Arise! Awake! And stop not till the goal is reached!"—স্বামিজীর

১ "বীরবাণী" পুস্তকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ কর্তৃক বাংলা কাব্যানুবাদ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' দ্রষ্টব্য।

এই বাণীকেই যাত্রাপথের মূলমন্ত্র করিয়া 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর পথচলা নূতন ছন্দে চলিতে থাকিল।

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, ইহার জন্য একটি স্থায়ী কার্যালয় ও ছাপাখানার অভাব খুবই অনুভূত হইতেছিল। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এই পত্রের পরিচালনার ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, শ্রীগুরুর আদিষ্ট একটি মহৎ ব্রত হিসাবে ইহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে আপ্রাণ যত্নশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ও স্বরূপানন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অবশেষে আলমোড়া হইতে ৫০ মাইল দূরে হিমালয়ের বনময় এক নির্জন প্রদেশে 'মায়ীপট' নামক পার্বত্য ভূখণ্ডটি ক্রয় করা হয়। পাহাড়ী 'মায়ীপট'-এর নূতন নাম হইল মায়াবতী এবং এখানেই ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবসে, স্বামিজীর আকাঙ্ক্ষিত 'অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের প্রধান কার্যালয়ও ঐ শুভদিনে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হইল। একটি ছোট ছাপাখানাও এই সময়ে কেনা হইয়াছিল। সেভিয়ার দম্পতি আশ্রমের পার্শ্বেই একটি পৃথক বাটীতে বাস করিতে থাকিলেন এবং সম্পাদকীয় কার্যালয়, ছাপাখানা ও সাধুকর্মিগণের আবাস ইত্যাদি আশ্রম-ভবনেই সংস্থাপিত হইল। ক্যাপ্টেন ও মাদার সেভিয়ার স্বরূপানন্দকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, স্বরূপানন্দও স্বীয় হৃদয়বত্তা, প্রতিভা ও কর্মকুশলতায় সেই স্নেহের যথার্থ মূল্যই দিয়াছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্র এবং আশ্রমের অধ্যক্ষতা স্বরূপানন্দ অসাধারণ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'প্রবুদ্ধ ভারত' তথা মায়াবতীর ইতিহাসে স্বরূপানন্দের নাম চির অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ তাঁহারই সম্পাদনাকাল হইতে দেশবিদেশের বিদগ্ধ-সমাজে 'প্রবুদ্ধ ভারত' উহার গৌরবমণ্ডিত আসন স্থায়ী করিয়া লইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের উপযোগী একটি শক্তিসম্পন্ন পত্র বলিয়া উহার খ্যাতি তখন হইতেই সর্বজনস্বীকৃত হয়। স্বামিজী স্বয়ং তাঁহার জনৈক শিষ্যকে নিউ ইয়র্ক হইতে একখানি পত্রে একবার (আগষ্ট, ১৯০০) লিখিয়াছিলেন, "স্বরূপকে বলবি আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী। **He is doing splendid work**।"

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন 'হিন্দুস্থান রিভিউ' (**Hindusthan**

Review) পত্রে, পুনা ডেকান কলেজের অধ্যাপক নেলসন্ ফ্রেজার ১৯০৩-এর জানুআরিতে স্বামিজীকে সমালোচনা করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'Swami Vivekananda : A Criticism.'। সুপণ্ডিত অধ্যাপক স্বামিজী সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন। প্রবন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে স্বামিজী সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। পরের মাসেই যুগপৎ উক্ত পত্রের ফেব্রুআরি সংখ্যায় এবং এলাহাবাদের 'কায়স্থ সমাচার' পত্রে স্বরূপানন্দ অধ্যাপক ফ্রেজারের ভ্রান্তি নিরসনার্থে তীব্র প্রতিবাদ মূলক এক প্রবন্ধ লেখেন। 'Swami Vivekananda : A Rejoinder' শীর্ষক তাঁহার জ্ঞানগর্ভ এই প্রবন্ধটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে এপ্রিল সংখ্যাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বরূপানন্দের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অধ্যাপক ফ্রেজার মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করিয়া মাচ মাসেই 'হিন্দুস্থান রিভিউ'তে উহার সম্পাদককে লিখিত একটি চিঠি প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "I write to acknowledge the force of the rejoinder which Swami Swarupananda makes in your February number to my article on Swami Vivekananda. It is clear that I did not do him justice."। স্বরূপানন্দের তেজোদীপ্ত লেখনী 'প্রবুদ্ধ ভারত'-কে যথার্থই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামিজীর বাণী, পত্র, রচনা ও ভাষণাবলী তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' মহাগ্রন্থের শ্রীম-কৃত ইংরেজী অনুবাদও 'Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna' শিরোনামায় এই কালের 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইত। ভগিনী নিবেদিতাও তখন এই পত্রের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন।

স্বরূপানন্দের অধ্যক্ষতাকালেই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামিজীর পদার্পণই মায়াবতীর ইতিহাসে পবিত্রতম স্মৃতি। প্রিয় শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের লোকান্তর গমনের পর স্বামিজী শোকসন্তপ্তা মাদারকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে অসুস্থ দেহেও এই দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া মায়াবতী ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুআরি স্বামিজী মায়াবতীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গী

ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী ও সদানন্দ। প্রায় পক্ষকাল স্বামিজী অবস্থান করেন—এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমবাসী প্রিয় শিষ্যগণের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মনীতি সম্পর্কে অনেক আলোচনাদি করিয়াছেন। স্বরূপানন্দের পরিচালনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' তথা অদ্বৈত আশ্রমের সুষ্ঠু ও সম্ভাবনাময় অবস্থা স্বামিজীকে খুবই প্রসন্ন করিয়াছিল। মায়াবতী হইতে তিনি কি প্রত্যাশা করেন, উহার যথার্থ আদর্শ কি হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামিজী মাতিয়া যাইতেন। শ্রীগুরুর অনুপ্রেরণায় স্বরূপানন্দও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। অনুগত সৈনিকের ন্যায় স্বামিজীর কাছে বিনীত-ভাবে বলিয়াছিলেন, তিনি সদাই প্রস্তুত—শ্রীগুরুর অভিপ্রায় মনেপ্রাণে সফল করিতে তিনি নিত্য নিয়ত তৈয়ার।

'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদন এবং আশ্রম পরিচালনের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়াও স্বরূপানন্দের পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়টি কিন্তু কখনও শুকাইয়া যায় নাই। চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়ী জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহার বেদনার অবধি ছিল না। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে চিকিৎসা নাই—দুঃসহ এই অবস্থা বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বরূপানন্দকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীগুরুর অনন্ত হৃদয়বত্তা শিষ্যের জীবনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনীয় কৃষিশিক্ষা প্রদানের নানা উপায় চিন্তা করিয়া, উহাকে কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়তায় পার্বত্য-অঞ্চলে কৃষিবিদ্যা প্রচারের জন্যও তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পাহাড়ী বালকদিগের জন্য জঙ্গলাকীর্ণ মায়াবতীতে এবং শোর গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন স্বরূপানন্দেরই আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রযত্নে সম্ভব হইয়াছিল। মায়াবতীতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাও তাঁহার আর এক স্মরণীয় কীর্তি। শত শত দুঃস্থ পীড়িত পাহাড়ী আজও বিনা ব্যয়ে এখান হইতে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আশ্রমের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত পাহাড়ী যুবকগণকে হিন্দী ও ইংরেজী শিখাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। দুর্গম পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময় ও ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে হিমাচলে বাঙ্গালী-উপনিবেশ সংস্থাপনের দুরূহ কার্যেও স্বরূপানন্দ হাত দিয়াছিলেন। কখনও কখনও তিনি সুদূর নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি

স্থানে গিয়া অবস্থান করিয়া পাহাড়ী জনগণের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করিতেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। স্বরূপানন্দ ঐ সময়ে তীর্থদর্শনোপলক্ষে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু জয়পুর পর্যন্ত আসিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের দুরবস্থার সংবাদে তাঁহার সকল সংকল্পের পরিবর্তন হইল। গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের সঙ্গেও অপ্রত্যাশিতভাবে জয়পুরে দেখা হইয়া যাওয়ায় উভয়ে একত্রে কিষণগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দুর্গত নারায়ণের সেবায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি আশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর এখানে সেবাকার্য চলিয়াছিল।

হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের পীড়িত ও বৃদ্ধ সাধুদের সেবার জন্য স্বামিজী শিষ্য কল্যাণানন্দকে আদেশ দিয়াছিলেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসী কল্যাণানন্দ গুরুর আশীর্বাদ মস্তকে বহন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে মায়াবতীতে প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজীর অভিপ্রায় শুনিয়া স্বরূপানন্দও অনুপ্রাণিত বোধ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া কল্যাণানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৈনিতালের পথে বাহির হইয়াছিলেন। নৈনিতালে তাঁহারা দেড়মাস কাল দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষা-লব্ধ অর্থ দ্বারাই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হরিদ্বারের নিকট কনখলে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাসে কল্যাণানন্দের নাম চিরউজ্জ্বল —কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে স্বরূপানন্দের উৎসাহ, উদ্যম ও অনুপ্রেরণা লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিলেও অবিস্মরণীয় সত্য। মিশন-পরিচালিত সেবায়তনগুলির মধ্যে কনখলের এই সেবাশ্রম আজ যথার্থই একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে স্বরূপানন্দ প্রায় তিনমাস এলাহাবাদে বেদান্তপ্রচারে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত-বিষয়ক ভাষণ স্থানীয় জনসাধারণের চিত্তে এমনই রেখাপাত করিয়াছিল যে, তাহারা উত্তরোত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া এলাহাবাদে একটি স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজনও করিয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাংড়া জেলার ধর্মশালায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। স্বরূপানন্দ

তখনও সেবাকার্যের জন্য অর্থভিক্ষাদি করিয়াছিলেন এবং বিপন্নদের সহায়তা করিতে আশ্রম হইতে গুরুভ্রাতা নির্ভয়ানন্দ ও জনৈক ব্রহ্মচারীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেবা ও সাধনার একটি সুন্দর সমন্বয় স্বরূপানন্দের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহুবিধ কর্মের মধ্যেও নিয়মিত ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রালোচনায় তিনি কখনই বিরত হন নাই। কর্মমুখর দিবাবসানে হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় যখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিত, স্বরূপানন্দও তখন আত্মচিন্তায় উদ্যোগী হইতেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী একটি দণ্ডমাত্র হাতে লইয়া আশ্রমের কিঞ্চিৎ দূরে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইতেন। একান্তে ধ্যান-জপ করিবার উদ্দেশ্যে নির্জন এই বনভূমির মধ্যে তাঁহার একটি কুঠিয়া ছিল। একবার গভীর নিশীথে ধ্যানান্তে আশ্রমে ফিরিবেন বলিয়া কুঠিয়া হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, একটি বাঘ মুখব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে। মাদার সেভিয়ার এই ঘটনা শুনিয়া স্বরূপানন্দকে ঐরূপ গভীর অরণ্যে রাত্রে ধ্যান-ধারণাদি করিতে নিষেধ করেন। পরে তাই আশ্রমসংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ একটি নির্জন স্থানে তিনি নূতন একটি কুঠিয়া নির্মাণ করেন। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই কুঠিয়াতে তিনি ইচ্ছামত ধ্যানজপ করিতেন—স্বাধ্যায়-বেদান্তালোচনায় নিমগ্ন হইতেন। মায়াবতীতে স্বরূপানন্দের সাধন-স্মৃতিজড়িত সেই জীর্ণ কুটিরটি আজও মৌন সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিথর রজনীতে নগাধীশের গম্ভীর-প্রশান্ত শিখরগুলি যখন চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে অভিস্নাত হইত—অন্তর্মুখ স্বরূপানন্দের চিত্তে তখন যোগেশ্বর শিবেরই ছবি ভাসিয়া উঠিত, অনন্তের উদ্দীপনায় তিনি পুলকিত হইতেন। বিরাটের মহিমাবোধের আনন্দে কখনও কখনও তিনি গুরুভ্রাতাদের লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্রহ্মপ্রাণ স্বরূপানন্দের হৃদয়ে কতই না ভাবের তুফান তুলিত!

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের জন্য তাঁহার উদ্যমের সীমা ছিল না। বিশেষতঃ যুবক ও ছাত্রসম্প্রদায় যাহাতে এই যুগধর্মকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়, তাহার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। নৈনিতাল, আলমোড়া, এলাহাবাদ, কলিকাতা, যেখানেই যখন যাইতেন, সর্বত্রই ছাত্র ও যুবকসমাজের

মধ্যে গিয়া নানাভাবে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নিহিত রহিয়াছে। হায়! এখন তাহারা যশ, মান, রাজনীতি প্রভৃতির বৃথা হুজুগে কিছুকালের জন্য উন্মত্ত হইয়া উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত সংসারে মগ্ন হইতেছে। কবে তাহারা দেশের জন্য যথার্থ ত্যাগধর্ম শিখিবে?" ত্যাগের আদর্শে সর্বদাই তিনি যুবকগণকে অনুপ্রেরণা দিতেন।

স্বরূপানন্দের গুরুভক্তি সত্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ। স্বামিজীর অতি নগণ্য শিষ্যরূপে নিজেকে পরিচিত করিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ গৌরববোধ ছিল। একবার যখন তিনি কিষণগড়ে অবস্থান করিতেছেন, তখন তথাকার দেওয়ান তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট স্বরূপানন্দের পরিচয়কালে ভুলক্রমে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মহাত্মা বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। গুরুভক্ত স্বরূপানন্দ তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানাইয়া সংশোধন করিয়া দিলেন, "আমি স্বামী বিবেকানন্দের একজন অতি নগণ্য শিষ্য ও অনুগত সেবকমাত্র।" দেওয়ান বাহাদুর এই আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাও ইহাতে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই দেওয়ান সাহেবই স্বরূপানন্দকে দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ জানাইয়া তথায় সমবেত রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। বরোদার মহারাজাও সেখানে স্বরূপানন্দের সদালাপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তদবধি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও স্বামিজীকে তিনি কিছুকাল বরোদারাজ্যে অবস্থান করিয়া ধর্মপ্রচারে আহ্বানও জানাইয়াছিলেন। স্বরূপানন্দের এক পত্রে এই সংবাদ জানিয়া মঠ হইতে উত্তরে স্বামিজী স্বয়ং লিখিয়াছিলেন (১৫ই মে, ১৯০১), "প্রিয় স্বরূপ, নৈনিতাল হতে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ।...যদি বরোদার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করলে সত্যিকারের কোন কাজ হয়, তবে আমি যেতে রাজী আছি" ইত্যাদি। স্বামিজী তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করিয়া সবে মাত্র ফিরিয়াছেন—শরীর খুবই ক্লান্ত ও ভগ্ন। তাই শেষ পর্যন্ত মহারাজের আমন্ত্রণ রক্ষা করা হইয়া উঠে নাই।

স্বরূপানন্দের আর একটি ঐতিহাসিক গৌরবমণ্ডিত উদ্যম,—স্বামিজীর গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন। ইহার কিছু কিছু মুদ্রণও তিনি আরম্ভ করিয়া

গিয়াছিলেন, যদিও বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ থাকায় এই কার্য তিনি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রচণ্ড কর্মপ্লাবনের মধ্যেও স্বরূপানন্দের শাস্ত্রচর্চার অভ্যাস কখনও বিঘ্নিত হয় নাই। তাঁহার অনূদিত ইংরেজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিদগ্ধমণ্ডলীতে আজও সমাদৃত। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁহার লিখিত বেদান্তবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সত্যই মনীষার পরিচায়ক। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) একবার তাঁহাকে আমেরিকাতে বেদান্তপ্রচারের জন্য লইয়া যাইতে আগ্রহ করিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে স্বরূপানন্দকে খুব উৎসাহ দিয়া তিনি পত্রাদি লিখিতেন। একখানি পত্রে দেখা যায়, তিনি লিখিতেছেন, "এখানে অনেক পিপাসী, আসবে ত বল যোগাড় করি।...এখানে অনেক কাজ আছে।...যদি রাজী হও ত আমি চেষ্টা করি। চলে এস, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ভারতের কার্য ছাড়িয়া স্বরূপানন্দ বিদেশে যাইতে সম্মত হন নাই।

মায়াবতীর কর্মভার গ্রহণের পর স্বরূপানন্দ মাত্র দুইবার বাংলাদেশে নামিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই দ্বিতীয় এবং শেষবার তিনি বেলুড়ে আসেন। মাদার সেভিয়ারের সঙ্গে মায়াবতীরই কর্মপ্রসঙ্গে তখন আসিয়াছিলেন। এই সময়েই কলিকাতার চিকিৎসকগণ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার আভাস পান। কলিকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধ-পথ্যাদি ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ সবল হইলে, তিনি পুনরায় মায়াবতীতে ফিরিয়া যান। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের ক্রমবর্ধমান কর্মপরিধি মাদার ও স্বরূপানন্দকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল তখন। লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন মায়াবতীর দুর্গম প্রদেশ অপেক্ষা আলমোড়া বা নৈনিতাল অঞ্চলে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হইলে স্বামিজীর প্রকল্পিত বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টা আরও সুষ্ঠু ও সহজভাবে সম্পাদন করা যাইতে পারে—এইরূপ একটি চিন্তা তখন তাঁহাদের মাথায় ছিল। এই চিন্তাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন, স্বরূপানন্দ আলমোড়া হইয়া নৈনিতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। স্বরূপানন্দ নৈনিতালে গিয়া লালা অমরশাহের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পথে এত জলবৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন যে, অমরশাহের গৃহে আসিয়া পরের দিন হইতেই সর্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কর্মযোগী স্বরূপানন্দ কিন্তু তখনও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। গুরু

বিবেকানন্দের আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারই পদপ্রান্তে বসিয়া সমাগত জিজ্ঞাসু সজ্জনদের নিকট অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন। লোককল্যাণব্রতী সন্ন্যাসী নিজের দেহকে এইভাবে দিনের পর দিন তুচ্ছ করিয়া অহর্নিশ ভগবদালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এদিকে ব্যাধির আক্রমণ প্রবলতর হইয়া ক্রমে নিউমোনিয়া দেখা দিল। ২৬শে জুন স্বরূপানন্দের কথা বলিবার শেষ শক্তিটুকুও বুঝি নিঃশেষিত হইয়া গেল। লালা অমরনাথ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ আপ্রাণ সেবা করিতে লাগিলেন—স্থানীয় চিকিৎসকমণ্ডলীও যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ২৭শে জুন (১৯০৬) বেলা দুই প্রহরের সময় স্বামী স্বরূপানন্দ মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন। স্বামী সারদানন্দজী এই ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[১]—"ফুল ফুটিয়াছিল—ভ্রমরও মধুলোভে নিত্য সমাগত হইতেছিল—কিন্তু সহসা নীহারপাতে শুষ্ক হইয়া গেল। অয়ি দেবি জগন্মাতঃ, তুমি কি সে অপূর্ব প্রসূনের মহিমা নরলোকে বুঝিবে না বলিয়া নিজ কেশে ধারণ করিয়া তাহার গৌরব বর্ধিত করিলে?"

'প্রবুদ্ধ ভারত' সেপ্টেম্বর (১৯০৬) সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতা এক শোকলিপি[২] প্রকাশ করিলেন: "গভীর বেদনার সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের মহাপ্রয়াণ সংবাদ জানিলাম। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা কতোখানি হারাইলাম—সন্থ বিয়োগের এই পটভূমিকায় উহা এখনই বলা সম্ভবপর নহে। যদিও জানি, এ ক্ষতি অপূরণীয়।......স্বামী স্বরূপানন্দকে আমাদের মতো যাঁহারা জানিতেন, বিরাট সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত এই মহান্ জীবনকে অনুধ্যান করিতে গিয়া, তাঁহাদের পক্ষে চিন্তা করা অসাধ্য যে, মৃত্যুতে সে-জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। গভীর প্রশান্তি ও নৈঃসঙ্গের দ্বার আজ উন্মুক্ত। পরমাত্মার মিলন-আকাঙ্ক্ষী বরেণ্য সেই আত্মা, আজ তাঁহার চিরঈপ্সিত ধামে উপনীত। চরম আত্মত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর মহাসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নব জন্মে অভ্যুদয় লাভ করিবে —পরিপূর্ণ তেজে, নবীন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখনই মর্ত্যের মানুষের জন্য তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন দেখা দিবে।"

---

১ স্বামী সারদানন্দ লিখিত প্রবন্ধ 'স্বামী স্বরূপানন্দ।' (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৩)

২ 'In Memoriam'-এর ভাবানুবাদ।

মাত্র আট বৎসরের সন্ন্যাস-জীবনে যুগাচার্যের আদিষ্ট কর্মপরিণত বেদান্তকে স্বরূপানন্দ যেভাবে নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাহাতে স্বামিজীর অন্যতম উত্তরসাধকরূপে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। একদা স্বামিজী তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ স্বরূপ, আমি যার মাথায় হাত রেখেছি,—তার কোন ভাবনা নেই। এ-কথা তুমি নিশ্চিত জেনো।" শ্রীগুরুর অজস্র আশীর্বাদ ও স্নেহের অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুআরি, কাশী হইতে স্বামিজী তাঁহার প্রিয়শিষ্য স্বরূপকে যে দীর্ঘ তত্ত্বপূর্ণ পত্র দিয়াছিলেন, উহার সমাপ্তিতে লিখিয়াছিলেন, "বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মনে সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। আমি এ বিষয়ে যে একটু আধটু আলোক পেয়েছি, তা বিশেষভাবে বুঝাবার পূর্বেই আমার শরীর যেতে পারে, কিন্তু কিভাবে এ-বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে, তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে ও তোমার গুরুভাইগণকে উহা কার্যে পরিণত করতে হবে। তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।" আচার্যের এই আদেশ ও আশীর্বাদ স্বরূপদর্শী স্বরূপানন্দের মধ্যে সত্যই মূর্তিধারণ করিয়াছিল। স্বামিজীর বহু-ঈপ্সিত বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ যে কী, তাহা স্বরূপানন্দকে দেখিলেই যে-কোন ব্যক্তির সহজে ধারণা হইত—ইহার জন্য কোন বিচার-বিশ্লেষণের আবশ্যক হইত না। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর একটি সুন্দর মন্তব্য[১] এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য :

"আমি গিয়েছিলুম তখন হিমালয়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে। সেখানে দেখলুম সেই 'অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল' ভারতবর্ষকে আমার, সেই 'শুভ্র তুষার কিরীটিনী' মাকে আমার। আহা কি সুন্দরী! চোখের সামনে ঝকঝক ঝকমক করছে কেদার ও বদ্রীনারায়ণের শৃঙ্গ। এই তুষার-প্রাচীরের উপরে অন্যান্য বর্ষ, অন্যান্য সভ্যতা; এপারে চিরসনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত-সভ্যতা, যা বেদমন্ত্রে মুখরিত হয়ে ভারতের গগন আচ্ছন্ন করেছিল, ঐ পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে

---

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, 'ভারতী'-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' দ্রষ্টব্য। সরলাদেবী স্বামিজীকেও দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখা স্বামিজীর কয়েকখানি মূল্যবান পত্র 'পত্রাবলীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

আজও কি তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে না? ঐ উপত্যকা-ক্রোড়োত্থিত মেঘপুঞ্জ চিরঞ্জীব ঋষিদের হোমাগ্নিধূমে কি আজিও ধূমায়িত নয়?...এখানে দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ—যাঁর সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামীয় অতি উচ্চাঙ্গের একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করছেন, ব্রহ্মচারীদের জন্য বেদান্ত ক্লাসে নিয়মিত অধ্যাপকতা করছেন, আবার তিনিই অন্য সময়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সৎকারের ত্রুটি না হয় বলে আশ্রমের ভাণ্ডারগৃহ থেকে চাল, ডাল, আটা, কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি বের করে রৌদ্রে শুখতে দিচ্ছেন, নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার ভাণ্ডারে তুলছেন। কোন কর্মই তাঁদের পক্ষে অবহেয় নয়। ধীরে ধীরে আমার মনে অনুপ্রবেশ করল যে, এই হল জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়; এঁদের এই গৃহস্থতুল্য কর্মের ভিতর গৃহস্থের স্বার্থপরবশতা নেই, শুধু কর্তব্যের ও পরসেবার অনুপ্রেরণা রয়েছে।"...

মায়াবতী তথা হিমালয়ের পটভূমিকায় বেদান্তনিষ্ঠ স্বরূপানন্দের একটি প্রাণবন্ত আলেখ্য লেখিকার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বরূপতঃ স্বরূপানন্দ ছিলেন বিবেকানন্দেরই পদানুবর্তী, তাইতো তাঁহার জীবনালেখ্য আজও এত মহিমোজ্জ্বল।

স্বামী প্রকাশানন্দ

স্বামিজী একদা সস্নেহে তাঁহার কোন সন্ন্যাসি-শিষ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "বৎস, প্রভুর কাজে আমি প্রাণপাত করিতেছি। তোমার জীবনও সেই কার্যে উৎসর্গ কর। আরও কত জীবন ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গেই এক মহান্ ব্রত সংসিদ্ধ হইবে।" যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি বর্ষিত হইয়াছিল যুগাচার্যের অমোঘ স্পর্শে তাঁহার জীবন যে ভগবৎ-কার্যে উৎসর্জনের এক মহৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? স্বামী প্রকাশানন্দের জীবনে তদীয় আচার্যের উল্লিখিত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীগুরুর এই আহ্বানই বুঝি তাঁহার সমগ্র জীবনকে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছিল—প্রভুর কার্যেই তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দের পূর্বনাম সুশীলচন্দ্র। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী সম্ভ্রান্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুশীলচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী ছিল কলিকাতায় সার্পেনটাইন লেনে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ঐ বাড়ীতেই সুশীলের জন্ম হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মপ্রাণ এই চক্রবর্তী বংশের দুইটি কৃতী সন্তানই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুইজন বিশিষ্ট পতাকাবাহীরূপে জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুশীলের অগ্রজ সুধীরও স্বামিজীর প্রিয় সন্তান স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পঞ্চম মঠাধীশরূপে মহনীয় হইয়াছেন। বংশের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্ম-সংস্কারের ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই। প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী সুশীল স্বগৃহের এই স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন। বালকের জীবনে ধর্মের বীজ তাঁহার জননীই উপ্ত করিয়াছিলেন —মাতৃক্রোড়েই তাঁহার প্রথম ধর্মশিক্ষা শুরু হইয়াছিল। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি মায়ের মুখে বা মাতৃস্থানীয়া বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়াদের নিকট শুনিয়া সুশীল মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হইতেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর সুধীরের প্রভাবও কনিষ্ঠের উপরে বড় কম ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই উভয় ভ্রাতার জীবন-লক্ষ্য উত্তরোত্তর একই দিকে নির্দিষ্ট হইতেছিল। সংসারে ইহাও এক অসাধারণ ঘটনা বলা যায়।



স্বামী প্রকাশানন্দ

ছাত্রজীবনে সুশীলের এমন কয়েকজন বন্ধু জুটিয়াছিল যে, তাঁহারাও যথার্থই ধর্মবন্ধু ছিলেন। চরিত্রবান ধর্মনিষ্ঠ সহপাঠীদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অগ্রজ সুধীরের সর্বতোভাবে অনুগামী ছিলেন অনুজ সুশীল—তাই ক্রমে দাদার বন্ধুরাই তাঁহারও বন্ধু হইয়া উঠিলেন। কালীকৃষ্ণ, বিমল, হরিপদ, গোবিন্দ শুকুল—যাঁহারা পরে যথাক্রমে বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, বোধানন্দ ও আত্মানন্দ নামে স্বামিজীর বিশিষ্ট শিষ্যরূপে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুধীরের অন্তরঙ্গ বলিয়া সুশীলেরও পরমপ্রিয় সঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা সকলে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন—সুশীল বয়সে কিছু ছোট বলিয়া দুই শ্রেণী নীচে পড়িতেন। যুবকদের অনেকেই যখন রিপন কলেজে পড়িতেছিলেন তখন হইতেই তাঁহাদের ভজন-সাধন, সাধুসঙ্গ, ধর্মচর্চা ইত্যাদিতে নিয়মনিষ্ঠা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'কার 'শ্রীম' তখন রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক। মাষ্টার মহাশয়ের অত্যুজ্জ্বল জীবনালোকে,এই দলের অপরাপর তরুণদের মতো সুশীলের পথ-অন্বেষণও যে অনেকখানি সহজ হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। মাষ্টার মহাশয়ই এই অধ্যাত্ম-পথান্বেষীদের বরাহনগর মঠের পথ চিনাইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানদের সাহচর্যলাভের ইঙ্গিত ও প্রেরণা সুশীল ও তাঁহার সঙ্গীরা 'শ্রীম'র নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও ইঁহারা কলেজ-জীবন হইতেই পরিচিত ছিলেন—কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার সঙ্গও ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই। আদর্শবাদী এই যুবকদলের নেতা ছিলেন খগেন্দ্রনাথ—পটলডাঙ্গায় ছিল তাঁহাদের বাড়ী। খগেনদের বাড়ীই ছিল সুশীলদের প্রধান আড্ডা—মিলনস্থান।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলীর তপস্যা ও ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা সুশীলকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। স্কুলের অবসরে বা ছুটির দিনে দাদা সুধীরের সঙ্গে বা অন্য কোন সঙ্গীদের সাথে তিনি কলিকাতা হইতে পদব্রজে বরাহনগর মঠে যাইতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এই তরুণদের খুব স্নেহ-যত্ন করিতেন। সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, শান্ত-সুশীল মধুর-ভাষী বালক মঠের সকলেরই বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মঠের দালানের একপ্রান্তে বসিয়া স্বামী যোগানন্দজীর সঙ্গে তাঁহাদের অনেক প্রসঙ্গ

হইত। যোগেন মহারাজ ছেলেদের খুবই স্নেহ করিতেন, ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে কতই না অনুপ্রেরণা দিতেন! বালক সুশীল মুগ্ধচিত্তে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে যোগেন মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন আর সব কয়টি কথাকে অতিশয় বিজ্ঞের মতো শোনামাত্র একেবারেই ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেন। উচ্চতত্ত্বমূলক কোন প্রসঙ্গকে বালক তৎক্ষণাৎ ঠিক ঠিক ধরিতে সক্ষম না হইয়া, বালকোচিত চপলতায় যোগেন মহারাজের কথার মধ্যেই কিছু একটা বলিয়া বসিতেন। যোগেন মহারাজ সস্নেহে বলিতেন, "তুই ছোঁড়া তো বড্ড বোকা!" ধমক খাইয়া সুশীল কিছুটা অপ্রতিভ হইয়া আবার স্থির হইয়া বসিতেন। দলের অন্য ছেলেরা তখন খুব মজা করিয়া হাসিতেন।

কলেজে পড়িবার সময় হইতেই সুশীলের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন আলোচনার ঝোঁক প্রবল হইয়াছিল। সমভাবের বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া নানা দার্শনিক তত্ত্বাদি নিয়মিত চর্চা করিতেন। আবার সন্ধ্যার দিকে একাকী কোন নিভৃত স্থানে অথবা বন্ধু খগেনদের বাড়ীতে বা কালীকৃষ্ণদের বাটীর উদ্যানে ধ্যান-ধারণা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করাও একটি প্রাত্যহিক অভ্যাস হইয়াছিল। এইভাবে উত্তরোত্তর সুশীলের মনের অন্তর্মুখীনতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইতোমধ্যে ১৮৯১।৯২ খ্রীষ্টাব্দে খগেনপ্রমুখ দুই একজন বন্ধুকে লইয়া সুশীল জয়রামবাটীতে গিয়া জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। জননীর অপার্থিব স্নেহ-করুণায় সুশীলের মনঃপ্রাণ ভরিয়া উঠিল—সম্ভবতঃ এই সময়ে বা পরে অন্যকোন সময়ে তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে মহামন্ত্রও লাভ করিয়াছিলেন।[১] দীক্ষালাভ করিয়া সুশীলের জীবনে অধ্যাত্ম-সাধনার গতিবেগ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—যদিও, এই দীক্ষালাভের কথা সঙ্গীদের নিকট বহুকাল তিনি গোপনই রাখিয়াছিলেন।

দলের একজন প্রধান সঙ্গী কালীকৃষ্ণ ইতোমধ্যেই গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে চলিয়া গিয়াছেন। তবে হঠাৎ তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, শ্রীশ্রীমার আদেশমতো শরীর সারাইবার জন্য পুনরায় কিছুদিনের

১ "We received our first initiation from the Holy Mother, and our last initiation—Sannyasa—from Swami Vivekananda." (১৯২৭-এর ১৬ই ফেব্রুআরি স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত স্বামী প্রকাশানন্দ-স্মৃতিসভায় স্বামী বোধানন্দজীর ভাষণ হইতে উদ্ধৃত।)—*Prabuddha Bharata*, June, 1927.

জন্য গৃহে আসিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকাল তখন। কালীকৃষ্ণকে পাইয়া সুশীলের আনন্দের অবধি ছিল না। এতদিন মঠে মহাপুরুষদের পুণ্যসাহচর্যে বাস করিয়া কালীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম-পথের পাথেয় অনেক সঞ্চয় করিয়াছেন। বাড়ীতে থাকিলেও রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণাদিতেই তাঁহার সময় কাটিত। সুশীল ও আর আর বন্ধুরা নিত্য বৈকালে এখন হইতে কালীকৃষ্ণের কাছে যাইতেন এবং তাঁহার মুখে মঠের সাধুদের তথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঠাকুরের পরমভক্ত, স্বামিজীর একান্ত অনুরাগী ও মঠের সাধুদের অকুণ্ঠ হিতৈষী শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষও কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতে এই বৈকালিক আলোচনাচক্রে সুশীলদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিতেন। স্বামিজী ইঁহাকেই 'হুটকো গোপাল' বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন। হুটকো গোপালের মুখেও শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর-লীলার কত কাহিনী সুশীলরা শুনিতেন, আর ভাবে আত্মহারা হইতেন। এইভাবে যতই দিন যাইতে লাগিল, সুশীলের মন যেন ততই অনন্তের পানে ধাবিত হইতে থাকিল—কোন অজানা এক আকর্ষণ যেন সর্বদাই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেন। সংসারের বন্ধন যেন ক্রমশঃই শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে থাকিল।

স্বামিজীর কথা তখন কলিকাতার আকাশে বাতাসে ভাসিতেছিল। বিদেশে তাঁহার বেদান্তপ্রচারের নানা অলৌকিক কাহিনী, তাঁহার বক্তৃতা ও বাণী তখন সংবাদ পত্রগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। সুশীল ঐসব পড়িয়া এবং নিয়মিত আলোচনা করিয়া জীবনে এক ঐশী প্রেরণা বোধ করিতে থাকিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন-রাত্রি ঐ একই প্রসঙ্গ—একই চিন্তা। ক্রমে স্বামিজীই সুশীলের ধ্যান-জ্ঞান হইলেন। মানসিক চিন্তাপ্রণালী এমনই এক নবীন দিক বাছিয়া লইল যে, সুশীলের পক্ষে আর ঘরে থাকা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। অথচ তখন আসন্ন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমার নিকট এই মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি সুশীলকে বৈরাগ্য-অবলম্বনের পথেই আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। মার আশিস্ লাভ করিয়া অবশেষে বিবেকানন্দ-বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট সুশীল সহসা একদিন ক্ষুদ্র সংসারগৃহ হইতে ঠিকরাইয়া উদার উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। তখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ—সম্ভবতঃ সেদিন ছিল ঝুলন-পূর্ণিমা। সুশীল আলমবাজার

মঠে আসিয়া যোগদান করিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনে গিয়া তপস্যারত স্বামী প্রেমানন্দজীর পবিত্র সঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া তিনি তীর্থপর্যটনাদি করিতে থাকেন। ১৮৯৭-এর ফেব্রুআরিতে, স্বামিজী পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া মঠে ফিরিয়াছেন। সুশীলের জীবনারাধ্য স্বামিজী,—এতদিন তো তাঁহারই ধ্যানে ও প্রতিক্ষায় সুশীল কালযাপন করিতেছিলেন। মঠে আসিয়া স্বামিজীর দিব্য সান্নিধ্যে সুশীলের অন্তরে বহু-আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক আনন্দের বন্যা যেন ছুটিয়া চলিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বামিজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন।—সুশীলের সুশীল স্বভাব আচার্যের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল। মঠে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই স্বামিজী যে চারজনকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন—সুশীল তাঁহাদের অন্যতম। স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দের সহিত সুশীলও ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের নিকট হইতে ত্যাগিকুলের পরমবাঞ্ছিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, স্বামী প্রকাশানন্দ নামে নবজন্ম লাভ করিলেন। "সন্ন্যাস না হলে কেউ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না। ত্যাগ ভিন্ন ভক্তি-মুক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সেদিন স্বামিজীর মুখোচ্চারিত এই বাণী ত্যাগী প্রকাশানন্দকে কতখানি উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার মুখে চোখে দেহে প্রাণে যে অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ জাগাইয়াছিল উহার বর্ণনা কে করিবে? তবে ইহাই সত্য যে, গৈরিকশোভিতকায় স্বামী প্রকাশানন্দ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রের সাধনে সেইদিন হইতে সর্বতোভাবে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন।

স্বামিজীর অগ্নিময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া—তাঁহার পদপ্রান্তে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থানের সুযোগ লাভ করিয়া, প্রকাশানন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের অতি আশ্চর্য প্রকাশ হইতে থাকিল। যুগাচার্যের ভাবরাশি প্রকাশানন্দের মধ্যে উত্তরোত্তর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। অচিরেই তিনি স্বামিজীর অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য বলিয়া সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৮-এর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনে স্বামিজী যখন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পাদবন্দনা করিয়াছিলেন—মাতৃচরণমূলে সেদিনও তিনি স্বামিজীর পশ্চাৎ-অনুসরণকারী ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং বিমলানন্দও তথায় স্বামিজীর সঙ্গী ছিলেন। সেদিনের স্মৃতি প্রকাশানন্দের মানসপটে চির অম্লান ছিল। স্বামিজী ভূলুণ্ঠিত দেহে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, মা ডান হাতখানি স্বামিজীর মাথায় রাখিয়া

আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। জননীর কাছে স্বামিজী সকৌতুক অভিমানভরে সেদিন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মা এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত যেত বলে সে শাপ দিলে, 'তিনদিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।' আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।" মা তাঁহার আদরের ছেলের অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য যতই না কেন বুঝাইতেছেন যে, ঠাকুর তো ভাঙ্গিতে আসেন নাই, সব বিদ্যা মানিতে হয়, ইত্যাদি,—স্বামিজী কিন্তু কিছুতেই মানিতে রাজী হইতেছেন না। অবশেষে মা সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা!" তুষার মৌলী উন্নতশির পর্বত সহসা গলিয়া ফাটিয়া অশ্রুর বন্যা আনয়ন করিল। সজল চক্ষে স্বামিজী পুনঃ পুনঃ মাতৃচরণে প্রণাম জানাইলেন। একটি স্বর্গীয় অথচ ঐতিহাসিক দৃশ্য।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অপর আর একটি পটভূমিকাতেও প্রকাশানন্দকে স্বামিজীর পার্শ্বে দেখি আমরা। ইহাও ১৮৯৮-এর ঘটনা। হাওড়া রামকৃষ্ণপুরস্থ শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা-কার্য স্বামিজী স্বয়ং সম্পন্ন করেন—সেখানেই সর্বপ্রথম জগদ্বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র "স্থাপকায় চ ধর্মস্য" স্বামিজীর শ্রীমুখে সহসা উচ্চারিত হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠান কার্যে স্বামিজীর ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন প্রকাশানন্দ—তিনি স্বামিজীর পাশেই আসনে বসিয়া পূজা-কৃত্যাদির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুর সাহচর্য প্রকাশানন্দকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছিল—এমনকি, স্বামিজীর বাচনভঙ্গীর অনুকরণও তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে লক্ষিত হইত। মঠে তখন স্বামিজীর আদেশে তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীরা নিয়মিত বক্তৃতাদির অনুশীলন করিতেন। ঐ সকল বক্তৃতা-সভায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। একবার মঠের হল ঘরে অনুরূপ একটি সভায় প্রকাশানন্দ আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে দশ মিনিট অতি মনোজ্ঞ এক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতার রীতি-নীতি এমন আশ্চর্যভাবে তাঁহার সেদিনের ভাষণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে,

সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী স্বয়ং তাঁহার শিষ্যের বক্তৃতা-পদ্ধতি এবং ভাব-ভাষার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর আদেশে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের সেবাকার্যের সূচনা হইলে, প্রকাশানন্দ দক্ষিণেশ্বর গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় কিছুকাল (১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭ হইতে ৯ই জানুআরি, ১৮৯৮ পর্যন্ত) আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সূচনাতেই স্বামিজী প্রকাশানন্দকে ঢাকায় প্রচারকরূপে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন—এই কার্যের জন্য বিরজানন্দকেও মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন বেলুড়ের স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের ঠাকুরঘরে একদিন শিষ্যদ্বয়কে কাছে বসাইয়া স্বামিজী অনেকক্ষণ ধ্যানান্তে, তাঁহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাস কর্, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে।" এইভাবে শ্রীগুরুর নিকট হইতে অমোঘ শক্তি লাভ করিয়া ১৮৯৯-এর ৪ঠা ফেব্রুআরি, প্রকাশানন্দ গুরুভ্রাতা বিরজানন্দের সহিত ঢাকায় যাত্রা করিয়াছিলেন। স্বামিজীর এই শক্তিমান শিষ্যদ্বয়ের উপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অতি আশ্চর্যরূপে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঢাকা শহরে মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূলে যে বীজ, তাহা ইঁহাদের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ কার্যবিবরণীর (General Report-এর) দ্বিতীয় সংখ্যায় ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপনার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতেও এই কথার স্বীকৃতি দেখা যায়:

"This branch of the Ramakrishna Mission was started as early 1899, when Swamis Virajananda and Prakashananda, deputed by Swami Vivekananda, visited these parts and by lectures and religious discourses created an interest in the message of Sri Ramakrishna and sowed the first seeds of the work. Under this auspices a society was started, in which religious sittings were regularly held."

ঢাকায় থাকাকালে প্রকাশানন্দ ও বিরজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একবার নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামেও গিয়াছিলেন। স্বামিজীর প্রিয় শিষ্যদ্বয়কে পাইয়া নাগ-

মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহাদিগকে পাইয়া প্রেমগদ্‌গদ চিত্তে আপন মনে কেবলই বলিতেছিলেন, "আজ আমার কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! মহাপুরুষরা কৃপা করে আমায় পদধূলি দিলেন।" আবার সন্ন্যাসিদ্বয়ও ভক্ত-চূড়ামণির পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার জন্মভূমি সন্দর্শন করিয়া পরম কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কিছুদিন ঢাকায় প্রচারের পর প্রকাশানন্দকে স্বামিজী পুনরায় মঠে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'উদ্বোধন'-এর পরিচালনা সংক্রান্ত নানা কাজে এবং মিশনের আরব্ধ সেবাকার্যাদিতে তিনি এই সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অভয় মামা অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের অতি আদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় মুখোপাধ্যায় যখন কাল ব্যাধি বিসূচিকায় আক্রান্ত হন, তখন শ্রীমৎ সারদানন্দজীর সহিত প্রকাশানন্দও অতন্দ্র নিষ্ঠায় তাঁহার সেবাভার বহন করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৯৯-র কথা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কিছুকাল জনকোলাহলের মধ্যে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই। গুরুভ্রাতা বোধানন্দের সহিত হিমালয়ের গহন প্রদেশে বা কেদারনাথ-বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ পর্যটনে তিনি রত ছিলেন। এই পরিভ্রমণকালে—উদার উন্মুক্ত দৃষ্টি লইয়া যখন তিনি ভারতের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ তীর্থাদি দর্শন করিতেছিলেন, তখন কতই না অভিজ্ঞতার সম্পদ্ তিনি পথ-প্রান্তর হইতে আহরণ করিয়াছিলেন! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘটনা তত্ত্বান্বেষী সন্ন্যাসীর মানসপটে নব নব জ্ঞানের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একটি ঘটনা, যাহা তিনি আবেগের সহিত পরে উল্লেখ করিতেন, এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

অরণ্যসঙ্কুল তুষারময় পার্বত্য পথ। পরিব্রাজক সন্ন্যাসিদ্বয় বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে দুর্গম বন্ধুর পথ বাহিয়া নামিয়া আসিতেছেন। সহসা একদল মহিলা তীর্থযাত্রীকে ঐ পথে উঠিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, মহিলাগণ চিৎকার করিয়া বলিলেন, যদি পথহারা কোন মহিলার সহিত তাঁহাদের কোথাও দেখা হয়, তবে যেন বলেন যে, তাহার সঙ্গীরা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সে যেন নির্ভয়ে এই পথেই আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। ঐ নারীর ক্রোড়ে একটি শিশুসন্তান থাকিবে—দেখিলেই সন্ন্যাসীরা চিনিতে পারিবেন। কিছু দূরে আসিয়া সন্ন্যাসিদ্বয় অনুরূপ একজন মহিলা যাত্রীকে দেখিতে পাইলেন। সবিস্ময়ে

আরও দেখিলেন, একটি তিন-চার মাসের শিশু পরম নিশ্চিন্তে মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতেছে, আর ঘুমন্ত সন্তান-ক্রোড়ে তীর্থান্বেষী ঐ মাতা অতি সন্তর্পণে পিচ্ছিল বরফের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। প্রকাশানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, এই নারীর কি নিজের সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই! গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আবাসস্থল এই ভয়াল প্রদেশে, দুস্তর বিপজ্জনক এই পথে, এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, তুষার-ঝঞ্ঝায় শিশুসন্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের আকর্ষণে সে ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছে! অবশেষে তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন, ইহাই বৈদিক ভারতের সনাতন আদর্শ। ধর্ম প্রথমে,—পুত্র-পরিজন জগৎ-সংসার সব পরে। আদর্শভ্রষ্ট ইহসর্বস্ব বর্তমান যুগেও, এ-হেন চিত্র যে নিতান্ত বিরল হয় নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে সনাতন ভারত এখনও মরে নাই, তাহার মৃত্যু নাই। সনাতন ভারত যেন মূর্তিধারিণী হইয়া ঐ তীর্থযাত্রী নারীর বেশে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রকাশানন্দের এই অনুভূতিটি যথার্থই তাৎপর্যময়—একটি উদ্দীপক দৃশ্য সন্দেহ নাই।

পরিব্রাজক প্রকাশানন্দ অতঃপর হৃষীকেশে ও হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া তপস্যাদিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে হরিদ্বারের অদূরে কনখলে স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য কল্যাণানন্দের কঠোর শ্রমে ও সাধনায় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ কিছুদিন কনখলে থাকিয়া সাধন-ভজন ও গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের কার্যেও নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বিরজানন্দও তখন ঘটনাচক্রে কয়েকদিনের জন্য কনখলে আসিলে, গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে, অন্তরঙ্গজনদের সাহচর্যে, এবং স্বাধ্যায়-আত্মচর্চাদিতে স্বভাব-শান্ত প্রকাশানন্দের মানসিক অন্তর্মুখীনতা যে এইকালে কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অমরনাথ এবং আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থও তিনি সুযোগমতো দর্শনাদি করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন হইতে হিমালয় যেন তাঁহার প্রাণমন জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতে থাকিল—বিরাটের আকর্ষণ হইতে দূরে যাওয়া বুঝি বা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবই হইবে না। স্বীয় ভাবানুগ কর্মকেন্দ্রও তাই এবার স্থির হইল মায়াবতী।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মিরূপে

প্রেরিত হন। এই সময় হইতে ১৯০৬-এর প্রথম দিক পর্যন্ত অর্থাৎ বিদেশ গমনের প্রাক্কাল পর্যন্ত তুষারমৌলি হিমাদ্রিই হইল প্রকাশানন্দের প্রিয় আবাস। অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের সম্পাদনায় তাঁহার সহায়তা ঐ পত্রের ইতিহাসে সত্যই স্মরণীয়। ইহা ছাড়া মায়াবতী আশ্রমের পরিচালনাতেও তিনি দক্ষ সহকারী ছিলেন। তখন মায়াবতীর অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামিজীর প্রিয়শিষ্য স্বরূপানন্দ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশানন্দ আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-কেন্দ্রের প্রচারকরূপে মনোনীত হন। বিদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করায় তিনিও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্যের অনভ্যস্ত পরিবেশ সম্পর্কে সংশয়াকুল সন্তানকে, জননী সেদিন এক অনবদ্য আলোক-বর্তিকা উপহার দিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দকে মা সর্বশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন,—"বাবা, মনে রেখো, যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।" প্রকাশানন্দও এই মাতৃ-আদেশকে আজীবন শিরোধার্য করিয়া চলিয়াছেন। যাহা হউক, পরবর্তী আগষ্ট হইতে স্যানফ্রান্সিস্কোস্থ হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী প্রকাশানন্দের ন্যায় সুযোগ্য সহকারীকে লাভ করিয়া খুবই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর কাল তিনি ত্রিগুণাতীত স্বামীর বহুবিধ কার্যে সহায়তা করিতে অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। উপযুক্ত কর্মী থাকায় নূতন নূতন কর্মপ্রয়াসও সৃষ্ট হইতে থাকিল। বেদান্ত অধ্যাপনা ও ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপনা এবং বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত প্রচারণা ছাড়াও 'Voice of Freedom' নামে একটি মাসিকপত্রও এইকালে ত্রিগুণাতীতানন্দজীর অধ্যক্ষতায় ও প্রকাশানন্দের সহযোগিতায় স্যানফ্রান্সিস্কোতে পরিচালিত হইতেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ক্যালিফর্নিয়ার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় (State University of California) ভারতের এই দুইজন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীকে যেভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তনিষ্ঠ এই সন্ন্যাসিদ্বয়ের কর্মপ্রণালী তদানীন্তন কালের আমেরিকাতেও কতখানি আদরণীয় হইয়াছিল বেশ বুঝিতে পারা যায়। জানা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্টকে ব্যতীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ

সম্মান প্রদর্শন অন্য কোন অতিথিকে করেন নাই—কোন বিদেশীকে তো নহেই। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বেঞ্জামিন হুইলার স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও প্রকাশানন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, "We are just beginning to acknowledge the gratitude we owe to the East and to appreciate the hitherto underestimated influence of India on Western Civilisation." অর্থাৎ, "আমরা আজ হইতে প্রাচ্যের নিকট আমাদের ঋণকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উপর ভারতের এতকালের উপেক্ষিত প্রভাবকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতে শুরু করিলাম মাত্র।" পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে প্রকাশানন্দ ওরিগন ও ওয়াশিংটন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তুমুল ধর্মান্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেই স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোতে 'প্যাসিফিক্ বেদান্তকেন্দ্র' (Pacific Vendanta Centre) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থাও তাঁহার উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একটি নিদারুণ দুর্ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী অকস্মাৎ দেহরক্ষা করিলে (১০ই জানুআরি, ১৯১৫), প্রকাশানন্দের উপর স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির দায়িত্বভার স্বাভাবিকভাবেই বর্তিত হয়। যদিও তাঁহার বহু-শাখায়িত কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়া মূল কেন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কার্যতঃ আরও প্রায় একটি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতেই তিনি স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষের কর্মভার লইয়া পরবর্তী মার্চ হইতে 'Voice of Freedom' মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন এবং আরও কয়েকটি বিভাগের কার্যও সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মধ্যে বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব প্রচার ও ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষাদানে অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নানাভাবে ব্যয়-সঙ্কোচন করিয়া, অতিশয় ধৈর্য তিতিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো হিন্দুমন্দির নির্মাণার্থ পুরাতন লক্ষাধিক টাকার ঋণ অচিরেই তিনি পরিশোধ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পরিচালনাধীনে হিন্দুমন্দিরের তথা বেদান্ত সমিতির সাফল্য অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক আচরণ, সরল অনাড়ম্বর অধ্যাত্মজীবন, মিষ্ট-বিনীত ব্যবহার, আর গভীর শাস্ত্রদর্শিতা পাশ্চাত্ত্যের

পরিবেষ্টনীতে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ক্যালিফর্নিয়ার নানা জনপদে-নগরে ভ্রমণ করিয়া, সমাজের বহুস্তরের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিয়া তিনি বেদান্তের প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর আমেরিকাবাসী তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া উঠিতে থাকিলেন এবং ভারতীয় সনাতন আদর্শের প্রতি তাঁহারা অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পানামা প্রদর্শনীতে আহূত হইয়া বেদান্তবিষয়ক যে বক্তৃতাবলী প্রকাশানন্দ দিয়াছিলেন জনচিত্তে তাহা বিশেষ সাড়া জাগাইয়াছিল। সেখানে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসভার সহ সভাপতিরূপেও তিনি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর কিছুদূরে স্যান্ আন্তনিও উপত্যকায় স্বামী তুরীয়ানন্দজী-প্রতিষ্ঠিত 'শান্তি-আশ্রম'-ও হিন্দুমন্দিরের পরিচালনাধীন। ক্যালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের বনময় নির্জন প্রদেশে অবস্থিত এই নিভৃত সাধন-কুটির সত্যই একটি জুড়াইবার স্থান—যথার্থই শান্তির নিলয়। প্রতিবৎসর হিন্দুমন্দিরের শিক্ষার্থিগণ গ্রীষ্মের অবকাশে বা অন্য যে-কোন অবসরে প্রকাশানন্দের অধিনায়কত্বে এই শান্তি-আশ্রমে আসিয়া ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যাদিতে অতিবাহিত করিতেন। তুরীয়ানন্দজীর তপস্যাপূত এই আশ্রমটি যেন সত্যই হিমালয়স্থ কোন তপোভূমি। প্রকাশানন্দের শিক্ষাধীনে বৎসরের কিছুভাগ সময় জিজ্ঞাসু অন্তেবাসিগণ কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে এখানে তপস্যায় রত থাকিতেন—তাঁহারা মনে করিতেন যেন ভারতবর্ষেরই কোন ঋষির আশ্রমে পুণ্য পরিবেশে থাকিয়া সাধন-ভজন ও বেদান্তচর্চাদি করিতেছেন। অরণ্য হইতে নিজেরাই কাষ্ঠাহরণ করিয়া, নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রে ধুনি প্রজ্বালিত হইত—ধুনির চতুষ্পার্শ্বে চলিত ধ্যান পাঠ আলোচনা। ব্রাহ্মক্ষণে শয্যাত্যাগ হইতে শুরু করিয়া জপ-ধ্যান, বেদান্তচর্চা, ভগবৎ-প্রসঙ্গ ভজন-আবৃত্তি এবং আশ্রমের যাবতীয় কর্ম, স্নান, রন্ধন ভোজন বিশ্রাম শয়ন সবই এখানে ছিল ভারতীয় আশ্রমের রীতিতে অত্যন্ত সহজ সুন্দর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলাময়। শান্তি-আশ্রমের শান্ত পটভূমিকায়, অন্তেবাসিগণ-পরিবৃত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের জীবন যেন আরও মাধুর্যময় হইয়া উঠিত। কর্মোন্মত্ত ভোগচঞ্চল পাশ্চাত্ত্য আবেষ্টনীতে এই শান্তি-আশ্রমের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যময় সন্দেহ নাই। অহর্নিশ অক্লান্ত শ্রমে প্রকাশানন্দের শরীর কিন্তু ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। যাহা হউক, ভগ্ন

স্বাস্থ্যেও শ্রীগুরুর আদিষ্ট কর্মে প্রকাশানন্দ আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অনুরোধে কিছুদিন বিশ্রাম লইবার আশায় তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য ভক্ত এবং ব্রহ্মচারী গুরুদাস (পরে স্বামী অতুলানন্দ) তাঁহার ভারত-যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন। দীর্ঘকাল অন্তে মঠে ফিরিয়া অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মানসিক খুবই প্রফুল্ল হইলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হইয়াছিল ঠিকই। কিন্তু ক্রমাগত বন্ধু-বান্ধব ভক্ত-জিজ্ঞাসু ও স্বদেশবাসী জনসাধারণের সহিত দেখাশোনা, কথাবার্তা ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদির ফলে পুনরায় তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম-প্রচারে তাঁহার সাফল্যকে কলিকাতাবাসিগণ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ কলিকাতায় এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয় —সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজীতে বহু সম্বর্ধনা-বাণী ও অভিনন্দনপত্র তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। স্বাগত অভিভাষণের উত্তরে তিনিও অতি মনোজ্ঞ এক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এইভাবে কলিকাতাতেও বক্তৃতাদি ও ধর্মপ্রসঙ্গে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যকীয় বিশ্রাম গ্রহণ আর সম্ভব হইয়া উঠিল না। তাঁহার প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, কাহারও কোন কথা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না,—ফলে সমাগত ব্যক্তিদের অনুরোধে অনর্গল তাঁহাকে কথা বলিতে হইত। যাহা হউক, এপ্রিল মাসে (১৯২৩) তিনি পুনরায় বিদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার মঠ হইতে দুইজন সন্ন্যাসী কর্মী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সঙ্গী সন্ন্যাসিদ্বয়ের একজন তাঁহারই সহকারিরূপে স্যানফ্রান্সিস্কোতে এবং অপরজন নিউ ইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের জন্য মঠ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

প্রকাশানন্দ স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রত্যাবর্তন করিলে বেদান্ত অনুরাগী ভক্তবৃন্দ আনন্দিত হইলেন, বিশেষতঃ এইবার একজন সহকারী সন্ন্যাসী সঙ্গে থাকাতে তিনি কিছু বিশ্রাম পাইবেন এই ভাবিয়া হিন্দুমন্দিরের শিক্ষার্থীরা বড়ই নিশ্চিত হইয়াছিলেন। কার্যতঃ কিন্তু তাঁহাদের এই আশা নিরর্থকই হইয়াছিল। যোগ্য সহকারীকে পাইয়া প্রকাশানন্দের চিত্তে উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল—স্বামিজীর ভাব প্রচারের প্রেরণা যেন তাঁহাকে আরও ব্যাকুল

করিয়া তুলিয়াছিল। কখনও কেহ বিশ্রামের কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সহাস্তে উত্তর দিতেন, "When my work is finished, I will rest.. Now I must be up and doing to spread Swamiji's message all over California"—অর্থাৎ, "কার্য সমাপ্ত হইলেই বিশ্রাম লইব। সমগ্র ক্যালিফর্নিয়ায় স্বামিজীর বার্তাপ্রচারই এখন আমার জীবনব্রত।" নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপনা করিয়া বেদান্ত-প্রচারের জন্য সহকারীকে সর্বদাই অনুপ্রেরণা দিতেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাকে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে পাঠাইতেন। এইরূপে প্রকাশানন্দের প্রেরণাতেই, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে, পোর্টল্যাণ্ডের বেদান্ত সমিতির জন্ম হয়। পরবর্তী নভেম্বরে স্বয়ং পোর্টলাণ্ডে গমন করিয়া ঐ সমিতির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি পৌরোহিত্যও করিয়াছিলেন। সমিতির ক্রমোন্নতি দেখিয়া পরে কতই না আনন্দিত তিনি হইয়াছিলেন! মুখে চোখে পরম তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিত—যখন বলিতেন, "We are gaining ground. Swami Vivekananda is blessing the work." অর্থাৎ "আমাদের কার্য অগ্রসর হইতেছে। স্বামিজীর অজস্র আশীর্বাদ এই কর্মের উপর বর্ষিত হইতেছে।"

প্রবল কর্মমুখরতার মধ্যেও কিন্তু প্রকাশানন্দের ধ্যান ধারণা ও শাস্ত্রচর্চাদির বিরাম ছিল না। কিছুসংখ্যক নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে লইয়া মধ্যে মধ্যে শান্তি-আশ্রমে তপস্যাদিতে আত্মনিয়োগ করিতেন। নিত্য নিয়মিত জপ ধ্যান; কথামৃত, স্বামিজীর গ্রন্থাবলী, ভাগবত, গীতা ও উপনিষদাদি হইতে পাঠ ও আলোচনা; ভজন-কীর্তন প্রভৃতি তাঁহার তপস্যার অঙ্গ ছিল। তাঁহার সাহচর্যে ও নির্দেশে শিক্ষার্থিগণও তাঁহাদের স্ব স্ব অধ্যাত্মজীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হইতেন। কঠোর পরিশ্রমে প্রকাশানন্দের স্বাস্থ্য কিন্তু ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়াই পড়িতেছিল। অবশেষে বহুমূত্র রোগের আক্রমণ বেশ উগ্রভাবেই দেখা দিল। শরীর দিন দিনই দুর্বল হইতে থাকিল—তথাপি একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে ম্লান দেখা যায় নাই। মহাপ্রয়াণের দিন অতি সমাগত জানিয়াও, নিজেকে সর্বতোভাবে স্বামিজীর হাতের যন্ত্রস্বরূপ বোধ করিয়া তাঁহারই আদিষ্ট কর্মে ও ধ্যানে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি রবিবার বৈকালে সাড়ে পাঁচটায় স্বামী প্রকাশানন্দ অতি ধীর-প্রসন্নভাবে শ্রীগুরুর

পাদপদ্মে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর।

একদা গুরুভ্রাতা স্বামী বিরজানন্দকে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে একখানি ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "I feel that I have still a message to give to the world"—"অনুভব করিতেছি যেন এখনও আমাকে বিশ্বের জন্য কিছু বার্তা বহন করিতে হইবে।" বেদান্তের মহত্তম বাণীকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করাই ছিল স্বামী প্রকাশানন্দের আমৃত্যু সাধনা। যাঁহার দৈবী প্রত্যাদেশে ও বৈদ্যুতিক প্রেরণায় এই দায় তিনি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত আপন শিরে পরমশ্রদ্ধায় বহন করিয়াছেন, সেই যুগাচার্য স্বামিজীই তাঁহার তপোক্লান্ত সন্তানকে কার্যশেষে স্বধামে আহ্বান করিয়া লইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একজন বরিষ্ঠ বার্তাবহ এইভাবেই ভগবৎপদে আত্মাহুতি দিলেন। তাঁহার দেহান্তের সংবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' (এপ্রিল, ১৯২৭) যে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করিয়াছিলেন—উহাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট উক্তি: "May rest and enternal peace be the reward of him who on earth worked untiringly, unselfishly, who served God and man as his master would have it. We are reminded of Swami Vivekananda's words: Our salutation goes to all those God-like men who worked to help humanity."



স্বামী বোধানন্দ

স্বামী বোধানন্দ

ক্লাশের ঘণ্টা তখনও বাজে নাই। বালকের দল ছুটিতেছে খেলিতেছে—তাহাদের প্রাণোচ্ছল কলরবে বিদ্যালয় ভবন মুখরিত। দোতলায় চতুর্থ শ্রেণীর কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া জনৈক বালক বাহিরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। স্বভাব-চপল তাহার চোখ দুইটি বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুস্থির শান্ত। কিন্তু কাহাকে দেখিয়া সে এমন মুগ্ধ হইল?···প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার গৌরবর্ণ উন্নত দেহে কালো আলপাকার কোট চাপানো, গলায় সাদা চাদর, এক হাতে ছাতা, অপর হাতে কি একখানা পুস্তক—আর আয়ত চক্ষুদুইটিতে যেন বিদ্যুতের ঝলক। তাঁহার চেহারায় যেমন অমিত তেজ ও মাধুর্য, চলনেও তেমন অসীম দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য। সৌম্যদর্শন তরুণ এই প্রধান শিক্ষকের প্রতিটি পদক্ষেপই বালককে আকৃষ্ট করিয়াছে। অপলক নেত্রে তাই সে তাঁহাকেই দেখিতেছিল। শুধু একদিন নয়, প্রতিদিনই সে এমন করে।

শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে নবাগত—মাত্র কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন। বালকটি কিন্তু রোজই তাঁহার পথপানে তাকাইয়া থাকে—উচ্চ শ্রেণীতে উঠে নাই এখনও, তাই প্রধান শিক্ষকের অধ্যাপনা শুনিবার প্রত্যক্ষ সুযোগ তাহার হয় না। মাষ্টার মহাশয়কে যতই দেখে, ততই সে ভাবে, এমন জ্যোতির্ময় চক্ষু কি মানুষের হয়? ইনি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ পুরুষ হইবেন।

বালকটির নাম হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতার বহুবাজারস্থ মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র। জীবনের প্রথম প্রভাতে, একদা আপনভোলা যে মাষ্টারটির সম্মোহন চক্ষুতে সে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে বিধির বিধানে সেই মহান শিক্ষকেরই পদপ্রান্তে তাহার চিরকালের আশ্রয় নির্ধারিত হইয়া আছে! শ্রীমান হরিপদর শৈশবের আদর্শ এই বিদ্যালয়-শিক্ষকই উত্তরকালে বিশ্বের বরিষ্ঠ লোকশিক্ষক আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেদিনের সেই সুবোধ ছাত্রটিই বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী বোধানন্দ নামে স্মরণীয়।

হাওড়া জেলার[১] বাগাণ্ডা গ্রামে, ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (১৮৭০

১ অধুনা হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাগাণ্ডা গ্রাম পূর্বে হুগলী জেলার ছিল।

খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে), অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হরিপদর জন্ম। তাঁহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আচার-বিচার তিনি খুব মানিয়া চলিতেন—পরিধানে থান-ধুতি আর গায়ে শুভ্র উত্তরীয় আজীবন ব্যবহার করিয়াছেন। শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেণীমাধব। এই বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র খগেন্দ্রনাথই স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে খ্যাত হইয়াছেন। হরিপদর গর্ভধারিণী মোক্ষদাদেবী অতিশয় কর্মকুশলা ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন। হরিপদর জীবন গঠনে তাঁহার জননীর প্রভাব অপরিসীম। খুল্লতাত ভ্রাতা খগেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সাহচর্য হরিপদর চরিত্র বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উভয় ভ্রাতার চরিত্র-মাধুর্যে পল্লীবাসী সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাহাদের পিতামহ কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। গ্রামের জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি একদা কালাচাঁদ বাবুকে তাঁহার এই দুই নাতির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "খগেন আর হরিপদ কখনো মেয়েদের মুখের দিকে তাকায় না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুলের বহুবাজার শাখায় হরিপদর প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ও অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল—বিশ্ববিশ্রুত স্বামিজী তখন শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে সেখানে প্রধানশিক্ষকতা করিতেছিলেন। মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র তিন-চারি মাসের জন্যই অবশ্য তিনি ঐ বিদ্যালয়ের গণ্ডীবদ্ধ ছিলেন।[১] হরিপদ তখন কলিকাতায় তাঁহার কাকার বাড়ীতে থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। হরিপদর সমগ্র জীবনে ইহাও এক অতিবড় তাৎপর্যময় যোগাযোগ সন্দেহ নাই। প্রবন্ধের সূচনাতেই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

হরিপদ পরে কিন্তু জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখান হইতেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রহিসাবে

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', পঞ্চম খণ্ড (দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 'উদ্বোধন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭) এবং *Prabudha Bharata* (October, 1934)-এ প্রকাশিত স্বামী বোধানন্দজীর স্মৃতিকথায় এই কালের হিসাব পরস্পরবিরোধী দেখা যায়, অর্থাৎ উদ্বোধনে ১৮৮৬ এবং *Prabuddha Bharat*-এ ১৮৮৭।

তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায়, বিদ্যালয়ে পড়িবার কালেই চেম্বারের ইংরেজী অভিধানটি (Chambers' Dictionary) তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। খুল্লতাত ভ্রাতা ফণীন্দ্রনাথকে নাকি প্রায় সমগ্র অভিধানখানি একবার মুখস্থ বলিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে কলিকাতায় রিপন কলেজে যখন তিনি অধ্যয়ন শুরু করেন, বস্তুতঃ তখন হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের গতি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ, আত্মানন্দ, প্রকাশানন্দ-প্রমুখ স্বামিজীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-সন্তানগণ পূর্বাশ্রমে তাঁহার সহপাঠী ও ধর্মবন্ধু ছিলেন। ইঁহারা তখন প্রায় চৌদ্দ-পনেরজন ছাত্র মিলিয়া প্রগাঢ় প্রীতির সহিত একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ভ্রাতা খগেন্দ্র (বিমলানন্দ) অথবা কালীকৃষ্ণ (বিরজানন্দ)-দের বাড়ীতেই এই তরুণদলের বৈঠক বসিত। ভগবৎপ্রসঙ্গ, সদালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, সাধুদর্শন, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিই ছিল এই যুবকদলের নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্যক্রম। ভিক্ষা করিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সাধুসেবা করা, তাঁহাদের ধর্মচর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। ভিক্ষায় লব্ধ তরিতরকারি চাউল ইত্যাদি কালীকৃষ্ণদের কোচম্যানের নিকট মাঝে মাঝে বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা জমাইয়া, উহাও নানা সৎকাজে ব্যয়িত হইত। একবার হরিপদ প্রভৃতি তিন-চারজন ছেলে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়বাগানের বাড়ীতে সাধুসেবার জন্য অর্থভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। যুবকরা যথাযোগ্য প্রণামান্তে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন, "যখন নিজেরা অর্থোপার্জনক্ষম হইবে, তখন স্বোপার্জিত অর্থে সাধু ভোজন করাইও। আমি উহার জন্য এক পয়সাও দিব না।" বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে ছেলেরা পড়াশোনায় ফাঁকি দিবার জন্যই ধর্মের ভান করিয়া এইসব হুজুগ করিতেছে। যাহা হউক, হরিপদদের ভাবের পরিবর্তন কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র হয় নাই।

একদিন গোলদীঘির ধারে বেড়াইবার কালে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যাবির্ভাব-উৎসবের একটি বিজ্ঞপ্তি হরিপদর হাতে কেহ দিয়াছিলেন। যোগোদ্যানের ঠিকানাটি হাতে পাইয়াই সহসা একদিন একাকী উক্ত উদ্যানে চলিয়া যান এবং ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। রামবাবুর মুখে

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া হরিপদ যেন সত্যই স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। এতদিন নানা সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিলেও এমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সম্পর্কে জানিবার কোন সুযোগ তাঁহাদের ছিল না। রামবাবু হরিপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা; শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে আপনার কি মনে হয় ?" রামবাবুর মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনিয়া হরিপদ তো সঙ্কোচে জড়সড় হইলেন এবং এইরূপ সম্বোধন না করিবার জন্যই রামবাবুকে অনুনয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হরিপদ সোজাভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—"পরমহংসদেব একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।" রামবাবু বালকের এই উক্তি শুনিয়া সজোরে বলিয়াছিলেন, "তিনি শুধু সিদ্ধপুরুষ নহেন, তিনি অবতার।" বহু ঘটনা এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি হরিপদর জিজ্ঞাসু অন্তরে এই ভাবটিকে পাকা করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হরিপদর উত্তরজীবনে লিখিত স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে সেদিন রামবাবু তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, সিদ্ধপুরুষ একটিমাত্র সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সেইটাতেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং শেষদশায় সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু পরমহংসদেব জগতের প্রধান ধর্মগুলির সাধনপদ্ধতি নিয়মিত অনুষ্ঠান করিয়া সবগুলিতেই সিদ্ধিলাভ করেন এবং সকলের ভিতর একই সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি বলিতেন, "মত পথ।" অর্থাৎ সমস্ত ধর্মমতই এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও এক সত্যই উহাদের লক্ষ্য। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এ-যুগে ধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই যুগাবতার।

রামবাবু সেদিন তাঁহার নিজের রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৃত্তান্ত একখানি হরিপদকে উপহার দিয়াছিলেন এবং অনেক রাত্রি হওয়ায় নিজের গাড়িতে করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সাক্ষাৎ ভক্তের নিকট এমন আত্মীয়তামাখা ব্যবহার এবং যুগাবতারের বার্তা শুনিয়া হরিপদ যেন অন্ধকারে পথ পাইলেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া বন্ধুদের নিকট আসিয়া সকল সংবাদ বলায় তাঁহারাও সকলে কাঁকুড়গাছিতে গিয়া রামবাবুর সঙ্গলাভে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। হরিপদর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, ঐদিন বন্ধুরা অনুমানে এইরূপই কিছু একটা সংবাদ আশা করিয়া, তাঁহারই প্রতীক্ষায় খগেনদের বাড়ীতে সকলে মিলিয়া বসিয়া-

ছিলেন। হরিপদ ফিরিয়া আসিলে সারারাত্রি ধরিয়া নাকি সেদিন একমাত্র ঠাকুরের কথাই হইয়াছিল। পরের দিন সকলে চাঁদা তুলিয়া এবং ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া আট-দশ টাকা সংগ্রহ করিলেন। ঐ টাকায় কয়েকটি ভাল আম ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া বন্ধুগণসহ হরিপদ পুনরায় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গিয়াছিলেন। এইভাবে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের সহিত ক্রমশঃ তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল এবং উত্তরোত্তর যোগোদ্যানে যাতায়াত ও সেখানকার নানা টুকিটাকি কাজে তাঁহারা নিজেদের যুক্ত রাখিতে থাকিলেন।

রামবাবুর ছিল বৈষ্ণব ভক্তের ভাব। একবার হরিপদ বালকোচিত সহজভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?" রামবাবু ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর কিনা বলিতেছিস্ তাঁহাকে মাঝি-মাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানবি যে, যে মাঝিমাল্লা সুকৃতিবশতঃ তাঁহার শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান।" হরিপদ লজ্জায় ও ক্ষোভে রামবাবুর নিকট তাঁহার ঐ উক্তির জন্য পায়ে ধরিয়া মার্জনা চাহিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আমি তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নই।"

কথামৃত-কার 'শ্রীম' বা ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন রিপন কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক। হরিপদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অতি আদরের 'মাষ্টার'-কে সহসা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়কে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সসম্ভ্রমে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন। রামবাবুর বাগানে ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে মাষ্টার মহাশয় কেন যান নাই, বালক হরিপদ ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় বিনম্র ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব নাই, তিনি সদা বিরাজমান।" এই একটি কথাতেই হরিপদ যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বরাহনগর

মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানমণ্ডলী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যথার্থই কামকাঞ্চনকে দূরে ঠেলিয়া ঠাকুরের ভাবে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতেছেন —এই সংবাদ সর্বপ্রথম মাষ্টার মহাশয়ের নিকটই হরিপদরা লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই ত্যাগী সন্তানদের নিকট তরুণদের প্রেরণ করিবার জন্য তিনি কতই না উৎসাহ দিয়াছেন। হরিপদ-প্রমুখ ছাত্রদের তিনি একবার বেশ বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসী শিষ্যগণ জাত্-আম—যেমন ফজলী, ল্যাংড়া। কিন্তু এখনও পাকে নাই। গৃহী শিষ্যগণ টোকো আম, কিন্তু পেকেছে।"

মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে হরিপদ আরও দুই-একজন সঙ্গী সহ একদিন অবশেষে বরাহনগর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকেই তাঁহারা সর্বপ্রথম দর্শন করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ এই সন্ন্যাসীদের দর্শনে ও সাহচর্যে হরিপদর জীবনগতি এতদিনে উপযুক্ত পথ পাইল। বরাহনগর মঠের আকর্ষণ উত্তরোত্তর দুর্নিবার হইয়া উঠিল তাঁহাদের নিকট। হরিপদ ও আর আর বন্ধুরা ঘন ঘন মঠে আসা যাওয়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

একবার চৈত্রসংক্রান্তির দিন হরিপদ মঠে গিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ওহে হরিপদ, আজ গ্রামে ভিক্ষা করতে যাবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?" হরিপদও নিঃসঙ্কোচে সম্মতি জানাইলেন। অকস্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁহার হাতের একখানি গেরুয়া কাপড় হরিপদকে দিয়া উহা পরিধান করিতে এবং তাঁহার সাদা ধুতিটি খুলিয়া পুঁটলি পাকাইয়া এককোণে রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। হরিপদও যথা আদেশ গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলেন এবং সিঁথির দিকে প্রায় পাঁচ-সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐদিন পথিমধ্যে কোনও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ গৈরিক পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরিতে দেখিয়া, তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া জানাইয়া দেয়। বাড়ীর লোকেরা এই কাণ্ড শুনিয়া মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, বুঝি বা এমন ভাল ছেলেটি সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়িয়া সংসারকে ফাঁকি দিল! যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সাদা ধুতি পরিয়াই রাত্রে যখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন—বাড়ীর পরিজনগণ স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন।

১৮৯০ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত একটানা কয়েক বৎসর এইভাবে হরিপদর

মঠে যাতায়াত এবং সাধনভজন, ঠাকুরসেবা ও সাধুসঙ্গ পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। প্রথম দুই তিন বৎসরের মধ্যে স্বামিজী এবং ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও হরি মহারাজ ব্যতীত ঠাকুরের প্রায় সকল সন্তানগণের সঙ্গলাভই তাঁহার ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল। মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করিয়া একাধিক দিন মঠেই বাস করা হইত। একবার পড়াশোনা ছাড়িয়া এইরূপে দুই-তিন দিন মঠেই আছেন, তাহাতে রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যবান যুবকের মঠবাসে প্রবল আগ্রহ এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণানন্দজী অবশেষে আরও একদিন থাকিবার অনুমতি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ঠিক সেইদিনই পুত্রের অনুসন্ধানে পিতাও আসিয়া মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হরিপদর পিতা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মঠে আসিয়া রামকৃষ্ণানন্দজীর কথাবার্তায় ও আচরণে স্নেহকোমল পিতা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মঠের প্রতি চিরকালের জন্য একটি আকর্ষণ অনুভব করিতেন এবং পুত্রের নিকট মঠের সন্ন্যাসীদের খোঁজ-খবর লইতেন।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের সহিত হরিপদর ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিপদ ও তাঁহার বন্ধুরা পালাক্রমে কখনও কখনও সেখানে ঠাকুরের সেবাপূজা ও ভোগরন্ধনাদির কাজ চালাইয়া লইয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যেদিন যোগোদ্যানে পদার্পণ করেন, হরিপদও সেদিন সেখানে জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই যোগোদ্যানে গমনাগমনের কালেই বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রের সহিত হরিপদর প্রথম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। মহাকবির সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিনেই হরিপদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেদিন যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, হরিপদর চিত্তপটে তাহা চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ভক্তভৈরব আনন্দে-গর্বে বলিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভের পূর্বে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ইত্যাদি শ্লোকটি মাত্র শুনিতাম, কিন্তু তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির পর উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি।" গিরিশবাবুর সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে মিশিবার সুযোগ তাঁহার পরে অনেক হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃসন্নিধানে গিরিশবাবুর সঙ্গে যে পনের দিন তিনি একত্রে কাটাইয়াছিলেন, উহার স্মৃতি তাহার মানসপটে চিরকালই অম্লান ছিল।

১৮৯১।৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও গিরিশবাবুর সঙ্গে হরিপদ জয়রামবাটী তীর্থদর্শনের সুযোগ প্রথম লাভ করেন। স্বামী সুবোধানন্দজী, কালীকৃষ্ণ (পরে স্বামী বিরজানন্দ) এবং কানাই (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এই যাত্রায় তাঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। জয়রামবাটীর পথে তাঁহাদের শ্রীধাম কামারপুকুর দর্শনও হইয়াছিল। জয়রামবাটীতে জননীর স্নেহচ্ছায়ায় দুই সপ্তাহ বাস করিয়া হরিপদ সত্যই অমর্ত্যালোকের আনন্দ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। মনে হয়, শ্রীশ্রীমা এইবারই তাঁহাকে মহামন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার মনুষ্যজন্মকে সার্থকতায় ভরিয়া দিয়াছিলেন। এই কালের স্মৃতি প্রসঙ্গে অন্তিমজীবনে তিনি মায়ের অপার্থিব করুণার কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন: "তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যে উহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে সে-ই উহার মহিমা জানে।...শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লাভ করা তাঁহার অহেতুকী কৃপা ভিন্ন সম্ভব হয় না।" হরিপদ বয়সে ছোট বলিয়া মায়ের কাছে সর্ববিষয়েই তাঁহার একটি বিশেষ অধিকার ছিল। মায়ের টুকিটাকি ফাই-ফরমাস খাটিতে মাতৃভক্ত হরিপদ সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কখনও বা তিনি রুটি বেলিয়া দিতেছেন—আর জগজ্জননী সেই রুটি উনানে সেঁকিতেছেন, এমন দৃশ্যও সংঘটিত হইয়াছে। সেইবারে মায়ের বাড়ীতে বীরভক্ত গিরিশের ভাব-বিভোর জীবনের পরিচয় আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হরিপদর হইয়াছিল। আমোদরের তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে, নীরব সন্ধ্যায় ভক্তভৈরব গিরিশের 'পাঁচসিকে-পাঁচ-আনা' ভক্তিমিশ্রিত প্রাণমাতানো সঙ্গীত "চমকে চপলা—চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলাহাসিনী" এবং "মদমত্তা মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়, তড়িতকুন্তলজাল বিজড়িত পায় পায়" ইত্যাদি তিনি আজীবন স্মরণ করিতেন। আবার এতবড় মহাকবিকে যখন সদ্যোস্নাত অবস্থায় সিক্তবসনে মায়ের পর্ণকুটীরের ছোট্ট অঙ্গনে ধূলায় ধূসরিত হইয়া দণ্ডবৎ হইতে দেখিতেন—তাঁহার অশ্রুসিক্ত বদনের দিকে তাকাইয়া তখন হরিপদও ভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। উত্তরকালে স্বয়ং বলিয়াছেন—"ঐ দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।" যাহা হউক, পরে তিনি আরও দুইবার জয়রামবাটীতে, এবং কয়েকবারই বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর উদ্যানবাটীতে ও বাগবাজারে মায়ের চরণ-দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন।

মঠের সঙ্গে হরিপদর সম্বন্ধ ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে মঠে যোগদান না করিলেও তিনি যেন মঠেরই অন্যতম অঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন। যেদিন বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া যায় (নভেম্বর, ১৮৯১) সেদিনও তিনি মঠে থাকিয়া জিনিষপত্রাদি স্থানান্তর করায় সারাদিন নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তীর্থভ্রমণান্তে মঠে ফিরিয়া আসিলে, মহারাজের কিছু ব্যক্তিগত সেবাদি করিবার সুযোগও হরিপদ লাভ করিয়াছিলেন। হরিপদর সেবা মহারাজ খুব পছন্দ করিতেন। হরিপদ ততদিনে বি. এ. পাশ করিয়া জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ব্রতী হইয়াছেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করায়, উহার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে তিনি আরও গৌরবান্বিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্যালয়টি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও বহুপূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি। স্বামিজী পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের প্রথম পর্ব শেষ করিয়া কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। আলমবাজার মঠের অদূরে গোপাললাল শীলের বাটীতে অবস্থান করিয়া সাধু-ভক্ত জিজ্ঞাসু-দর্শনার্থী সকলকেই অহর্নিশ অনুপ্রেরণা ও উপদেশাদি বিতরণ করিতেছেন। সেদিন ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্ম-মহোৎসব। ফেব্রুআরির শেষ অথবা মার্চের প্রথম দিকের কোনও রবিবার হইবে। সাধারণ উৎসব তখন অনুষ্ঠিত হইত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উদ্যানে। হরিপদ এই উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যেই, আগের দিন, অর্থাৎ শনিবার রাত্রিতেই আলমবাজার মঠে চলিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি স্বামিজীর দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন—স্বামিজীও তাঁহার ঘরের জানালা হইতে আগন্তুক যুবককে দেখিয়া স্বয়ং নীচে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন। শীতের উষা, অরুণোদয়ের তখনও কিছু বাকী আছে। শান্ত পবিত্র উষাক্ষণে, আলো-অন্ধকারের পুণ্য সন্ধিতে গুরু-শিষ্যের এই প্রথম মিলন-চিত্রটি বড়ই তাৎপর্যমণ্ডিত। হরিপদর মনে হইয়াছিল, তিমিরান্তক সাক্ষাৎ দিবাকর বুঝি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। দেহধারী ভাস্করকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই অতি পরিচিত জনের ন্যায় তাঁহাকে তিনি কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দজীও নিকটে ছিলেন। তিনি হরিপদর পরিচয় করাইয়া দিলে, বহু

বহু জন্মের ঘনিষ্ঠতাব্যঞ্জক অতি আপনকরা ভাবে স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে ঠিক সন্ন্যাসী করবো। আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দিতে পার?" হরিপদর জীবনে যথার্থই সুপ্রভাত সূচিত হইল সেদিন—অন্ধকার বিদূরণের পরম আশ্বাস লাভ করিয়া, আনন্দে গৌরবে ও কৃতার্থতায় তিনি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

উৎসবের দিন স্বামিজী যখন মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, হরিপদকে সস্নেহে বলিলেন, "আমি মঠে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।" হরিপদ সসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন, "আমি হেঁটে যাব।" উত্তরে স্বামিজী আবার বলিলেন, "না, তুমি গাড়ীর ছাদে বসে যাবে।" সেদিন স্বামিজীর সঙ্গে একই গাড়িতে মঠে আসার সৌভাগ্যও তাঁহার লাভ হইয়াছিল।

সকাল আটটা নাগাদ স্বামিজী মঠে পৌছিয়া, স্নানাদি সারিয়া, ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন—হরিপদও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন স্বামিজীর পার্শ্বে উপবেশনের দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছিলেন। তারপর বেলা আন্দাজ এগারটায় স্বামিজী সদলে দক্ষিণেশ্বর উৎসবভূমিতে আগমন করেন। তাঁহার পদার্পণে জনসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল —সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে মাত্র একটিবার দর্শন করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িল। স্বামিজী দুই-তিনবার চেষ্টা করিয়াও ঐ জনতার মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বেলা একটার পরে তিনি মঠে ফিরিয়া আসেন। সেদিন হরিপদ সারাক্ষণই স্বামিজীর খুব নিকট সাহচর্য পাইয়াছিলেন। এইদিনের স্মৃতিপ্রসঙ্গে পরে বোধানন্দজী বলিতেন যে, উহা তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। তাঁহার স্মৃতিতে সে চিত্রটি চির-অম্লান ছিল। উত্তরজীবনেও সেই দিনটির কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দ-শিহরণ অনুভব করিতেন। "That was a most glorious day of my life. Its impression is indelible in my memory. As I think of it now I still seem to feel the thrill of the joy I felt then."[১]

১ *Prabuddha Bharata*, October, 1934—দ্রষ্টব্য।

স্বামিজীর পুণ্য দর্শনের স্মৃতিকে বক্ষে লইয়া হরিপদ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কাজকর্মে আবার লাগিলেন ঠিকই—কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত আলমবাজার মঠে। মঠে যাতায়াত আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। স্বামিজীর দর্শন ও সঙ্গ এখন হইতে হরিপদর জীবনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। মঠে তখন স্বামিজী নিয়ম করিয়াছিলেন ঠাকুরঘরে সারারাত্রি ধরিয়া সাধুব্রহ্মচারীরা পালাক্রমে জপধ্যান করিবেন। হরিপদ যেদিন যেদিন মঠে রাত্রিবাস করিতেন, সেদিন তাঁহাকেও ঐরূপ জপধ্যান করিতে হইত। একবার বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হইলে অন্য কোথাও না গিয়া তিনি মঠে আসিয়া স্বামিজীর সাহচর্যে কিছুকাল বাস করিবার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কালের এক একটি চিত্র তাঁহার মানসপটে চিরকালের জন্য অঙ্কিত ছিল। একদিন বেলা তখন সাড়ে দশটা, ঠাকুরঘরে সাধুরা বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। প্রেমানন্দজীর কি সাধ হইল, স্বামিজীকে আসিয়া ধরিয়া বসিলেন ঠাকুরের পূজা করিবার জন্য। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং অতি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পূজার আসনে গিয়া বসিলেন। আসনে বসিতে না বসিতেই মন যেন কোন রাজ্যে চলিয়া গেল, আর তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘ সময় এইরূপ ধ্যানস্থ থাকিবার পর, ক্রমে যেন বাহ্যভূমিতে নামিয়া আসিয়া পুষ্পপাত্রে যত ফুল ছিল, উহাতে চন্দন ছিটাইয়া দিলেন। অঞ্জলি ভরিয়া চন্দনসিক্ত পুষ্প লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদিতে, পাদুকায় ও আত্মারামের কৌটাতে প্রদান করিলেন। সুন্দর পরিপাটি করিয়া অতি সন্তর্পণে প্রভুর আলেখ্যে নানা বর্ণের পুষ্প সাজাইয়া দিলেন। তারপর অবশিষ্ট ফুলগুলি ধ্যানরত গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের মস্তকে বর্ষণ করিলেন। এমন অপূর্ব পূজাবিধি হরিপদ পূর্বে কখনও দেখেন নাই—কোন উপচারের বালাই নাই, ঘণ্টাধ্বনি নাই, কোশাকুশির আওয়াজ নাই, জল ছিটানো নাই, মুদ্রা প্রদর্শন নাই। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের মধ্যেও যে প্রভুরই অস্তিত্ব অনুভব করিতেন তাহা এই ঘটনা হইতেই হরিপদর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পূজাশেষে সাধু-ব্রহ্মচারী সকলে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

হরিপদর জীবনে এই মঠবাসের স্মৃতি যেন নূতন নূতন প্রেরণার উৎসস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। স্বামিজীর সন্নিধানে আসিয়া জীবনের লক্ষ্যকে আরও স্পষ্ট

করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। এইকালে প্রত্যহ তিনি স্বামিজীর আদেশে গীতার দশটি করিয়া শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতেন এবং স্বামিজীকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। যাহা হউক, জুন মাসে স্বামিজী আলমোড়া চলিয়া যান এবং গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইয়া যাওয়ায় হরিপদও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারের দিকে মন দেওয়া এখন হইতে তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার চিত্ত তখন বৈরাগ্যের প্রচণ্ড অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে ১৮৯৮-এর শেষ দিকে হরিপদ চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া যোগদান করিলেন। ততদিনে মঠ বেলুড়ের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছে। এই বৎসরেরই নভেম্বরে স্বামিজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীর হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। বৈরাগ্যবান তরুণ যুগাচার্যের কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহারই চরণাশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। স্বামিজী হরিপদকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া নাম দিয়াছিলেন স্বামী বোধানন্দ।

মঠে ধ্যান-ভজন ও শাস্ত্রপাঠাদিতে তখন সকলেই খুব ভরপুর। বিশেষতঃ স্বামিজী মঠেই অবস্থান করায় সাধুব্রহ্মচারীদের আনন্দের সীমা নাই—তাঁহাদের আদর্শ যেন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। মঠের সেই উদ্দীপনাময় পরিবেশে অবস্থান করিয়া বোধানন্দ স্বাধ্যায় ও জপ-ধ্যানাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়া উত্তরোত্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিলেন। ঐ সময়ে স্বামিজীর আদেশে তিনি স্বামী সারদানন্দজীর নিকট গীতা ও ব্রহ্মসূত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেন। সারদানন্দজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা বোধানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনে দিনদিনই নূতন আলোকের সন্ধান আনিয়া দিত।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বোধানন্দ উত্তরাখণ্ডের তীর্থাদি দর্শনে বহির্গত হন। গুরুভ্রাতা প্রকাশানন্দের সহিত হিমালয়ের কেদার-বদরী প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ নগ্নপদে তিনি ভ্রমণ করেন। অতঃপর হৃষীকেশে ও হরিদ্বারে থাকিয়া কিছুকাল কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে কনখলে গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের সাহচর্যে বাস করিয়া তাঁহার আরব্ধ সেবাকার্যেও কিছুদিন সহায়তা তিনি করিয়াছিলেন। আহারাদির জন্য তখন তাঁহাদের মাধুকরীই ছিল অবলম্বন। যাহা হউক, হৃষীকেশেই বোধানন্দের তপস্যা-

কালের অধিক ভাগ কাটিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ও স্বাধ্যায়াদি বোধানন্দের সন্ন্যাসি-মনকে তখন আরও সতেজ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, জাপানী মনীষী ওকাকুরাকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী কাশীধামে আসিয়াছেন। শ্রীগুরুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠিলে বোধানন্দ হরিদ্বার হইতে কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শোনা যায়, তপস্বী শিষ্যের আগমনসংবাদে স্বামিজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "তাকে আমার কাছে সোজা আসতে বলে দাও। আমি তাকে হৃষীকেশের বেশেই দেখতে চাই।"

প্রিয় শিষ্যকে পাইয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন—তপস্যার সংবাদাদি খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিয়াই ফেলিলেন, "তুমি আসাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। জনৈক মহারাজা এখানে একটি আশ্রমের জন্য প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত আছেন। সে আশ্রমের ভার তুমি নিতে পারবে কি?" বোধানন্দ বিনীতভাবে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "আমার চেয়েও উপযুক্ত সব এখানে আছেন, যাঁরা ভাল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন।" স্বামিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, "তুমি অপরের অনুকরণ করোনা। আমি বলি আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনপূর্বক স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে যাও। আন্তরিক হলে তুমি নিশ্চিতই সফল হবে।"

স্বামিজী অতঃপর বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন—বোধানন্দকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। বোধানন্দ পুনরায় শ্রীগুরুর পবিত্র সন্নিধানে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে বড়ই কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ধ্যানভজন ও গুরুসেবায় তাঁহার দিন বেশ আনন্দেই কাটিতে থাকিল। সাধ্যানুযায়ী মঠের অন্যান্য কাজেও তাঁহার উৎসাহ ও আন্তরিকতার কিছুমাত্র অভাব দেখা যাইত না। একবার কিছুদিন ধরিয়া মঠে মেথর অনুপস্থিত থাকিলে, বোধানন্দই স্বয়ং ময়লার টব মাথায় বহিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং নিয়মিত পায়খানা পরিষ্কার করিতেন। ছোটবড় সকল কাজকেই তিনি উপাসনা জ্ঞানে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করিতেন। শাস্ত্রপাঠ, ধ্যানধারণা ও স্বামিজীর সেবা তো তিনি সমানই বোধ করিতেন। মঠে তখন স্বামিজীর আদেশ ছিল, প্রত্যুষে উঠিয়া যথাকালে ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যানজপে না বসিলে সেদিন ভিক্ষা করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একদিন কোন কারণে বোধানন্দ ও অন্য কাহারও কাহারও প্রত্যুষে ঠাকুর-ঘরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। স্বামিজীর নির্দেশ হইল, "সকলে আজ কলকাতায় গিয়ে ভিক্ষে করুক। মঠে কেউ আহার পাবে না।" প্রিয় শিষ্যকে আরও একটু বিশেষ বলিয়া দিলেন, "দেখ, কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যেও না যেন।" বোধানন্দ কলিকাতায় গিয়া গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এমনকি, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত পথে দেখা হইলে, তিনি কিছু পয়সা দিতে চাহিয়াছিলেন। বোধানন্দ তাহাও লন নাই। ভিক্ষাশ্রান্ত দেহে যখন সন্ধ্যায় বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, তখন খেয়াঘাটে দেখিলেন স্বামিজী যেন তাঁহারই পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আদরের সঙ্গে কাছে ডাকিয়া স্বামিজী ভিক্ষার সব অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তাঁহার সারাদিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। গুরুশিষ্যের কি মধুর অনির্বচনীয় সম্বন্ধই না ছিল!

স্বামিজীর অতি ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাস করিবার ফলে, তাঁহার অন্তর্জীবনের কয়েকটি মাধুর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যক্ষ করিবার দুর্লভ সুযোগ বোধানন্দ পাইয়াছিলেন। বেদান্তঘনমূর্তি বিবেকানন্দ বেলুড়ের গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া দূরে অপরতীরে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরগুলির দিকে তাকাইয়া কিরূপ ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন,—সে-দৃশ্য বোধানন্দের মনশ্চক্ষে চিরসমুজ্জ্বল ছিল। এইরূপ একদা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া আবেগের সহিত ঠাকুরের প্রসঙ্গে নিজেরও কথা কতই না বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। "আমার বাহিরে অদ্বৈত-বেদান্তের ভাব আর অন্তরে ভক্তির ফল্গু,—ঠাকুরের আবার ঠিক বিপরীত।" পরে শিষ্য বোধানন্দকে রহস্য করিয়া আবার বলিয়াছিলেন, "নিরক্ষর ঐ ব্রাহ্মণ-পূজারীর স্নেহের গোলাম হয়ে, দেখ্ আমার অমূল্য জীবনের কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি!" ভুবন-বিজয়ী বিবেকানন্দের এ-হেন রহস্যবাক্যে বোধানন্দ আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। স্বামিজী সেদিন যেন মূর্তিমান বিশ্বাসরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত ছিলেন। বিমুগ্ধ বোধানন্দ তদীয় শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়াছিলেন, "ঠাকুর অবতার ছিলেন কি তদপেক্ষাও বড় ছিলেন তা জানি না। তাঁকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করলেই তাঁর মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শ্রীশ্রীস্বামিজী মর্ত্য-লীলা সংবরণ করেন।

শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণ চোখের সম্মুখে দেখিয়া বোধানন্দ হতবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন—প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বক্ষপিঞ্জর বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐদিনও বিকালে তিনি স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিয়া পাণিনির পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু হায় তখন কে-ই বা জানিতেন যে, উহাই ছিল স্থূলদেহে তাঁহার শেষ অধ্যাপনা।

তদানীন্তন মঠাধীশ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সেবা করিবার সুযোগও বোধানন্দ কিছুকাল লাভ করিয়াছিলেন। উহা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। বোধানন্দ তখন প্রাণপাত করিয়া মহারাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ বৎসরেরই শেষে তিনি হিমালয়ের কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়া, দক্ষিণভারতের দিকে পরিভ্রমণ করেন। কিছুদিন মান্দ্রাজ মঠে অবস্থান করিয়া সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করেন। অবশ্য মাত্র কয়েক মাসের জন্যই তাঁহাকে এই আশ্রমের কার্য করিতে হইয়াছিল, কারণ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই তাঁহাকে নূতনতর কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা ও শাস্ত্রপ্রচারাদির দক্ষতা স্থানীয় সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এমন সময়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত-কেন্দ্রে স্বামী অভেদানন্দজীর একজন সহকারী প্রয়োজন হওয়ায় সঙ্ঘনায়ক ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বোধানন্দকেই ঐ কার্যের জন্য মনোনীত করেন। তদনুযায়ী তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে বেলুড়ে ফিরিয়া আসিয়া ১১ই এপ্রিল বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে ১৫ই এপ্রিল জাহাজে চড়িয়া, মে মাসের শেষে নিউইয়র্কে পৌছেন। এখানে তিনি আট মাস কাল অভেদানন্দজীর প্রচারকার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে বোধানন্দ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাষ্টী (Turstee) এবং পরিচালনা-পরিষদের সদস্য (Member of the Governing Body) মনোনীত হইয়াছেন। যাহা হউক, ১৯০৭-এর জানুআরিতে তিনি পিটস্‌বার্গ শহরে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রেরিত হন—এবং অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে সেখানে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত কেন্দ্রের কর্মভার ত্যাগ করিলে, সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ

তাঁহাকেই ঐ কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। ফলে পিটস্‌বার্গ কেন্দ্র বন্ধ হইয়া যায়। এখানে স্মরণীয় যে নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্র ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে স্বয়ং স্বামিজীরই অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ লইয়া সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুর পুণ্যস্মৃতিজড়িত এই আশ্রমের কর্মভার তাই বোধানন্দের নিকট একটি মহৎ ও পবিত্র দায়স্বরূপ ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই সুদক্ষ সৈনিকের মতোই তাঁহার হস্তে অর্পিত পতাকাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করিয়াছেন।

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের ইতিহাসে বোধানন্দের সত্যই একটী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। পাশ্চাত্ত্যের সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যেও ভারতীয় সন্ন্যাস-জীবনের কঠোর নিয়মাবলী তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজে বাস করিয়াও, অবাস্তর লৌকিকতার প্রশ্রয় না দেওয়া এবং মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশায় ভারতীয় বিধি-রীতি সর্বদা মানিয়া চলা, তাঁহার ন্যায় অতি বড় নীতিনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। মার্কিনের ইহসর্বস্ব পরিবেশ একটি দিনের জন্যও বোধানন্দের জীবনধারাকে সামান্য-ভাবেও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। শোনা যায়, ভারতবর্ষে কেহ তাঁহাকে, আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের অসাধারণ সাফল্যের হেতু সম্পর্কে একবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নাকি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বিমোহিত না হয়ে, খাঁটি সন্ন্যাসজীবনযাপনই সাফল্যের আসল কৌশল।"

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির বর্তমান স্থায়ী ভবনটি বোধানন্দেরই অদম্য কর্মশক্তির সাক্ষীস্বরূপ। তখন সমিতির নিজস্ব কোনও গৃহ না থাকায়, সাময়িকভাবে বাড়ীভাড়া লইয়া কাজকর্ম চালানো হইত। বোধানন্দেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমিতির জন্য বর্তমান বাড়ীটি ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছিল। অদ্যাবধি সেখানেই নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালিত হইতেছে। আমেরিকায় ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদান্ত-কেন্দ্র।

বোধানন্দের অনাড়ম্বর জীবনযাপন, স্বাধ্যায় ও ভজনশীলতা, এবং বেদান্তজ্ঞান ও বাগ্মিতা শত শত মার্কিন নর-নারীকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বকে এড়াইয়া চলা নিকটবর্তী কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। ফলে, যে-কেহ

তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। সাধারণ বক্তৃতা, ধ্যানধারণাদি শিক্ষাপ্রদান, এবং বেদান্ত-অধ্যাপনা ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করা তাঁহার নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। অথচ বহুবিধ কর্ম নিযুক্তির মধ্যেও তাঁহার ব্যক্তিগত সাধন-ভজন এবং স্বাধ্যায়াদির একতিলও এদিক ওদিক কখনও হইত না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ' তাঁহার নিয়মিত পাঠের বিষয় ছিল। সময়ানুবর্তিতা ছিল বোধানন্দের জীবনে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। আত্মসংযম ও পৌরুষের কঠোর বহিরাবরণ ঠেলিয়া তাঁহার খুব নিকটে যাইতে পারিলে, স্পষ্টই দেখা যাইত আদর্শনিষ্ঠ এই সন্ন্যাসীর হৃদয়টি ছিল কত কোমল ও মমতাপূর্ণ। কাহারও সহিত ভগবদ্‌বিষয়ক আলোচনা ব্যতীত কোনপ্রকার লৌকিক আলোচনা তাঁহার আদৌ পছন্দ ছিল না। তাঁহার সহকারী সন্ন্যাসীদের প্রতিও ঐভাবে চলিবার নির্দেশ তিনি দিতেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া, পরবর্তী ১০ই ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে আসিয়া ভারতের মৃত্তিকা তিনি আবার স্পর্শ করেন। একটানা দীর্ঘ ষোল বৎসরেরও অধিককাল আমেরিকায় বাস করিবার পরেও একজন আদর্শ ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁহার সরল জীবনযাপনপ্রণালী কিরূপে অব্যাহত রাখিতে পারেন তাহা স্বামী বোধানন্দকে দেখিয়া সকলেই সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। বোম্বাই শহরের কাওয়াস্‌জী জাহাঙ্গীর হলে তাঁহাকে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। ২০শে ডিসেম্বর তিনি বেলুড়মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা বহুকাল পরে আবার নিজেদের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুর স্মৃতিতীর্থ এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া তিনিও না জানি কতই উদ্দীপনা বোধ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী তখন মঠাধ্যক্ষ।

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে কলিকাতাবাসীরা ২০শে জানুআরি (১৯২৪) তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেদিন নাগরিকদের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট বক্তারা, তাঁহার বিদেশে বেদান্তপ্রচারের অসাধারণ সাফল্যের জন্য, তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসীর হৃদয়ের প্রীতি-স্মারকরূপে একটি রৌপ্যমণ্ডিত কমণ্ডলু এবং মানপত্র তাঁহাকে

উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। স্বামী বোধানন্দ অতিশয় সহজ সরল ভাষায় তাঁহাদের অভিনন্দনের একটি সারগর্ভ প্রতিভাষণ দিয়াছিলেন। প্রিয় গুরুভ্রাতা শুদ্ধানন্দ তখন কাশীধামে। এই অনুষ্ঠানের সংবাদে তিনি ঠিক ঐ তারিখেই এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—"অদ্য বোধানন্দ স্বামীর reception হইবে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, আশা করি উহা খুব ভাল রকমই হইবে এবং এই reception-এর ফলে সাধারণের মনে ক্ষণকালের জন্যও ঠাকুরের ও তাঁহার উপদেশাবলীর কথা উদিত হইবে।"

মঠে অবস্থানকালে নানাস্থানে ধর্মসভায় যোগদানের জন্য অজস্র আহ্বান তাঁহার নিকট আসিত। এইসব আহ্বানে সাড়া দিতেই হইত—ফলে, বক্তৃতাদির বিরাম এদেশেও ছিল না। ঐ বৎসর শ্রীশ্রীস্বামিজীর আবির্ভাব-তিথির দিনেই বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্যও সম্পন্ন হয়। সেদিন ছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুআরি (১৪ই মাঘ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। ঐ উপলক্ষে মঠে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতেও তিনি স্বামিজীর জীবনী ও বাণী সম্পর্কে বাংলায় অতি ওজস্বিনী ভাষণ দিয়াছিলেন। স্বামিজীর 'বীরবাণী' হইতে কবিতাবলী আবৃত্তি করিয়া ঐ সভায় বালক ও তরুণরা বোধানন্দ স্বামীর হস্ত হইতে পুরস্কার ও পদক ইত্যাদি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের নানা জায়গায় এবং পরে পাটনায় ও কাশীতে ক্রমান্বয়ে তিনি স্বামিজীর ভাব ও বাণী প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন। সুদূর রেঙ্গুনের ডাকেও সাড়া না দিয়া পারেন নাই—সেখানেও নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া জনচিত্তে স্বামিজীর ভাবের চমক লাগাইয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল মহাপুরুষ মহারাজের সহিত তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করেন। মান্দ্রাজ মঠে মাসাধিককাল থাকিয়া আশ্রমে ও শহরের নানাস্থানে বেদান্তবিষয়ক কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরে গিয়াও একমাসের কিছু বেশী ছিলেন। সেখানেও প্রতি রবিবারে আশ্রমে ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং শহরের দুই-একটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাও দিয়াছেন। ব্যাঙ্গালোরেও একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। ২৯শে জুন তিনি মান্দ্রাজে আবার ফিরিয়া আসেন। কয়েকদিন পরেই তিনি সেখান হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন এবং পরবর্তী ১৫ই জুলাই সমুদ্রপথে আবার

আমেরিকার পথে যাত্রা করেন। এবার ইউরোপের ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স তাঁহার যাত্রাসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামী বোধানন্দের ইহাই ভারত হইতে শেষ বিদায়। জন্মভূমি-সন্দর্শন আর তাঁহার হয় নাই। এইকাল হইতে জীবনের অন্তিম পর্যন্ত একটানা তিনি আমেরিকাতেই বেদান্ত-প্রচারণায় নিরত ছিলেন।

বোধানন্দের ন্যায় বৈরাগ্যবান ও নিয়মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া নিউইয়র্কস্থ জিজ্ঞাসু নরনারী যে অধ্যাত্মপথের প্রচুর পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তাঁহার প্রদত্ত ভাষণাবলী পাশ্চাত্ত্যের শান্তিকামী মানুষের কাছে যথার্থই অমৃত-বার্তার ন্যায় ছিল। 'Lectures on Vedanta Philosophy' নামে সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে তাঁহার কয়েকটি স্মরণীয় বক্তৃতা বেদান্ত সমিতির অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও আত্মগোপনপ্রিয় সন্ন্যাসী তাঁহার এই সকল ভাষণকে গ্রন্থের রূপ দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। 'বেদান্তদর্পণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রও বোধানন্দের পরিচালনায় কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতেও তাঁহার মনীষাপূর্ণ ভাষণ কখনও কখনও মুদ্রিত দেখা যাইত।

শ্রীগুরুর আরব্ধ বেদান্তপ্রচারের মহৎ কর্মভারকে বোধানন্দ জীবনের শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত প্রসন্নমুখে একটি পবিত্র ব্রত বলিয়াই সাধন করিয়া গিয়াছেন। জরা বার্ধক্য বা শারীরিক কোন বাধাই তাঁহাকে এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম করিতে সক্ষম হয় নাই। গুরু বিবেকানন্দের আকাশের ন্যায় উদার, আর সমুদ্রের মতো গভীর হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয় শিষ্যের জীবনে মানবপ্রেমের ধারাটি চিরদিনই এমন প্রাণোচ্ছল ছিল। বোধানন্দ নিজেও তাই এইরূপ বলিতেন, "স্বামিজী ছিলেন প্রকৃত পুরুষোত্তম। তাঁহার গভীর মানবপ্রেমের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার উদার মানবপ্রেমিক হৃদয়ই আমাকে চিরতরে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিয়াছিল।"

আমেরিকা হইতে লেখা, এই সময়কার তাঁহার একটি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতি দিলে, তাঁহার উল্লিখিত দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি বুঝিতে সুবিধা হইবে। পাটনার জনৈক তরুণ ভক্তকে লিখিতেছেন—"পাটনা আশ্রমের জন্য একটি স্থায়ী বাটী নির্মাণকল্পে টাকা উঠিতেছে শুনিয়া সুখী

হইলাম। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। আমরা অবিশ্বাসী বলিয়া আঁকুপাঁকু করিয়া থাকি। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে সময়ে সবই তিনি করিয়া দেন। আমরা তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ। 'আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।' তাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি হউক ও তাঁহার মহৎ কার্যের সহকারী হইয়া আমরা যেন ধন্য হইতে পারি, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।" (তারিখ, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪)

শেষ জীবন ভারতেই কাটাইবার আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করিতেন—কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বৃদ্ধ বয়সেও কর্মে ক্লান্তি বোধ করিতেন না—কিন্তু ধ্যানধারণা ও ঈশ্বর-নির্ভর, ইহাই ছিল তাঁহার সমগ্র কর্মের মূল প্রেরণা। দেহরক্ষার মাত্র কয়েকমাস আগে একজনকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মা কতদিনে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন তিনিই জানেন। এখন সর্বদা এই গানটি মনে হয় 'যখন যেভাবে রাখিবে আমারে, সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।' তাঁহাকে স্মরণ করাই স্বর্গবাস।" জনৈক অন্তরঙ্গকে লেখা উক্ত পত্রটির উল্লিখিত অংশের প্রতিটি কথায় মাতৃগতপ্রাণ বোধানন্দের জীবন-সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ সুস্পষ্ট আলেখ্য পাওয়া যায়। বৃদ্ধ শরীরে পূর্বের ন্যায় শ্রম ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে তিনি কঠিন মূত্রাশয়-গ্রন্থির (Prostrate glands-এর) পীড়ায় শয্যা-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তাঁহাকে নিউইয়র্ক শহরের রুজভেল্ট হাসপাতালে চিকিৎসার্থ ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত করেন, এবং তদনুযায়ী ১৮ই (১৯৫০) অস্ত্রোপচারের দিন ধার্য হয়। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। চিকিৎসকগণের বহুবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বৈকাল ৩-১৫ মিনিটে অস্ত্রোপচারকালে স্বামী বোধানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ত্যাগ-তপস্যা ও কর্মময় অশীতিবর্ষ দীর্ঘ একটি যাত্রার আজ পরিসমাপ্তি ঘটিল বটে, কিন্তু পশ্চাতে যে পদচিহ্নগুলি পড়িয়া থাকিল উহাই ভবিষ্যৎ পথিকদের অনেককে পথ চলিবার ইঙ্গিত করিবে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ বোধানন্দ মাত্র ক্ষুদ্র কয়েকটি কথায় তাঁহার নিজ জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া

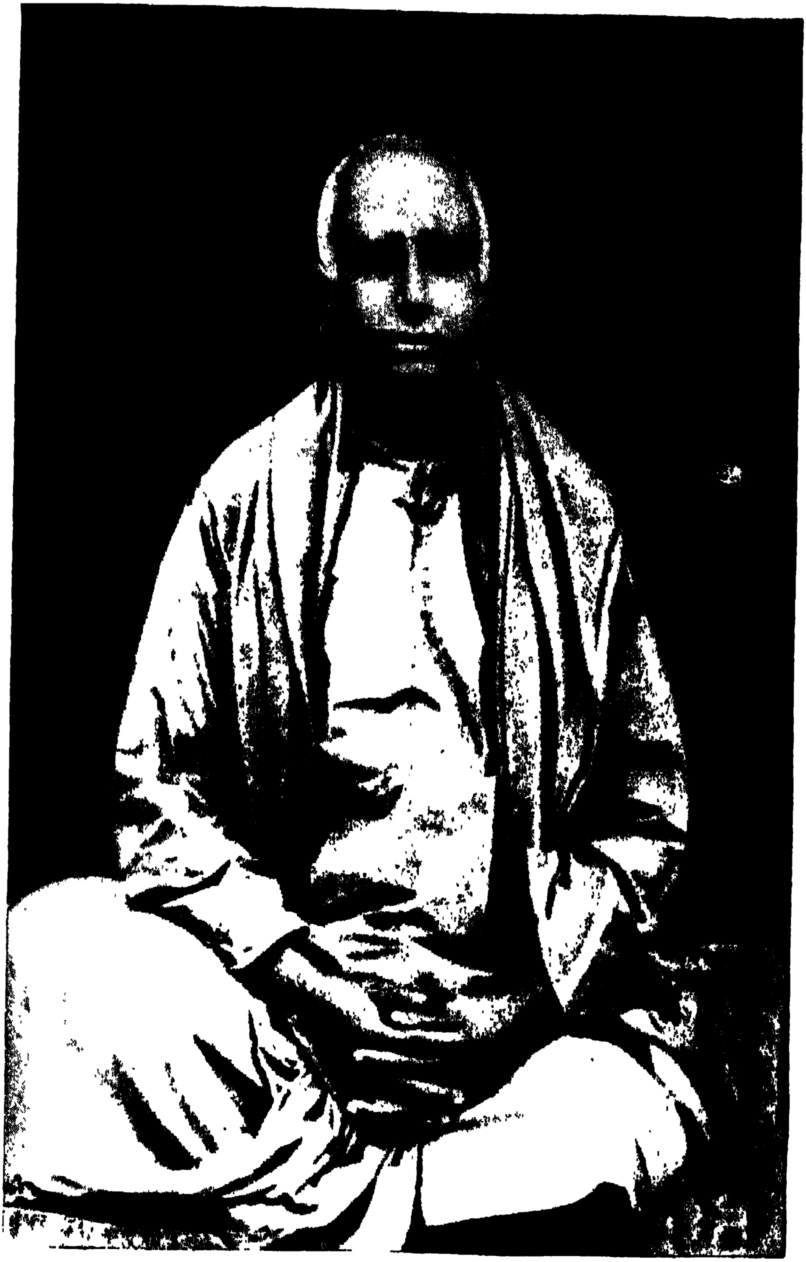
গিয়াছেন। কথা কয়টি এই: "স্বামিজীর মতো মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ, ঠাকুরের দরবারে স্থান লাভ এবং সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ—এই তিনটি আমার জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করি।" স্বামী বোধানন্দের যথার্থ আত্মজীবনী ইহাই। আত্মনিষ্ঠ এই সন্ন্যাসীর জীবন-চরিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে চির আদরণীয় হইয়াই থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্বামী আত্মানন্দ

"জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম—কোন্‌টায় কে অনার্স (Honours) নিবি বল্‌।"—আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ একদা তাঁহার শিষ্যদের নিকট এইরূপ একটি প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। সমীপাগত তরুণদের মধ্যে তাহাতে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল—কেহ বলিলেন আমি চাই জ্ঞান; কেহ বলিলেন আমার ইচ্ছা জ্ঞান ও ভক্তি, অর্থাৎ ডবল অনার্স (double Honours)। আবার কেহ বা উৎসাহভরে চাহিলেন ট্রিপল (triple) অনার্স—জ্ঞানে কর্মে ভক্তিতে। স্বামিজীকে ঘিরিয়া সেদিন বৈরাগ্যবান যুবকের দল আনন্দে উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রসন্ন গুরুর সম্মুখে শিষ্যেরা সকলেই সপ্রতিভ,—শুধু একজন নীরবে সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। যুবকটি স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। তাঁহার হইয়া অন্য আর একজন কিছু বলিতে যাইবেন, এমন সময়ে স্বয়ং স্বামিজীই জবাব দিয়াছিলেন, "ওর মধ্যে জ্ঞান যোগ ভক্তি কর্ম সব ভাবই আছে—ও সবেতেই আছে।"

ঘটনোক্ত সেই যুবকটির উত্তরজীবন পর্যালোচনা করিলে, দ্রষ্টা আচার্যের সেদিনের বাক্য যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যুগপ্রবর্তক স্বামিজীর সমন্বিত যোগের আদর্শ তাঁহার উক্ত শিষ্যের জীবনে যেন যথার্থই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। শান্তপ্রকৃতি স্বল্পভাষী এই যুবকই পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী আত্মানন্দ—যাঁহার সম্পর্কে স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ তাঁহার জনৈক শিষ্যকে একবার বলিয়াছিলেন, "আত্মানন্দের মতো মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহা সৌভাগ্য।" ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের জলন্ত উদাহরণস্বরূপ এই আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবনানুধ্যানের তাই একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

স্বামী আত্মানন্দ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলায়। তাঁহার পিতামহ যুগলকিশোর শুকুল কোন কর্মোপলক্ষে উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় আসিয়া বসবাস করেন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'শুক্ল' পদবী শোনা যায়—মনে হয় 'শুকুল' এই 'শুক্ল' শব্দেরই অপভ্রংশ। যুগলকিশোরের দুই পুত্র গুরুপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ তনয় গোবিন্দপ্রসাদই উত্তরকালে স্বামী



স্বামী আত্মানন্দ

আত্মানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন। মালদহ জেলার দেবীপুর গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ স্থায়ী বসতবাটী নির্মাণ করেন এবং সেখানেই গোবিন্দপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তারিখ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি নিজেও এ-বিষয়ে কাহাকেও কখনও কিছু বলেন নাই। সন্ন্যাসিসুলভ উদাসীন মনোভাব ছিল তাঁহার সহজাত প্রকৃতি—তাঁহার নিজের সম্পর্কে তাই কেহ কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন নাই। তবে তাঁহার সহপাঠী বাল্য-বন্ধুদের বয়ঃক্রম ধরিয়া, তাঁহারও বয়সের মোটামুটি একটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্বামিজীর বিশিষ্ট কয়েকজন সন্ন্যাসিশিষ্য—শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, প্রকাশানন্দ ও বোধানন্দ—পূর্বাশ্রমে ছাত্রাবস্থায় গোবিন্দপ্রসাদের অন্তরঙ্গ সমপাঠী ছিলেন।

গোবিন্দের জীবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গুরুপ্রসাদের প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়। ধর্মপ্রাণ গুরুপ্রসাদ মালদহ জেলান্তর্গত চাঁচল-রাজের দেবালয়ে প্রধান পুরোহিত ছিলেন। রাজবাটীর দেবালয়ে দেবী অন্নপূর্ণা ও গোবিন্দজীর নিত্যসেবা ছিল। গুরুপ্রসাদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহার সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বেচ্ছায় নিজহস্তে লইয়াছিলেন। বালক গোবিন্দ জ্যেষ্ঠতাতকে পূজাদি কার্যে সহায়তা করিতেন, আবার তিনিও ভক্তিমান ভ্রাতুষ্পুত্রকে সৎগ্রন্থাদি পাঠে এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাইতেন। বালকের ধর্মশিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে তাঁহার লক্ষ্য ছিল অপরিসীম। স্বধর্মনিষ্ঠ এই গুরুপ্রসাদেরই শিক্ষাগুণে ও লালন-পালনে গোবিন্দের বাল্যজীবন অপর দশজন বালক অপেক্ষা কিছু বৈশিষ্ট্য লইয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বালকের অন্তর্মুখীন মনোবৃত্তি ও ধ্যানধারণাদিতে অনুরাগ উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া, তাঁহার চরিত্রে একটি মধুর স্নিগ্ধতা আনয়ন করিয়াছিল। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতিপূর্ণ মেলামেশা থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দের জীবনে যেন একটা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইত। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ইহাই ক্রমে তাঁহার মাধুর্যমণ্ডিত প্রশান্ত ব্যক্তিত্বে পরিণতি লাভ করে। যাহা হউক, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ চাঁচল-রাজ উচ্চ-বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চাঁচলের রাজাই এই চরিত্রবান মেধাবী বালকের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহারই আনুকূল্যে অতঃপর কলিকাতার রিপন কলেজে গোবিন্দের এফ্. এ.

পড়িবার ব্যবস্থা হয়। মেধাবী বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সরকারী বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন।

রিপন কলেজে পড়িবার কালে কয়েকজন ধর্মবন্ধুর সাহচর্যলাভ গোবিন্দপ্রসাদের জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। স্বামিজীর পূর্বোল্লিখিত যে-কয়জন শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার পূর্বাশ্রমের প্রণয়-সম্পর্ক ছিল, তাঁহাদের সকলের সঙ্গে এই রিপন কলেজেই প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) পড়িতেন সিটি কলেজে। অবশ্য শুধু রিপন কলেজে অধ্যয়নের প্রসঙ্গেই ইঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—অন্য আরও একটি কারণ এই যোগাযোগের উপলক্ষ্য হইয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ কলিকাতার যে বাটীতে থাকিয়া কলেজের পড়াশুনা করিতেন, ঘটনাচক্রে সেই বাটীতেই একটি ছেলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সতীর্থ এই তরুণের সহিত সম্পর্ক ক্রমশঃ এমনই প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, জীবনের চলার পথে উহা সত্যই অচ্ছেদ্য হইয়া গিয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদের এই তরুণ বন্ধু খগেনই উত্তরকালে স্বামিজীর অন্যতম সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী বিমলানন্দ। আরও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামিজীর আর একজন বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী বোধানন্দও পূর্বাশ্রমে ঐ একই পরিবারভুক্ত ছিলেন। খগেনদের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেদের গোবিন্দপ্রসাদই পড়াইতেন অবশ্য ইহার জন্য কোন বেতন তিনি লইতেন না। খগেনের নেতৃত্বে যে যুবকগোষ্ঠীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে গোবিন্দও উহার নিয়মিত সভ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। আদর্শনিষ্ঠ এই তরুণদলের ধর্মচর্চা, সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-প্রণিধান তাঁহাকে খুবই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইঁহাদেরই সঙ্গে মিলিত হইয়া কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, বরাহনগর মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যে যাতায়াত সুরু হইয়াছিল—উহাকেই গোবিন্দপ্রসাদের অধ্যাত্মজীবনের যাত্রারম্ভ বলা চলে। এইকালে 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সঙ্গলাভ তাঁহার এই যাত্রাপথে দুর্লভ প্রেরণাস্বরূপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নির্দেশই তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের সান্নিধ্যে অনুপ্রেরণ করিয়াছিল। বরাহনগর মঠের সাধুদের জলন্ত ভগবদ্‌বিরহ ও সাধন-তপস্যা গোবিন্দপ্রসাদকে আশ্চর্যরকম আকৃষ্ট করিয়াছিল। যুগাবতারের লীলা-পরিকরগণের অগ্নিস্পর্শে তরুণচিত্ত উত্তরোত্তর

আলোকিত হইতে থাকে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীই এই যুবকগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহচর্য প্রদান করিয়া উদ্দীপনা জোগাইতেন।

রিপন কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অতঃপর ঐ কলেজেই বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। বি. এ. পড়িবার সময় হইতে গোবিন্দপ্রসাদের অন্তরে বৈরাগ্যের অনল আরও তেজোময় হইতে থাকে। মঠ তখন বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া আসিয়াছে। মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও যাতায়াত যতই বাড়িতেছিল, ভগবদ্-অন্বেষণে তাঁহার মন ততই অন্তর্মুখ হইতেছিল। ইতঃপূর্বে বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইয়া রামবাবু-প্রমুখ ভক্তগণের সাহচর্যে আনন্দিত হইতেন, বিমল সুখ অনুভব করিতেন,—আর এখন ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নূতন এক রাজ্যের সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীভগবানের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর দুর্বার হইয়া উঠিতে থাকায়, সংসারের প্রতি ঔদাসিন্যও ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে থাকিল। গোবিন্দের সংসার-বিরাগ লক্ষ্য করিয়া অভিভাবকগণ কিন্তু তাঁহাকে ইতোমধ্যেই বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দ-প্রসাদকে বিবাহ তাঁহারা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সংসারী করিতে পারেন নাই।

১৮৯৩ বা '৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গোবিন্দ সাধন-ভজন ও নিভৃত জীবন-যাপনের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিয়মিত আলমবাজার মঠে আসিয়া সাধুসঙ্গ ও ধ্যান-ধারণাদি করা, বা কখনও কখনও কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের বাগানে গিয়া একান্তবাস ও ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার তত মনোযোগ ছিল না। মাঝে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াও ধ্যান-চিন্তাদি করিতেন।

চাঁচলের রাজার নিকট গোবিন্দের এই ভাবান্তরের সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হয় নাই। ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাজা বোধ হয় নিদারুণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন—কেননা শোনা যায় তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার পড়াশোনার ব্যয়ভার আর বহন করেন নাই। ফলে কিছুকাল পরে, গোবিন্দপ্রসাদের কলেজ অধ্যয়ন বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, সংসারের এই-সব ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার অকল্যাণ কিছুই হয় নাই, বরং বৈরাগ্য আরও

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, কলেজে পাঠরত অবস্থাতেই কোনও সময়ে তিনি জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন—মা তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার নব-জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূলতায় সাধন-ভজনের অসুবিধা হইতে থাকায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর পরামর্শানুযায়ী অবশেষে একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে চলিয়া যান এবং সেখানেই অবস্থান করিয়া নিশ্চিন্তে ধ্যান-ভজনে রত হন। কালীবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে লব্ধ ভিক্ষাদ্বারা কোনও প্রকারে আহারাদি সারিয়া অধিকাংশ সময় জপধ্যানাদিতে কাটাইতেন—আবার মাঝে মাঝে আলমবাজার মঠেও চলিয়া যাইতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তখন মঠের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি গোবিন্দকে অনুগ্রহ করিয়া অতি নিকটে ডাকিয়া নানা উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া সর্বদা প্রাণবন্ত রাখিতেন এবং প্রকারান্তরে তাঁহার ভাবী সন্ন্যাস-জীবনের বনিয়াদও গড়িয়া তুলিতেছিলেন। অবশেষে একদিন রামকৃষ্ণানন্দজীর আদেশেই গোবিন্দপ্রসাদ মঠে আসিয়া স্থায়িভাবে যোগদান করিলেন। তখন ইংরেজী ১৮৯৬ সাল।

গোবিন্দ সংসারকে ছাড়িলেও, সংসার কিন্তু গোবিন্দকে ছাড়িতে চাহিতেছিল না—দৃঢ় শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাড়ীতে আত্মীয়-পরিজন অনন্যোপায় হইয়া চাঁচল-রাজের সহায়তা প্রার্থনা করেন—যাহাতে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের বলে গোবিন্দকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া দেন। রাজ-অর্থে গোবিন্দের স্কুল-কলেজের পড়াশোনা সব কিছু—সুতরাং রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রাজা খুব অনুনয় করিয়া গোবিন্দকে আলমবাজার মঠে একখানি পত্র দিলেন। পত্রের মূল বক্তব্য ছিল যে, রাজার একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে, গোবিন্দপ্রসাদের উপস্থিতি একান্তই অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তিনি দুই-চার দিনের জন্য চাঁচল-রাজবাড়ীতে গেলে রাজা বড়ই উপকৃত হইবেন। গোবিন্দ সরল অন্তরে রাজার অনুরোধে সাড়া দিলেন—অবিলম্বে গিয়া চাঁচল-রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ ও রাজা স্বয়ং তখন তাঁহাকে সংসারত্যাগ না করিবার জন্য বহু অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারও বুঝিতে কিছু বাকী থাকিল না যে, এই উদ্দেশ্যেই ছল করিয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীতে আনা হইয়াছে। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি

স্বামীর কর্তব্য আছে এবং সে-কর্তব্য অবশ্যপালনীয়—কেহ যদি স্বেচ্ছায় এই কর্তব্য অবহেলা করে, তাহার কপালে অশেষ দুর্গতি হয় ইত্যাদি আরও বহু ন্যায়-নীতির কথা রাজা গোবিন্দকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করিতে অথবা তাঁহার রাজকার্যে যে-কোন পদ গ্রহণ করিয়া, সুখে-শান্তিতে সংসার-যাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্তও করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুতেই কিছু ফল হইবার আশা না দেখিয়া, অবশেষে রাজা কঠোর ভাষায় তাঁহাকে বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন নাই। এদিকে পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী সজলচক্ষে সবই দেখিতেছিলেন। সংসারবিরাগী পতিকে গৃহে ফিরাইবার কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজ ইষ্টদেবতার নিকট কাতরে প্রার্থনাই শুধু তিনি জানাইতে-ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ব্রহ্মময়ী দেবীও পরে শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং সাধন-ভজন পূজা-অর্চা লইয়াই বাকী জীবন অতি পবিত্রভাবে অতিবাহিত করেন। যাহা হউক, গোবিন্দকে গৃহমুখী করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রাজবাড়ীর কঠিন প্রহরা উপেক্ষা করিয়া তিনি নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে দ্রুত পলায়ন করিলেন।

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরাসম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

গোবিন্দপ্রসাদের বৈরাগ্যের নিকট ধন-জন-পত্নী-মান-খ্যাতি রাজ-অনুকম্পা ইত্যাদি সবই তুচ্ছ হইল। তিনি একবস্ত্রে সোজা আলমবাজার মঠেই ফিরিয়া আসিলেন।

গোবিন্দের শরীর বাল্যকাল হইতেই রুগ্ন। অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া, এমন হইয়াছিল যে তিনি ভাবিতেন এ-জন্মে আর ঐ শরীর দিয়া কোন উচ্চতর সাধনা সম্ভব হইবে না। শরীর যখন যাইবেই, তখন অন্ততঃ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে উহা পাত হউক—পরজন্মে তাহাতে যোগাভ্যাসের উপযোগী শক্ত-সমর্থ দেহ লাভ হইবে।

গোবিন্দপ্রসাদের এই বিচিত্র চিন্তাই তাঁহাকে অনলস সেবায় ও কর্মে এবং অতন্দ্র ভগবচ্চিন্তায় অনুপ্রেরিত করিয়াছিল। তিনি প্রাণমন ঢালিয়া

সাধন-ভজন ও আশ্রমের নানা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। এমনই ভাবে ইংরেজী ১৮৯৬ সালের শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনধারা ধীর মন্থর-গতিতে ছুটিতেছিল। অকস্মাৎ সেই শান্তগতিতে মহা আলোড়ন দেখা দিল,—বুঝি বা আসন্ন প্লাবনেরই সূচনা ছিল উহা।

১৮৯৭-এর প্রথমভাগে আচার্য স্বামিজী পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত-বার্তা প্রচারান্তে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হইয়াছে। স্বামিজী আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেছেন—গুরুভ্রাতা ও শিষ্য-অনুরাগীদের আনন্দ-উৎসাহের সীমা নাই। গোবিন্দপ্রসাদকে তখন মঠে সকলেই 'শুকুল মহাশয়' বা 'শুকুল' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদিন সহসা স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "কিহে শুকুল, তুমি সাধু হতে এসেছ?" গোবিন্দপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে উত্তর করিয়াছিলেন, "আজ্ঞে, সাধু হবার উপযুক্ত শরীর বা মন কোনটাই আমার নেই। এই পচা শরীর-মনকে যদি আপনার একটু সেবায় লাগিয়ে পাত করে দিতে পারি, তবে বিশ্বাস আছে, পরজন্মে আমার ভাল দেহ-মন হবে। শুধু এই বিশ্বাস নিয়েই এসেছি।" ভাবী শিষ্যের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামিজী সাহ্লাদে 'That's right' (বাঃ বেশ তো), এইরূপ কয়েকবার বলিয়াছিলেন। উত্তরজীবনে শুকুল মহারাজ এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন—বলিতেন, "সজোরে দুই-তিনবার উচ্চারিত স্বামিজীর 'That's right' কথাটি আজও আমার কানে বাজিতেছে।" স্বামিজী প্রসন্ন হইয়া অচিরেই—বোধহয় উক্ত ঘটনার দুই-একদিনের মধ্যেই, গোবিন্দপ্রসাদকে ও নবাগত আর একজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করেন। গোবিন্দপ্রসাদ শুকুলের শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে নবজন্মলাভ হইল—শ্রীগুরুর আশিস্-পূত ঐ শরীরের নাম হইল স্বামী আত্মানন্দ। সন্ন্যাসপ্রাপ্ত স্বামিজীর অপর শিষ্যটিই স্বামী কল্যাণানন্দ। মনে হয়, ইহা ১৮৯৭ এর শেষ, অথবা ১৮৯৮-এর প্রথম দিকের কথা।

মঠে শ্রীগুরুর সাহচর্যে বাস করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুরুসেবা, ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রচর্চাদির সহায়ে আত্মস্থভাবে অবস্থান করিতে আত্মানন্দ এখন হইতে আরও বেশী উৎসাহিত হইতে থাকিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনধামে গিয়া কিছুকাল একান্তবাস ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। শুধুমাত্র মাধুকরীর অন্নে তখন শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তপস্যাকালে আলমোড়া

হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দজী 'শুকুল মহাশয়'-কে পত্রাদি দ্বারা খুব উৎসাহ জোগাইতেন।

আত্মানন্দ শুধুমাত্র ধ্যান-তপস্যাতেই ডুবিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ইহাই ছিল তাঁহার শ্রীগুরুর প্রত্যাদিষ্ট জীবনাদর্শ। তাই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আবেদনও তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানচর্চা বা ভক্তিসাধনারই অনুরূপ সাড়া জাগাইত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ, স্বামিজীর আদেশে রামকৃষ্ণ মিশন যখন প্লেগ-কবলিত কলিকাতাবাসীর সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন সেই ঐতিহাসিক সেবাকার্যে আত্মানন্দের সেবা-নিষ্ঠার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সেবান্দোলনের নেতা ছিলেন স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য সদানন্দ স্বামী—আত্মানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁহারই প্রধান সহকারিদ্বয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি বা ১৯০১-এর প্রথম দিকে তিনি কিষেণগড়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দকে সাহায্যার্থ মঠ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার উদ্যম বিস্ময়কর ছিল। আত্মানন্দের এই সেবাভাব যথার্থই প্রত্যক্ষ-অনুভবজাত,—নিছক কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত ছিল না। পরবর্তী জীবনেও দেখা যাইত, কত নিষ্ঠা ও প্রাণ সংযুক্ত থাকিত তাঁহার সেবাদৃষ্টিতে। যখন তিনি ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ, তখন একদিন আশ্রম-পরিচালিত চিকিৎসালয়ের রোগীদের পথ্য গ্রহণের পূর্বে সাধু সেবকগণ আহার করিতে বসিলে, তিনি ব্যথিতচিত্তে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণদের আগে না খাইয়ে, তোমরা কি করে খেতে বসলে?" আহা সেদিন কতই না বিরক্তি ও বেদনা তাঁহার মুখেচোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! মানুষের মধ্যে এই নারায়ণ-দৃষ্টি আত্মানন্দের জীবনে অতি স্বাভাবিক হইয়াছিল, স্বামিজীরই কৃপায়।

আত্মানন্দের গুরুভক্তি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস ছিল অনন্যসাধারণ। বরাবরই তিনি নিরামিষাশী—মনে হয়, এ সংস্কার তাঁহার বেশ প্রবলই ছিল। স্বামিজী একদিন শিষ্যের এই সংস্কার কত দৃঢ়, অথবা তাঁহার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা কতখানি অকপট তাহা পরীক্ষার জন্য সহসা নিজের হাতে মাছের টুকরা আত্মানন্দের পাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গুরুদেবের প্রসাদজ্ঞানে শিষ্য নিঃসঙ্কোচে ও পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই মাছ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে

স্বামিজী সংস্কারমুক্ত শিষ্যের ভক্তিতে প্রীত হন, এবং তাঁহার নিষ্ঠার খুব প্রশংসা করিয়া উহা ভঙ্গ করিতে নিষেধ করেন। স্বামী আত্মানন্দের জীবনের সর্ববিধ সিদ্ধির মূলে ছিল, তাঁহার অগাধ বিশ্বাস—অবিচল গুরুভক্তি। একদা স্বামিজী তাঁহার নিজের সম্পর্কে নানা উদ্ভট ও কৌতুকপূর্ণ কতকগুলি মন্তব্য করিয়া সরল শিষ্যকে পরখ করিবার জন্য বলেন, "...ভেবে দেখ্, তবুও কি আমাকে তুই গুরু বলে মানবি?" আত্মানন্দ মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনি যা খুশি বলুন, যা ইচ্ছা করুন। আমি জানি আপনিই আমার ইহকাল-পরকাল।" পরিণত বয়সে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস সাধুজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস অধিকতর প্রয়োজন।"

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কত যে মধুর ও তাৎপর্যপূর্ণ হইতে পারে, তাহা স্বামিজীর সন্নিধানে আত্মানন্দকে দেখিলেই অনুভব করা যাইবে। শিষ্যবৎসল স্বামিজী এমনই বালকস্বভাব ছিলেন যে, নিজ-শিষ্যদের সহিত অনেক সময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় মেলামেশা করিয়া, তাঁহাদের জীবনের অতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকেও মার্জিত ও পরিশোধিত করিয়া দিতেন। অবশ্য আচার্য-পুরুষদের লক্ষণই এইরূপ। আত্মানন্দের মধ্যে তাঁহার শ্রীগুরুর যে সুন্দর প্রতিবিম্বটি পরবর্তিকালে সকলকে মুগ্ধ করিত, ইহা তাঁহার সাধন-জীবনে লব্ধ একান্ত গুরু-সাহচর্যেরই ফল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয়: আত্মানন্দের নিজের বিছানাপত্র বা কাপড়-জামা খুবই বাহুল্যবর্জিত এবং নিতান্ত সামান্য ছিল চিরকাল। অথচ দেখা যাইত যে, খুব পরিষ্কার-পরিপাটি একটি শয্যা তিনি নিত্যই খুব নিষ্ঠা সহকারে রচনা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিজের দৈনন্দিন জীবনযাপন ছিল খুব কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ—অথচ অকারণ কেন এত যত্ন করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখেন, ইহা সকলেরই বড় বিস্ময়ের বস্তু ছিল। একবার জিজ্ঞাসিত হইলে, সজলচক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠে স্বামিজী মাঝে মাঝে এসে আমার বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন। তাঁহার দেহান্তের পরেও একদিন স্বপ্নে দেখলুম, তিনি আমার বিছানায় শুয়েছেন।...দেখ, কখন তিনি আসবেন তা তো জানা নেই। তাই, তাঁর জন্য বিছানাটি তৈরী করেই রাখি!" বলিতে বলিতে সেদিন তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছিল। চলা-ফেরা, পদক্ষেপ, এমনকি বহির্বাস পরিধানের আদব-কায়দাটি পর্যন্ত তিনি স্বামিজীর কাছে শিক্ষালাভ করিয়া-

ছিলেন। মঠে স্বামিজী একদিন ভজন গাহিতেছেন, হঠাৎ আত্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "শুকুল, তব্‌লা বাজা তো।" শুকুল তো সভয়ে উত্তর দিল, "আমি যে তবলা বাজাতে জানি না।" স্বামিজী সস্নেহে তিরস্কার করিলেন, "জানিস্ না কি রে? আয় শিখিয়ে দি।" শ্রীগুরুর প্রেরণায় আত্মানন্দ পরে কুশলী তবলাবাদক হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পাখোয়াজেও তাঁহার দক্ষতা ছিল—ধ্রুপদ গানের সঙ্গে নিজেই বাজাইতেন। ধ্রুপদ গান স্বামিজীর বড় প্রিয় ছিল, আত্মানন্দেরও তাহাতে অনুরাগের সম্ভবতঃ ইহাই কারণ। স্বামিজীর গানের সঙ্গেও তিনি অনেকবার বাজাইয়াছেন।

আত্মানন্দের ধ্যানশীলতা ও শাস্ত্রানুরাগ তাঁহাকে স্বামিজীর বিশেষ স্নেহাস্পদ করিয়াছিল। গীতা, উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রপাঠে তাঁহার অনুরক্তি মঠের অন্যান্যদেরও শাস্ত্রপাঠে প্ররোচিত করিত। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি স্বামিজীর এত আস্থা ছিল যে, তাঁহার দ্বারা তিনি মঠে শাস্ত্রাধ্যাপনাও করাইতেন।

মঠে অবস্থানকালে শাস্ত্রচর্চা, সাধন-ভজন এবং গুরুসেবা ব্যতীতও আত্মানন্দ নানাবিধ কঠিন পরিশ্রমের কাজ পরম আনন্দের সঙ্গে করিতেন। মন্দির-মার্জনা ও ঠাকুর-পূজা তাঁহার অন্যতম প্রিয় কার্য ছিল। সারা দিনের কঠোর শ্রম ও পূজা-পাঠাদি করিয়াও, দিনের পর দিন সাধুদের সেবার নিমিত্ত রাত্রে কয়েক সের আটা ঠাসিয়া রুটি বেলিতে তাঁহাকে কেহ অপ্রসন্ন দেখেন নাই।

'উদ্বোধন'-পত্র পরিচালনার ভার তখন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর উপর ন্যস্ত ছিল। আত্মানন্দ কিছুকাল এই কার্যে ত্রিগুণাতীত মহারাজের সহকারী ছিলেন। সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাদি, বিশেষ তাঁহার নাটকগুলি, আত্মানন্দ কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করিতেন। গিরিশবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া তিনি বলিতেন, "অত বড় কবি! গিরিশবাবুর অধিকাংশ নাটক 'ভাবমুখে' লেখা। ভাবের তোড় এলে তিনি বসে যেতেন, আর দুই তিনটি লেখক তা লিখে নিতেন।··· সেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখা যায়, আর গিরিশবাবুর নাটকের ছত্রে ছত্রে গভীর দার্শনিক ভাব আছে।" আবার

ইহাও বলিতেন, "মানুষ কত নিম্ন থেকে কত উচ্চে উঠতে পারে, কত অসৎভাব থেকে সৎভাবে যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত যেমন সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় গিরিশবাবুর নাটকে লিখিত, তেমনটি অন্য কোন গ্রন্থে পাইনি।" স্বামিজীর মুখে তিনি বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রসঙ্গাদি শুনিবার সৌভাগ্যও অনেকবার লাভ করিয়াছিলেন। একবার মঠে ঐরূপ একটি আলোচনা-চক্রে স্বামিজী উপস্থিত যুবক সাধুদের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা বল্ তো মাইকেল মধুসূদন দত্তর কোন্ বইখানা শ্রেষ্ঠ?" আলোচনায় স্বামিজী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যই মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সেদিন স্বামিজী আত্মানন্দকেই দৌড়িয়া গিয়া বইখানা আনিতে আদেশ করেন। বই আনা হইলে, তাঁহাকেই প্রথমে বইটির স্থানবিশেষ খুলিয়া পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য, পরে স্বামিজী নিজেই অনর্গল পড়িয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামিজী অত্যন্ত আবেগের সহিত বই-এর সেই জায়গাটি পাঠ করিয়াছিলেন, যেখানে বর্ণনা আছে—মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে। রাবণ ও মন্দোদরী পুত্রশোকে বিহ্বল। নানা ভাবে পিতা ও মাতা বীর পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছেন। এমন সময়ে দৌবারিক সংবাদ দিয়া গেল, দ্বারদেশে শত্রু উপস্থিত। রাবণ তৎক্ষণাৎ যেন ভিন্নমূর্তি ধারণ করিয়া মন্দোদরীকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাণী, এখন শোক প্রকাশের সময় নয়। আমাকে অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হতে হবে। শোক পরিত্যাগ করে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য বিদায় দাও।" স্বামিজীর সেই তেজোদৃপ্ত পাঠ ও আলোচনা আত্মানন্দের স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল। অতন্দ্র কতর্ব্যনিষ্ঠাই জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে—ইহাই তিনি স্বামিজীর নিকট হইতে সেদিন শিখিয়াছিলেন। স্বামিজীর স্মৃতি-প্রসঙ্গে এই ঘটনাটিও তিনি খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করিতেন।

১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই তাঁহাকে প্রচণ্ড এক আঘাত হানিয়াছিল। স্বামিজীর লীলা-সংবরণে গুরুগতপ্রাণ আত্মানন্দ শোকে ক্ষোভে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা পরে নিজেই একবার এইরূপ বলিয়াছিলেন: "স্বামিজীর দেহত্যাগের পর আর সংসারে থাকার মোহ রইল না। শরীর থাক্ আর যাক্ এই সঙ্কল্প নিয়ে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম। ঘরে ঢুকতাম না,

কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হতো না, খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে উঠতই না।" শ্রীগুরুর স্ব স্বরূপে লীন হওয়ায়, আত্মানন্দও জগৎ-সংসার হইতে মন উঠাইয়া লইয়া কঠোর আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বামিজীর পবিত্র সমাধিভূমির অদূরে একটি পর্ণকুটির বাঁধিয়া, সেখানেই পড়িয়া থাকিতেন—ধ্যানজপ ও শাস্ত্রপাঠ লইয়াই অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতেন। বেলুড়ের গঙ্গাতটে ঐরূপ তপশ্চর্যা তিনি বেশ কিছুদিন করিয়াছিলেন। দুপুরে স্বয়ং মঠ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন আর রাত্রে কয়েকটি রুটি মঠ হইতে কেহ গিয়া তাঁহার কুঠিয়ায় রাখিয়া আসিতেন। অবশেষে মঠের কোন কোন সাধুর উপরোধে তিনি আবার মঠবাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কিন্তু তখনও আত্মানন্দের চক্ষে স্বামিজীর বিরহে মঠের সর্বত্রই এক মর্মান্তিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। এ অবস্থাটি কাটাইয়া উঠিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল।

কোন অবস্থাতেই কিন্তু আত্মানন্দের শাস্ত্রচর্চার বিরাম ছিল না। স্বামী সারদানন্দজী স্বয়ং তখন মঠে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেন। সারদানন্দজীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নের সুযোগ আত্মানন্দ একটি দিনের জন্যও হারান নাই—বেদান্ত-নিষ্ঠা ছিল তাঁহার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত নিজের গুরু বলিয়াই কি স্বামিজীর অদর্শনে আত্মানন্দ এতখানি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা এই আচার্য-শিষ্যের মাঝে আরও কিছু রহস্য-সূত্র আছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? স্বীয় জীবনের একান্তই ব্যক্তিগত কোন ঘটনাবিশেষের উল্লেখ করিয়া পরবর্তিকালে আত্মানন্দকে আবেগ-রুদ্ধকণ্ঠে, অন্তরঙ্গ সেবকদের নিকট বলিতে শোনা গিয়াছে, "···সেদিন স্বামিজীকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তিনিই আমার সামনে দাঁড়িয়ে······।" মঠ ভূমিতে দণ্ডায়মান স্বামিজীর সম্মুখে উপবিষ্ট ভীত-চকিত শিষ্যের এই সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি গভীর অর্থজ্ঞাপক। আবার একথাও প্রায়ই তিনি বলিতেন, "স্বামিজী শিবাংশে জাত।" স্বামিজী সম্পর্কে তাঁহার উক্তিগুলি ছিল হৃদয়-নিংড়ানো সত্য—ভাবে ও প্রকাশে অতুলনীয়। স্বামিজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন, বলিতেন, "অতবড় আচার্য আর আসেননি।"

সন্ন্যাসী আত্মানন্দের জীবন কর্মবহুল না হইলেও, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মসাধনা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উঁহার

বাহ্যিক পরিধি খুব চমকপ্রদ না হইলেও, ভাবের গভীরতায় কিন্তু উহা নিঃসন্দেহে অবদানমূলক। কর্ম সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব ভাবটি এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—ইহাও তিনি গুরু বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। কর্মযোগ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল এইরূপ: "সাধু জীবনের উদ্দেশ্য মনকে একাগ্র ও অন্তর্মুখীন করা। স্বামিজী ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই কর্মযোগের সাধনা করতেন। তাঁর মতে যে ভাল করে ঝাঁট দিতে পারে, সে তন্ময় হয়ে ধ্যানও করতে পারে। নিবৃত্তিমূলক কর্মযোগই সাধুজীবনের লক্ষ্য। সকাম কর্ম সাধুজীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কর্ম যদি কর্মীর অন্তরে অহংভাবকে নাশ করে নিবৃত্তি ও অনাসক্তির দিকে না নিয়ে যায় তাহলে তা অন্তর্জীবন গঠনের সহায়ক হয় না। 'যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি।' উপায় বা সাধনা ঠিকমত হলে সিদ্ধি স্বতঃই আসে। এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ও সৃষ্টির রহস্য। আর এই হ'ল কর্মযোগীর আদর্শ।" আত্মানন্দের নিজের জীবনে কর্মযোগের এই আদর্শটিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে মান্দ্রাজ মঠে কর্মিরূপে যাইতে হয়। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সেইবারই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী (Trustee) এবং মিশনের কার্যনির্বাহক পরিষদের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।

ব্যাঙ্গালোরে তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পরিশ্রমে, প্রচারে ও প্রভাবে বেশ কিছুসংখ্যক লোক ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে আকৃষ্ট এবং তাঁহাদের চেষ্টায় তথায় একটি আশ্রমও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু একা রামকৃষ্ণানন্দজীর পক্ষে মান্দ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোর এই উভয় স্থানের কর্মপরিচালনা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। জিজ্ঞাসু ভক্তের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছিল—তাঁহাদের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা ও ধ্যানধারণাদির উপদেশ প্রদান রামকৃষ্ণানন্দজীর পক্ষে উপযুক্ত সহকারী ব্যতীত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে তিনি আত্মানন্দের উপরই ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ভার সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের পরিচালনা—উহার সর্ববিধ সংগঠনমূলক কার্য এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবাদর্শ প্রচার তাঁহার কর্মজীবনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ব্যাঙ্গালোরে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে,

আত্মানন্দের ন্যায় ত্যাগী, শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্মযোগীর সাধনা রহিয়াছে বলিয়াই, উহা আজ মিশনের একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্দ্রে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

স্বামী আত্মানন্দকে স্থানীয় প্রাচীন ভক্তরা অদ্যাবধি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এ শ্রদ্ধা তাঁহার বাঙ্‌নৈপুণ্য বা প্রচার-কুশলতার জন্য নহে—তাঁহার সাধুচরিত্র, মাধুর্যময় ব্যক্তিত্ব এবং ভগবন্নিষ্ঠ জীবনযাপন-প্রণালীই ইহার কারণ। আত্মানন্দের বাগ্মিতা ওজস্বিনী হইলেও, বক্তৃতাদি তিনি বিশেষ দিতেন না। তাঁহার বক্তৃতাদির সংখ্যা যদিও খুবই কম, কিন্তু চিন্তাশীলতার দিক হইতে ভাষণগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। 'প্রবুদ্ধ ভারত' (Prabuddha Bharata) ও তদানীন্তন 'ব্রহ্মবাদিন্‌' (Brahmavadin)-পত্রে তাঁহার কিছু কিছু ইংরেজী ভাষণ তখন প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সেইসব প্রবন্ধাবলী সঙ্কলিত হইয়া কখনও পুনঃপ্রকাশিত হইলে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুদের পক্ষে পরম উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই। স্বামী সারদানন্দজী আত্মানন্দকে আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারকরূপে প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—এমনকি ব্যাঙ্গালোরে তাঁহাকে তার করিয়া এ প্রস্তাব জানানও হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশে যাইতে তিনি সম্মত না হওয়ায়, প্রস্তাবটি কার্যকরী হয় নাই। যাহা হউক, প্রায় ছয় বৎসর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মভার ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, আত্মানন্দের প্রিয় গুরুভ্রাতৃদ্বয় বোধানন্দ এবং বিমলানন্দ ব্যাঙ্গালোরের কাজ-কর্মে তাঁহাকে কিছুকাল সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১০-এর সূচনাতেই আত্মানন্দের জীবনে এক পরম শুভ যোগাযোগ উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণভারতের তীর্থাদি দর্শনে আগমন করিয়াছেন। মায়ের রামেশ্বর দর্শনের উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় জগজ্জননীর সঙ্গে তাঁহারও ভাগ্যে রামেশ্বর দর্শনের সুযোগ ঘটিয়া গেল। তীর্থ-পরিক্রমা অপেক্ষাও জীবনারাধ্যা ইষ্টদেবীর পুণ্যসন্নিধিলাভ, মাতৃভক্ত আত্মানন্দের এক পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু ছিল। দক্ষিণভারত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা ব্যাঙ্গালোরেও সাতদিনের জন্য পদার্পণ করিয়াছিলেন। তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া মা মাদ্রাজ হইয়া, পুরীতে কয়েকদিন বিশ্রাম লইয়া

কলিকাতায় পৌঁছিয়া বেলুড় মঠে আগমন করেন। আত্মানন্দও মায়ের সঙ্গে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এই তীর্থভ্রমণের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের মণিকোঠায় আজীবন সযত্নে রক্ষিত ছিল। জননীর প্রিয় সন্তান শুকুলের মাতৃভক্তি অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয়, উহা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নহে। তাঁহার উত্তর-জীবনের একটি প্রাণস্পর্শী ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য:

তখন তিনি ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ। শ্রীশ্রীমা লীলাসংবরণ করিয়াছেন। মায়ের পূতাস্থি ঢাকা মঠে নিত্যপূজার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইতেছে। পূতাস্থি তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই—বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যাইতেছে। মাতৃভক্ত শুকুল মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায় ঘর-বাহির করিতেছেন। সেদিন তাঁহার কী ভাব! মুখেচোখে যেন দিব্যজ্যোতিঃ ফাটিয়া পড়িতেছে। কী একটা আবেশে, যেন অফুরন্ত কোন আনন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে, অনাহারে উপবাসে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তিরও মনে হইয়াছিল, 'আহা মাতৃহারা শিশু বুঝি এতদিনে তাহার মাকে আবার ফিরিয়া পাইবে।' আশ্রমের ভাণ্ডারে নির্দেশ দিলেন, মায়ের জন্য আগে হইতেই যেন ভাত রান্না করা না হয়। হাঁড়িতে জল ফুটিতে থাকিবে, আশ্রমে মা পৌঁছিলেই তবে চাউল ছাড়িতে হইবে। পথশ্রান্তা মা যেন আসিয়া গরম গরম আহার করিতে পারেন, তাহারই জন্য দরদী সন্তানের এই ব্যবস্থা। সকলে জানিত পূতাস্থি আসিতেছে—আত্মানন্দ কিন্তু মায়ের প্রত্যক্ষ আগমনই অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছিলেন। সত্যই যখন পবিত্র অস্থি-পাত্র মঠ-ভবনে আনীত হইল—তখন আত্মানন্দের অশ্রুসিক্ত রক্তিম বদন দেখিয়া উপস্থিত কাহার না বোধ হইয়াছিল যে, মা আজ হইতে এই আশ্রমে নিত্য অধিষ্ঠিতা হইলেন? সেদিনের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই।

একবার কিছুকালের জন্য ভুবনেশ্বরে তিনি চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। তখনও সেখানে মঠ স্থাপিত হয় নাই। প্রসন্নবাবু নামে জনৈক ভক্তের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি পর্ণকুটীরে থাকিয়া তিনি তখন তপস্যারত ছিলেন। অপর একজন সাধুও এই সময়ে তাঁহার দেখাশোনার জন্য সঙ্গে ছিলেন। এইকালে তাঁহার কঠোর সাধন-ভজন ও ধ্যান-তন্ময়তা সেবক সাধুটিকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিল। একদিন একটি বিষাক্ত সাপ কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করায়, সেবক বিচলিত হইয়া পড়িলেন, ধ্যানমগ্ন আত্মানন্দ কিন্তু যেমন

নিশ্চল ছিলেন তেমনি নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিলেন। এদিকে সেবক ভীত হইয়া 'সাপ এসেছে, সাপ এসেছে' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন।[১] এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাদ্বারা বুঝিতে বিলম্ব হয় না আত্মানন্দের ধ্যানপরায়ণতা কত গভীর ছিল। এই ভুবনেশ্বরেরই একটি দিনের কথা এখানে স্মরণ করিলে, তাঁহার মাতৃগতপ্রাণতার আরও একটি অতি মধুর চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিবে। একদা মহাষ্টমীর গভীর নিশীথে, মাতৃভক্ত সন্ন্যাসি-সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে নিজহস্তে প্রস্তুত পায়েসের বাটি ধরিয়া বালকের ন্যায় একাকী রোদন করিতেছেন—গণ্ড বাহিয়া অশ্রুবন্যা বহিয়া চলিয়াছে, আর বলিতেছেন, "মা, করেছ সন্ন্যাসী। কি দিয়ে আর তোমার পূজা করি?" মায়ের সঙ্গে সন্তানের এমন সকরুণ আলাপ অগোচরে কেহ কখনও শুনিয়া ফেলিলে, তাহারও প্রাণে ভক্তির তরঙ্গ খেলিয়া যাইত।

শ্রীশ্রীমায়ের করুণা ও আশীর্বাদ তাঁহার এই প্রিয় সন্তানের আধ্যাত্মিক জীবনে কতদূর অনুরণন তুলিত, তাহা সাধারণ লেখনীতে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। তথাপি দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়াও পারা যায় না। আত্মানন্দ একদা নিজমুখে অন্তরঙ্গ বাল্যসহচর ও গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে একটি দিব্যস্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কথা হইতেছিল সমাধির আনন্দ সম্পর্কে। আত্মানন্দ বলিতেছেন, তেমন আনন্দ নাকি একবার একটি আশ্চর্য সুস্বপ্নে তিনি বোধ করিয়াছিলেন—আর সেই আনন্দ স্মৃতিই তাঁহাকে অধ্যাত্মপথে প্রচুর প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়া থাকে। তিনি একদিন তন্দ্রার আবেশে বোধ করিয়াছিলেন যেন শ্রীশ্রীমায়ের ক্রোড়ে তিনি শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে বসিয়া অনন্ত উত্তাল-তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। প্রচণ্ড ঊর্মিবেগ মাতৃ-অঙ্কে আসীন শিশু শুকুলকে আদৌ চঞ্চল করিতে পারিতেছে না—এক অনির্বচনীয় আনন্দে সে বিভোর। দেখিতে দেখিতে আত্মানন্দের বাহ্য-সংজ্ঞা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ সময় এইভাবেই কাটিয়াছিল।

১ 'উদ্বোধন', অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, সংখ্যায় স্বামী করুণানন্দ-লিখিত "ব্রহ্মলীন স্বামী আত্মানন্দ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্রমে আবার স্পষ্ট অনুভব করিলেন যেন স্নেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে তিনি নৃত্য-চপল শিশুমাত্র।[১]

বেলুড়মঠে আত্মানন্দের জীবনচর্যা নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিকট আদর্শ-স্বরূপ ছিল। প্রাচীনদেরও তাঁহার উপর আস্থা ছিল অপরিসীম। নবাগত কয়েকটি যুবক ব্রহ্মচারী একদিন বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে—এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দজী তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে সস্নেহে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোরা মঠে যখন এসেছিস্, তখন শুকুল মশায়ের সঙ্গে ওঠাবসা কর্, কথাবার্তা বল্। তাঁর কাছে ত্যাগ-তপস্যা শেখ্। তোদের কল্যাণ হবে। বৃথা সময় নষ্ট করিস্নি।" স্বামী প্রেমানন্দজী একবার কিছুদিন মঠে অনুপস্থিত থাকায়, আত্মানন্দের উপরই মঠের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। সাধুজীবনের লক্ষ্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি এতখানি সজাগ ছিলেন যে, এ-বিষয়ে কাহারও সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। কেহ একবার মঠে সাধুদের বাসগৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া আগন্তুক জনকয়েক মহিলাভক্তকে বসিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে শুকুল মহারাজ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আজ একটি খুব গর্হিত কাজ করলে, মঠের একটি নিয়ম ভাঙ্গলে।" সাধুদের থাকিবার ঘরে স্ত্রীলোকের আসা-যাওয়া সন্ন্যাসীদের মঠে নিয়মবিরুদ্ধ।

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দীর্ঘকাল ঠাকুরের নিত্যপূজাদি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি নিজেই করিয়াছেন। তাঁহার ভাবোদ্দীপক সেবা-পূজা অপরের মনেও আবেগের সঞ্চার করিত। স্বয়ং স্বামী প্রেমানন্দজীই তাঁহাকে পূজাদি শিক্ষাপ্রদান করেন এবং পূজকের আসনে বসাইয়াছিলেন। ভক্তিবিনত আত্মানন্দকে তাঁহার সুনিপুণ ঠাকুর-সেবায় কেহ

১ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর একটি পত্রের উদ্ধৃতি:

"One day he narrated to me a dream that he had seen (perhaps some years ago) : He was floating, as it were, on the surface of an ocean, lying in the lap of the Mother. At last he felt an unspeakable bliss—as if torrents of bliss were gushing up everywhere—and he lost all outward consciousness. As he came back to his senses after a long time he found himself to be a little child, dancing in the arms of the Mother."

—*Prabuddha Bharata*, Nov., 1923.

প্রশংসা করিলে, তৎক্ষণাৎ বলিতেন, "আমি কি আর ঠাকুরের পূজা করতে পারি? ঠাকুরের এক পার্ষদ আমার হাত ধরে পূজায় বসিয়ে দেন। তাই করছি। ঠাকুরের পূজা করা খুব শক্ত।" তাঁহার চক্ষে ঠাকুরের প্রতিকৃতি বা বিগ্রহ কতখানি প্রত্যক্ষ ছিল,—তাঁহার ভাব-দৃষ্টি কী দূরপ্রসারী ছিল, উহার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, যে সাধু বা ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে ঠাকুরের পূজা করিতেন, তাঁহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তিনি দিতেন না। ঐরূপ কেহ প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিলে আত্মানন্দ বলিতেন, "কত ভাগ্যবান তোমরা—ঠাকুর-সেবার অধিকার লাভ করেছ। যে হাত দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবানের পূজা-সেবা কর সে হাত কি আর মানুষের পায়ে লাগাতে আছে? না না, তা কখনই উচিত নয়।" আবার একথা তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—"শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামিজী—এঁরাই ভগবান, এঁদের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করবে।" মঠের বিশেষ পূজাদিতে তিনি পূজক এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক—এমনটি দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই বহুবার হইয়াছে। ইঁহাদের নিরভিমান সাধু-জীবন ও সুবিনীত আচরণ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। এই পূজা-প্রসঙ্গেই উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্মরণীয়: স্বামী শুদ্ধানন্দ যেখানে তন্ত্রধারক, আর স্বামী আত্মানন্দ যেখানে পূজক, এ-হেন দুর্লভ সংযোগকেও সুরসিক আত্মানন্দ বলিতেছেন, "আমরা আর কি পূজা করব? পূজক ল্যাংড়া আর তন্ত্রধারক কানা। শশী মহারাজ বা বাবুরাম মহারাজ যখন পূজা করতেন তখন পূজা কি জমত! যারা দেখত, তাদেরও ভক্তিবৃদ্ধি হত। আহা এমন পূজা দেখলেও কল্যাণ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের প্রতিও কী গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার বাক্যে ও আচরণে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহাদের প্রসঙ্গে তিনি সঙ্ঘের নবাগতদের বলিতেন, "তাঁরা (ঠাকুরের সন্তানরা) ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ।"

স্বামিজীর গ্রন্থাবলী নিত্য নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা ছিল আত্মানন্দের অতিপ্রিয় অভ্যাস—তিনি যেখানেই থাকুন, এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। স্বামিজীর পুস্তকাদি পাঠ তাঁহার কাছে শাস্ত্রচর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শোনা যায়, তিনি স্বয়ং নাকি চব্বিশবার স্বামিজীর সম্পূর্ণ রচনাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। আবার এই পাঠ অর্থ শুধু পড়া নহে—স্বামিজীর এক একটি বাণীকে তিনি মন্ত্রজ্ঞান করিয়া উহার উপর গভীর মনন করিয়াছেন—

দিনের পর দিন ধ্যান করিয়াছেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে, সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি স্বামিজীর গ্রন্থাবলী অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার মুখে স্বামিজীর মূল রচনাদির পাঠ যে কত ওজস্বী ও শক্তিপ্রদ শুনাইত, তাহা যাঁহারাই শুনিয়াছেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন। আত্মানন্দের ইংরেজী উচ্চারণ ও সুস্পষ্ট পাঠ এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। বিশুদ্ধ পাঠ-বিধিও তিনি অনেককে শিক্ষা দিতেন। স্বামিজীর বাণী ও রচনা সম্পর্কে তিনি বলিতেন, "শিববাক্য একটিও মিথ্যা হবার নয়। তিনি যা যা বলেছেন সব সত্য—কালে সব সত্য হবেই। স্বামিজী বৃথা বাক্য একটিও ব্যবহার করেননি। তাঁর কথা থেকে সামান্য একটি কমা-ও বাদ দেবার নয়।" স্বামিজীর উক্তিনিচয় তাঁহার কতখানি প্রাণের জিনিস, কত সাধনার বিষয়, তাহা তাঁহার একদিনের একটি কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। জনৈককে একদিন বলিয়াছিলেন, "অনেকে বাহাদুরী দেখিয়ে বলে, 'স্বামিজীর অমুক বইখানা আমি একদিনে পড়ে শেষ করেছি।' আমি কিন্তু স্বামিজীর বই-এর কোন কোন অংশ তিন দিন ধরে ধ্যান করতাম। তাতে তাঁর বাণীর সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি হত। এক নিঃশ্বাসে তাঁর বই পড়ে কি বুঝবে?" আবার বিরক্তির সঙ্গে এরূপ মন্তব্যও করিয়াছেন, "শাস্ত্রবাক্য কিংবা ঠাকুর-স্বামিজীর কথা সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়, ধ্যান ও উপলব্ধির বিষয়। অলকটপ্পা মারবার বিষয় নয়।"

স্বামিজীর গ্রন্থকে তিনি যে কী সম্মান দিতেন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। এইরূপ উচ্চচিন্তা-উদ্দীপক বই একটানা গড় গড় করিয়া পড়িয়া যাওয়া তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যখন তিনি সম্বলপুরে আছেন, একদিন তাঁহার সম্মুখে স্বামিজীর কোন গ্রন্থ ঐরূপ দ্রুত কেহ পড়িতেছিলেন। আত্মানন্দ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "স্বামিজীর বই একসঙ্গে এতখানি পড়ে কেউ কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আমি তো অনেক সময়ে তাঁর একটি মাত্র বাক্যের ভাব বুঝবার জন্য পনেরদিন ধরে চিন্তা করেছি।" নিছক ভাষাজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে স্বামিজীর বাণীর মর্মার্থ গ্রহণ করা যায় না, তাহাও ঐ সম্বলপুরেরই একটি দিনের ঘটনা স্মরণ করিলে উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যেই কেহ তাঁহার কাছে স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। উচ্চশিক্ষিত একজন স্থানীয় ভদ্রলোক তাঁহার নিকট নূতন

যাতায়াত করিতেছেন,—একদিন তিনি আত্মানন্দের কাছে বসিয়া স্বামিজীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। নবাগত পাঠকের ইংরেজী পাঠ সত্যই খুব প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু তাঁহার ভাবের দিকে তত নজর ছিল না। পাঠশেষে দেখা গেল, আত্মানন্দ একটু গম্ভীর। পাঠক ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে, উপস্থিত জনৈক ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন, "—বাবু আজকের পাঠটাই নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি আগেই এসে আসনে বসে পাঠ আরম্ভ করে দেবেন। ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব না পেলে কি কেউ এসব বই ঠিক ঠিক পড়তে পারে? শুধু কতগুলো পাশ করলে আর ইংরেজী জানলে কী হবে? আসল হচ্ছে ভাব।"

যুগাচার্য স্বামিজী এবং তাঁহার বাণী সম্পর্কে আত্মানন্দের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও হৃদয়াবেগ তাঁহার জীবনালোচনা করিলে বহুভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে ঘটনার পর ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কথামৃত' পাঠ অপেক্ষাও, স্বামিজীর বাণী পাঠ করিতে তিনি এতবেশী জোর দিয়া থাকেন কেন, এরূপ সন্দেহ অনেকেরই মনে জাগিতে পারে। একটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই ইহারও উত্তর পাঠকের মিলিবে। একদা জনৈক ভক্তকে আত্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "অফিসের ও সংসারের কাজকর্ম ছাড়া আপনার অন্য সময় কি ভাবে কাটে?" ভক্তটি সবিনয় উত্তর দিয়াছিলেন, "একটু একটু 'কথামৃত' পাঠ করি।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, "স্বামিজীর বই পড়েছেন কিছু?" 'না' জবাব শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর বই না পড়ে এবং তাঁর ভাবকে হৃদয়ঙ্গম না করে, 'কথামৃত' পাঠ করলে কি বুঝবেন? 'কথামৃত' নবযুগের বেদ, আর স্বামিজীর রচনাবলী সেই বেদেরই ভাষ্য। ভাষ্য না পড়লে বেদ বোঝা যায় না। কাজেই স্বামিজীর ভাষ্য ধরে, 'কথামৃত' পাঠ করলে তবে ঐ বেদের ভাবার্থ হৃদ্গত হবে।

সম্বলপুরের একটি স্মৃতি-চিত্র এখানে স্মরণযোগ্য: 'কথামৃত' পাঠ চলিতেছে। আত্মানন্দ তন্ময় হইয়া অনন্যমনে সেই পাঠ শুনিতেছেন। পাঠ শেষ হইয়া গেলেও, বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "'কথামৃতে' লিখিত ঠাকুরের কথা তাঁরাই ধারণা করতে পারেন, যাঁদের পরমহংস অবস্থা হয়েছে। তাঁর কথা জীবনে প্রতিফলিত করতে মুমুক্ষুরাই পারেন। 'কথামৃত'-পাঠ শুনতে শুনতে অনেকে বলেন, 'ঠাকুর এটা বেশ

বলেছেন', 'আহা কী প্রাণের কথা এসব!' কিন্তু তাঁর উপদেশ জীবনে পালন করতে পারেন এমন লোক কোথায়? দেখ, তোমাদের ঠিক বলছি, ঠাকুরের উপদেশ বুঝতে হলে স্বামিজীর জীবনী ও বাণী পড়া, সাধুসঙ্গ করা এবং সাধন-ভজন করা একান্ত আবশ্যক। ঠাকুরকে বুঝতে হলে আগে স্বামিজীকে বুঝতে হবে। আধুনিক মানুষের ধর্মজীবন গঠনের মূল সূত্রগুলি স্বামিজীর গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।"

আত্মানন্দের বৈরাগ্য-দৃপ্ত জীবন মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছে সর্বতোভাবে অনুকরণীয় ছিল। শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা ছাড়াও, তাঁহাদিগকে আদর্শ সাধু হইবার পথে তিনি নানাভাবে উপদেশ ও প্রেরণাদি প্রদান করিতেন। সংসার-ত্যাগী তরুণ সাধুদিগকে তিনি বলিতেন, "পূর্বাশ্রমের জীবন একেবারে ভুলে যাও। মনে কর, মঠে নূতন জন্ম হয়েছে। সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি বার বার পড়বে এবং মর্মার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে। সন্ন্যাসী স্বগৃহে যাবে কেন? বার বৎসর পরে স্বগৃহে একবার যাবার কথা থাকলেও তা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।...হরি মহারাজকে দেখ। সংযতচরিত্র সাধুর শরীর ভাঙ্গে, কিন্তু মুখ ভাঙ্গে না। সংযমের অভাব হলেই চোখ বসে যায়।" তিনি বলিতেন, পূর্বাশ্রমের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখাও সন্ন্যাসীর পক্ষে অনিষ্টকর। তবে একমাত্র গর্ভধারিণী জননীর লিখিত পত্রের উত্তর দেওয়া চলিতে পারে—অন্য কাহারও চিঠি পড়াও অনাবশ্যক। স্বামিজী-প্রণীত 'মঠের নিয়মাবলী'টি সাধুদের নিত্য পাঠ করিতে, এমনকি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পথে যতপ্রকার অন্তরায়, আত্মানন্দ তাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া বলিতেন—সতর্ক করিয়া দিতেন।

যাহা হউক, মঠের জলবায়ুতে আত্মানন্দের শরীরে তেমন উন্নতি কিছু দেখা গেল না।—গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের ব্যবস্থাপনায় ও অন্যান্য প্রাচীন-গণের পরামর্শে কিছুদিনের জন্য সম্বলপুরে বায়ুপরিবর্তনে যাওয়া স্থির হইল। মঠের জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত সেখানে তাঁহার সেবা-চিকিৎসাদির সব ভার গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে তাহারই বাটীতে আত্মানন্দের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুযায়ী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, দুর্গাপূজার পরেই তিনি সম্বলপুরে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার শরীর এত খারাপ যে, দিনে প্রায় বিশ-পঁচিশবার

বাহ্যে যাইতে হইত। এইকালে তাঁহার পথ্য ছিল বার্লির জল মাত্র। কিন্তু সম্বলপুরের পুণ্যবান সেই ভক্তটির সেবাযত্নে এবং সুচিকিৎসার ফলে আত্মানন্দ অল্পদিনেই বেশ সুস্থ হইয়াছিলেন। সেখানকার পানীয় জল তাঁহার শরীরের খুব উপযোগী ছিল। অচিরেই তাঁহার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি দেখা গিয়াছিল যে, সকলেই খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণ যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ভগবানের মন্দির বা আশ্রম গড়িয়া ওঠে। আত্মানন্দের অবস্থানে সম্বলপুরের নিরালা সেই ছোট গৃহটিও যেন সত্যই একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। দৈনিক ভক্ত-সমাগম,—জিজ্ঞাসুদের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সংসার-তাপে ক্লিষ্ট বহু ব্যক্তি আসিয়া সৌম্য-শান্ত এই সন্ন্যাসীর সাহচর্যে কিছুক্ষণ বসিতেন—তাঁহার অপূর্ব উদ্দীপনাময় উপদেশ লাভ করিয়া শান্তি পাইতেন। 'কথামৃত', স্বামিজীর গ্রন্থাবলী এবং গীতা-উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রাদি নিয়মিত তাঁহার কক্ষে পাঠ ও আলোচনা হইত।

আত্মানন্দের গভীর ধ্যান-তন্ময়তার কথা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। সম্বলপুরে অবস্থানকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ, মনে হয়, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শরীর বেশ সুস্থ-সবল হওয়ায়, প্রত্যহ বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পাহাড়ে-জঙ্গলে তিনি বেড়াইতেন। জঙ্গলাকীর্ণ একটি শিবালয় অতিশয় নির্জন ছিল বলিয়া, তিনি ভ্রমণশেষে সেখানে গিয়া একটি নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডের উপর নিয়মিত কিছুক্ষণ আপনভাবে ধ্যান-চিন্তাদি করিতেন। সাধারণতঃ তিনি একাকীই যাইতেন—কখনও খুব ঘনিষ্ঠ ভক্ত কেহ বা তাঁহার সঙ্গী হইতেন। একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আত্মানন্দ তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে নীরবে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন—সঙ্গী একটি ভক্তও কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে আর একটি সোপানের উপর বসিয়া আছেন। ক্রমশঃ বনস্থলীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, এমন সময় চকিতে দেখা গেল একটি বিরাট ব্যাঘ্র সরাসরি ধ্যান-মগ্ন আত্মানন্দের সম্মুখে চলিয়া আসিয়াছে। অসহায় সঙ্গী ভদ্রলোক তো হতবুদ্ধি হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছেন। যাহা হউক, ব্যাঘ্রটি আত্মানন্দের প্রস্তরবৎ ধ্যানমূর্তির প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া মাথা নীচু করিয়া পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্রটি প্রস্থান করিলে সঙ্গী ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে যেন ঘাম ছুটিল—পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে দৌড়িয়া

আসিয়া আত্মানন্দের ধ্যানভঙ্গ করাইয়া স্থানত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন। তিনি কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে যেন কোন রাজ্যে ছিলেন—বন্ধু ভদ্রলোকটির কথায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন সাড়াই দেন নাই।

স্বামী আত্মানন্দের সরল অনাড়ম্বর ও মধুর চরিত্রে সম্বলপুরের ভক্তগণ মুগ্ধ হইতে থাকিলেন। তাঁহার শান্ত ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে একটি স্থায়ী মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও তাঁহারা তখন করিয়াছিলেন। যদিও নানা কারণে শেষ পর্যন্ত উহা আর বাস্তবে পরিণত হয় নাই। আত্মানন্দের জীবনস্পর্শে সম্বলপুরবাসী অসংখ্য ভক্তের হৃদয়েতে যেমন শান্তি আনন্দ ও ভগবৎভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে, তেমনই বিপথগামী বহু ব্যক্তির চরিত্র-পথ পরিবর্তিত হইয়া সৎ ও কল্যাণের দিকে ফিরিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বরিষ্ঠ পার্ষদগণ এই কারণেই তাঁহাকে এত গৌরব প্রদান করিতেন। আত্মানন্দকে স্বগৃহে রাখিয়া যে ভাগ্যবান ভক্ত তাঁহার সেবাদির ভার লইয়াছিলেন, তিনি একবার কলিকাতায় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দের দর্শনে গিয়াছিলেন। প্রেমানন্দজী তখন বলরাম-মন্দিরে অত্যন্ত অসুস্থ—সম্ভবতঃ তাঁহার মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বের কথা ইহা। আগন্তুক ভক্তটি প্রেমানন্দজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র। প্রথমে কুশল প্রশ্নাদির পরে আত্মানন্দের প্রসঙ্গ উঠিল। প্রেমানন্দ মহারাজ ভক্তটিকে বলিলেন, "শুকুল মশায় কেমন আছেন? তাঁকে আমার প্রণাম দিও।" মহাপ্রস্থান-যাত্রী মহাপুরুষের এই বার্তা যখন সম্বলপুরে আত্মানন্দের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে দিব্যরেখাশ্রেণী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। আত্মানন্দ সজল চক্ষে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন—আর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "জয় প্রভু, জয় মা, জয় গুরুদেব!"

সন্ন্যাসী আত্মানন্দের চরিত্রে পরদুঃখকাতরতা তাঁহার পরমপ্রেমিক আচার্যদেবের নিকট হইতেই সংক্রমিত হইয়াছিল। কাহারও ব্যথায় বেদনায় অভাবে দৈন্যে তাঁহার সন্ন্যাসী অন্তঃকরণটি কাঁদিয়া উঠিত; তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আদর্শটির যথার্থ মর্ম আত্মানন্দকে দেখিলে উপলব্ধি হইত। একদিনের একটি ঘটনা বড়ই প্রাণস্পর্শী। গ্রীষ্মকালের এক দুপুরে অপরিচিত জনৈক কুলী প্রচণ্ড রৌদ্র

মাথায় লইয়া কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ঘর্মাক্ত দেহে অবশেষে আত্মানন্দের ঘরের বারান্দায় আসিয়া একটু বিশ্রামের আশায় বসিয়াছে। তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন, টের পাইয়া বাহিরে আসিয়া সেই ব্যক্তির দুঃসহ ক্লান্তি দেখিয়া বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ নিজের পাখা আনিয়া, পথশ্রান্ত নারায়ণের পাশে বসিয়া হাওয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যথিতকণ্ঠে বারবার বলিতে লাগিলেন, "আহা, এই রকম করে মানুষকে খাটাতে হয়!" বিশ্রামরত কুলীটি ইহাতে মহা অপ্রস্তুত—কিন্তু প্রেমিক সন্ন্যাসী কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। যতক্ষণ না ঐ ক্লান্ত ব্যক্তির সারা দেহের ঘাম শুকাইয়া গিয়াছিল, ততক্ষণ পরম যত্নে তাহাকে তিনি সেবা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল নগণ্য এক পথের কুলীর একটু আরাম বিধানের জন্য অসুস্থ বৃদ্ধ তাপস তাঁহার নিজের অত্যাবশ্যকীয় সামান্য বিশ্রামটুকু পর্যন্ত পরিহার করিয়া দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে পাখা হাতে বীজন করিতেছেন—এ দৃশ্য সত্যই শিক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি-কণা এখানে পরিবেশিত হইলে আত্মানন্দের পরবেদনা-কাতর কোমল হৃদয়টিকে আরও বুঝা যাইবে। এ-ঘটনা সম্বলপুরের নহে—তখন তিনি দেওঘরে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের[১] বাটীতে বিশ্রামের জন্য দিন ক'এক ছিলেন। ঐ বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে একদিন সহসা একটি বোলতা দংশন করিলে, সংসারত্যাগী সাধুর প্রাণে কী ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব হইয়াছিল, জনৈকা প্রত্যক্ষদর্শিণীর ভাষায় উহা এইরূপ :

"আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। বোধ হয় ১৯১৩ সাল সেটা। আমার বোনঝিকে বোলতায় কামড়ানোতে শুকুল মহারাজের যে কী কষ্ট বোধ!—কী করলে সারবে, কী ওষুধ দেওয়া দরকার,—কী হবে, কী হবে, করতে লাগলেন। তাঁর ছট্‌ফটানি দেখে মনে হচ্ছিল যেন, তাঁরই দেহে বোলতা কামড়িয়েছে। শুকুল মহারাজ ছিলেন ঠিক যেন মায়ের মতো।" মায়ালেশহীন সন্ন্যাসী চিত্তের এই মাতৃত্বমণ্ডিত রূপের মাধুর্য সংসারে কয়জনই বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম?

আত্মানন্দের সাধুতা, বিনয়, ও শিষ্টাচার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল—তিনি ছিলেন নিপুণ ব্যবহারকুশলী। তাঁহার প্রাণ কোমলতা ও মাধুর্যে ভরপুর ছিল।

---

১ ভক্তপ্রবর শ্রীবলরাম বসু মহাশয়ের পুত্র।

তথাপি, তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি সর্বপ্রকার অসাধুতার প্রতি নির্মম কঠোর ছিলেন। এই অন্যায়দ্রোহিতাও তিনি শিখিয়াছিলেন পুরুষাবতার স্বামিজীরই সংস্পর্শে। প্রয়োজন-ক্ষেত্রে 'কুসুমাদপি কোমল' সন্ন্যাসী 'বজ্রাদপি কঠোর' হইয়াও উঠিতেন। একদা সম্বলপুর শহরের কতিপয় বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাদের এক আড্ডায় বসিয়া অজ্ঞতাবশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে নানারূপ ব্যাঙ্গোক্তি করেন। তাঁহাদের ভাষাও খুবই অশিষ্ট ও অমার্জিত ছিল। ঐ আড্ডায় গতায়াত-কারী জনৈক ভদ্রলোক, এই সংবাদটি একদিন আত্মানন্দের কানে তুলিয়া দিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি তো মশায় এখানে যাওয়া-আসা করেন এবং আমাদের সব খবর জানেন। আপনি ঐসব মিথ্যা মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন না কেন?" ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমাকে সকলে এমনভাবে আক্রমণ করলেন যে, আমি একা তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না।" আত্মানন্দ স্বামী এই কথায় গর্জিয়া উঠিয়াছিলেন,—"আপনি এখনই তাঁদের কাছে যান এবং যদি নিজে কিছু বলতে না পারেন, তবে আমার কথা তাঁদের কাছে বলুন। তাঁদের সৎসাহস থাকে তো আমাকেই তাঁরা আহ্বান করুন এবং যাঁর যা প্রশ্ন আছে ভদ্রভাবে তা বলুন। আর তাঁদের সে সাহস যদি-না থাকে তো, আমিই তাঁদের এখানে আমন্ত্রণ করছি। তাঁদের বক্তব্য সব আমাকে বলুন তাঁরা। আমি স্বামিজীর সন্তান, আমি bulldog-এর মতো এক এক জনকে টুঁটি ধরে শিক্ষা দেব।" পরে আবার বলিতেছিলেন, "এরা তো কাপুরুষ। এদের সাধ্য কি যে আমাকে ডাকে বা আমার সামনে আসে?" যাহা হউক, উক্ত ভদ্রলোকটি কিন্তু তাঁহাদের ঐ আড্ডায় গিয়া যথা আদেশ সব কথাই 'বাবুদের' নিকট বলিয়াছিলেন। নির্ভীক তেজস্বী এই সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলেই নাকি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন—কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই। পরে একদিন আবার ভদ্রলোকটির মুখে সব শুনিয়া আত্মানন্দ ক্ষোভের সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন, "দেখুন, এদের মধ্যে কেউ হয় তো উকিল, কেউ হাকিম। ইংরেজের গোলামী করে এদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। এরা গরীবের যমস্বরূপ, বলবানের পদলেহক।...এদের কাছে আর কি আশা করা যায়? হায় শাপগ্রস্ত পরাধীন এই দেশ!"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা: জনৈক ধর্মবক্তা একবার সম্বলপুরে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায়, স্বামিজীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা খ্যাপনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা কিছু উক্তি করিয়াছিলেন। কোন বিশিষ্ট ভক্ত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন,—তিনিই আবার আত্মানন্দের নিকট ঐ ধর্মবক্তার ভ্রান্ত উক্তির বিষয়ে বর্ণনা করিলে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আপনাকে এখানে কর্ম করতে পাঠিয়েছেন,—অমুককে অমুককে খোসামুদি করতে নয়, তাঁর ভাব প্রচার করতে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে ঠাকুরের ভাব প্রচারই আপনার প্রধান কাজ। অসত্য ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া, অন্যায় আচরণ ও মিথ্যা ভাষণেরই সমান। আপনি —বাবুর মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ না করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন।"

সম্বলপুরের জল-হাওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায়, ১৯১৯-এর প্রথমার্ধের দিকে তিনি পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহাকে আমরা দেখিব ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষরূপে। সম্ভবতঃ ১৯২০-এর সূচনাতেই তিনি ঢাকায় গমন করেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, আত্মানন্দের ঢাকায় অবস্থান-প্রসঙ্গে একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ও বসে থাকলেই কাজ হবে।" আত্মানন্দের ঢাকায় গমনের প্রাক্কালে, মহাপুরুষ শিবানন্দজী মিশনের ঢাকাকেন্দ্রের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়কে একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য। ঐ পত্রে মহাপুরুষজীর উক্তি: "স্বামিজী মহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মহাত্যাগী মহাভক্ত ও মহাতপস্বী এবং সঙ্ঘের একজন প্রাচীন সাধু আত্মানন্দ তোমাদের ওখানে যাইতেছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ঐ অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ হইবে। শুকুল মহারাজের উপর শ্রীশ্রীমহারাজেরও উচ্চ ধারণা জানিবে।" স্বামী আত্মানন্দের ইহাপেক্ষা সুন্দর পরিচিতি আর কি হইতে পারে? আত্মানন্দের ঢাকায় অবস্থান-কালে একবার জনৈক সাধু মঠ হইতে ঢাকাকেন্দ্রের কর্মিরূপে প্রেরিত হইতেছেন। যাত্রাকালে স্বামী শিবানন্দজীর আশীর্বাদ-গ্রহণ করিতে গেলে, তখনও তিনি যুবক সাধুটিকে খুব উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ যাও, সেখানে শুকুল আছে—শিবতুল্য পুরুষ।" শ্রেষ্ঠ আচার্যপুরুষ-

গণের এই সকল উক্তিতে আত্মানন্দের প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তিই উদ্রিক্ত হয়।

ঢাকা মঠেও আত্মানন্দের দৈনন্দিন জীবনধারা সেই একই ভাবে প্রবাহিত ছিল। আশ্রমের প্রত্যেকটি কার্যের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তিনি যেন অনুভব করিতেন। সর্বোপরি তাঁহাতে যোগিসুলভ নির্লিপ্ততা ও উদ্যমশীলতার একত্র সমাবেশে সকলের নিকট তাঁহাকে বড়ই মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সেখানেও তিনি সাধু-ভক্ত সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বাহুল্যবর্জিত দৈনন্দিন জীবন—অনাড়ম্বর অথচ পরিপাটি ব্যবহার-সামগ্রী লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, "যদি একখানা কাপড়, একখানা গামছায় চলে যায়, তবে আর বেশী ভাল নয়। যে মনটি ভগবানের পাদপদ্মে দিতে হবে, তা কি আবার জিনিসপত্র সামলাতে দেওয়া উচিত?" তাঁহার নিজের ব্যবহারের সামান্য দুই-একটি জিনিস বা কাপড়-কৌপীন ইত্যাদিও এমন সুন্দর গোছগাছ করিয়া সাজানো থাকিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। ঘর ঝাঁট দিবার ঝাড়ুটি পর্যন্ত ঘরের একটি কোণে এমন যত্নে রক্ষিত থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত তিনি কত সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন! নিজের সকল কাজ নিজেই করিতেন—কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। তাই কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্য একটি ঘটি এবং একগাছি দড়িও অতি মার্জিত ভাবে আপন কক্ষেই রাখিতেন। সর্বব্যাপারে এই সুশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে তিনি সুন্দর একটি কথা বলিতেন, "এ হচ্ছে মনঃসংযমের পরিচায়ক। যারা বাইরে এলোমেলো, তারা ভেতরেও ঐ রকম। যে ভাল শিল্পী, সে ইচ্ছা করলে ভাল সাধু হতে পারে। শিল্পী হতে গেলে মনঃসংযোগ দরকার—আর মনঃসংযোগ না হলে ধর্মসাধনা অসম্ভব।" আরও বলিতেন, "প্রত্যেক জিনিসটিই যথাস্থানে রাখা দরকার—Everything must be in its proper place"। তিনি যেমন শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য পছন্দ করিতেন, তেমনই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার ভাবটিকেও সর্বদা জাগাইয়া রাখিতেন। শোনা যায়, দুই-একখানা কাপড়-জামা, এবং বিছানার জন্য একটি সতরঞ্চি ও তোয়ালে ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা পুঁটলি বাঁধিয়া একটি লাঠিতে ঝুলাইয়া মাঝে-মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন যে, আবশ্যকমতো নিজেই উহা বহন করিতে পারিবেন কিনা।

তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মঠে আশ্রমে এমন ভাবে থাকবে যেন দরকার হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যত্র যাবার জন্য তৈরী হতে পার। সাধু সর্বদাই এমন অনাসক্ত থাকবে। যেন যমের ডাক এলেও যেতে দেরী না হয়। বীরের মতো চলাফেরা করবে।"

নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁহার উপদেশাবলী সর্বকালের অধ্যাত্মপথের পথিকদের জন্য সতর্কবাণী। চলা ফেরা ও কথাবার্তায় তিনি পৌরুষভাবকে খুব উৎসাহিত করিতেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীসুলভ নরমভাব তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। "মেয়েলী ভাব মন থেকে মুছে ফেল, যদি ধর্মপথে এগোতে চাও। আরে অবতার অবতার কর, অবতার কি জান? যাঁর ইঙ্গিতে সৌরজগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনিই এই সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ রক্তমাংসময় শরীর ধরে এসেছেন। অবতারে বিশ্বাস শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।" কোন তরুণ সাধু তাঁহার সম্মুখে অকারণ মৃদুতা বা জড়তা প্রদর্শন করিলে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "একি রে! বীর সৈনিকের মতো চলবি, কথা বলবি, কাজ করবি। রজোগুণের আশ্রয় না নিলে তমোগুণে ডুবে মরবি যে।"

তিনি স্বয়ং যেমন নিঃসম্বল ছিলেন—অপর শিক্ষার্থীদেরও ঐরূপ রিক্ততার উপদেশ প্রদান করিতেন। কেহ একটি টাকা দিলেও, তিনি মহা ভাবিত হইয়া পড়িতেন, উহা লইয়া তিনি কি করিবেন, তৎক্ষণাৎ ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিয়া তবে চিন্তা দূর করিতেন। তিনি বলিতেন, "স্বামিজী নিয়ম করেছিলেন সাধুদের ব্যক্তিগত জিনিস কিছু থাকবে না। আমরা তাই সব মঠেই জমা দিয়ে দিতাম। হৃষীকেশ থেকে ফিরে একটি লোটা আর কম্বল, তা-ও মঠে পৌঁছেই জমা দিয়েছিলাম। ···একবার মঠে অসুখ হয়েছিল আমার। গরম কিছুই ছিল না গায়ে দেবার মতো। কারুর চোখে পড়েনি—স্বামিজী কিন্তু ঠিক নজর করেছেন। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'আমি নিয়ম করেছিলাম, তাইতো এরা যে যা পেয়েছে মঠে এনে জমা দিয়েছে। এখন আর কেউ দেখছে না এদের! কি আশ্চর্য!' তারপর তিনি নিজেই একটি ভাল কম্বল ও বালিশ এনে স্বহস্তে আমার বিছানায় পেতে দিয়ে যান। এরপর থেকেই আবশ্যকীয় সব জিনিস মঠে জমা দিতে নিষেধ করে দিলেন তিনি।" অন্তিম জীবনেও আত্মানন্দ সেই নিঃসম্বল সন্ন্যাসীই ছিলেন। কাশীতেও তাঁহার এই প্রকৃতি দেখা যাইত। সামান্য জিনিস কেহ কিছু দিলে

তাহা তৎক্ষণাৎ আশ্রমাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। নিজের একটি পুরাতন বাক্স ছিল—উহাতে দুইটি গরম কাপড় এবং একটি ফ্লানেলের জামা ছিল। গরম কাপড় দুইখানির একখানি শ্রীশ্রীমা, আর অপরখানি রাজা মহারাজ তাঁহাকে আশীর্বাদস্বরূপ দিয়াছিলেন। তাই সে দুইটি চিরকাল মাথায় ঠেকাইয়াছেন, কখনও ব্যবহার করেন নাই। বন্ধুবর শুদ্ধানন্দ স্বামী কাশীতে গেলে তাঁহার হস্তে ঐ বাক্সের চাবি অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই নাও, এই বাক্সে যা আছে তা বাক্সটি সহ মঠে পাঠিয়ে দাও। আমি আর এটা রাখতে পারব না। তুমি মঠাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দাও। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেবেন। স্বামিজীর নিয়ম, মঠের প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে সব দিয়ে যাবেন। আমি যা-হোক করে সস্তার একটা কাপড় যোগাড় করে আগামী শীতে ব্যবহার করব।" তিনি সাধারণতঃ একটি জামা, দুই জোড়া কৌপীন, দুইটি বহির্বাস ও একটি গেঞ্জিমাত্র নিজের সঙ্গে রাখিতেন। হৃষীকেশ, বদ্রীনারায়ণ ও উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তীর্থাদি তিনি প্রায় কপর্দকহীন ভাবেই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস থাকলে সাধুর কখনও অর্থাভাব হয় না।"

সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল এইরূপ: "সন্ন্যাস কি জান? যাদের অন্ন খেয়ে ধর্মজীবন লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তাদের কল্যাণে, লোকের কল্যাণে, জগতের কল্যাণে শরীরটাকে পাত করে দেওয়া।" শ্রীগুরুর নিকট "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" যে মন্ত্র তিনি স্বয়ং লাভ করিয়াছিলেন, স্বামিজীর গ্রন্থ অধ্যাপনাকালে সেই মহামন্ত্রেরই ভাষ্য তাঁহার মুখে এই ভাবে শোনা যাইত।

বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের পক্ষে ক্ষতিকর—এমনকি সংসারী ব্যক্তি ভক্ত হইলেও তাঁহাদের সহিত আচরণে সাধুদের আশ্রমোচিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলা তিনি পছন্দ করিতেন। গৃহীদের সঙ্গে খুব মিশুক বা সামাজিক প্রকৃতির সাধুদের তিনি তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "ওতে সাধুভাব কমে যায়। গেরস্থ ভক্তরাই সাধুদের দফা রফা করে দেয়।" শহরে গিয়া সান্ধ্যভ্রমণ বা সন্ধ্যার পর আশ্রমের বাহিরে থাকা সাধুদের পক্ষে তিনি অনুচিত মনে করিতেন। এ বিষয়ে সাবধান করিয়া বলিতেন, "সন্ধ্যার পর শহরে থেকো না। রাত্রিকালে শহরের মনোহর

চাকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখলে মন আটকে পড়বে। সন্ধ্যার পূর্বেই আশ্রমে ফিরবে। আসন সাধুকে বাঁচায়। রাস্তায় চলবে ডাইনে-বামে তাকাবে না।" আড্ডা দেওয়া, রাজনৈতিক আলোচনা, সংবাদপত্রপাঠ এবং সর্ববিষয়ে অকারণ কৌতূহল সাধুজীবনের মহা অনর্থকর—ইহা তাঁহার নিজের আচরণে ও শিক্ষায় বুঝিতে বিলম্ব হইত না। বলিতেন, "আড্ডা মানুষকে ruin করে দেয়। খুব সাবধান। কিছু কাজ না থাকে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু আড্ডায় যাবে না। কেউ আড্ডা দিতে এলে, একখানা বই খুলে পড়তে থাকবে। দেখবে সে আস্তে আস্তে সরে পড়বে।" আবার নবীন সাধুদের উদ্দেশে প্রায়ই বলিতেন, "যে সংস্কারগুলি মাথায় ঢুকে আছে, সেগুলিই তাড়ানো যাচ্ছে না। আবার নতুন নতুন সংস্কার ঢোকান কেন? সাধু-জীবনে এটা জানব, ওটা দেখব, এসব ভাব মোটেই ভাল নয়।" জনৈক তরুণ সাধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সংবাদপত্র না পড়লে কোথায় বন্যা, কোথায় দুর্ভিক্ষ এসব খবর কি করে জানব?" তৎক্ষণাৎ মৃদু ভৎর্সনা করিয়া তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি তো আর অধ্যক্ষ নও। তিনি ঐ সব দেখে যেমন তোমাদের বলবেন, তোমরা তেমন করবে। ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেশ্য, তারই জন্য ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ। এইসব সাধনার যা পরিপন্থী, যা চিত্তবিক্ষেপকারক তা নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে।" ঢাকা মঠে কেহ সংবাদপত্র সাধুদের বাসগৃহে আনিতে পরিতেন না—একমাত্র বাহিরে গ্রন্থাগারেই সংবাদপত্র থাকিত, পড়িতে হইলে সেখানে গিয়া কাগজ পড়িতে হইত। আবার খুব স্নেহমাখা স্বরে তিনি নবীনদের প্রায়ই বলিতেন, "বুড়ো হলে যখন কাজকর্ম করবার সামর্থ্য থাকবে না, তখন কি নিয়ে থাকবে? তাই এই তরুণ বয়সে কিছু সদভ্যাস স্বভাবগত করে নিতে হয়—যেমন জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনা। আর এখন যদি আড্ডা দিয়ে কাটাও, বুড়ো হলেও তাই করতে হবে।" ইহাও বেশ সুন্দর বলিতেন, "একটা routine করে চলবে। অবশ্য তাতে আহারের পর একটু গল্প করবার এবং বিকেলে একটু বেড়ান বা একটু ব্যায়ামাদি করবার সময়ও থাকবে।"

সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ গতায়াত বা সাধুদের সঙ্গে অবাধ ওঠা বসা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। আশ্রমে স্ত্রী-ভক্তগণ আসিলে তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানসহকারে অভ্যর্থনাদি করিতেন বটে, কিন্তু

প্রয়োজনাতিরিক্ত একটুও সময় তিনি তাঁহাদের কাছে থাকিতেন না—খুব বিনীতভাবে ও কৌশলে তিনি বিদায় লইতেন। বলিতেন, "এমন একটি আশ্রম থাকিবে, যেখানে স্ত্রী-মেথর পর্যন্ত প্রবেশ করিবে না।" একদিন স্থানীয় কোন বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী এবং শিক্ষিকা ঢাকা মঠে আসিয়াছেন। আত্মানন্দজী জনৈক ব্রহ্মচারীকে তাঁহাদের হাতে প্রসাদ দিবার নির্দেশ দেন। ব্রহ্মচারীটি একা, এতগুলি মেয়েকে প্রসাদ দিতে তাই একটু সময় লাগিয়াছিল। মেয়েরা চলিয়া গেলে বিরক্তির সঙ্গে তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, "আইবুড়ো মেয়েদের হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকবে না। তারা আভাঙ্গা সাপের মতো। বেশীক্ষণ তাদের সাথে তোমাদের থাকা অনুচিত।"

সন্ন্যাসী আত্মানন্দের সাহচর্যে ঢাকার সাধু-ভক্তদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নিত্য বৈকালে তিনি শাস্ত্রাধ্যাপনা করিতেন। একদিন বেদান্তদর্শনের কোন সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে খুবই উচ্চভূমিতে মনকে উঠাইয়া লইয়া উত্তেজিতভাবে নিজের মাথায় অঙ্গুলি ঠুকিয়া প্রকাশ্যেই বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর কৃপায় এর মধ্যে কিছু আছে।" জনৈক সাধু একদা তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?" সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নটি শুনিয়া প্রথমে বালকের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "আরে, যদি একটা ভূতও দেখতাম, তবুও বুঝতাম যে একটা কিছু দেখেছি।" কিন্তু পরক্ষণেই খুব গম্ভীর হইয়া আরক্তিম বদনে বলিয়াছিলেন, "দেখ, স্বামিজীর কৃপায় মনে কোন বাসনা নেই।"

এই প্রসঙ্গে তাঁহার আরও দুই-একটি উক্তি খুবই অনুধাবনযোগ্য। একদিন বলিয়াছিলেন, "রূপদর্শনাদিই সাধনরাজ্যের খুব উচ্চস্তরের কথা নয়। উপলব্ধির জগৎ দর্শনাদির ঊর্ধ্বেই অবস্থিত জানবে। সকল সাধকের প্রকৃতিতে রূপদর্শনাদি হয় না।" আর একবার একজন কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ আপনার দিব্যদর্শনাদির কথা কিছু বলুন।" স্মিতহাস্যে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি স্বামিজীর কৃপা পেয়েছি, তাঁকে দর্শন করেছি আর অন্য দর্শনের প্রয়োজন নেই। তিনি কৃপা করে বলেছেন, তাঁর আশ্রিত সন্তান নরকে গেলেও তিনি তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন।" স্বামিজীর অন্যতম একনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-সন্তানের নিজ মুখের এই উক্তি গভীর

অর্থদ্যোতক। স্বামী আত্মানন্দের উপর তদীয় আচার্যের কৃপা অজস্র বর্ষিত হইয়াছে—তত্ত্বালোক-উদ্‌ভাসিত তাঁহার জীবনে ইহার ভূয়িষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আশ্রমের নবীন-প্রাচীন সাধু-কর্মী সকলের জীবন গঠনে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। জনৈক যুবক সাধুকে তিনি নিত্য গীতা পড়াইতেন এবং তাঁহারই নির্দেশমতো গীতার পাঁচটি করিয়া শ্লোক সাধুটি তাঁহার নিকট মুখস্থ বলিতেন। যখন ঢাকা হইতে তিনি চলিয়া আসেন, তরুণ সেই সাধু ভাবিয়াছিলেন, বুঝিবা গীতাপাঠ বন্ধই হইবে এতদিনে। আত্মানন্দ তরুণের মনের আশঙ্কা বুঝিয়া, সস্নেহে উপদেশ দিয়াছিলেন, "গীতা পড়া একদিনও বন্ধ রাখবে না। রোজ পাঁচটি করে শ্লোক যেমন মুখস্থ করে যাচ্ছ, অমনিই করবে, আর ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে শোনাবে।" আত্মানন্দজী বলিতেন, "প্রত্যেক সাধুর গীতাখানি কণ্ঠস্থ থাকা দরকার।" "পূজা কেমন ভাবে করা উচিত, বলে দিন।"—এই রকম জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিয়াছিলেন, "পূজা মানে সেবা। তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন, এইটি নিশ্চিত জেনে তাঁকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, পুষ্পমাল্যাদি দিয়ে সাজানো ইত্যাদি।" খুঁটিনাটি এমন ভাবেই তিনি শিক্ষা-প্রদান করিতেন। সর্বোপরি, তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রম ও জীবন-যাপনই ছিল তাঁহার মুখের উপদেশের উদাহরণস্বরূপ।

ঢাকা মঠ হইতে কিছুদিনের অবসর লইয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর মঠেই তখন অবস্থান করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধন ভজনে ও শাস্ত্রচর্চাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন সর্বদা। এই কালে লোক-জনের সহিত মেলামেশা বা দেখাশোনা বড় বেশী একটা তিনি করিতেন না।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কাশীধামে শ্রীমৎ-স্বামী তুরীয়ানন্দজীর মহা-সমাধিলাভ হইলে, কাশীর সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ বড়ই শূন্যতা বোধ করিতে-ছিলেন। মঠাধীশ স্বামী শিবানন্দজী তাই আত্মানন্দকেই কাশীধামে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং ভুবনেশ্বর হইতে তাঁহাকে বেলুড় মঠে চলিয়া আসিতে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী ১৯২৩-এর প্রথম দিকে, স্বামী আত্মানন্দ কাশীধামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে মহাপুরুষজীকে প্রণামান্তে তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় চাহিলে, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আত্মানন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মঠের পুরাতন ঘাট হইতে

নৌকায় চড়িয়া কলিকাতার দিকে আত্মানন্দ রওনা হইয়াছেন—পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন, মহাপুরুষজী তখনও অপলকনেত্রে মঠবাড়ীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার যাত্রাপথে আশীর্বাদ সিঞ্চন করিতেছেন। আত্মানন্দ করজোড়ে, যতক্ষণ দেখা যায়, নৌকায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন কে জানিত যে আত্মানন্দের ইহাই শেষ মঠ-দর্শন—মহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতে ইহাই শেষ বিদায়! কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে আসিয়া, উদ্বোধন-কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দজীকেও প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়াছিলেন।

কাশীর পথে পাটনাতে নামিয়া দিন কয়েক তিনি সেখানেও অবস্থান করেন। স্থানীয় ভক্তদের ইহাতে আনন্দের সীমা ছিল না—দূর দূরান্ত হইতেও পরিচিত ভক্তরা আসিয়া পাটনাতে তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া যাইতেন। জনৈক ভক্তের মুখে তখনকার স্মৃতি-চারণ:

"কাশী যাবার পথে শুকুল মহারাজ আমাদের পাটনা আশ্রমে এসে কয়েকদিন ছিলেন। আমরা তখন রাতদিন আশ্রমে কাটাতুম, ওঁর সেবার জন্য। আমার বড় সাধ হয়েছিল, গঙ্গাজল নিয়ে এসে ওঁকে স্নান করাবার। তা' তাঁর কৃপায় আমার সে-সাধ মিটেছিল। আমরা ওঁকে আরও দিন কতক বেশী আটকাতে চেয়েছিলুম পাটনাতে। উনি বলেছিলেন, 'আমার তো দেরী করবার জো নেই। মঠাধ্যক্ষ মহারাজের আদেশ—পাটনায় কিছুদিন থেকে, টিকেট কেটে সোজা কাশী চলে যেতে হবে।'

"তখন জ্ঞানেশ্বর মহারাজ[১] আশ্রমে গীতা ক্লাস নিতেন। রাজেন্দ্র-প্রসাদ[২], কুলবন্ত সহায়[৩], প্রভৃতিরা ঐ ক্লাসে নিয়মিত আসতেন। সেদিন পড়া হচ্ছিল, 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং...' ইত্যাদি। ভ্রূমধ্যে ধ্যান করার কথাও এলো। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বললেন, 'এখানে স্বয়ং স্বামী আত্মানন্দ আছেন—তিনিই এ-বিষয় ঠিক ঠিক বোঝাতে সক্ষম।' শুকুল

১ পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সংস্থাপক স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে তাঁহার বৈদগ্ধ্য চিরস্মরণীয়।

২ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

৩ বিচারপতি কুলবন্ত সহায়।

মহারাজ শুনে জবাব দিলেন, 'অখণ্ড ব্রহ্মচর্য সাপেক্ষ এ-সব। তোমরা কী বুঝবে ?'

"একদিন ওঁর টিনের বাক্সটি গোছাচ্ছি। দেখলুম কৌপীন-কাপড় ছাড়া বাক্সে কিছুই নেই। রাজা মহারাজের দেওয়া বালাপোষটি কতো যত্ন করে রেখেছিলেন। আমাকে খুব সাবধানে হাত দিতে বললেন। রোদে দেওয়ার কালে গঙ্গাজল-টল ছিটিয়ে—কোন কাক-পাখী না বসে, তাই নিজেই পাহারা দিতে বসে গেলেন। আমি বললুম, 'আমিই পাহারা দিচ্ছি, আপনাকে দিতে হবে না।'

"শুকুল মহারাজের কোনও গরম জামা ছিল না দেখে, একদিন একটা সোয়েটার কিনে এনে দিলুম। সোয়েটারটি পেয়ে বালকের মতো আনন্দ করেছিলেন—নিজে গ্রহণ করলেন, গায়ে দিলেন। খ—মহারাজ দেখেই সোয়েটারটি চেয়ে বসলেন,—তক্ষুনি আবার সেই একই রকম আনন্দের সঙ্গে সোয়েটারটিকে গা থেকে খুলে তাঁকে দিয়ে দিলেন। খ—মহারাজের ব্যবহার করা একটা পুরানো সোয়েটার দিব্যি গায়ে চাপিয়ে বসলেন।

"খুব প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব ছিল শুকুল মহারাজের। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ আমাদের বলে দিয়েছিলেন, 'ইনি হচ্ছেন স্বামিজীর সন্তান। খুব বড় মহাত্মা।' আমরা একদিন তাঁকে ধরে বসেছিলাম, 'মহারাজ স্বামিজীর কথা কিছু বুঝিয়ে দিন।' সেদিন বলেছিলেন, 'স্বামিজীকে তোমরা কি ধরবে ? স্বামিজীকে ধারণা করতে হলে, তাঁর source-টাকে (জীবনের উৎসকে) বোঝা দরকার। Source হচ্ছেন ঠাকুর আর মা। আবার স্বামিজীর মধ্য দিয়ে না দেখলে ঠাকুরকে মাকেও কিছু বুঝতে পারবে না। আরে, ঠাকুরই তো স্বামিজী।'

"যখন শুকুল মহারাজের গা টিপে দিতাম, শুনতাম উনি খুব আস্তে আস্তে 'মা' 'মা' বলতেন।"

অবশেষে মোক্ষতীর্থ কাশী। কাশী সেবাশ্রমে তাঁহার উপস্থিতিতে সকল সাধু, কর্মী ও অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে পুনরায় আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইল। ভগবৎ-প্রসঙ্গ, সৎচর্চা, পাঠ-আলোচনা ইত্যাদিতে সকলেই উৎসাহ পাইতে থাকিলেন। স্বামিজীর 'Inspired Talks', 'Raja Yoga', 'Bhakti

Yoga', 'Jnana Yoga' এবং 'Karma Yoga' প্রভৃতি গ্রন্থাদি তিনি নিয়মিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিকট অধ্যাপনা করিতেন। পাঠকালে কেহ কিছু অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে বা ভুল পড়িলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন—সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেন যে, স্বামিজীর অধিকাংশ পুস্তকেরই ভাষা তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ। হয়তো বা কেহ বলিতেন, "না মহারাজ, বইতে এইরকমই আছে।" তিনি কিন্তু নিঃসংশয়ে উত্তর দিতেন, "তা ভুল। তোমরা পুরানো সংস্করণ মিলিয়ে দেখ।" পুরাতন সংস্করণ মিলাইয়া দেখা হইলে, তাঁহার আশ্চর্য স্মৃতি ও মেধাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইত। এমন পরিচয় বহুবার মিলিয়াছে। স্বামিজীর 'বীরবাণী' হইতে যখন তিনি আবৃত্তি করিতেন, তখন যেন সেইস্থানে ভাবের হিল্লোল খেলিত। 'সন্ন্যাসীর গীতি' স্বয়ং আবৃত্তি করিতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে উহার প্রত্যেকটি ছত্রের মর্ম বুঝাইয়া বলিতেন। 'সন্ন্যাসীর গীতি'-প্রসঙ্গে আত্মানন্দ বলিতেন "যদি প্রকৃত সাধু হতে চাও, আজ থেকে এর প্রত্যেকটি কথা নিয়ে ধ্যান কর।"

বাংলা ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাস তখন। একদিন সেবককে বলিতেছেন, "খেলাধুলা ঢের হল। চল আবার একান্তে গঙ্গাতীরে বসে যাই। গোলমাল, লোকালয় আর এসব ভাল লাগে না।" এই সময়ে তিনি খুবই নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, পাঠ-আলোচনাদি ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তাঁহার কাছে তোলাই অসম্ভব ছিল। সেবাশ্রমের এলাকার মধ্যে কিছু কিছু স্থান তখনও বেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনি অম্বিকাধামে বাস করিতেন—উহারই অদূরে ঐরূপ নিভৃত জঙ্গলের মধ্যে একটি বিশেষ অশ্বত্থ গাছের তলায় দুই-চারখানি ইট-পাথর সাজাইয়া তিনি তাঁহার আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নিয়মিত সেখানে গিয়া নিরালায় তিনি ধ্যানধারণাদি করিতেন। জায়গাটি এমন নির্জন ও লোক-চলাচলের অনুপযোগী ছিল যে বহুদিন পর্যন্ত কেহ টেরই পান নাই, তিনি কোথায় গিয়া আসন পাতেন। পরে অবশ্য জানাজানি হওয়ায় লোকসঙ্গে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসী সেখান হইতে আসন উঠাইয়া, সেবাশ্রমের বর্তমান ১০নং ওয়ার্ড-ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বটগাছটির তলায় তাঁহার আসন রচনা করেন। ঐ স্থানের পরিবেশ ও দুর্গমতা, এখন আর ঠিক অনুমান করা যাইবে না। মোটকথা, অন্ততঃ সাপের ভয়েও কেহ ওদিকে বড় একটা যাইতেন না। এই বটবৃক্ষমূলের ধ্যানাসনই আত্মানন্দের জীবনের শেষ সাধনস্থল। সকাল আটটা হইতে

নাগাদ সাড়ে দশটা ও বৈকাল দুইটা-আড়াইটা হইতে চারটা-সাড়ে চারটা পর্যন্ত এবং পুনরায় সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বা পরে তাঁহাকে এখানেই নিভৃতে উপবিষ্ট দেখা যাইত। অবশ্য মাঝে-মধ্যে পূর্বোল্লিখিত সেই অশ্বত্থবৃক্ষের মূলেও বসিতেন। স্বামী আত্মানন্দের এই কালের জীবনে অন্তর্মুখীনতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথা তাঁহার সম্মুখে অপর কেহও বলিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার নিরন্তর জপপরায়ণতা অন্যকেও জপ ধ্যানে অনুপ্রেরণা প্রদান করিত।

সরল-নির্মল আত্মানন্দের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সেবাশ্রমের ও অদ্বৈত আশ্রমের সাধু-কর্মীদের জীবনযাত্রা বহুভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কর্মের প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোন সাধুর ব্যক্তিগত জীবনে সাধন-ভজন ও জ্ঞানবিচারাদি উপেক্ষিত হইলে, উহার বিষময় পরিণতির কথা তিনি বার বার সতর্ক করিয়া দিতেন। সেবাশ্রমের জনৈক পুরাতন সাধু একবার কোন একটি ব্যাপারে সত্যের কিঞ্চিৎ অপলাপ করেন—অর্থাৎ তাঁহার কথায় সামান্য একটু মিথ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল। আত্মানন্দের কানে ইহা পৌছিলে,— তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া উত্তেজিতভাবে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কর্ম সাধুকেও **hypocrite** (কপট) করে দেয়। এতকালের পুরানো সাধুর মুখে মিথ্যা কথাটা আটকালো না! যদি পার কর্ম ছেড়ে কিছুকাল এখন শুধু ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাক।"

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র', 'বিল্বমঙ্গল', 'কালাপাহাড়', 'নসীরাম', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'রূপ সনাতন' প্রভৃতি বই তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—অনেক সময়ে উহার কোনটি হইতে নিজেও পড়িয়া শুনাইতেন বা নিকটবর্তী কাহাকেও পড়িতে বলিতেন। একান্তে নিভৃতে পাদচারণা করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে গিরিশচন্দ্র-রচিত এই গানটি আপনভাবে গাহিতে শোনা যাইত:

"জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতন শীলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
চেতন যমুনা চেতন রেণু গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

খেলা খেলা খেলা মেলা, নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।"

আবার কখনও বা তন্ময় হইয়া স্বামিজীর প্রিয় 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটিও তিনি গাহিতেন।

প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দও তখন কিছুদিন পরে কাশীতে আগমন করায়, আত্মানন্দ খুব আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীও সেই সময়ে কাশীধামে শহরের দূরপ্রান্তে পুঁটিয়া রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয় গুরুভ্রাতা একসঙ্গে একদিন দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া গিয়া অখণ্ডানন্দজীকে দর্শনাদি করিয়া আসিয়াছিলেন। আত্মানন্দের স্বাস্থ্য তখনও বেশ ভালই ছিল। শুদ্ধানন্দজীকে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "Working Centre-এ (কর্মকেন্দ্রে) থাকতে আমার ইচ্ছা হয় না—এখানে মন চঞ্চল হয়। কেবল মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে রয়েছি। তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে হরিদ্বার বা ঐ রকম কোন নিভৃত জায়গায় গিয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে থাকি। তবে এখন আর একলা থাকবার ক্ষমতা নেই। কেউ সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়, কারণ, জল তোলা প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হয়ে পড়েছে। যদিও বসে বসে রান্নাবান্নাটা এক রকম করে নিতে পারি।"

শুদ্ধানন্দজী কাশী আগমন করার পরে মাত্র নয় দশ দিনই আত্মানন্দ স্বামী সুস্থ ছিলেন। প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত, "গঙ্গাতীরেই শরীর ছাড়ব। কাউকে যেন ভোগাতে না হয়।" অত্যন্ত অন্তর্মুখভাবে আপনমনে সন্ধ্যার দিকে পাদচারণা করিতেন। মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুতি কিন্তু সকলের অলক্ষ্যেই চলিতেছিল। কাশীধামে তাঁহার এই শেষ কয়টি দিনের ঘটনাবলী বড়ই প্রাণস্পর্শী। অপরিগ্রহ তাঁহার সারা জীবনের একটি মূলমন্ত্র ছিল। কপর্দকশূন্য রিক্তহস্ত সন্ন্যাসী নিজের অবশিষ্ট ছোট টিনের বাক্সটিও মঠাধ্যক্ষ মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য শুদ্ধানন্দজীর হাতে ইতিমধ্যেই অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। শুদ্ধানন্দজীও পত্রযোগে এই সংবাদ মহাপুরুষ মহারাজকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোন ভক্ত বা সাধুর প্রীতির দান কখনও তিনি উপেক্ষা করেন নাই—নিজে সাদরে গ্রহণ করিয়া পরক্ষণেই সেবাশ্রমের ভাণ্ডারে জমা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। একদিন কোন ভক্তিমান ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হয়,

আত্মানন্দজীকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোন খাবার খাওয়াইবেন। কয়েক আনা পয়সা এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবকের কাছে দিয়া তাঁহার মনোগত আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত করায়, সেবকও সেই খাবার তৈয়ারী করিয়া আত্মানন্দজীকে আহারের সময় দিয়াছিলেন। নূতন বস্তুটি আহার করিয়া সেদিন কতই-না আনন্দিত হইয়াছিলেন—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এমন-সুখাদ্য কোথা হইতে কে আনিল, ইত্যাদি। কিন্তু সেবকের হাতে উদ্বৃত্ত এক আনা পয়সা তখনও আছে। মহা দুশ্চিন্তার ব্যাপার! আত্মানন্দজী অবশেষে বলিলেন, ঐ এক আনায় একটি স্বামিজীর ছবি কেনা হউক। ছবিটি কিনিয়া আনা হইলে শিশুর মতো আহ্লাদে ও গৌরবে উহা মাথায় ঠেকাইয়া তিনি নিজে শিয়রের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

অকস্মাৎ শুদ্ধানন্দ ও আত্মানন্দ উভয় ভ্রাতাই জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। দুইজনেই অম্বিকাধামে আছেন। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়াই সকলের মনে হইল—শুদ্ধানন্দের ক্ষেত্রে তাহাই হইল বটে, আত্মানন্দের জ্বরের গতি কিন্তু অন্যদিকে ঘুরিয়া চলিল। একদিন উভয়েই দুধ-সাগু পথ্য পান করিতেছেন, আত্মানন্দ নিজেই বলিলেন, "এবার স্বামিজীর ডাক এসেছে। তাঁর পাঁঠা এবার তিনি বলিদান দেবেন। আমার এ-জ্বর সামান্য জ্বর নয়। এ হয় টাইফয়েড না হয় নিউমোনিয়া।" তাঁহার এ অনুমান সত্য নয়, তিনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন ইত্যাদি অনেক বুঝানো হইল বটে—কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত বলিলেন, "আচ্ছা দেখে নিও, তোমাদের কথা ঠিক কি আমার কথা ঠিক। স্বামিজীর পাঁঠার বলি এবার নিশ্চয়ই হবে।" হাঁ, আত্মানন্দজীর কথাই ঠিক ছিল, শুদ্ধানন্দজী সারিয়া উঠিলেন, আর তিনি স্বামিজীর পদে নিজেকে নিঃশেষে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষাতেই থাকিলেন।

আত্মানন্দ স্বামীর শারীরিক জটিলতা চিকিৎসক ও সেবকগণকে ক্রমেই চিন্তান্বিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রবল জ্বর, উহার সহিত উদরাময় এবং পরিশেষে কঠিন নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দেওয়ায়, সকলের আপ্রাণ সেবাযত্ন সবই ব্যর্থ হইতে থাকিল। অথচ এমন অবস্থাতেও স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী বাহ্যে বা প্রস্রাবের জন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নাই—টলিতে টলিতে দেওয়াল ধরিয়া পায়খানাতেই যাইতেন। এই কালের

একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা সন্ন্যাসী আত্মানন্দের বৈরাগ্যোজ্জ্বল জীবনেতিহাসকে সমধিক স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাটি এইরূপ :

আত্মানন্দের চির-অভ্যস্ত পুরাতন একটি সতরঞ্চি, উহার উপর একটি পরিচ্ছন্ন তোয়ালে, আর ছোট একটি বালিশ, এবং গায়ে দিবার একটি মোটা বোম্বাই চাদর, এই শয্যাসামগ্রী শেষ অসুখের সময় পর্যন্ত ছিল। একদিন তিনি পায়খানায় গিয়াছেন, ইত্যবসরে সেবক একটি নূতন তোষক পাতিয়া তাঁহার জন্য বিছানা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। পায়খানা হইতে ফিরিয়াই তিনি কোমল শয্যা দেখিয়া, সেবককে তিরস্কারের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা আমায় শান্তিতে মরতে দেবে না? তাই যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে বাপু তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার সেবা আমি চাই না।" ভগ্নদেহের সেই ক্ষীণ কণ্ঠে তখনও যে এইরূপ তেজ আছে, সেবকের তাহা কল্পনাও ছিল না। সেবক সবিনয়ে বলিলেন, "মহারাজ, আমার অপরাধ মার্জনা করুন।" তোষকের দিকে হাত বাড়াইয়া আবার তিনি বলিতে থাকিলেন, "সন্ন্যাসীর মৃত্যুশয্যায় এসব কেন? তুমি দয়া করে এটা তুলে নেবে কি?" দুর্বল দেহে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া ঘরের মেঝেতেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। সেবক বিচলিত হইয়া, অগত্যা তোষকটি তুলিয়া লইয়া করজোড়ে অনুনয় বিনয় করিলে অসুস্থ সন্ন্যাসী শান্ত হইলেন এবং পুনরায় নিজ সতরঞ্চি-শয্যা গ্রহণ করেন। পরের দিন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে আসেন—তাঁহার সস্নেহ অনুরোধে এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কালিকানন্দের কাতর প্রার্থনায় অবশেষে তোষকটি তিনি শয্যায় পাতিতে আর অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের অন্ত্যলীলাখণ্ডে জগদানন্দ-প্রদত্ত তুলার তোষক ও বালিশ দেখিয়া মহাপ্রভুর খেদোক্তির সেই অপূর্ব তেজোমণ্ডিত ভাষাই এখানে স্মরণ হয়—সন্ন্যাসি-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য যে তিতিক্ষা, উহাই সে ভাষার বর্ণে বর্ণে অভিব্যক্ত হইয়াছে :

"প্রভু কহেন, খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলি বালিশ মস্তক-মুণ্ডন॥"

'সন্ন্যাসী' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যার্থেই স্বামী আত্মানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন—তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যই ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। একদা কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনি কি ব্রাহ্মণ?" আত্মানন্দ জবাব দিয়াছিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।" একবার, দুইবার, তিনবার, ঐ প্রশ্নের একই উত্তর তিনি দিয়াছিলেন।

দুর্বলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল—জাপক আত্মানন্দের কর-জপ কিন্তু তখনও অবিরাম চলিতেছিল। দেহ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। অবশেষে, ১২ই অক্টোবর (১৯২৩), শুক্রবার (বাংলা ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০), মহাযাত্রার শেষদিনটি সমাগত হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দজী ব্যথিতকণ্ঠে প্রশান্তবদন প্রয়াণোন্মুখ সন্ন্যাসীকে উচ্চৈঃস্বরে ইষ্টনাম শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং অন্যান্য বহু সাধু-পরিবৃত হইয়া জগজ্জননীর প্রিয় সন্তান, স্বামিজীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী আত্মানন্দ সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে আত্মস্বরূপে বিলীন হইলেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আনুমানিক ৫৫ বৎসর। পরের দিন (১৩ই অক্টোবর) স্বামী শুদ্ধানন্দজী বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীকে পত্র[১]-দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন,—

"......আমাদের পরম প্রিয়তম বহুকালের বন্ধু ও গুরুভ্রাতা শুকুল মহারাজ গতকল্য শুক্রবার, ৭টা ২৫ মিনিটের সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে আমরা যথারীতি তাঁহার দেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকায় জলসমাধি করিয়া আসিয়াছি।"......স্বামী শিবানন্দজী সব শুনিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ ছিল।"

দেহত্যাগের মাত্র কিছুদিন পূর্বে জনৈক সেবক ব্রহ্মচারী আত্মানন্দজীকে তাঁহার দর্শনানুভূতি সম্পর্কে কিছু বলিবার জন্য ধরিয়া বসিয়াছিলেন। প্রিয় সেবকের বার বার অনুরোধে নিজমুখে এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন: "তোমরা দর্শন বলতে যা বোঝ, আমার বাপু তেমন কিছু হয়নি। তবে একটি দিব্যস্বপ্ন—হাঁ স্বপ্নই বটে—দেখেছিলাম। তা শোন। একে যদি তুমি দর্শন বলতে চাও বল।......একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি 'কিছুই তো হল

১ স্বামী শুদ্ধানন্দজী-লিখিত দীর্ঘ পত্রখানি 'উদ্বোধন', অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত।

না। জন্মটা বৃথাই গেল' এরূপ ভাবতে ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য ঠিক ঘুমিয়েছিলাম বলে মনে হয় না। হঠাৎ দেখি সামনে দুটি জ্যোতির্ময় পদচিহ্ন। কার পায়ের ছাপ তক্ষুনি বুঝিনি—পরে ঠিক বুঝেছিলাম শ্রীশ্রীমারই পদচিহ্ন। দেখতে দেখতে চরণচিহ্নযুগল থেকে অসীম জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়ে আমাকে যেন ঘিরে ফেলল—আমি তাতে একেবারে ডুবে গেলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, কিন্তু পরম আনন্দে ছিলাম। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্তে ও আনন্দে থাকে, ঠিক তেমন বোধ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল কত দূরদূরান্তরে চলে যাচ্ছি,—'আমি'-টাও ছিল কিনা বলতে পারছি না, সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। সে আনন্দের নেশা অনেকক্ষণ ছিল। পরে অনেক ভেবেছি—'একি সত্য না স্বপ্ন?' এখনও আমি ঠিক করতে পারিনি। স্বপ্নই হয়তো—কিন্তু সেই পরমানন্দের আস্বাদ এখনও পাই। আর তারই জন্য মনটা আজও ব্যাকুল।"

সাধক আত্মানন্দের এ অনুভূতির মর্ম-ব্যাখ্যা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি তাঁহার উচ্চ অনুভূতিশীল অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের জন্যই এই ঘটনার উল্লেখ। মাতৃভক্ত শুকুল মহারাজের হৃদয়টি কেমন মা-ময় ছিল উহার কিছু পরিচয় প্রবন্ধমধ্যে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান প্রসঙ্গেও পুনরায় উহা অভিসূচিত হইল।

সন্ন্যাসী আত্মানন্দের প্রতি সঙ্ঘের প্রবীণ নায়কদের কতখানি বিশ্বাস ছিল, সে-পরিচয়ও পাঠক ইতোমধ্যে পাইয়াছেন। আর একটি ঘটনাতে উহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী উপস্থিত। তাঁহার নিকট কয়েকজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসপ্রার্থী। আশ্রমের প্রাঙ্গণে জামগাছটির তলায় সারদানন্দজী বসিয়া আছেন—আত্মানন্দপ্রমুখ আরও কেহ কেহ নিকটে আছেন। ব্রহ্মচারিগণ সারদানন্দজী মহারাজের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। সারদানন্দজী তাঁহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন, শুকুল মহারাজের অনুমতি নিতে। শুকুল মহারাজ অনুমতি দিলে তাঁহার আপত্তি নাই। আত্মানন্দজী ইহা শুনিয়াই করজোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ আপনি এদের মাথায় চাঁটি মেরে দিলে এদের মুক্তি হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে এদের সন্ন্যাস দেবেন, তাতে আর আমাদের মতামত কি? এরা ভাগ্যবান যে আপনার কৃপা পাবে। আপনার কৃপায়

এদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমরা আর এ বিষয়ে কি বলব ?" এই কথা বলিয়াই তিনি সারদানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

আত্মানন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের এইসব পরিচয়-চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে অনুধ্যানযোগ্য। সন্ন্যাসীর পালনীয় কঠোর নিয়ম ও রীতিনীতিগুলির প্রতি অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি সমান সজাগ ছিল। একবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমে ভাগবত পাঠ হইতেছে—স্বামী প্রেমানন্দজী এবং তুরীয়ানন্দজী পাঠ শ্রবণ করিতেছেন,—উভয় আশ্রমের প্রাচীন-নবীন অনেক সাধুই সেখানে রহিয়াছেন। আত্মানন্দও তখন কাশীতে ছিলেন এবং তিনিও পাঠ শুনিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত আসিয়া বড় সতরঞ্চির একপ্রান্তে সকলের পশ্চাতে বসিলে, আত্মানন্দ তন্মুহূর্তেই পাঠশ্রবণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। পরে কোন প্রাচীন সাধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে সন্ন্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ।" তাঁহাকে যখন বলা হইল, তবে প্রেমানন্দ স্বামী, তুরীয়ানন্দ স্বামী ঐ আসনে বসিলেন কি করিয়া, তাহাতে সুন্দর উত্তর তিনি দিয়াছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজের এক এক চাঁটিতে আমার মতো হাজার শুকুলের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়।" শোনা যায়, স্বামী প্রেমানন্দজী পরে এই ঘটনা শুনিয়া আত্মানন্দের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্বামী আত্মানন্দের মহাসমাধির পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁহার যে চরিত্র-চিত্রণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাই তাঁহার সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য।[১] উহা এইরূপ : "He combined in his life the hard rigour and discipline of an ascetic with quiet inward disposition of a Yogi. And every minute detail of his activity was a clear demonstration and proof of that particular phase of personality." বাস্তবিকই, তপস্বী আত্মানন্দের জীবন তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা এবং যোগিসুলভ অন্তর্মুখীনতার উপাদান দিয়াই গঠিত ছিল। তাঁহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কর্মের মধ্যেও এই আশ্চর্য ব্যক্তি-সত্তাটিই ফুটিয়া উঠিত।

১ *Prabuddha Bharata*, **Nov. 1923.**

স্বামী আত্মানন্দজীর অন্যতম প্রিয় সহচর ও গুরুভ্রাতা স্বামী বোধানন্দজীর কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী উক্তি বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহারে স্মরণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,[১] "তাঁহার সেই দিব্যমূর্তি আমার মনের সম্মুখে এখনও বিরাজ করিতেছে। আমি করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার পুণ্যজীবন আমাদের এক জলন্ত আদর্শ। উহা ধর্মমার্গের পথিকদের ধ্রুবতারাসদৃশ। স্বামী আত্মানন্দের জীবনচরিত পড়িয়া পাঠক ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। তাঁহার চরণে আবার নমস্কার করি।"

---

১ 'উদ্বোধন' (আষাঢ়, ১৩৫৭) দ্রষ্টব্য।



স্বামী সদানন্দ

স্বামী সদানন্দ

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বৃন্দাবন হইতে হৃষীকেশের পথে চলিয়াছেন। টিকেটের মেয়াদ ছিল বোধ হয় হাতরাস পর্যন্তই—তাই হাতরাস স্টেশনেই ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর কীভাবে যাইবেন, সাহায্য কোথা হইতে আসিবে, সবই অনিশ্চিত। সন্ন্যাসী কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত, মুখে-চোখে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই, বরং তীব্র বৈরাগ্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ের দীপ্তি তাঁহার আয়ত চক্ষু দুইটি হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তবে পথশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিল—তাই স্টেশন-প্লাটফর্মে একটি বেঞ্চের কোণায় আপনভাবে বসিয়া আছেন। কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টারের দৃষ্টি সহসা প্লাটফর্মের একান্তে উপবিষ্ট এই সাধুটির প্রতি পড়িল। সাধুর অস্বাভাবিক উজ্জল চক্ষু এবং প্রসন্ন মুখকান্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করায়, নিকটে গিয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন—"ক্যা মহারাজ! হিঁয়া পর্ কেঁও বৈঠা হ্যায়? যাওগে নেহি?" জবাব মিলিল, "হাঁ হাঁ, যায়েঙ্গে তো জরুর।" সাহস পাইয়া আর একটু কাছে গিয়া স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, তামাকু পিওগে?" এবারও উদাস-নিস্পৃহ উত্তর—"হাঁ, পিলাও তো পিয়েঙ্গে।"

নিরভিমান সাধুর সহজ সাদাসিধা কথায়, এবং তাঁহার কমনীয় অথচ তেজোদৃপ্ত চেহারায়, রেল-কর্মচারী ভদ্রলোকটি বড়ই আকর্ষণ বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "বাঃ, এমন চমৎকারমূর্তি সাধু তো কখনও আগে দেখি নাই।" সসঙ্কোচে আবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনার কি বাঙ্গালী শরীর?" সন্ন্যাসী স্মিতহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "হুঁ।" করজোড়ে এবার অনুনয় করিলেন, "মহারাজ, মনে হচ্ছে আপনি বড় ক্ষুধার্ত। অনুগ্রহ করে আমার বাসায় আপনি চলুন। আমি একাই সেখানে থাকি।" "বেশ তাই চলো"—একেবারে এককথায় সন্ন্যাসী স্টেশন মাস্টারের বাসায় গিয়া অতিথি হইলেন।

আপন-পর-ভেদহীন এই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর সরল আচরণ স্টেশন-মাস্টার মহাশয়ের অন্তরকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করিল। বাসায় উপস্থিত হইয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, কি দিয়ে তুমি অতিথিকে সেবা করবে?"

উত্তরে গৃহস্বামী একটি ফারসী কবিতার অংশ আবৃত্তি করেন। উহার অর্থ: "হে প্রিয়তম, তুমি আমার গৃহে আগমন করিয়াছ, আমি আমার বুকের কলিজা দিয়া তোমার জন্য উত্তম আহার্য প্রস্তুত করিব।" সত্য-সত্যই বুকের কলিজা দিয়া সেদিন আহার্য তৈয়ারী হয় নাই বটে, কিন্তু সম্মানিত এই সন্ন্যাসি-অতিথির সেবায় তিনি যে নিজের হৃদয়টিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পরিব্রাজক এই সন্ন্যাসীই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেবক স্টেশন মাস্টারটির নাম শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত—উত্তরজীবনে স্বামিজীর অনুগত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে গুপ্ত মহারাজ নামে খ্যাত। গুরু-শিষ্যের প্রথম পরিচয় এইভাবেই হইয়াছিল।[১] অনেকের মতে স্বামিজীর সর্বপ্রথম শিষ্য হইবার ঐতিহাসিক গৌরব হাতরাসের এই স্টেশন-মাস্টারটিরই প্রাপ্য। এবং ইহাও ঠিক যে এই গৌরবই স্বামী সদানন্দকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুআরি (১২৭১ বঙ্গাব্দের, ২২শে পৌষ) কলিকাতার গড়পার পল্লীতে শরৎচন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতা যদুনাথ গুপ্ত ১৮৬৮ সালেরই কোন সময়ে সপরিবারে বারাণসীর সন্নিকটে জৌনপুরে চলিয়া যান এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করেন। বাঙালী হইলেও, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় লালিত পালিত—তাই শরৎচন্দ্র বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ও উর্দুই ভাল জানিতেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্তও গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সংসারে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত ও উপার্জনক্ষম যুবক ছিলেন, কিন্তু সহসা বৈরাগ্যের প্রেরণায় সকল কিছুকে পশ্চাতে ফেলিয়া সংসার-বিরাগী হইয়া চলিয়া যান। সিন্ধুপ্রদেশে এবং হায়দ্রাবাদের দিকে তিনি অনেককাল ছিলেন। সর্বদা হাত-তালি দিয়া মধুরস্বরে ওঁকার গান করিতেন বলিয়া, ঐসব অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে 'তালিদার বাবা' বলিয়া চিনিত। কিছুদিন তিনি কাশীধামে দুর্গাবাড়ীতে থাকিয়াও ভজন-সাধন করিয়াছেন।

১ ভগিনী কৃষ্টিনের *Swami Vivekananda As I saw Him* নামক স্মৃতি-প্রবন্ধে স্বামিজীর সহিত সদানন্দের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি একটু অন্যরূপ দেখা যায়। ট্রেনের কামরায় আসীন স্বামিজীর নেত্রদ্বয় দেখিয়া, শরৎচন্দ্রই তাঁহাকে অনুনয় করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে এক রাত্রিতে তিনি ঐ আশ্চর্য চক্ষু দুইটি নাকি স্বপ্নেও দেখিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য: *Reminiscences of Swami Vivekananda*, **Published by Advaita Ashrama.**)

বহুলোক ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একবার তাঁহার কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল। নিবেদিতা এই সাধুকে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "The inner man is out" ("এঁর অন্তর-পুরুষ প্রকাশিত হয়েছেন")। শরৎচন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণতা, মনে হয় তাঁহার পূর্বগামী এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ সংক্রমিত হইয়াছিল।

বলিষ্ঠ দেহ, দৃঢ় চরিত্র, অবিবাহিত শরৎচন্দ্র ভারী দিলদরাজ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অকপট, সরল ও উদার মনোভাবই তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের কর্মজীবনের—শুধু কর্মজীবনের নহে, তাঁহার সমগ্র জীবনের এক অবিস্মরণীয় পর্যায়, তাঁহার রেলবিভাগের কর্ম স্বীকার। আবার হাতরাসের স্টেশন-প্লাটফর্মটিই যেন তাঁহার জীবন-নাট্যের সর্বপ্রধান দৃশ্যপট। স্টেশন মাস্টারের পদে নিযুক্ত—তাই দৈনন্দিন অসংখ্য যাত্রীর সঙ্গে তাঁহার দেখাশোনা, কত সহস্র মানুষের যাওয়া-আসার পথের সাক্ষী তিনি। চেনা-অচেনা আপন-পর কত লোকই নিত্য সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করে, কিন্তু এই কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টারের দৃষ্টিকে কেহই এমন আকর্ষণ কথনও করে না, যাহাতে তাঁহার কর্তব্যকর্ম বিঘ্নিত হয়। এইরূপই চলিতেছিল স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের কর্তব্যমুখর জীবন। এমন সময়ে সহসা পরিব্রাজক স্বামিজীর আবির্ভাব হাতরাস স্টেশনে। মূর্তিমান পৌরুষের বিশাল নেত্রদ্বয়ের মধ্যে কী বিদ্যুৎশক্তি সেদিন খেলিতেছিল কে জানে? কর্তব্যপরায়ণ শরৎচন্দ্রের সকল কর্তব্য-বন্ধন ঘুচাইয়াছিল সেই শক্তিই। স্বামী বিরজানন্দজীর ভাষায়: "শরৎচন্দ্র গুপ্ত তাঁর মনোহর রূপ ও 'মারাত্মক' চক্ষু দেখে মুগ্ধ হলেন···।"

শরৎচন্দ্রের বাসায় স্বামিজী অতিথি হইয়াছেন। অপূর্বদৃষ্ট এই সন্ন্যাসীর চক্ষে সারা বিশ্বকে আপনকরা এক অলৌকিক প্রভা দেখিয়া শরৎচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। ইঁদারা হইতে নিজে জল তুলিয়া পরম যত্নে ও শ্রদ্ধাসহকারে স্বামিজীকে স্নান করাইলেন, নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করাইলেন, তাঁহার বিশ্রামের জন্য যথোচিত আয়োজনাদি করিয়া দিলেন, সন্ন্যাসী অতিথির সামান্য একটু তৃপ্তি বিধানের জন্য আরও কি যে করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। স্বামিজীও তাঁহার সেবায়,

আন্তরিকতায় ও সরলতায় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে যতই দেখেন, ততই শরৎচন্দ্রের প্রাণ তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকে—সংসারে একমাত্র তাঁহাকেই আপন জন বলিয়া মনে হইতেছিল। শরৎচন্দ্রের সবই ছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, যৌবন, সামর্থ্য, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, বা পরিজন-আত্মীয় সংসারে সবই তাঁহার ছিল—তথাপি তাঁহার প্রাণে ধ্বনিত হইতেছিল, "পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে?" দিশাহারা শরৎচন্দ্র সরল প্রাণে স্বামিজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আমার কি হবে? আমায় আপনি সঙ্গে করে নিয়ে চলুন।" রহস্যপ্রিয় স্বামিজী ইহাতে 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে কয়েকটি কলি গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—হুবহু অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিয়াছিলেন:

"বিদ্যা যদি লভিতে চাও,
চাঁদমুখে ছাই মাখো
নইলে এই বেলা পথ দেখো।"

অতিশয় সরল শরৎচন্দ্র ক্ষণমাত্র না ভাবিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন—দৌড়িয়া গিয়া উনুন হইতে কিছু ছাই তুলিয়া আপন মুখে মাখিয়া কিম্ভূত-কিমাকার সাজিয়া আবার আসিয়া হাজির হইলেন। স্বামিজী তো হাসিয়া আকুল, বলিলেন, "আরে দূর্, তুমি মুখে ছাই মেখে এলে কেন?" অপ্রস্তুত শরৎচন্দ্র অমনিই উত্তর দিলেন, "কেন বাবা, এই যে আপনি মাখতে বললেন।"

যাহা হউক, হাসি-আমোদ এইরূপ চলিলেও, শরৎচন্দ্র কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে জীবনের সর্বস্ব বিকাইয়াও স্বামিজীকে অনুসরণ করিবেন—আবশ্যক হইলে কর্ম ত্যাগ করিবেন, সংসার ছাড়িবেন। একদিন স্বামিজীকে একটু চিন্তান্বিত দেখিয়া, অকপটে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী, এত কি ভাবছেন আপনি? আমি আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদাই তৈয়ারী। কি সাহায্য আমি করতে পারি আদেশ করুন।" স্বামিজী সেদিন অত্যন্ত আবেগজড়িত ভাষায় ভাবী শিষ্যকে তাঁহার জীবনের মূল রহস্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট মহান্ কর্ম এবং উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন। জীবোদ্ধাররূপ মহৎ দায় কী উপায়ে তিনি সম্পন্ন করিবেন,—এই গুরুভার লাঘব করিতে কে বা কাহারা আসিয়া মাথা পাতিয়া দিবে, ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তার কারণ। স্বামিজী পরে বলিলেন,

"তুমি ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে প্রস্তুত?" বলিষ্ঠ উত্তর হইল, "আপনি অনুমতি করুন।" স্বামিজীর আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ স্টেশন মাস্টার শরৎ গুপ্ত রেলের কুলীদের পল্লী হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি স্বামিজীর পদপ্রান্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের আজ্ঞাবহতা ও নিরভিমানিতা দেখিয়া স্বামিজী খুবই খুশী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অজস্র আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

এদিকে স্বামিজীর মন হিমালয়ের টানে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—হাতরাসের আসন গুটাইয়া হরিদ্বার ও হৃষীকেশের পথে আবার যাত্রা শুরু করিবেন, এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াছেন। সহসা একদিন বলিলেন, "আর আমি এখানে থাকব না। সন্ন্যাসীর এক জায়গায় বেশীদিন থাকা উচিত নয়। তা' ছাড়া, এখানে থাকতে থাকতে তোমাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছি—এ-ও ভাল নয়। তোমরা কিন্তু আর আমায় আটকিও না বাপু।" এই কথায় শরৎচন্দ্র বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরিব্রাজক সাধুকে আর ধরিয়া রাখা যাইবে না বুঝিয়া, বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, "স্বামিজী, অনুগ্রহ করে আপনি আমায় শিষ্য করে নিন।" তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বামিজী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার শিষ্য হলেই কি ভাবছ অধ্যাত্মজগতের সব তত্ত্ব তোমার করতলগত হবে? মনে রেখো, ঈশ্বর সবভূতে আছেন, তা' হলেই তোমার উন্নতি হবে। মাঝে মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎচন্দ্র কিন্তু ভুলিবার পাত্র নহেন। যে কোন বস্তুর বিনিময়ে স্বামিজীর চরণাশ্রয় গ্রহণ তাঁহার জীবনের একমাত্র পণ হইয়া দাঁড়াইল। রেলের কর্মে ইস্তফা দিয়া, দুই-চারিখানি কাপড় গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া লইয়া পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন—স্বামিজীর অনুসরণ করিবেন। অগত্যা স্বামিজীও তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না।

পরিব্রাজক স্বামিজী আবার হৃষীকেশের পথে পা বাড়াইলেন। যাত্রা শুরু হইল—শরৎচন্দ্রও শ্রীগুরুর পদাঙ্ক ধরিয়া অনুগমন করিতে থাকিলেন। সরল আনন্দময় শিষ্যের অকপট আনুগত্যে গুরুরও আনন্দের সীমা ছিল না—স্বামিজী নবীন শিষ্যকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নাম দিলেন সদানন্দ। সন্ন্যাসী সদানন্দ আচার্যকে প্রাণপণ অনুসরণ করিতেছিলেন, আর ক্রমে ইহাও উপলব্ধি

করিতে পারিতেছিলেন যে, এই নিরালম্ব পরিব্রাজক-জীবন সাধারণ লোকের পক্ষে কত কঠিন। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো জীবনভর এই কঠোরতারই সাধনা। যাহা হউক সশিষ্য স্বামিজীর যাত্রাপথে নানাপ্রকার বিঘ্ন-বিপদ মাঝে মধ্যে ক্লেশ উৎপাদন করিলেও কখনও পথরোধ করিতে পারে নাই। সাহারানপুর পর্যন্ত ট্রেনে আসিয়া, তারপর তাঁহারা পদব্রজেই চলিতে থাকিলেন।

স্বামিজীর অনুগমনকারী সদানন্দের জীবনে এইকালের স্মৃতিগুলি গভীরভাবে মুদ্রিত ছিল—বস্তুতঃ এইগুলিই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের কর্ম ও সাধনার প্রেরণাস্বরূপ। পার্বত্য বন্ধুর পথে, কম্বল-পুঁটলি নিজের স্কন্ধে ঝুলাইয়া,বা হাতে লইয়া, চড়াই-উতরাই করা অনভ্যস্ত সদানন্দের পক্ষে যে কী কষ্টকর ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ বলিষ্ঠপদে বিচরণকারী স্বামিজী দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন। সদানন্দ নিজের দেহের ভার, তদুপরি সঙ্গের পুঁটলিটির বোঝা লইয়া ক্রমশঃ বেসামাল হইয়া পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। পায়ের ভারী বুট জুতাজোড়াও যেন অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইল—উহার ওজন মনে হইতেছিল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নিরুপায় সদানন্দ পায়ের জুতাজোড়া খুলিয়া পুঁটলির মধ্যে ঢুকাইয়া লইলেন—ভাবিলেন, খালি পায়ে ভাল হাঁটিবেন। কিন্তু হায়, অবসন্ন শরীরে দুর্গম পথ অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে যেন অসাধ্যই হইয়া উঠিতেছিল—ভারসাম্য রাখিয়া উঁচু-নীচু কঠিন-পিচ্ছিল পথে পা যেন আর ফেলিতেই পারিতেছিলেন না। অবশেষে পুঁটলিটি মাথায় লইয়া চলার চেষ্টা করিলেন। শিষ্যের এই দুরবস্থা দেখিয়া, স্বামিজী তাঁহার পুঁটলিটি কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং দৃঢ় হস্ত প্রসারিত করিয়া শিষ্যের দেহটিকেও সবলে ধরিয়া লইয়া পথ চলিতে থাকিলেন। পরবর্তী জীবনে সদানন্দ এই ঘটনা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন আর সগৌরব অভিমানভরে বলিতেন, "আরে, তা' না হলে কি স্বামিজী আমার গুরু? অম্লানবদনে আমার পরা জুতা মাথায় করে নিয়ে চললেন! আর আমিও তখন এমনই হাবা-গোবা যে, স্বামিজীর কথায় এতদূর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি যে স্বয়ং গুরু যে আমার জুতা মাথায় করে নিয়ে চলেছেন, তা আর কিছু খেয়াল ছিল না। একমাত্র তাঁর কথার উপরেই আমার ষোল-আনা মনটা পড়েছিল। একেই বলে স্বামিজীর ভালবাসা! আরে, আমি জন্মেছি স্বামিজীরই সেবা করবার জন্য। আমি আর কিছু জগতে চাই না।" আবার

আবেগভরে এমনও বলিয়াছেন বহুবার : " 'উল্টা সমঝিলি রাম' হল, তাঁকেই আমার বোঝা বইতে হল! শুধু বোঝা নয়, আমার ভারী জুতাজোড়া পর্যন্ত মাথায় করে বইলেন। এমন না হলে কি আর তাঁকে গুরু করি?"

স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের উদ্দীপনাময় ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী মানুষকে পুরুষকার, সাহস ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামী সদানন্দের মুখে তাঁহার শ্রীগুরুর স্মৃতিকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে এমন বহু কাহিনী শোনা যাইত, যাহাতে স্বামিজীর লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। স্বামিজীর সঙ্গে এই পর্যটনকালে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন—আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কত কথাই বলিতেন! সদানন্দকথিত স্মৃতি-চিত্র : "একদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এতো কাতর হয়েছিলাম যে, সেদিন নিশ্চিতই আমার মৃত্যু হত। কিন্তু স্বামিজীর কি স্নেহ! তিনি নিজ হাতে আমায় ধরে ধরে কতকদূর নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আর একদিন একটি পার্বত্য নদী পার হয়ে যেতে হবে। একজনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া যোগাড় করা গেল। নদীতে দারুণ বেগ—আবার স্রোতের তলায় ভয়ঙ্কর পিছল পাথর আর নুড়ি। পা পিছলাবার আশঙ্কা পদে পদে। আর ঐ খরস্রোতের মধ্যে এক পা পিছলালেই মৃত্যু অবধারিত। আমি তো দিব্যি ঘোড়ায় চড়ে চলেছি—আর স্বামিজী নিজের জীবন বিপন্ন করে, সহিসের মতো আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে, ঘোড়াকে আর আমাকে সামলিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে এমন কয়েকবার মনে হয়েছিল যে, ঘোড়াকে বুঝি আর রাখা যাবে না। কিন্তু অসমসাহসী ছিলেন স্বামিজী,—কত প্রেম আর করুণা ছিল তাঁর বক্ষে! নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, ঘোড়াশুদ্ধ আমাকে পার করেছিলেন। তাঁর প্রেম ভালবাসার কথা কি মুখে বলা যায়? তিনি প্রেমেরই অবতার ছিলেন।...তাঁর সঙ্গে থাকলে মনে এতটা বল ও সাহস থাকত যে মৃত্যুকেও তুচ্ছ বোধ হত। একদিন পাহাড়ে এক জঙ্গলের পথে চলেছি, যেতে যেতে এক জায়গায় কিছু মানুষের অস্থি পড়ে আছে দেখা গেল—আশে পাশে আবার টুকরো টুকরো গেরুয়া কাপড়ও পড়েছিল। স্বামিজী সেইদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখ সদানন্দ, একজন সন্ন্যাসীকে

বাঘে খেয়েছে। তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আপনি সঙ্গে থাকলে কিসের ভয় আমার?' "

সদানন্দকে লইয়া স্বামিজী হৃষীকেশে আসিয়া পৌছিলেন। ঝাড়িতে অবস্থান করিয়া কঠোর ভজন-সাধনে সশিষ্য তিনি বেশ তন্ময় হইয়াই ছিলেন। কেদার-বদরী দর্শনের জন্য স্বামিজীর মন তখন ব্যাকুল, কিন্তু সদানন্দের স্বাস্থ্য ও অক্ষমতার কথা ভাবিয়া তিনি বার বারই মনকে শান্ত করিতেছিলেন। সর্ববন্ধনমুক্ত পরিব্রাজক হঠাৎ একদিন বলিয়া বসিলেন, "তুই দেখ্ছি গুপ্ত, আমার পায়ের বেড়ি হলি। আমি সব ছেড়ে একা বেড়াচ্ছি, তুই এসে এক উৎপাত জুটলি। এবার আমি নিজের ভাবে চললুম—আর এখানে নয়।" এদিকে তখন ক্ষুধার্ত স্বামিজীর জন্য সদানন্দ ভিক্ষালব্ধ চালে-ডালে খিচুড়ি রন্ধন করিতেছিলেন। স্বামিজী কিন্তু ঐ কথা বলিয়াই কম্বল কাঁধে করিয়া ও দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন—চকিতের মধ্যে দ্রুতপদে লছমন ঝোলার পথে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সদানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উনুনের কাছে নির্বাক বসিয়াই থাকিলেন। উনুনের ধিক্ ধিক্ আঁচে চাল-ডাল ফুটিতেছিল—বুঝিবা এতক্ষণে তাঁহার বক্ষ-পঞ্জরেও আঁচ লাগিয়া হৃদ্‌পিণ্ডটিও ফুটিতে শুরু করিয়াছিল! ঘণ্টা তিন-চার এমন কাটিয়া গেল—হতাশায়, অভিমানে, বেদনায় সদানন্দ নিস্পন্দ একঠাঁই বসিয়া আছেন। সহসা কোথা হইতে স্বামিজী আবার আসিয়া সদানন্দের পিছনে দাঁড়াইয়াছেন, "হ্যাঁরে, কিছু খাওয়াতে পারিস্? বড় ক্ষিদে পেয়েছে?" জমাটবাঁধা কালো মেঘ ঠেলিয়া যেন সূর্যের প্রকাশ হইয়াছে। সদানন্দের মুখে হাসি ফুটিল—উত্তর দিলেন, "এক্ষুনি দিচ্ছি। খিচুড়ি তো বসানোই রয়েছে।" স্বামিজী খুশী হইয়া শিষ্যকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "তুই না খেয়ে বসে আছিস্?" অভিমানভরা কণ্ঠে শিষ্যও জবাব দিলেন, "আপনি নেই, আমি খাই কি করে?" স্বামিজী তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তুই দেখছি সত্যিই আমার পায়ের বেড়ি হয়েছিস্। চলে তো আমি গিয়েইছিলাম—পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে মনে পড়ে গেল তোর কথা। তোকে একা ফেলে এসেছি। তুই যা বোকা-হাবা, কি করতে কি করে বসবি তার ঠিক নেই। দেখ্ তাই আবার তোরই জন্যে ফিরে এলুম।" সদানন্দ স্বামিজীর জন্য গরম খিচুড়ি ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া

তাঁহাকে আহারে বসাইলেন। স্বামিজীকে খুব প্রসন্ন দেখিয়া, ভক্ত-শিষ্য সগৌরবে বলিলেন, "আপনি যাবেন কি করে? আমিই তো আপনাকে টেনে নিয়ে এলুম।"

যাহা হউক, স্বামিজীর ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সদানন্দের জন্যই তাঁহার আর কেদার-বদরী দর্শন হইয়া ওঠে নাই। সদানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তাঁহাকে লইয়া পুনরায় তিনি হাতরাসে চলিয়া যান। সেখানে পুরাতন বন্ধুদের সাহায্যে সদানন্দের চিকিৎসাদির বন্দোবস্তও স্বামিজী করিয়া দিলেন। তখন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক। স্বামিজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং সদানন্দকেও বলিয়া আসিয়াছিলেন, একটু সারিয়া উঠিলেই যেন তিনি বরাহনগরে চলিয়া যান। তদনুযায়ী কয়েকমাস পরেই সদানন্দ মঠে চলিয়া আসিলেন। তিনি মঠে পৌঁছিয়াই শুনিলেন যে, স্বামিজী পুনরায় প্রব্রজ্যায় যাইবেন বলিয়া সব স্থির হইয়া আছে। কিন্তু নবাগত শিষ্যকে পাইয়া তাঁহার সেই সঙ্কল্প আরও এক বৎসর স্থগিত রাখেন। স্বামিজীর এই শিষ্য-প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া সদানন্দ উত্তরজীবনে সগর্বে বলিতেন, "স্বামিজীর জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তো আমাকে নিয়েই।"

সদানন্দ বরাহনগর মঠে আসিয়া, অনভ্যস্ত পরিবেশ ও আবেষ্টনীতে প্রথমে বোধহয় একটু অসুবিধাই বোধ করিতেছিলেন। সর্বোপরি বাংলা-ভাষায় তেমন দখল না থাকায়, সকলের সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার সুখ পাইতেছিলেন না, আবার অপরের কথাও সব সময়ে তিনি ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার আধা হিন্দী আধা বাংলা মিশাইয়া অভিনব বাক্‌ভঙ্গি শুনিতে সকলে বেশ মজা বোধ করিতেন। যাহা হউক, এই সময়ে স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে খুব সহানুভূতি দেখাইতেন এবং সর্বপ্রকারে তাঁহাকে মঠের ভাবধারার সঙ্গে অভ্যস্ত করাইতে যত্ন লইয়াছিলেন। সারদানন্দজীর মমতাপূর্ণ শিক্ষাগুণেই, সদানন্দ খুব অল্প-দিনেই বরাহনগর মঠের একজন বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই জীবনের অন্তিম পর্যন্ত তিনি স্বামী সারদানন্দজীর অতুলনীয় স্নেহের কথা উল্লেখ করিতেন। বরাহনগর মঠে আগমনের এই প্রথমাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "শরৎ মহারাজ তখন আশ্রয় না দিলে, কি যে করতুম তা কে জানে!"

মঠের সেই প্রারম্ভিক কালে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা কেহ বা তপস্থায়, কেহ বা তীর্থভ্রমণে, আবার কেহ বা অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন—বরাহনগরে আসিয়া মাঝে মাঝে অবস্থান করিলেও একই কালে সকলের একসঙ্গে বাস বা দেখাশোনা কদাচিৎ হইত। পরস্পরের সম্বোধন ইত্যাদিতে তাই তখনও পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট প্রথা কিছু ছিল না। সদানন্দ স্বামী পশ্চিমী প্রথানুযায়ী সাধুদের সকলকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। তখন হইতেই মঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বোধনে 'মহারাজ' কথাটির প্রচলন হয়।

বরাহনগর মঠের পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করিয়া সদানন্দ পরে অনেক প্রসঙ্গ করিতেন। স্বামিজীর তখনকার মঠ-জীবনের অতি সুন্দর আলেখ্য ঐ-সব প্রসঙ্গাদি হইতে জানা যায়। তিনি বলিতেন, "তখন সর্বদা শশব্যস্ত থাকতে হত, এক মুহূর্তেরও বিশ্রাম ছিল না। অনেক লোক আসা যাওয়া করতেন, অনেক পণ্ডিত তর্ক-আলোচনাদি করতেন,—স্বামিজী এক মুহূর্তও কাজ ছাড়া থাকতেন না। কখনও কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকবার অবসর পেতেন; সেই সময়ে 'হরিবোল, হরিবোল!' অথবা 'মা, মা!' বলতে বলতে পায়চারি করতেন। আমি দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতাম; এবং একটু ফাঁকা পেলে বলতাম, 'আপনি খাবেন না?' আর তিনি তা শুনে রহস্যপূর্ণ সব উত্তর দিতেন।...চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর কাজ ছিল। তিনি যেন উন্মত্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন! আবার অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই তিনি উঠে পড়ে 'জাগো, জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী' এই গানটি গাইতে গাইতে সকলকে উঠিয়ে দিতেন। তারপর সকলে ধ্যান করতেন। পরে ভজন, সৎপ্রসঙ্গ, পাঠ, আলোচনা এমন চলতো যে সবাই আত্মহারা হয়ে তাতেই ডুবে যেতেন। বেলা একটা-দু'টোর সময়ে হয়তো স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—তিনিই তখন একাধারে মঠের তত্ত্বাবধায়ক, ঠাকুরের পূজারী এবং পাচক ছিলেন—সবাইকে জোর করে স্নানাহার করতে পাঠাতেন। এর পরেও আবার প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত ভজন ও সৎপ্রসঙ্গাদি। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক—পরে কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হত। তারপর আবার সকলে ধ্যান করতেন—একেবারে ধ্যানে ডুবে যেতেন। কখনও কখনও ছাদের উপর বসে মধ্যরাত্রির অনেক পর পর্যন্ত 'জয় সীতারাম!' বলে নামগান করতেন সকলে।"

বরাহনগর মঠের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ভগবদ্-বিরহ ও বৈরাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেন, "ওখানে এত জোর তপস্যা চলতো যে ওঁদের কাছে কেউ ঘেঁষতেই পারত না।" আবার উত্তেজিতভাবে সদানন্দকে বলিতে শোনা যাইত, "We are not mere Sadhus. We belong to the line of Prophets." ("আরে আমরা কী শুধু সাধু? আমরা ঋষিদের দলের")।

মঠে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া সদানন্দ প্রাণ ভরিয়া জপধ্যান এবং নানাবিধ সেবার কাজে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের কঠিন অসুখের সময়ে স্বামী শিবানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত সদানন্দের অক্লান্ত সেবা ও পরিচর্যা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার সেবানিষ্ঠার আরও চমকপ্রদ ইতিহাস পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে। সদানন্দের অন্তরে সেবাভাবের বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামিজী। গাজীপুর হইতে একখানি পত্রে (তারিখ ১৪ই ফেব্রুআরি, ১৮৯০) স্বশিষ্য সদানন্দকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিছু অংশ এখানে স্মরণযোগ্য। স্বামিজী লিখিয়াছিলেন, "……আপনার জপতপ সাধনভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমিও তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে।…যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সে-ই তোমার গুরু জানিবে। কর্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে। গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য এবং অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে।"

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গলাভের পরে, স্বামিজী কাশীধামে গিয়া পুনরায় তপস্যায় রত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের একটি উদ্যানে থাকিয়া কঠোর-ধ্যান-ভজনাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তখনই বা অন্য কোন সময়ে সদানন্দও তাঁহার সঙ্গে কাশীবাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরুর সাহচর্যে থাকিয়া এই তপস্যার স্মৃতি সদানন্দকে সারাজীবন উদ্দীপিত করিত। এই সময়ে স্বামিজীর মন কত উচ্চভূমিতে বিচরণ করিত, তাহা স্মরণ করিয়া সদানন্দ উত্তরজীবনে অনেককে বলিয়াছেন, "স্বামিজী ও আমি একসময়ে কাশীতে বাস

করতাম। একটা লেবু-বাগানে তখন পড়ে থাকতাম আর মাধুকরী করতাম। স্বামিজী কী কঠোর জপ-ধ্যান করতেন! এই সময়ে তিনি কী যে একটা ভাবে থাকতেন, তা বলা চলে না। সর্বদাই বিভোর, যেন মনটা দেহ ছেড়ে কোথায় উড়ে চলে গেছে! মুখ এত গম্ভীর, চোখদুটি এমন জ্যোতিঃপূর্ণ যে মুখের দিকে তাকানোই যেত না—কাছে যেতেও সঙ্কোচ হত।"

এদিকে ১৮৯০-এর মার্চ মাসে স্বামী অভেদানন্দজী হৃষীকেশ হইতে অসুস্থ হইয়া স্বামিজীর নির্দেশানুসারে চিকিৎসার্থে কাশীতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী স্বয়ং তাঁহার চিকিৎসাদির সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ বলরামবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া স্বামিজী কলিকাতায় ফিরিয়া যান। ঐ সময়ে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের উপর অভেদানন্দজীর সেবা-চিকিৎসা ও দেখাশোনার ভার স্বামিজী দিয়া গিয়াছিলেন। অভেদানন্দজীর শরীর তখন খুব কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর কলিকাতা হইতে স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে সদানন্দও আবার কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—অভেদানন্দজীর সকল ভার স্বামিজীর আদেশে এখন তাঁহারাই গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা সকলেই বংশী দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। অভেদানন্দজী পরে এইকালের স্মৃতি-প্রসঙ্গে[১] উল্লেখ করিয়াছেন:

"শরৎ ও গুপ্তকে দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল এবং স্বামিজীর গভীর ভালবাসার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলাম। শরৎ ও গুপ্ত মহারাজের যত্নে ও সেবা শুশ্রূষায় আমি ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইলাম। অবশ্য সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় চারিমাস লাগিয়াছিল।"

অভেদানন্দজী কিছুটা সুস্থ হইয়াই মে মাসে এলাহাবাদের নিকটে যমুনার পরপারে ঝুসীতে গিয়া পুনরায় তপস্যারত হন। সারদানন্দজী এবং সদানন্দ কিন্তু আরও কিছুদিন কাশীধামে থাকিয়া গেলেন এবং তপস্যাদিতে অতিবাহিত করিতে থাকেন। অবশ্য বেশীদিন গত হইতে না হইতেই সদানন্দও ঝুসীতে গিয়া অভেদানন্দজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে তখন যমুনার ধারে একটি ঝুপড়ীতে থাকিতেন। ঝুসীতে তপস্যাকালে তাঁহারা ধ্যান-ধারণা শাস্ত্রচর্চা ও ভজনাদিতে সর্বদা

১ স্বামী অভেদানন্দ লিখিত "আমার জীবনকথা" দ্রষ্টব্য।

মাতিয়া থাকিতেন। অভেদানন্দজী তখন সদানন্দকে নিয়মিত বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেন। এইকালে ধ্যান-ভজনে তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে ভিক্ষার জন্য বাহির হওয়াও যেন বৃথা সময় নষ্ট করা হইবে মনে করিয়া কোন কোন দিন আদৌ ছত্রে যাইতেন না—ভিক্ষার সময় কুঠিয়াতে বসিয়াই বেদান্তচর্চা করিয়া বা ভজন-সঙ্গীত গাহিয়া অতিবাহিত করিতেন। অথচ এমনই আশ্চর্য যে কোন না কোন অপ্রত্যাশিত উপায়ে, ঐরকম দিনে তাঁহাদের কুঠিয়াতেই আহার্য চলিয়া আসিত—কেহ না কেহ আসিয়া ভিক্ষা প্রদান করিয়া যাইতেন। এমন অনেক ঘটনা সদানন্দ স্বামীর মুখে পরে শোনা যাইত। অভেদানন্দজীও এই দিনগুলির স্মৃতি-চারণায় লিখিয়াছেন: "দুই জনে মধ্যাহ্নে মাধুকরীতে যাইতাম। তবে কোন কোন দিন আমি আবার মাধুকরীতে যাইতাম না, গুপ্ত মহারাজ একাই যাইতেন এবং যাহা পাইতেন তাহাই দুই জনে ভাগ করিয়া খাইতাম। প্রতিদিন বৈকালে গুপ্ত আমার নিকট 'বিচার সাগর' (হিন্দী বেদান্ত গ্রন্থ) ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে মাঝে মাঝে দুইজনে বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। ঝুসীতে সাধন-ভজনে ও শাস্ত্রপাঠে দিন বেশ আনন্দের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল।

"ঝুসীতে থাকা কালে একদিনের এক ঘটনার কথা এইখানে বলি। তখন বর্ষাকাল। তখন প্রতিদিন প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে। একদিন প্রাতঃকাল হইতে মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমার গুহার নিকটে নানকপন্থী এক হিন্দুস্থানী সাধু থাকিতেন। আমি ও গুপ্ত মহারাজ যখন মাধুকরীতে বাহির হইতাম তিনিও মাঝে মাঝে আমাদের সহিত যাইতেন। সেইদিন ভোর হইতেই বৃষ্টির সূত্রপাত দেখিয়া নানকপন্থী সাধু আমাদের সকাল সকাল ভিক্ষায় যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন—অন্যথা উপবাস থাকিতে হইবে। আমি সাধুজীর কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম: 'আজ আর ভিক্ষায় যাবনা, অজগর বৃত্তি[১] অবলম্বন করব। ভগবানের কৃপা ও ইচ্ছা হলে আমার ভিক্ষা এখানে এসেই হাজির হবে।'......

১ বেশী বর্ষায় সর্প আহার অন্বেষণেও গর্ত ছাড়িয়া বাহিরে যায় না। তদনুরূপ অভ্যাসের নাম অজগর বৃত্তি।

"সত্যই সেইদিন আমি আর মাধুকরী করিতে বাহির হইলাম না। গুপ্ত মহারাজও আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর ভিক্ষায় বাহির হইলেন না। আমরা দুই জনে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রাদি বিচার ও ধ্যান-জপে ডুবিয়া গেলাম। এই দিকে ঘটনা ঘটিল এক অপূর্ব রকমের! বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি তখন সদানন্দকে 'বিচার সাগর' ব্যাখ্যা করিতেছি। এমন সময় দেখি, জনৈক ভদ্রলোক একটি ঝুড়িতে প্রচুর খাবার-দ্রব্য লইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে আসিতে দেখিলাম, আমাদের চিরপরিচিত বরাহনগর নিবাসী মৈত্র মহাশয়। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম এবং কী ভাবে তিনি আমাদের সন্ধান পাইলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। মৈত্র মহাশয় বলিলেন: 'আমি এলাহাবাদে উপস্থিত হয়ে শুনলাম যে, কালী-তপস্বী নামে একজন তিতিক্ষাবান সাধু ঝুসীতে গঙ্গার ধারে বাস করে তপস্যা করছেন। কালী-তপস্বী নাম শুনে বেশ আগ্রহান্বিত হলাম এবং কালী-তপস্বী অবশ্য আপনিই হবেন এটা মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম। গুপ্ত মহারাজ যে এখানে আছেন তা জানতাম না। যাইহোক আপনাকে দেখার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং রিক্ত হস্তে সাধু দর্শন নিষিদ্ধ বলে এই সামান্য কিছু মিষ্টান্ন-দ্রব্য সঙ্গে এনেছি। অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে এখন অকস্মাৎ আপনাদের এখানে পেয়ে।'

"......আমরা মিষ্টান্নাদির কিছু অংশ সেই নানকপন্থী সাধুকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম এবং বলিলাম: 'সাধুজী, গীতার যোগক্ষেমং বহাম্যহং বাণী আজ সার্থক হয়েছে।' নানকপন্থী সাধুটি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় গুফা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। মৈত্র মহাশয়ও আমাদের প্রণাম করিয়া সহর অভিমুখে রওনা হইলেন। আমি ও গুপ্ত মহারাজ অবশিষ্ট মিষ্টান্নাদি খাদ্য-দ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং গুপ্ত মহারাজকে বলিলাম: 'দেখলে তো, করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে আমাদের পিছনে সদাসর্বদাই আছেন ও আমাদের রক্ষণাবেক্ষন করছেন।' গুপ্ত মহারাজ পরম শ্রদ্ধাসহকারে দুই হস্ত মস্তকে রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন।" ("আমার জীবনকথা" হইতে উদ্ধৃত)

যাহাহউক, জুন মাসেই তাঁহারা বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৯১-এর নভেম্বরে মঠ যখন আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়, সদানন্দ তখন রামকৃষ্ণানন্দজী, প্রেমানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সঙ্গে নূতন মঠের কার্যে খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মঠে তখন খুব অল্প কয়েকজন সাধু থাকেন—সুতরাং সকলকেই ব্যক্তিগত সাধন-তপস্যা ছাড়াও মঠের বহুবিধ কার্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিতে হইত। সুতরাং সদানন্দকেও এই সময়ে ধ্যান-ভজনের অতিরিক্ত সময়ে, জলতোলা, বাসনমাজা, ঘর পরিষ্কার করা এবং ঠাকুরঘরের আরও নানা কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সদাব্যস্ত আপন-ভোলা ও আনন্দপ্রিয় সদানন্দ মঠের সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সদানন্দ-প্রসঙ্গে তাঁহার বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা স্বামী বিরজানন্দের স্ব-লিখিত স্মৃতি এইরূপ[১]: "গুপ্ত মহারাজকে মঠে তখন সকলে 'পীরিত-পাগলা' বলতো। একটু ভালবাসলে তিনি আনন্দে লাফাতেন, গোলাম হয়ে যেতেন, গা হাত পা টিপে দিতেন, কত খাটতেন।" স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে বাংলা ভাষাও ইতোমধ্যে বেশ শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা কোন নূতন কথা শুনিলেই, সদাসরল সদানন্দের কী আনন্দই না হইত! যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন কথাটির অর্থ বুঝিতেছেন বা শিখিয়া লইতেছেন, ততক্ষণ যেন তিনি বালকের মত অধৈর্য হইয়া বেড়াইতেন।

যাহা হউক, সবই ঠিক চলিতেছিল, কিন্তু বাংলার জল-হাওয়া যেন তখনও তাঁহার ঠিক ধাতস্থ হইতেছিল না। বরাহনগর মঠ হইতেই যে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, উহাই যেন তাঁহাকে উত্তরোত্তর আরও শারীরিক দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে সারদানন্দজীর উপদেশ অনুযায়ী তিনি কিছুকালের জন্য পশ্চিমে তাঁহার পূর্বাশ্রমের দিকে চলিয়া যান। গুপ্ত মহারাজের মাতা-পিতা তখনও জীবিত ছিলেন,—তাঁহাদেরই অনুরোধে সন্ন্যাসিপুত্র কিছুকালের জন্য পিতৃগৃহে থাকিতে সম্মত হন। যদুনাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র অধরচন্দ্র বহু পূর্বেই সংসারত্যাগী হইয়াছেন—শরৎচন্দ্রও সন্ন্যাসী। সুতরাং শরৎচন্দ্রের আগমনে বৃদ্ধ জনক-জননীর শূন্যবক্ষে কী পরিমাণ আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। কিছুকাল পূর্বাশ্রমের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া গুপ্ত মহারাজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহযোগে বৃদ্ধ মাতা-পিতার

১ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রণীত 'অতীতের স্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

সেবায় যত্নপর হইলেন। জল-হাওয়ার পরিবর্তন হওয়ায় সেইকালে তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এইভাবে জনক-জননীকে শান্ত করিয়া, অতঃপর তিনি সুস্থ দেহ-মন লইয়া আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। সদানন্দ তাঁহার পিতার প্রসঙ্গে বলিতেন, "বাবা খুব ভক্ত ছিলেন। আমি যখন শেষবার জৌনপুর স্টেশন থেকে রওনা হই, উনি আমাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হন। আমি বিশেষ বাধা দিয়ে 'বাবা, করেন কি, করেন কি' বলাতে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'বাবা শরৎ, তুমি যে সাধু।' "

আলমবাজার মঠে সদানন্দের জীবনধারা পুনরায় উচ্ছলিত গতিবেগে ছুটিতে থাকিল। তাঁহার হাস্যচপল অথচ অন্তর্মুখ প্রকৃতি, এবং বালকবৎ দিলখোলা মেজাজ ও স্বল্পে সন্তুষ্টিভাব সকলকেই অতি সহজে মুগ্ধ করিত। তাঁহার জপ-নিষ্ঠা একটা অনুকরণীয় বিষয় ছিল। যখনই একটু সময় পাইতেন, তখনই জপ করিতেন। গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত-গ্রন্থাদি তিনি নিজে নিয়মিত পাঠ করিতেন এবং খুব নিষ্ঠার সহিত অন্যকে দিয়া পাঠ করাইয়াও শ্রবণ করিতেন। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' তাঁহার বড় আদরের ছিল। ইহার অধিকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন—আলমবাজার মঠবাসকালে একসময়ে তিনি কিছুকাল নিয়মিত বাইবেল পাঠ করিতেন। ঘনিষ্ঠ কেহ কাছে আসিলে, তাঁহাকেও বলিতেন বাইবেল পড়িয়া শুনাইবার জন্য। আর তিনি সাশ্রুনেত্রে নীরবে বসিয়া বাইবেলোক্ত কাহিনীগুলি শুনিয়া যাইতেন এবং ধ্যান করিতেন।

স্বামিজী তখন ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন—কিন্তু পত্রাবলী পাঠে দেখা যায়, শিষ্য সদানন্দের প্রতি তাঁহার কী টান! তাঁহার গুরুভ্রাতাদের নিকট লিখিত নানা চিঠির মধ্যে সদানন্দের একটু কুশল-বার্তার জন্য স্বামিজী কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন! শিষ্যের যোগ্যতা ও শক্তি সম্পর্কেও তদীয় আচার্যের ধারণা কত উচ্চ ছিল, তাহাও ঐসব বিভিন্ন পত্রের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানি উদ্দীপনাপূর্ণ চিঠিতে[১] লিখিয়াছিলেন, "আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুপ্তকে

১ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিস্ হইতে লিখিত।

এই কাজে লাগাও।" আবার স্বামিজীর আর একটি পত্রে[1]—সেটিও মঠের সকল গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া লেখা,—কয়েকজনের নামের মধ্যে গুপ্ত মহারাজেরও নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "—সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে।" স্বামিজীর এই সব চিঠি-পত্রের ভাষায় অনুরক্ত শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর অসীম স্নেহ ও অনন্ত আশীর্বাদই সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। মঠের বিভিন্ন জনের নিকট লিখিত পত্রের মধ্যে, স্বামিজী তাঁহার প্রিয় সন্তান গুপ্তকেও স্মরণ করিতেন, স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেন ও কুশল জানিতে চাহিতেন, তাহাতে সদানন্দ গর্বে ও আহ্লাদে বলিতেন, "আরে তা' না হলে কি আমার গুরু হতে পারে? আমার মত বেয়াড়া লোককে শায়েস্তা করতে না পারলে সে কি আর আমার গুরু হয় রে বাবা?" অতি সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী উক্তি!

১৮৯৭-এর জানুআরিতে স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পূজ্যপাদ আচার্যকে সর্বপ্রথম বরণ করিবার গৌরব দক্ষিণ ভারতই লাভ করিয়াছিল। স্বামিজী মান্দ্রাজে পদার্পণ করিলে, সহস্র সহস্র নরনারীর এক বিপুল জনসমুদ্র তাঁহাকে একবার শুধু দর্শন করিবার জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাড়ম্বর শোভাযাত্রা সহকারে, যথোপযুক্ত মর্যাদামণ্ডিত সুসজ্জিত একখানি গাড়ীতে বসাইয়া, স্বামিজীকে রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তাঁহার সেই যাত্রাপথের একটুমাত্র ধূলি স্পর্শ করিবার জন্য কত রাজমুকুট ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল সেদিন। পথে পথে পত্র-পুষ্পের তোরণ, প্রতি ভবন-শীর্ষে বর্ণাঢ্য পতাকা, দ্বারে দ্বারে দোলায়মান পুষ্পমাল্য—সমগ্র নগরী উৎসব সাজে সজ্জিত হইয়া যুগাচার্যকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শোভাযাত্রার গতিপথের মাঝে মাঝে স্বর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছিল, 'এসো শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য সন্তান', 'স্বাগত পুরুষসিংহ', 'স্বাগত অতীত ঋষিগণের যুগ-প্রতিনিধি', 'সুস্বাগত ভগবৎসেবক', 'বিশ্ববন্দ্য বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন', 'এসো হে শান্তির অগ্রদূত', 'স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জাগ্রত ভারতের সানন্দ সংবর্ধনা' ইত্যাদি এবং বেদ-উপনিষদের নির্বাচিত নানা মন্ত্র। রাজপথের দুইধারের গৃহগুলির দ্বারে, জানালায়, অলিন্দে ও ছাদে—অগণিত দর্শনার্থী যুক্তকরে দাঁড়াইয়াছিল। যত বড় সম্মানিতই হউন, কোনও মানুষের অভ্যর্থনার জন্য এ-হেন

১ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, নিউইয়র্ক হইতে লিখিত।

সমারোহ মাদ্রাজবাসী পূর্বে কখনও দেখেন নাই। লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি ও অবিরাম পুষ্পবৃষ্টির মধ্যেও সহসা স্বামিজী কেন যেন কাহার দিকে তাকাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—অজস্র মানুষের মধ্যে অতি প্রিয়জন কাহারও প্রতি অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, "এসো এসো সদানন্দ, বাপ আমার, এদিকে এসো", বলিয়া স্বামিজী উচ্চৈঃস্বরে কাহাকে আহ্বান করিতেছেন। গাড়ী থামাইয়া সদানন্দকে তুলিয়া লইয়া পরম স্নেহে তিনি নিজের পাশে বসাইয়া চলিলেন। স্বামিজীর অভূতপূর্ব এই সংবর্ধনা স্বচক্ষে দর্শন করিবেন বলিয়া সদানন্দ মাদ্রাজে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিষ্যবৎসল স্বামিজীর তীক্ষ্ণ স্নেহ-দৃষ্টি কিন্তু ঐ বিশাল জনসমুদ্র ঠেলিয়া নিজ সন্তানকে ঠিকই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। গুপ্তমহারাজ সেদিনের এই স্মৃতি স্মরণ করিয়া পরবর্তিকালে নয়নজলে ভাসিতেন।

মাদ্রাজের ভক্তগণ স্বামিজীকে ঐ দেশে একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য বার বার অনুরোধ জানাইতেছিলেন। তাই স্বামিজী আলমবাজার মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াই, গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে দক্ষিণ ভারতের কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। ১৮৯৭-এর মার্চে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া মাদ্রাজ যাত্রা করেন—তাঁহার সহকারী সঙ্গে গিয়াছিলেন স্বামী সদানন্দ। দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম-সূচনা এই-ভাবেই হইয়াছিল। সদানন্দের সুযোগ্য সহযোগিতায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী অচিরেই আইস্ হাউস্ রোডে একটি ভাড়া-বাড়ীতে রামকৃষ্ণ আশ্রম (Ramakrishna Home) প্রতিষ্ঠা করেন—যাহা মাদ্রাজের সুবৃহৎ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রের প্রথম অঙ্কুর। একটি ঘটনা এখানে স্মরণীয়—যদিও উহার বিষয়বস্তু এমন কিছু জরুরী নহে, তথাপি ক্ষুদ্র এই ঘটনাটি স্বামিজীর অপার স্নেহশীলতা ও শিষ্য-বৎসলতার একটি নিদর্শন। সদানন্দ মাদ্রাজে পৌছিবার দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁহাকে একটি কুকুরে কামড়াইয়াছিল। স্বামিজী তখন দার্জিলিং-এ—সংবাদটি তাঁহার কাছে পৌছিতে মোটেই বিলম্ব হয় নাই। দার্জিলিং হইতে ২০শে মার্চ (১৮৯৭) তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে যে পত্র লেখেন, উহাতে সদানন্দের এই সংবাদ-প্রাপ্তিতে তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত দেখা যায়। লিখিয়াছিলেন, "গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম ; কিন্তু শুনিতেছি যে ঐ কুকুর হন্যা নহে—তাহা হইলে

ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক গঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়।" অনুগত গুপ্তের প্রতি স্বামিজীর কতখানি মনোযোগ থাকিত, সামান্য এই ঘটনাটিতে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

অতঃপর স্বামিজীর পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরভারত ভ্রমণের কালে সদানন্দ আবার তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্য পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর এই পরিভ্রমণ-কালের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন সদানন্দ। এই দিনগুলির স্মৃতি সদানন্দের সমগ্র জীবনে শুধু ঐতিহাসিক তথ্যমণ্ডিতই নহে, অফুরন্ত প্রেরণার উৎসস্বরূপ—প্রিয় ও মধুর তো বটেই। স্বামিজীর একান্ত সাহচর্যই ঐ স্মৃতিচিত্রগুলিকে অনবদ্য মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল। পরে সদানন্দ-প্রদত্ত সেই সব কাহিনী এবং ভগিনী নিবেদিতার লিপিবদ্ধ এইকালের বিবরণীই স্বামিজীর জীবনীগ্রন্থের মূল্যবান উপাদান হইয়াছে। উল্লেখ থাকা দরকার যে, ভগিনী নিবেদিতাও তখন তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সালের (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ই ডিসেম্বর 'ব্রহ্মবাদিন্' (Brahmavadin) পত্রে স্বামিজীর খেতড়ি পরিদর্শনের একটি সুন্দর আলেখ্য সদানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। খেতড়িতে সদানন্দকে লইয়া বেশ মজার একটি ঘটনা হইয়াছিল :

সদানন্দ বরাবরই একটু বেপরোয়া প্রকৃতির এবং দুঃসাহসসম্পন্ন। স্বামিজী তখন সদলে খেতড়ি রাজার অতিথি। ভয়ানক অবাধ্য একটা তেজস্বী ঘোড়ায় চড়িয়া সদানন্দ একদিন খুব হাঁকাইয়া ছুটিয়াছেন—স্বামিজী রাজ-প্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে অপলকনেত্রে স্বশিষ্যের এই কাণ্ড দেখিতেছেন। নিকটে দণ্ডায়মান খেতড়ি-রাজ অজিত সিংহ এবং অন্যান্য সকলে ঐ দুর্ধর্ষ অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান সদানন্দকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছেন। সদানন্দ কিন্তু সেই প্রচণ্ড বজ্জাত ঘোড়াটিকে দৃঢ় বাহুতে সামলাইয়া তীব্রবেগে ছুটিতেছেন। শিষ্যের এই দ্রঢ়িষ্ঠতা দেখিয়া স্বামিজী সেদিন মহা খুশী হইয়াছিলেন। সদানন্দ ফিরিয়া আসিলে সাহ্লাদে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠিক ঠিক মরদ চেলা।" এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনাও সদানন্দের জীবন-কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য। উহা ঘটিয়াছিল, ১৯০১-এর জানুআরিতে। স্বামিজী মায়াবতী হইতে নামিয়া আসিতেছেন—ডিহড়ি হইতে পিলিভিতের পথে চলিয়াছেন। তাঁহার দলে স্বামী শিবানন্দজী ও সদানন্দ আছেন,—আর

মায়াবতী হইতে স্বামী বিরজানন্দ আসিয়াছেন স্বামিজীকে পিলিভিত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। ডাণ্ডী ও ঘোড়া ইত্যাদি সবই সংগ্রহ ছিল। সদানন্দ একটি ঘোড়া বাছিয়া লইলেন, যেটি সর্বাপেক্ষা বেশী তেজী। মহা উৎসাহে ঘোড়ায় চাপিয়া বসিয়াই সদানন্দ মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টনকপুর ছাড়াইয়া আরও মাইলখানেক পরে, স্বামিজী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন—সদানন্দ বা তাঁহার ঘোড়ার কোন চিহ্ন পর্যন্ত কেহ দেখে নাই। অবশেষে জনৈক পথচারী যাহাও কিছু সংবাদ দিলেন, তাহা স্বামিজীকে আরও অধিক উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। পথিক সংবাদ দিলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্বে একটি ঘোড়া উন্মত্ত হইয়া, আরোহী সহ ঐ দূর প্রান্তরের দিকে বিদ্যুৎ বেগে দৌড়াইয়া গিয়াছে। অগত্যা সকলেই প্রান্তরের দিকে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিতে শুরু করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখা গেল সদানন্দ বিজয়ী সৈনিকের মতো ঘোড়া হাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন—স্বামিজীও শান্ত হইয়া শিষ্যের নিকট সব শুনিতে থাকিলেন। জানা গেল যে, ঘোড়া নাকি একবার উহার বীর সওয়ারকে ফেলিয়াও দিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার জীবনহানি হয় নাই বা তেমন আঘাতও কিছু লাগে নাই। স্বামিজী সেদিনও বলিষ্ঠ শিষ্যের সাহসিকতার খুব তারিফ করিয়াছিলেন। সদানন্দের অটুট মনোবল, ঐকান্তিকতা ও সাধুচরিত্রের উপর স্বামিজীর প্রচুর আস্থা ছিল। ইহার ভূয়িষ্ঠ নিদর্শন সদানন্দের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করিলে পাওয়া যাইবে।

স্বামিজীর সহিত এই উত্তরভারত ভ্রমণকালে, সদানন্দ মর্মন্তুদ্ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষকারী ছিলেন। স্বামিজী তখন সদলে আলমোড়ায়। এখানেই তিনি গাজিপুরের সুবিখ্যাত যোগী পওহারী বাবার যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতিদানের সংবাদ পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর জীবনী-পাঠকের জানা আছে, তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনে এই মহান যোগীর অলৌকিক চরিত্র তাঁহাকে একদা কীরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই সংবাদ তাই স্বামিজীকে অতি বিষণ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সদানন্দ, নিবেদিতা প্রমুখ যাঁহারা তখন নিকটে ছিলেন, তাঁহারা স্বামিজীর সশ্রদ্ধ উক্তি শুনিয়াছিলেন। "পওহারী বাবা তাঁর সকল উৎসর্গকে পূর্ণ করলেন এইভাবে দেহোৎসর্গ করে। যজ্ঞাগ্নিতে

দেহ বিসর্জন করে তিনি পূর্ণাহুতি দিলেন।" অতঃপর, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মর্মঘাতী ঘটনা—গুড্‌উইনের[১] দেহত্যাগ। বজ্রাঘাতের মতো আকস্মিক এক তারবার্তা আসিল (৪ঠা জুন, ১৮৯৮)—গুড্‌উইন ২রা জুন উতাকামণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। টেলিগ্রামটি স্বামিজীর নামে প্রেরিত ছিল, কিন্তু সদানন্দের হাতেই উহা প্রথমে আসে। স্বামিজীর এক বিশ্বস্ত সন্তানের এই অপ্রত্যাশিত তিরোধানের সংবাদে সদানন্দ চোখের জল চাপিতে পারেন নাই। "বুঝলাম পুত্রশোক কী ভয়ঙ্কর!" প্রিয় গুড্‌উইনের বিয়োগ-যন্ত্রণায় স্বামিজীর শোকোদ্বেল এই উক্তি সদানন্দকে আরও অধিক কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামিজী করুণ-স্বরে বলিয়াছিলেন—"আহা গুড্‌উইন যদি বেঁচে থাকত, কত কি করতে পারতো!" গুড্‌উইনকে ঘিরিয়া স্বামিজীর স্নেহ-কোমল মন ঐ কয়েকটি দিন কীরূপ বিষাদময় ছিল, সদানন্দ তাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শোকোচ্ছ্বাসে স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"এবার আমার বক্তৃতার পালা শেষ।" আবার এমন খেদোক্তিও স্বামিজীকে করিতে শোনা গিয়াছে—"গুড্‌উইন চলে গেছে, আমার ডান হাত খসে গেছে; এ-ক্ষতির সীমা নেই। বোধ হয় মা'র ইচ্ছা নয় যে আর আমি কাজ করি। এবার থেকে নিজের হাতে লিখতে হবে। লেকচার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে!"

১৮৯৮-এর অক্টোবরে স্বামিজী দলবল সহ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য সংস্কারকে ভারতীয় ছাঁচে ঢালিয়া সনাতন বৈদিক সংস্কৃতিতে পরিণত করার কঠিন দায়িত্ব স্বয়ং স্বামিজীই লইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, এই নিবেদিতার তত্ত্বাবধান ও সাধারণ দেখাশোনার ভার সদানন্দের উপরই স্বামিজী ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁহারই সাহায্যে নিবেদিতা মঠের দৈনন্দিন জীবনধারা ও কর্মপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন এবং তাঁহাদের পরমপূজ্য আচার্যদেবের লোকোত্তর জীবনকাহিনীর বহু তথ্য জানিতে পারেন।

---

১ স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য ও সাংকেতিক লিপিকার মিঃ জে. জে. গুড্‌উইন। এই ইংরেজ যুবকই স্বামিজীর অধিকাংশ বক্তৃতার লিপিকার, তাই জগৎ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। তাঁহারই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া স্বামিজী "Requiescat in Peace" কবিতাটি রচনা করেন।

ভগিনী একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন[১]: "ইহার সন্ন্যাসের নাম স্বামী সদানন্দ। ইহারই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অথচ সতেজ ইংরেজী সাহায্যে কথিত বিবরণ হইতে আমি এই কালে স্বামিজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি।"

ভগিনী নিবেদিতার লেখায়[২] সদানন্দের একখানি অনুপম উজ্জ্বল আলেখ্য আমরা পাই,—যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী যোগানন্দজী মহাসমাধিতে মগ্ন হন (২৮শে মার্চ, ১৮৯৯)। নিবেদিতার ভাষা হইতে ভাবানুবাদ: "সুগম্ভীর দৃশ্য। মৃত্যুশীতল দেহখানি—গৈরিক রেশমের পাগড়ি মাথায়—সারা শরীর ফুলে ঢাকা, যা স্বামিজী ও আর আর সবাই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—সদানন্দ ধরে আছেন উঁচু করে, জ্বলন্ত কর্পূরের আরতি করা হচ্ছে সামনে, আর ঘরের ভিতরে ও বাহিরের দর্শনার্থীরা সকলে উচ্চারণ করে চলেছেন ভগবানের পুণ্য নাম। এই সদানন্দের মুখশ্রী যেন একেবারে ঋষি!.........শ্মশানে ওঁর চিতা সাজানো হ'ল। 'আগুনের মাঝখানে ঠিক যেন শিবের মুখ'—সদানন্দ বললেন।"

সদানন্দের কর্মক্ষমতা ও সেবানিষ্ঠার প্রতি স্বামিজীর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, ১৮৯৯-এর প্লেগ মহামারীর সময়ে কলিকাতার সমগ্র সেবান্দোলনের নেতৃত্বভার স্বামিজী সদানন্দের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন! রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ঐ সেবাকার্য সত্যই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বামী সদানন্দ ছিলেন উহার প্রধান কার্যাধ্যক্ষ, এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্পাদিকা, আর স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ সহায়ক ছিলেন।

৩১শে মার্চ (১৮৯৯) হইতে সদানন্দের নেতৃত্বে কলিকাতার প্লেগ-প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। স্বামিজীর অনন্ত মানবপ্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শে সদানন্দের হৃদয়টিও কতখানি দ্রব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় তদানীন্তন কলিকাতাবাসীরা অবগত হইয়াছেন। ডঃ যদুনাথ সরকার-প্রমুখ ঐতিহাসিক এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর-প্রমুখ বিখ্যাত সমাজসেবীদের লিপিবদ্ধ বিবরণী

১ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার পত্র-সঞ্চয়ন—শঙ্করী প্রসাদ বসু-প্রণীত "নিবেদিতা লোকমাতা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২ ভগিনী নিবেদিতার *The Master as I saw Him*-গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দ-কৃত অনুবাদ 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' দ্রষ্টব্য।

পাঠ করিয়া ইদানীন্তনের মানুষও উহা জানিতে পারিয়াছেন। আতঙ্কিত সম্পন্ন নাগরিকরা সহর ছাড়িয়া পলায়নপর, সঙ্গতিহীন অসহায় সাধারণ মানুষ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দনরত, আর ব্যাধি-কবলিত হতভাগ্য বস্তীবাসী মৃত্যুর মুখের গ্রাস হইয়া প্রতীক্ষমান—এই ছিল সেদিনের মহানগরী কলিকাতার চিত্র। সেই শ্মশানপুরীতে বিবেকানন্দ-শিষ্য সদানন্দ ছিলেন মূর্তিমান আশ্বাস ও অভয়ের মতোই। তাঁহার উপস্থিতিতেই মানুষের অশ্রু মোচন হইত। ১৮৯৮-এর মে মাসেই কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব হয়। স্বামিজী অবশ্য তখন হইতেই এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই বিপুল সেবা-যজ্ঞের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "দরকার হলে নতুন মঠের জমি বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ করব।" অবশ্য ভগবদিচ্ছায় অতদূর প্রয়োজন তখন হয় নাই।

স্বামিজীর আদেশে প্লেগ-বিধ্বস্ত কলিকাতাবাসী সকলের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি—বাংলা ও হিন্দীতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেগের প্রথম সূচনার কালেই (মে, ১৮৯৮) রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে এই আবেদন-পত্র জনসাধারণের জন্য স্বামিজী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সদানন্দের এবং নিবেদিতার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্বামিজীর ঐ ঘোষণা-বাণী কলিকাতার ঘরে ঘরে সেদিন পৌছিয়াছিল, আর তাহাতেই জনসাধারণ অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মূল বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এই :

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

কলিকাতানিবাসী ভাই সকল!

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী, এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের

মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। তোমাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর, অথবা যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর।

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর আর স্থানে প্লেগ যেরূপ রুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল।

৫। এস, সকলে বৃথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস করিয়া কোমর বাঁধিয়া কার্যক্ষেত্রে নামি, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি তাঁহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে।

৬। (ক) বাড়ী, ঘরদুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দামা প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া টাট্‌কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।

(ঘ) অন্যায়পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনকালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যু-ভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

(ঙ) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে।

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না।

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাকেও জোর করিয়া টিকা দিবেন না। যাহার ইচ্ছা হইবে সেই টিকা লইবে।

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে, নিজের হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনী লোক পালাক্, আমরা গরীব, গরীবের

মর্মবেদনা বুঝি। জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন—ভয় নাই! ভয় নাই!!

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম সংকীর্তন করিবে।...

কলিকাতা-নগরীর বস্তীতে বস্তীতে স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক ঝাড়ুদার বা মেথর তখন কলিকাতায় ছিল না—যাহারা বা ছিল, তাহারাও ভয়ে পলায়নপর। স্বামী সদানন্দ ঝাড়ু হাতে শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়াছেন—যেসব ময়লা ঘাঁটা-ঘাঁটি করিতে বহুকালের অভ্যস্ত মেথররা পর্যন্ত সক্ষম হইত না, সদানন্দ সেইসব দুর্গন্ধময় ক্লেদপূর্ণ জঞ্জালও দিনের পর দিন অম্লানবদনে সাফ করিয়াছেন। পচা নর্দমা বা দুর্গন্ধযুক্ত কোন আবর্জনারাশি দেখিয়া কোন মেথর হয়তো নাকে-মুখে কাপড় চাপিয়া দূরে সরিয়া পড়িতে চাহিতেছে—নির্দ্বন্দ্ব সন্ন্যাসী প্রসন্নচিত্তে মেথরের হাত হইতে ঝুড়ি কোদাল কাড়িয়া লইয়া আগাইয়া যাইতেন। এমন দৃশ্য দেখিয়া আরও দশজন শিক্ষিত যুবক ছুটিয়া আসিত—মেথররাও লজ্জিত হইয়া কাজে যোগ দিত। সদানন্দ সকলকেই এমনকি ক্লিন্ন-শরীর মেথরকেও পরম সমাদর করিয়া আলিঙ্গন দিতেন। কোন প্লেগ-রোগী অসহায় অবস্থায় কোথাও আছে শুনিলেই, মূর্তিমান সেবার ন্যায় সদানন্দ তাহার শয্যার পাশে ছুটিয়া যাইতেন—তাহাকে পূর্ণ নিরাময় না করা পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবায় মগ্ন হইতেন। কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকরা সেদিন এই সেবাব্রতী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে, ভাগলপুরে যখন প্লেগ-মহামারী দেখা দিয়াছিল, তখন সেখানেও সদানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। নিঃশঙ্ক নির্ভীক সদানন্দ সেখানেও আর্ত-পীড়িত মানুষের কাছে বিমূর্ত অভয়স্বরূপ ছিলেন।

মিশনের বহুমুখী সেবাকার্যের মূলে আছে সাক্ষাৎ স্বামিজীরই প্রেরণা ও

শিক্ষা। স্বামিজীর এই সেবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-মন্ত্রেরই সাধন—বেদান্তের উচ্চতম আদর্শেরই বাস্তব প্রয়োগ। সদানন্দের জীবনে এই সাধনা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা দুই একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই অনুভব করা যাইবে। পথে চলিতে চলিতে একবার একটি বলদকে প্রহৃত হইতে দেখিয়া, তিনি নিজের দেহেতেই প্রহারের যন্ত্রণা বোধ করিয়াছিলেন। আর একবার এক ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিতেছেন। প্রভাত হইতেই দেখিলেন যে, রাত্রে তিনি এক কুষ্ঠ-রোগীর পাশেই শয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমে তো ভয় ও শঙ্কা লইয়া ধর্মশালা ত্যাগ করিলেন—কিন্তু কিছু দূর গিয়াই জ্ঞান হইল যে, কুষ্ঠ-রোগীও তো নারায়ণ। আবার ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া সেই কুষ্ঠ-রোগীর পাশেই নিজের জায়গা করিয়া থাকিতে লাগিলেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত পরম যত্নে তাহার শুশ্রূষাদি করিলেন। অন্য এক সময়ে সদানন্দ জনৈক বসন্ত-রোগীর সেবা করিতেছিলেন। আকস্মিক কোন কারণে রোগী আগুনের উপর পড়িয়া গেলে, অগ্নিদগ্ধ বসন্ত-রোগীর দেহকে তৎক্ষণাৎ শীতল করিবার জন্য তিনি নিজ দেহ দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। এইরূপ কত ঘটনাই সদানন্দের অনুপম সেবা-সাধনার সাক্ষ্য প্রদান করে! সর্বভূতে ঈশ্বরোপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে নিছক মনুষ্য-বুদ্ধিতে এমন সেবা কি সম্ভব?

দুঃস্থ অসহায় আর্ত নারায়ণের সেবায় মিশনের নানা উদ্যোগে, স্বামিজীর প্রিয় সহচর সারদানন্দজীর উৎসাহ ও উদ্যমই সাধু-কর্মিগণকে নিরলস কর্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সদানন্দ ঐসকল উদ্যোগের সূচনাকালে, স্বামী সারদানন্দজীর অতি বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে তাই সদানন্দ চিরস্মরণীয়। সদানন্দ দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই—অকালেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় নানা সেবান্দোলন পরিচালনায় যে অমানুষিক পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত,উহাই পরিণামে তাঁহার শরীরের উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল। সেবার সুযোগ তিনি একবার পাইলে আর ছাড়িতেন না। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর হইতে জীবনের বাকী কয়টি দিন 'গোপালের মা' যখন বাগবাজারে নিবেদিতার গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারেও নিবেদিতাকে সদানন্দ সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জগতের মহীয়সী এই বৃদ্ধার সেবাতেও যেমন তিনি

অক্লান্তকর্মা, আবার বসন্ত বা কলেরা রোগাক্রান্ত অজ্ঞাতকুলশীল কোন দীন-দরিদ্রের শুশ্রূষাতেও তিনি তেমনই একনিষ্ঠ ছিলেন। সদানন্দ-চরিত্রের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য।

১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই, স্বামিজীর লীলা-সংবরণের দিনে সদানন্দ মঠেই উপস্থিত ছিলেন।[১] সদানন্দ ভাবিলেন, তাঁহার জীবনের সর্ববিধ সৎ ও শুভ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনা ও সিদ্ধির আদর্শ প্রতিমাখানির বুঝি আজ বিসর্জন হইল! জ্বলন্ত চিতাগ্নির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৌনভাবে তিনি কত কথাই স্মরণ করিতেছিলেন! হাতরাস হইতে শুরু করিয়া বেলুড়মঠ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় চতুর্দশ বৎসরের নানা দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। বারবার মনে পড়িতেছিল, শ্রীগুরুর অভয় আশীর্বাণী: স্বামী প্রেমানন্দজীকে একদিন স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম, আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলব। তা যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুর-আদি সব মিথ্যা জানবি।" শ্রীগুরুর দক্ষিণামূর্তি স্মরণ করিয়া হৃৎস্পন্দনে তাঁহারই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সদানন্দ সেদিন গঙ্গাতটে বসিয়া নীরবে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধানের পরে পিতৃ-মাতৃহীন বালকের মতো তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "আমি তো স্বামিজীর সেবা করবার জন্য জন্মেছিলুম। স্বামিজী চলে গেছেন, আমারও আর দেহ রাখবার আবশ্যক নেই।"

স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পরে ম্যাকলাউডকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার একখানি চিঠি (২৮শে জুলাই, ১৯০২) হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। ঐ অংশের ভাবানুবাদ এইরূপ: "সদানন্দ অতীব চমৎকার। ...তিনি বুঝেছিলেন যে কিছু ঘটবে, কারণ স্বামিজীর 'করুণা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল', খুব কোমল করুণ দৃষ্টিতে তিনি তাকাতেন, আপন মনে স্মিত হাসিতে ভরে থাকতেন,—ব্রহ্মানন্দ ঠিকই বলেছিলেন, 'এবার উনি চলে যাবেন ঠাকুরের মতোই, কারণ প্রতিদিনই আমি ঠাকুরকে দেখছি ওঁর মধ্যে।' ......সদানন্দ জানেন, তিনি সর্বদাই আমাদের মধ্যে

---

১ *Sister Nivedita* **By Pravrajika Atmaprana** এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-প্রণীত 'ভগিনী নিবেদিতা' দ্রষ্টব্য।

আছেন। যদি আমরা অন্যায়ও করতে চাই 'তিনি রক্ষা করবেন।' সদানন্দ তাঁর কাছে সন্ন্যাস নেন হৃষীকেশে। তখন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামিজী, যদি আমার পতন হয়?' তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, 'হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায়না। আমারই সে-দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছোনি।' ''......

অতঃপর সদানন্দকে নির্দিষ্ট কোন কর্মপরিধির মধ্যে দেখা না গেলেও জীবনের অবশিষ্টকাল জপ-ধ্যান, দেশ-পর্যটন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুবক-গোষ্ঠীর মধ্যে স্বামিজীর ভাব-বিস্তার ইত্যাদি নানা পটভূমিকায় তাঁহাকে দেখা যায়। স্বামিজীর সাহচর্যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণের দুর্লভ সৌভাগ্যের তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের মাত্র কিছুদিন পূর্বেও (এপ্রিল, ১৯০২) তিনি নেপাল পর্যটনে গিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার নানা কর্মপ্রচেষ্টার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতারূপেও সদানন্দ সুপরিচিত ছিলেন। স্বামিজীর তিরোধানের কিছু পরে সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা যখন বোম্বাই, নাগপুর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচার-সফরে যান, তখন সদানন্দও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বরে তাঁহারা দক্ষিণ-ভারতের দিকে গিয়াছিলেন।

যীশুর জন্মদিন স্মরণে তাঁহাদের 'বড়দিন' উদ্‌যাপনের স্মৃতি এই যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরিতে তাঁহারা ঐ দিনটি পালন করেন ১৩ই ডিসেম্বর (১৯০২) সন্ধ্যায়। নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরতলে, নিস্তব্ধ পাহাড়ে ঘাসের উপর বসিয়া, প্রজ্জ্বলিত ধুনির সম্মুখে নিবেদিতা বাইবেল পাঠ করিতেছিলেন—কম্বল মুড়ি দিয়া ধ্যানাবিষ্ট হইয়া যীশু-চরিত্রের অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে সদানন্দ যেন অজ্ঞাত আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সন্ধ্যায় যীশুকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় আচার্য স্বামিজীর ভাবেই ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অনুভূতি নিবেদিতার ভাষায়[১] এইরূপ: ''ঈশ্বর করুন, আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও যাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট মাত্র স্মরণীয়

১ ভগিনী নিবেদিতার *The Master as I Saw Him*-গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দকৃত অনুবাদ 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' দ্রষ্টব্য

বস্তু না হইয়া, সর্বদা জলন্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।" ব্রহ্মচারী অমূল্য[১] এই যাত্রায় তাঁহাদের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র মঠে যোগদান করিয়াছেন।

উড়িষ্যা হইতে মান্দ্রাজে গিয়া তাঁহারা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সাহচর্যে কিছুকাল বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন। এই বৎসরই মান্দ্রাজে স্বামিজীর আবির্ভাব-উৎসব সর্বপ্রথম প্রতিপালিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ঐদিন প্রাণপ্রিয় নেতা আচার্য বিবেকানন্দের ভাবে তদ্‌গত হইয়াছিলেন। সদানন্দ এবং নিবেদিতাও শ্রীগুরুর স্মৃতিতে সেদিন তন্ময় হইয়া কাটাইয়াছেন। এই দক্ষিণভারত ভ্রমণের কালে মান্দ্রাজ শহরে ও আরও কয়েকটি স্থানে তাঁহারা স্বামিজীর বাণী প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন। স্বামিজীর অদর্শনের পর এই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ভাব ও আদর্শকে—এককথায় শ্রীরামকৃষ্ণকে, ভারতের জনসাধারণ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে বসাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহারা খুবই আশান্বিত হইয়াছিলেন। সদানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর স্থূল শরীর চলিয়া গেলেও, সূক্ষ্মভাবে তাঁহার কার্য জনচিত্তে ঠিকই চলিতেছে।

১৯০৩-এর প্রথমদিকে নিবেদিতা ছোট ছোট ছেলেদের জন্য বিবেকানন্দ বিদ্যার্থি-আশ্রম (Vivekananda Home) প্রতিষ্ঠার প্রথম সূচনা করেন। এই আশ্রমের বালকরা দেশমাতাকে ভালবাসিবে, তাঁহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে—স্বামিজীর দৃষ্টিতে ভারতমাতাকে উপলব্ধি করিবে। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বৎসরের বেশ কিছুভাগ কাল ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া বেড়াইবে—ভারতের অখণ্ডস্বরূপ এইসব কিশোররা প্রত্যক্ষ করিবে। ইহাই ছিল সংক্ষেপে নিবেদিতা-প্রকল্পিত উক্ত বিদ্যার্থি-আশ্রমের আদর্শ। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া স্বামী সদানন্দের পরিচালনায় একদল বালক (এপ্রিল মাসে) কাঠগোদামের পথে কেদার-বদরী তীর্থদর্শনে গিয়াছিল। সন্ন্যাসী অভিভাবকের সঙ্গে উৎসাহী এই কিশোর দল দুর্গম পিণ্ডারি হিমবাহ পর্যন্ত যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঘর-কুনো বঙ্গসন্তান মায়ের অঞ্চল ছাড়িয়া, প্রকাণ্ড সূর্যালোকে বাহির হইয়া পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তদানীন্তন সমাজের পরি-

১ উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী।

প্রেক্ষিতে ইহা নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য ঘটনা। জানা যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সময়ে তাঁহার পুত্রকে এই অভিযাত্রিদলে পাঠাইয়াছিলেন। অনুরূপ ভ্রমণ সদানন্দের পরিচালনায় পরের বৎসরেও একবার হইয়াছিল। অবশ্য অর্থাভাব ও আরও নানা অসুবিধায় নিবেদিতার এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

১৯০৩-এর মাঝামাঝি, সদানন্দ একবার ভারতের বাহিরে জাপান-ভ্রমণে গিয়াছিলেন ব্রহ্মচারী অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া। সদানন্দের এই জাপান-পরিদর্শন প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভগিনীর উক্তি: "তাঁর (সদানন্দের) দেহে স্বামিজীই সেই ভূমিতে (জাপানে) যেতে চান, এই আমার বিশ্বাস।"

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি, সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আর একবার প্রচার-সফরে যাত্রা করিয়াছিলেন—এবার লক্ষ্য ছিল পাটনা। ব্রহ্মচারী অমূল্যও তাঁহাদের সহিত গিয়াছিলেন। পাটনায় একদিন সদানন্দ স্বামী ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে জাপানের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যাদি বিরাট এক মহিলা সমাবেশে পরিবেশন করেন। অমূল্যকে দিয়া তিনি চিত্রগুলির পরিচিতি ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। পাটনা হইতে তাঁহারা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন—পথে বক্তিয়ারপুর, রাজগীর ও বোধগয়া হইয়া নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে গিয়াছিলেন। বোধগয়াতে তাঁহারা মোহন্তের অতিথি হইয়াছিলেন। সেখানে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি-জড়িত বোধিবৃক্ষমূলে চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত এক রাত্রিতে নীরবে বসিয়া, তাঁহারা পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর স্মৃতিও এই প্রাচীন বৃক্ষটির সহিত জড়াইয়া আছে। ঐসব পুণ্যস্মৃতি-স্পর্শে সদানন্দ ভাবাবিষ্টের ন্যায় বোধিদ্রুমতলে বহুক্ষণ কাটাইয়াছিলেন। মার্চ মাসে তাঁহারা লক্ষ্ণৌ হইতে কাশীধামে গমন করেন। বোধগয়া দর্শন আবার একবার হইয়াছিল। এইবার সঙ্গী ছিলেন মাদার সেভিয়ার।

বোধগয়ায় মন্দিরের অধিকার লইয়া তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল তখন। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরটিকে পরিপূর্ণভাবে বৌদ্ধদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। এই আন্দোলনের প্রতিবাদকল্পে ঐ বৎসরের অক্টোবরে একটি বিরাট প্রতিনিধিদল বোধগয়া যাত্রা করিয়াছিলেন—সদানন্দও সেই দলের অন্যতম ছিলেন। অবশ্য ভগিনী নিবেদিতাই ছিলেন দলের নেত্রী—অন্যান্য যাঁহারা

ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগিনী কৃষ্টিন, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী ও শ্রীমতী র‍্যাট্‌ক্লিফ্, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমথুরানাথ সিংহ এবং ব্রহ্মচারী অমূল্য। বিরাট এই যাত্রিবাহিনীর সহিত সদানন্দ প্রায় একমাস ধরিয়া বোধগয়া, রাজগীর, নালন্দা ইত্যাদি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি আবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সদানন্দের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন অতবড় বলিষ্ঠ পুরুষকেও বাধ্য হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল। তবে যেখানেই যখন থাকিতেন, সমীপাগত ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্যে, স্বামিজীর ভাব প্রচার করা, ব্যাখ্যা করা, তাঁহারই প্রসঙ্গ করা সদানন্দের জীবনব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৯০৭ বা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বেশ কিছুকালের জন্য তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার পুণ্য-স্মৃতি-জড়িত। সদানন্দের বিষ্ণুপুরে বাস করার ফলে, যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসুরেশ্বর সেন ও তাঁহার পরিবারবর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মরণীয় যে, শ্রীশ্রীমা পরে জয়রামবাটি হইতে গমনাগমনের পথে বিষ্ণুপুরে থামিয়া ভাগ্যবান এই সেন-পরিবারের গড়দরজা-বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য হইলেও বিশ্রাম লইতেন—কোন কোনবার দুই-একদিনও অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা শেষবার (১৯১৯-এর ২৪শে ফেব্রুআরি) জয়রামবাটী হইতে যখন কলিকাতা আসেন, তখনও সুরেশ্বরবাবুদের গৃহে দুইরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ভক্ত সুরেশ্বরবাবু উহার কয়েকমাস মাত্র পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জনৈক যুবক পুত্রকে মা ঐকালে একদিন বলিয়াছিলেন, "এই বাড়ীটি রেখো। এখানে তোমার বাবা ছিলেন, গুপ্ত এসেছিল, আর আমি এসেছি। এই যা সব দেখছ, তার রাস্তা তো গুপ্তই খুলে দিয়েছে।" মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া যুবক মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি গুপ্ত মহারাজ না আসিতেন—। মা কিন্তু বলিয়াই চলিলেন, "গুপ্ত যদি না আসতো, ঠাকুর অন্য একটা কিছু করতেন। গুপ্তই এদের সব রাস্তা খুলে দিয়েছে।"

যাহা হউক, সদানন্দের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর অবনতির পথেই দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। কষ্টকর বহুমূত্র রোগের আক্রমণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ

হইয়া যাইতে থাকিলেন। কলিকাতায় থাকিলে চিকিৎসার সুবিধা হইবে, এই কারণে বাগবাজার বোসপাড়া লেনের একটি গৃহ ভাড়া লইয়া উপযুক্ত পথ্য ও সেবাদির বন্দোবস্ত ভগিনী নিবেদিতাই করিয়া দিয়াছিলেন। একদল অনুরাগী যুবক নিবেদিতারই নির্দেশক্রমে প্রাণ-মন ঢালিয়া তাঁহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।[১] অনুগত এইসব যুবকগণ নিজদিগকে 'সদানন্দের কুকুর' বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। সামান্য এই কথায় বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, সদানন্দ তাঁহাদিগকে কতখানি জয় করিয়াছিলেন। দুই বৎসরেরও অধিককাল তিনি শয্যাগত ছিলেন—আর এই অনুরক্ত কয়েকটি যুবকই তাঁহার সেবায় প্রাণপণ শ্রম করিয়াছিলেন।

সদানন্দের শেষজীবনে দেহ-মনের স্বাভাবিক সর্বপ্রকার বৃত্তি প্রশমিত হইয়া, শুধুমাত্র শরণাগতির ভাবটিই যেন তাঁহার একমাত্র মনোবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মায়িক সকল বন্ধনকে নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া, স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিরবাঞ্ছিত মুক্তির জন্য বড়ই তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শোনা যায়, একবার সুস্থাবস্থায় বেড়াইতে বেড়াইতে কোন বিস্তীর্ণ উদ্যানের একপ্রান্তে নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরণোন্মুখ একটা কুকুরকে দেখিয়া, সদানন্দ নাকি বলিয়াছিলেন, "আহা, এমন দিন কি হবে যে, সর্ববন্ধনের বাইরে, সকলের অগোচরে, আমার জীবনটাও এইভাবে শেষ হবে!" সদানন্দ চিরকালই নির্ভীক—অন্তিমকালেও মায়ানির্মুক্ত সন্ন্যাসীর মতোই মৃত্যুর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামিজীর কণ্ঠস্বর বোধ হয় তখন সারাক্ষণই তাঁহার বুকের মধ্যে অনুরণিত হইত: "সন্ন্যাস অর্থ সংক্ষেপে—মৃত্যুকে ভালবাসা। আত্মহত্যা নয়—মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করা।" রোগশয্যাতেও সদানন্দের গুরুভক্তি—তাঁহার বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সত্যই অনুকরণীয়। এই কালের একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

---

১ "Since the Swami's death, Swami Sadananda had been Nivedita's greatest guide, philosopher and friend......when he had fallen ill, Nivedita had rented a house near her own and had made arrangements for his diet etc.. Some boys served him, but Nivedita went to him every day and looked after him like a loving mother."

—*Sister Nivedita*, By Pravrajika Atmaprana.

১৯১১-র কথা। মায়াবতী হইতে স্বামিজীর রচনাবলী তখন ভাগে ভাগে প্রকাশিত হইতেছিল। উহারই মুদ্রিত কাগজ বোধ হয় সদানন্দ স্বামীকে মাঝে মাঝে মায়াবতী হইতে পাঠানো হইত। তিনি শ্রদ্ধা সহকারে উহা পাঠ করিতেন আর স্বামিজীর কথা স্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিতেন। তিনি কিন্তু তখন সম্পূর্ণ শয্যাগত। বাহ্যে-প্রস্রাবের জন্যও আর তখন ওঠা-বসা সম্ভব ছিল না, শয্যার উপরেই সেবকরা ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বিছানার চাদরের তলায় কাগজ পাতিয়া দিবার আবশ্যক হইত। সেবককে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কাগজ বিছানায় পাতা হয়। পুরাতন খবরের কাগজ দেওয়া হয় শুনিয়া কুণ্ঠার সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "না, না, ও কাগজ দিও না। মা সরস্বতী রয়েছেন তাতে। আরও কত দেব-দেবীর কথা হয়তো ছাপা থাকে। তোমরা এসব কাগজ দিচ্ছ—আমাকে তোমরা অপরাধী করছ। নিশ্চয়ই আমার অপরাধ হচ্ছে।" তিনি বার বার এইরূপ বলিতে থাকায় সেবক জিজ্ঞাসা করেন, "সব কাগজই তো তাহলে সরস্বতী, কি কাগজ তবে দেওয়া চলবে?" সাশ্রুনয়নে সদানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ঐসব কাগজ দেবে যাতে স্বামিজীর কথা আছে। আমি তাঁর সন্তান—তিনি তো আর আমার কোন অপরাধ নেবেন না। তাঁর কাছে আমার সব দোষের ক্ষমা আছে। তিনি যে আমার বাপ, মা, গুরু, সবই।" ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাবের গভীরতায় অনবদ্য।

এই প্রসঙ্গে ম্যাকলাউডকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার একখানি ব্যক্তিগত পত্রের[১] কয়েক ছত্র সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ্য। বিবেকানন্দ-শিষ্য সদানন্দের অনুভূতিময় অধ্যাত্ম জীবনের ইহা একটি গোপনীয় কিন্তু মূল্যবান প্রমাণপত্র বিশেষ। নিবেদিতার উক্তিগুলির ভাষান্তরিত রূপ এই: "এরপর যে-কথা বলতে যাচ্ছি সেকথা ভবিষ্যতে আমার কাছে বা অপর কারো কাছে কখনই তুলবে না; অত্যন্ত পবিত্র গোপন বস্তুর মতো একে রক্ষা করবে। সদানন্দের কাছে স্বামিজী আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছিলেন। সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই অনুভূতিতে। তিনি

১ পত্রের তারিখ ১৪ই জানুআরি, ১৯০৪। শঙ্করী প্রসাদ বসুর "নিবেদিতা লোকমাতা" দ্রষ্টব্য।

উপলব্ধি করছেন—চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন। তিনি জানেন যে সবই সত্য—এবং আমরা সে-সত্যে পৌঁছে গেছি।"

শ্রীশ্রীমা স্বয়ং একদিন বোসপাড়া লেনের বাটীতে অসুস্থ সদানন্দকে দর্শন দান করিতে আসিয়াছিলেন—যোগীন-মা ও গোলাপ-মা সঙ্গে ছিলেন। দিনটি ছিল ২৫শে নভেম্বর, ১৯১০। জননীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিয়াই সদানন্দ করজোড়ে বলিয়াছিলেন, "মা, বাইশ বছর আগে আপনি আশীর্বাদ করেছিলেন, তারই বলে এই সন্ন্যাস-জীবন বেশ কাটল। এবার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে—ওপারে যে কী আছে তা তো কিছুই জানি না।" মা অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা? ওপারে ঠাকুর তোমাকে কোলে নেবার জন্য বসে আছেন।" সদানন্দ কিন্তু অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে মার কাছে প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে সেই বাইশ বছর আগে যেভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আর একবার আশীর্বাদ করুন।" সন্তানের আর্তিতে মা মৌন হইয়া গেলেন। মাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, সদানন্দ এবার আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "মা, যদি তেমন ভাবে আশীর্বাদ না করেন, তাহলে আপনার চরণতলে এইখানেই এক্ষুনি শরীর ত্যাগ করব।" করুণাময়ী জননী অবশেষে সন্তানের নতশিরে পাদপদ্ম রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। দিব্যভাবমুখর এই দৃশ্যটি সদানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করে। বাইশ বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে —আবার সেদিনও কী আশীর্বাদ করিলেন, উহাও উপস্থিত সকলের অগম্য থাকিল। বীরভক্ত সদানন্দের মাতৃভক্তির তুলনা নাই। পূর্বে মা যখন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের ভাড়া-বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তখন সদানন্দ রোজই বেশ কিছু সময় ঐ বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া কাটাইতেন। অথচ তাঁহাকে কখনও বাড়ীর ভিতরে গিয়া মাকে দর্শন-প্রণাম করিতে দেখা যাইত না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তিটি বড়ই তাৎপর্যময়। বলিতেন, "শ্রীশ্রীমাকে জীবনে একটিবার মাত্র দেখলেই সব হয়ে যায়।" কথাটি সদানন্দের অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত—তাই এত মধুর।

স্বামী সদানন্দ একনিষ্ঠ জাপক ছিলেন। মৃত্যুশয্যাতেও তাঁহার জপের বিরাম ছিল না। শ্রীগুরুর চরণে চিরবিশ্রামের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দিন

দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১১, বেলা ৩টা। সদানন্দের দীপ্তিমান চক্ষু দুইটি দেওয়ালে রক্ষিত স্বামিজীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ নিষ্পলক হইয়া গেল। 'স্বামিজী, স্বামিজী, স্বামিজী'—তিনবার এই প্রিয়নাম উচ্চারণ করিয়া, স্বামিজীর বীরসন্তান গুপ্ত মহারাজ স্বামিজীরই পাদপদ্মে অনন্ত কালের জন্য মিলিত হইলেন।

স্বামিজীর বড় আদরের 'গুপ্ত' তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তির জন্যই ইতিহাসে ব্যক্ত থাকিবেন চিরকাল। স্বামিজীর জন্য তিনি না করিতে পারিতেন এমন কার্য ছিল না—প্রাণবিসর্জন তো অতি তুচ্ছ ছিল। গুপ্ত মহারাজের জীবনের যত মহনীয় বৈশিষ্ট্য, উহার গুপ্ত রহস্য ইহাই। একদা স্বামিজী নাকি তাঁহার কাছে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমার চেয়েও ভাল সাধু দেখিস্, তাহলে তোরা আমাকে ছেড়ে দিবি তো ?" উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর উক্তিতে উত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "না, কখনই না—আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব।" এবার সদানন্দের দিকে ফিরিয়া স্বামিজী বলিলেন, "সদানন্দ, তুই কি বলিস ?" মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া নিঃসঙ্কোচে তিনি জবাব দিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি ছেড়ে দেব। যেদিন আপনার চেয়েও বড় কাউকে দেখব, সেইদিনই আপনাকে ছেড়ে দেব। বেশী বড় বা বেশী ভাল দেখাটাই তো ছেড়ে দেওয়া।" ভাবদ্যোতক এই উক্তিটির মধ্যে সদানন্দের গুরুভক্তি কত উচ্চগ্রামের ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ভক্তির চরম পরিণতি প্রেমাস্পদের সহিত অভিন্নবোধ। সদানন্দ অন্তিমদিনে হাঁপানির জন্যও বেশ কষ্ট ভুগিয়াছেন। একদিন ঐ কষ্টের মধ্যেও খুব শান্ত-গম্ভীরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন। কিছু পরে সেবককে বলিয়াছিলেন, "যখন খুব কষ্ট বেড়েছিল, তখন স্বামিজীকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম তিনি আমার চেয়েও বেশী হাঁপাচ্ছেন আর বলছেন, 'এই দেখ্ আমাকে। ভয় কি ?' " এই ঘটনার পর হইতে, হাঁপানির জন্য কোন কষ্ট প্রকাশ আর করেন নাই। সেবকদিগকে প্রায়ই বলিতেন, "স্বামিজী আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তা নইলে তোদের আমার শরীর ছুঁতে দিতাম ? আমি এই শরীরে স্বামিজীর সেবা করেছি। আমার শরীরকে আমিই পূজা করি।" একবার খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া ভগিনী নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Swampsee, it must be very trying"

("স্বামপ্সি[১], খুব কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই")। সদানন্দ সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "No Sister, I have dissociated myself from the body. I *see* it suffering." ("না ভগিনী, আমি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছি। দেখছি শরীরটা ভুগছে।")

আচরণে তিনি ছিলেন বীর, ব্যবহারে ছিলেন তিনি দরদী, আর পর-হিতায় তিনি ছিলেন সদা-আত্মভোলা। সদানন্দ সম্পর্কে 'প্রবুদ্ধ ভারত' তাই যথার্থই মন্তব্য[২] করিয়াছিলেন : "There was no work so hard, no difficulty so unsurmountable, no word of command so unpracticable, that he could not carry into effect,—for the sake of Swamiji. Heroic in his ways, loving in his manners, self-forgetful in succouring the needy and afflicted, he won the hearts of everybody who came in touch with him." স্বামিজীর জীবনেতিহাসে, তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিপুল পরিধির মধ্যে স্বামী সদানন্দের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে এবং উহা স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। সদানন্দ-চরিত্রের সেই মহিমাও সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহার শ্রীগুরুর সুবৃহৎ জীবনী-গ্রন্থের[৩] ভাষাতেই—অন্য ভাষা নিষ্প্রয়োজন। সে ভাষা এই : "His whole character might be summed up in three words—sweetness, sincerity and manliness." অর্থাৎ, তাঁহার সমগ্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করা চলে মাত্র তিনটি কথায়—মধুরতা, নিষ্ঠা ও পুরুষকার।

১ ভগিনী নিবেদিতা সদানন্দকে *Swampsee* বলিয়া ডাকিতেন। মনে হয়, 'স্বামিজী'-কথাটিকেই তিনি সহজভাবে ঐরূপ উচ্চারণ করিতেন।

২ *Prabuddha Bharata* (March, 1911).

৩ *Life of Swami Vivekananda*—By His Eastern & Western Disciples.



স্বামী কল্যাণানন্দ

স্বামী কল্যাণানন্দ

মানবকল্যাণে সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত স্বামী কল্যাণানন্দের জীবন, সেবাব্রতী মানুষের কাছে চিরদিনই প্রেরণাস্বরূপ। স্বামিজী-প্রবর্তিত নারায়ণ-বুদ্ধিতে নরসেবার মহৎ আদর্শকে যাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো আপন করিয়া, উহারই সাধন ও সিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সেইসকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের মধ্যে স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য কল্যাণানন্দ অন্যতম। সেবাধর্মের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকালই জাজ্বল্যমান থাকিবে।

স্বামী কল্যাণানন্দের পূর্বনাম দক্ষিণারঞ্জন গুহ। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, বরিশাল জেলার উজিরপুরের নিকটবর্তী হাতুয়া গ্রামে একটি অভিজাত অথচ দরিদ্র পরিবারে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র গুহ। দক্ষিণা-রঞ্জন মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান—কিন্তু অতি শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। ধর্মপ্রাণা জননীর সস্নেহ লালন-পালন, বালক দক্ষিণারঞ্জনকে 'আদরের দুলাল' তৈয়ারী করে নাই, বরং তাঁহাকে ধর্মপথে চলিবার মতো উপযুক্ত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল। বিধবা জননীর নয়ন-মণি হইয়াও বালকের মনে ভগবৎ-ভক্তি ও সংসার-অনাসক্তির বীজ শিশুকাল হইতেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। জ্যেষ্ঠতাতই বাড়ীতে অভিভাবক ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জনের পড়াশোনার বিধি-ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন। বানরীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সংসারের অনটন ও তদুপরি সংসারের প্রতি তরুণ বয়স হইতেই ঔদাসীন্য তাঁহার পড়াশোনার অগ্রগতিকে বহুলাংশে বিঘ্নিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকাদি অপেক্ষা সুরেশচন্দ্র দত্ত-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' প্রভৃতি ধর্মপুস্তকাদি পাঠের দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল প্রবল।

স্বামিজীর বেদান্তপ্রচারের নানা কাহিনীতে ও তাঁহার বক্তৃতাবলীতে তখন দেশের আকাশ-বাতাস ভরিয়া ছিল—বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতেও তখন ঐসব কথা প্রকাশিত হইত। আদর্শবাদী যুবকমাত্রই তখন স্বামিজীর ভাবে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এই ভাব-প্লাবন সুদূর পল্লীবাংলার তরুণদের চিত্তেও আলোড়ন জাগাইতেছিল। আদর্শচরিত্র যুবক দক্ষিণারঞ্জনের মনের তটেও যে

ঐ বিবেক-তরঙ্গ আসিয়া স্পর্শ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সেবানুরাগ ছিল তাঁহার আবাল্য সংস্কার। পরের জন্য পরিশ্রম করা এবং অন্যের আপদে-বিপদে, ব্যাধিতে-জ্বালাতে, সমবেদনা বোধ করা ও সাহায্য করা, তাঁহার একটি প্রিয় অভ্যাস ছিল। সহজাত এই সেবাবৃত্তির যথোপযুক্ত পরিস্ফূরণের জন্য তাঁহার মন যেন একটি পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সংবাদ পাইয়াছিলেন, বেলুড়ে স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত মঠে সেবা একটি বিশিষ্ট যোগ বা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়রূপে সাধিত হইয়া থাকে। দক্ষিণারঞ্জনের উক্ত আদর্শ-প্রাণতা ও সংসার-বৈরাগ্যই অবশেষে একদিন তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ হইতে উদার বহির্বিশ্বে আহ্বান করিয়া আনিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠে আসিয়া যোগদান করেন। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে।

মঠে আসিয়া এতদিনে দক্ষিণারঞ্জনের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও সেবার ভাবটি পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে, জীবনের সর্বতোমুখী প্রকাশ-সাধনের উপায়গুলিকে খুঁজিয়া পাইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। স্বামিজী স্বয়ং তখন মঠে রহিয়াছেন—সুতরাং দক্ষিণারঞ্জনের আনন্দের অবধি ছিল না। যাঁহার সম্বন্ধে এতদিন শুধু কানেই শুনিয়াছেন ও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন, যাঁহার এক-একটি কথার শক্তিতে কতই-না উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছেন, আজ তাঁহারই প্রত্যক্ষ সন্নিধিতে বৈরাগ্যবান দক্ষিণারঞ্জনের মনোজগতে কী আলোড়ন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। গ্রাম হইতে আগত সরল যুবকের আন্তরিকতা পরীক্ষার জন্য স্বামিজী একদিন রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, ধর্ আমার কিছু টাকা দরকার। তার জন্য যদি তোকে চা-বাগানের কুলী বলে বিক্রী করি—তুই রাজী আছিস্ তো?" দক্ষিণারঞ্জন বিনা দ্বিধায় সানন্দেই সম্মতি জানাইয়াছিলেন। গুরুপদে সমর্পিত-প্রাণ এই শিষ্যের জীবনকে যদি সমগ্রভাবে অবলোকন করা যায় তবে নিশ্চিতই ইহা গোচর হইবে যে, চা-বাগানের কুলীরূপে নহে, বিরাট মানবজাতির সেবাতেই স্বামিজী তাঁহার এই অনুগত শিষ্যটিকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন স্বামিজীর পদপ্রান্তে আশ্রয়লাভ করেন—১৮৯৮-এরই কোন সময়ে। সন্ন্যাস-দীক্ষান্তে স্বামিজী নবীন শিষ্যের নাম দিলেন

স্বামী কল্যাণানন্দ। আরও একজন সুযোগ্য শিষ্যকে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে স্বামিজী সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন—তিনি স্বামী আত্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'শুকুল মহারাজ' নামে যিনি খ্যাত।

কল্যাণানন্দ সেবা করিবার সামান্য একটু সুযোগ পাইলেও নিজেকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। মঠে অবস্থানকালে সাধন-ভজন ও গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ সেবাকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বেলুড় গ্রামের দুস্থ আর্ত ও পীড়িতদের সেবার জন্য তিনি অশেষ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিতেন। স্বামী যোগানন্দজী যখন কলিকাতায় অন্তিমশয্যায় কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন প্রায় একমাসকাল সেই মহাপুরুষের সেবা করিবার সৌভাগ্য কল্যাণানন্দ লাভ করেন। তাঁহার সেবায় এতই প্রাণ মিশ্রিত থাকিত যে যোগানন্দজীর সামান্য একটু ইঙ্গিত বা চোখের ইশারাতেই তিনি তাঁহার প্রয়োজন বুঝিয়া ফেলিতেন। এই সেবা-নিষ্ঠার জন্য অচিরেই তিনি শ্রীগুরুর এবং অন্যান্য সাধুগণের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৯৯-এর জুন মাসে স্বামিজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য দেশে যাত্রা করেন। উহার মাসখানেক পরে (জুলাই মাসে) স্বামী কল্যাণানন্দ তীর্থদর্শন ও তপস্যাদির উদ্দেশ্যে বাহির হন। এই ভ্রমণ-প্রসঙ্গে তিনি কাশীতে কেদারনাথ মৌলিক নামক জনৈক আদর্শপ্রাণ তরুণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঠ হইতে গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দই কেদারনাথের নিকট কল্যাণানন্দের সম্পর্কে একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ পত্রই কেদারনাথের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা স্থাপনের প্রাথমিক সূত্র হইয়াছিল। উভয়ের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, উত্তরজীবনে ইঁহারা একই পথের যাত্রিরূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন। কল্যাণানন্দের সাহচর্যে কেদারনাথ ও চারুচন্দ্র দাস-প্রমুখ তাঁহার যুবক বন্ধুগোষ্ঠীর মনে স্বামিজী-প্রবর্তিত সেবাধর্মের প্রতি একটি বিশেষ অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সেবার মধ্যেই যে জ্ঞান কর্ম যোগ ও ভক্তির সমন্বয়সাধন সম্ভব, এই সমন্বিত যোগের সাধনই যে যুগধর্ম, তাহাও তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন স্বামিজীর এই সেবানিষ্ঠ শিষ্যের সংস্পর্শে আসিয়া। স্বামিজীর ভাবানুগ সেদিনের এই যুবকদলই কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্থাপয়িতা, এবং যুবক কেদারনাথ

ও চারুচন্দ্রই উত্তরকালে যথাক্রমে স্বামী অচলানন্দ (কেদারবাবা) ও স্বামী শুভানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে খ্যাত হইয়াছেন।

কাশীধাম হইতে কল্যাণানন্দ এলাহাবাদ গমন করেন এবং সেখানেও নানাবিধ সেবামূলক কর্মে তিনি যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছিলেন। 'এলাহাবাদ অনাথাশ্রম' নামক স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও পরিচালকগণকে স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, তাঁহাদের সেবানুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সার্থকতায় ভরিয়া দিতে তিনি প্রচুর যত্ন করিয়াছেন। এইভাবে পর্যটন করিতে করিতে কল্যাণানন্দ জয়পুরে পৌছেন; জয়পুর রেল-স্টেশনে অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, উভয়েরই খুব আনন্দ হইয়াছিল। স্বরূপানন্দও তীর্থভ্রমণে চলিয়াছিলেন। কিন্তু একটি দুঃসংবাদ শুনিয়া, তাঁহারা সকল সঙ্কল্প সেখানেই বর্জন করিয়াছিলেন। কিষেণগড়ে সেই সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্রন্দনে রাজপুতানার আকাশ তখন মলিন। উভয় গুরুভ্রাতাই তীর্থদর্শন অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট জীবন্ত নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাকে অধিক সমীচীন বলিয়া অনুভব করিলেন এবং অনতিবিলম্বে কিষেণগড়ে ছুটিয়া গিয়া সেবাকার্যের সূচনা করেন। স্থানীয় বদান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায়, কল্যাণানন্দ ও স্বরূপানন্দ কিষেণগড়ে বিস্ময়কর কার্য করিয়াছিলেন—এবং ব্যথিত মানুষের অশ্রুমোচনে যথেষ্ট সাফল্য দেখাইয়াছিলেন। ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা প্রতিদিন তাঁহারা প্রায় তিন শত (৩০০) ব্যক্তির অন্নের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাময়িকভাবে একটি অনাথাশ্রমও তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বরূপানন্দ কিছুকাল পরেই মায়াবতীতে চলিয়া গেলে, কল্যাণানন্দ একাই কিষেণগড়ের সমগ্র কার্যভার বহন করিয়াছিলেন। অহর্নিশ অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায়, স্বামী আত্মানন্দ ও নির্মলানন্দ আসিয়া তাঁহাকে সহায়তা করেন। কিষেণগড়ে অনাথ শিশুদের জন্য স্থাপিত অস্থায়ী আশ্রমটি কল্যাণানন্দের নেতৃত্বে এমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছিল যে, উহাকে একটি স্থায়ী রূপ দিবার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ খুবই অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেখানে কোন স্থায়ী আশ্রমের ভার গ্রহণ করা মিশনের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কাশী হইতে কেদারনাথও

আসিয়া কিষেণগড়ের সেবাকার্যে কল্যাণানন্দকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। পুনরায় এখানে তাঁহার সাহচর্যে কেদারনাথের অন্তরের সেবাবোধ আরও পরিপুষ্টি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। দুর্গাপূজা উপলক্ষে কল্যাণানন্দ অনাথ শিশুদের লইয়া ঘটস্থাপনা করিয়া মাতৃপূজা করিয়াছিলেন—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট রাজপুতানায় ইহাও এক অভিনব সেবা-প্রচেষ্টা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত কার্যবিবরণী হইতে জানা যায়, ঐ অনাথাশ্রমটিতে তখন ৫০ জন বালক ও ২০ জন বালিকা প্রতিপালিত হইতেছিল। যাহা হউক, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে স্বামিজী বিদেশ হইতে পুনরায় বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামী সারদানন্দজী কল্যাণানন্দকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "স্বামিজীকে ইচ্ছা করিলে তোমরা এখন দর্শন করিতে পার।" রাজপুতানার কার্য শেষ করিয়া কল্যাণানন্দ তখন বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। ১৯০১-এর প্রথম দিকে তিনি শ্রীগুরুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামিজীর পবিত্র সান্নিধ্যে কল্যাণানন্দের মঠ-জীবন বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার রেশ লইয়া চলিতে থাকিল। সহসা একদিন স্বামিজী ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্, কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস্? তাঁদের দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।" স্বামিজী পরিব্রাজক-জীবনে উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণকালে বৃদ্ধ ও পীড়িত সাধুদের দুর্দশার করুণ দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও সেখানে অসুস্থ হইয়া ততোধিক মর্মন্তুদ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তদবধি এই বিষয়টি তাঁহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া ছিল, আজ উপযুক্ত শিষ্যকে পাইয়া উহাই তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া, তাঁহার আদেশপালনই মহৎ সাধনা বুঝিয়া, কল্যাণানন্দ সানন্দে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দের সহিত পরামর্শের জন্য মায়াবতীতে গমন করেন। স্বামিজীর ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিতে কর্মসূচী কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়—ইহা লইয়া দুই গুরুভ্রাতা অনেক আলোচনাদি করিলেন। স্বরূপানন্দ এই কঠিন কার্যে কল্যাণানন্দকে আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং কর্মের সূচনা করিয়া দিতে নিজেও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর দুই সন্ন্যাসি-শিষ্য গুরুদত্ত এই

মহৎ দায়কে মাথায় লইয়া, অর্থভিক্ষার জন্য নৈনিতালের দিকে যাত্রা করেন। স্বরূপানন্দের ন্যায় যোগ্য সুহৃদের সহায়তায় ও পরিশ্রমে কল্যাণানন্দ অচিরেই প্রচুর মনোবল আহরণ করিয়া লইলেন—অর্থও কিছু সংগৃহীত হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাখণ্ডই যুগ যুগ ধরিয়া সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রিয় আবাসভূমি। নগাধীশ হিমালয়ের ভাব-গাম্ভীর্যমণ্ডিত, ও পবিত্র জাহ্নবীর কলধ্বনিমুখরিত উত্তরাখণ্ডের তীর্থে তীর্থেই অধ্যাত্ম-ভারত আজও যেন সজীব। আবার হৃষীকেশ ও হরিদ্বার উক্ত তীর্থরাজির মধ্যে একটু বিশেষ মহিমা লইয়া, অনন্ত পুণ্যস্মৃতির সাক্ষীরূপে ভারতচিত্তে চির-জাগরূক হইয়া আছে। হিমালয়ের পাদদেশে হৃষীকেশ-হরিদ্বারের উপলময় তটে দাঁড়াইয়া প্রবহমান গঙ্গার গৈরিক স্রোতকে দেখিলে এখনও মনে হয় যেন সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির ভাবস্রোত অব্যাহত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতের সাধু-সন্ত সন্ন্যাসি-উদাসী ও বৈরাগী-পরিব্রাজকের দল তাই এই তীর্থভূমিতেই আসিয়া আসন পাতিয়া থাকেন—গঙ্গার তীরে তীরে কুঠিয়া বাঁধিয়া তপস্যাদিতে মগ্ন হন। কিন্তু লোকালয় হইতে দূরে এইসব অঞ্চলে কোনরূপ চিকিৎসা-সেবার সুযোগ না থাকাতে, বৃদ্ধ বা পীড়িত সাধুদের দুরবস্থা সহজেই কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। স্বামিজীর বেদনার্ত হৃদয় তাই এই নিঃসম্বল সাধুদের সেবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—যোগ্য কোন সেবাপ্রাণ শিষ্যের অপেক্ষা-তেই যেন তিনি এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। কল্যাণানন্দ শ্রীগুরুর আশী-র্বাদ মাত্র ভরসা করিয়া এই হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া কিছু দক্ষিণে কনখল—প্রাচীন তীর্থভূমি। পৌরাণিক মতে এই কনখল দক্ষযজ্ঞের পীঠক্ষেত্র,—সতীর দেহত্যাগের স্থান। কল্যাণানন্দ নিভৃত কনখলেই তাঁহার সেবা-সাধনার স্থান নির্বাচন করিলেন।

হরিদ্বার ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীর্থ—বৎসরের প্রায় সকল সময়েই অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী ও অজস্র পুণ্যার্থী নরনারীর ভিড় এখানে লাগিয়া থাকে। আবার কুম্ভমেলার কালে তো লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগমে এই স্থান মুখরিত হইয়া ওঠে। হরিদ্বারের মাত্র পনের মাইল উত্তরেই হৃষীকেশ—সনাতন তপোভূমি। আরও তিন মাইল উত্তরে লছমনঝোলা,—গঙ্গার অপর তীর ধরিয়া ক্রমে কেদারনাথ

বদরীনারায়ণ ইত্যাদি। অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক সাধুর গমনাগমনের পথে, হরিদ্বারের সমীপবর্তী কনখল তাই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি—কারণ হরিদ্বারই বস্তুতঃপক্ষে হিমালয়ের প্রথম প্রবেশ-ধাপ। জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন, অথচ জনবহুল তীর্থের সন্নিহিত, এমন শান্ত গম্ভীর আবেষ্টনী রুগ্ন-পীড়িতদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ পরিবেশ। কনখলেই কল্যাণানন্দ তাঁহার গুরু-উপদিষ্ট সাধনার জন্য আসন স্থাপনা করিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ইহাই ছিল স্বামিজীর নিকট প্রাপ্ত তাঁহার সাধনার মন্ত্র। কল্যাণানন্দ আমৃত্যু একটানা প্রায় ৩৬ বৎসর এই কনখলেই উক্ত মহৎ সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

১৯০১-এর জুন মাসে, কনখল পল্লীতে মাসিক ৩ টাকায় দুইখানি ঘর[১] ভাড়া লইয়া, কল্যাণানন্দ তাঁহার সেবাযজ্ঞের প্রথম সূচনা করেন। ঐ দুইটি ঘরের মধ্যেই অসুস্থ সাধুদের জন্য শয্যা, চিকিৎসালয়, তাঁহার নিজের বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। হোমিওপ্যাথি ঔষধের একটি ছোট বাক্স, চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতিও ইতোমধ্যে সংগ্রহ হইয়াছিল। প্রত্যহ সাধুদের কুঠিয়াতে কুঠিয়াতে ঘুরিয়া তিনি পীড়িত বা বৃদ্ধ সাধুদের খোঁজ-খবর লইতেন এবং ঔষধ-পথ্যাদির বন্দোবস্তও করিয়া আসিতেন। আবার আবশ্যক হইলে রুগ্ন সাধুদের নিজের আস্তানায় লইয়া আসিয়া স্বয়ং সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কল্যাণানন্দ রোগীদের জন্য পথ্যাদি নিজেই প্রস্তুত করিতেন, অথচ নিজে সম্পূর্ণ মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতেন। এইভাবেই বীজাকারে যে কার্যের শুরু হইয়াছিল, উহাই কালক্রমে স্বামিজীর আশীর্বাদে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান, কনখল সেবাশ্রমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ভিক্ষালব্ধ অর্থ, ঔষধ ও সেবা-সামগ্রী দিয়া, কল্যাণানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুর আশিস্‌কে স্মরণ করিয়া প্রবল উৎসাহ ও অকৃপণ হৃদয় লইয়া প্রাণ ঢালিয়া সাধুসেবায় রত থাকিলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারাও এই সময়ে তাঁহাকে খুবই সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা জোগাইতেন। মায়াবতী হইতে বিমলানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রে মাঝে মাঝে কল্যাণানন্দের প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের

১ 'নির্বাণী আখড়া'র বারকুঠরী নামক বাড়ীর ভিতরে।

জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন (Appeal) প্রকাশ করিতেন। ১৯০১-এর আগষ্টেই সর্বপ্রথম বিমলানন্দ-লিখিত আবেদন 'প্রবুদ্ধ-ভারত'-এ মুদ্রিত হয়। সুচিন্তিত ও তীক্ষ্ণ লেখনীপ্রসূত এই আবেদনগুলিই বাস্তবিক-পক্ষে দেশ-বিদেশের জনসমাজে সেবাশ্রমকে প্রথম পরিচিত করাইয়া দিয়াছিল।

অতীতের স্মৃতি—উহা যতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হউক, বর্তমানের চোখে উহার একটি বিশেষ পবিত্র রূপ আছে। অতীতের অসম্বদ্ধ সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর মধ্যেও একটা পারম্পর্য বা সামঞ্জস্য মানুষ ঠিক খুঁজিয়া পায়। বর্তমান কিছু-একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে—অতীতেরই দৃঢ়ভিত্তির উপর তাহার অবস্থান। অতীত ভবিষ্যতেরও নিয়ামক—উহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার উৎসভূমি। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আজ ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সেবায়তন। সুপরিচালিত বৃহৎ এই প্রতিষ্ঠানের অতীত দিনের দুই-একটি স্মৃতি স্মরণ করিলে, আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের তাৎপর্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। আজ যেখানে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শত শত পীড়িত ব্যক্তির সেবা-চিকিৎসার বিরাট আয়োজন নিত্য নিয়ত চলিতেছে, সেখানে একদা একজন নিঃসম্বল সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কী অতন্দ্র নিষ্ঠা লইয়া এই সেবাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই একটি ঐতিহাসিক বিস্ময়।

সেবাশ্রমের প্রথম প্রকাশিত প্রতিবেদন (Report)[১] হইতে তখনকার মাত্র একটি মাসের রোগী ও আয়-ব্যয়ের একটি চিত্র এখানে উপস্থাপিত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯০১-এর সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব হইতে জানা যায়: ঐ মাসে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে (indoor-এ) ৬ জন সাধু চিকিৎসিত হইয়াছিলেন; বহির্বিভাগে (outdoor-এ) ৪৮ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জন ছিলেন সাধু এবং বাকী সকলে দরিদ্র গৃহী। বহির্বিভাগের ৩৬ জনই সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন, এবং দশজন তখনও চিকিৎসাধীনে ছিলেন ও ২ জনের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের আয়ব্যয়ের হিসাব ছিল এইরূপ:

---

১ *Prabuddha Bharata*, October, 1901.

	টাকা	আনা	পাই
পথ্য	১২	১৫	১১/২
ঔষধ	৪	১৪	৪১/২
ঘরভাড়া	৩	০	০
আশ্রম-ব্যয়	১	১	০
আলো ইত্যাদি	৩	৬	৬
বেতন-মজুরী	১	০	৬
ডাকখরচ	০	৬	০
বিবিধ	১	১	৭১/২
মোট—	২৭	১৩	১১/২

ইহা ব্যতীত ভিক্ষা ও দানলব্ধ ২১/২ মন গম, ২০ সের ডাল এবং ৩ সের লবণ ঐ মাসে খরচ হইয়াছিল।

'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের তখন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে স্বামী স্বরূপানন্দ ও বিমলানন্দ। এই দুই গুরুভ্রাতার অনুপ্রেরণা ও উত্তম কল্যাণানন্দকে আরও বেশী উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিমলানন্দ স্বামী তো কয়েকবারই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সতেজ লেখনী-দ্বারা কল্যাণানন্দের কর্মপ্রণালীর, তথা স্বামিজীর সেবাদর্শের যথেষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। তখন প্রতি মাসেই 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রে কনখল সেবাশ্রমের মাসিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইত। ক্রমেই ভারতের শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র এই সেবাকুটীর, তথা সেবাব্রতী সম্বল-হীন ঐ সাধুটির প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে।

হৃষীকেশের সাধুদের জন্যও কল্যাণানন্দের কল্যাণ-হস্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত না হইয়া পারে নাই। তিনি হৃষীকেশের ঝাড়িতে এবং অন্যান্য স্থানের কুঠিয়াগুলিতে গিয়াও সাধুদের জন্য ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে হৃষীকেশেও পূর্ণোদ্যমে সেবাশ্রমের শাখা-কার্য পরিচালিত হইতে থাকিল। কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পাইয়া চলিল—কর্মী কিন্তু সেই একজনই। স্বামিজীর মহিমায় এক কল্যাণানন্দ যেন দ্বিগুণিত বহুগুণিত হইয়া শতহস্তে কার্য করিয়াছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ হৃষীকেশ শাখার জন্যও আবেদন প্রকাশিত হইল। ১৯০২-এর জানুআরি সংখ্যায় 'In Aid

of the Sadhus' শিরোনামায় ঐ আবেদনটিও লিখিয়াছিলেন স্বামী বিমলানন্দ।

সেবাশ্রমের হৃষীকেশ-কেন্দ্রের কার্যবিবরণীও 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হইত। ১৯০২-এর এপ্রিল সংখ্যাতেই প্রথম উহা মুদ্রিত দেখা যায়। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় মার্চ মাসে, হৃষীকেশের ১০ জন সাধু বহির্বিভাগে এবং ৭ জন অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিত হইয়াছেন। মার্চের হিসাবও পাওয়া যায় ঐ বিবরণীতে :

ব্যয়-তালিকা	টাকা	আনা	পাই
পথ্য	২	১৫	০
আলো	০	৩	০
রেলভাড়া	০	৩	৩
ঔষধ	১	৭	০
বিবিধ	০	৫	৬
	৫	১	৯

৫ সের ১২ ছটাক চাউল, ৯ সের ২ ছটাক ডাল, ১৮ সের ১২ ছটাক গম, ১ সের ৮ ছটাক লবণ এবং ২ টাকা ৯ আনার দুধ দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল, এবং উহাও সম্পূর্ণ খরচ হইয়াছিল।

ফুল-ফল-পত্রশোভিত বহুশাখাসমন্বিত বিরাট বৃক্ষটিকেই মানুষে চেনে ও সম্মান করে, কিন্তু ঐ বিরাট সম্ভাবনা যে অণু-প্রমাণ বীজটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা চিরকালই লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া যায়। ইহাই জগতের নিয়ম। কনখল সেবাশ্রমের কথা বলিতে গিয়া, অতীত দিনের উল্লিখিত বিবরণীগুলির বিশদ অবতারণা করাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই। তথাপি কর্তব্যবোধেই আমরা পুরাতনের দিকে দৃষ্টিকে একটু না ফিরাইয়া পারি না—অতীতের প্রতি বর্তমানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য।

যাহা হউক, কনখল ও হৃষীকেশের দুইটি সেবা-কেন্দ্র একা কল্যাণানন্দের পক্ষে অধিকদিন চালানো একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিতেছিল। তবে গ্রীষ্মকালে হৃষীকেশে সাধুর সংখ্যা খুবই কম হইয়া যায়, সকলেই পাহাড়ের উপরে তীর্থাদিতে চলিয়া যান। সুতরাং ঐ অবকাশে হৃষীকেশের কার্য

আপাততঃ বন্ধ থাকিলেও, কোন অসুবিধা হয় না। তদনুযায়ী কল্যাণানন্দ ১৯০২-এর মে মাস হইতে হৃষীকেশ-কেন্দ্রের কার্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়া, কনখলের দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে মনস্থ করেন। সেবাশ্রমের কার্য উত্তরোত্তর যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে উহাকে একটি স্থায়ী রূপ দিবার জন্য অর্থ ও কর্মী উভয়ই দরকার হইয়া পড়িল। স্বামিজীর আদেশেই তিনি এই কর্মে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। অন্তরে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, তাঁহারই আশীর্বাদে কিছুই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। স্বামিজীও বেলুড় মঠ হইতে অনুগত শিষ্যের অক্লান্ত সেবা-সাধনার কথা শুনিয়া কতই না খুশী হইতেছিলেন! মঠের অন্যান্য সাধুদের নিকট 'কল্যাণে'র প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। কল্যাণানন্দও অনেকদিন শ্রীগুরুর দর্শন না হওয়ায়, মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে-ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন এবং সেবাশ্রমের ভাবী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য কল্যাণানন্দ কিছুদিনের অবসর লইয়া মঠে চলিয়া আসিলেন। স্বামিজীও তাঁহার প্রিয় 'কল্যাণ'কে কাছে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

পুনরায় স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে বাস করিয়া কল্যাণানন্দ তাঁহার সাধনপথের অনেক অনেক পাথেয় সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎভাবে গুরুসেবার সুযোগও এবার তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। স্বামিজীর শরীর তখন খুবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অসুস্থ দেহেও কিন্তু শিষ্যদের কল্যাণচিন্তায় কখনও তিনি বিরত হন নাই। কল্যাণানন্দের গুরুসেবা ও ভক্তিভাব অনন্যসাধারণ ছিল। অসুস্থ-দেহ স্বামিজীর জন্য একবার বরফ আনিবার প্রয়োজন হওয়ায়, কল্যাণানন্দের উপরই কলিকাতা যাইবার আদেশ হয়। তখন সামান্য একটা জিনিসের জন্যও বেলুড় হইতে কলিকাতায় ছুটিতে হইত —যাতায়াতও ছিল নৌকায় ও পদব্রজে। কল্যাণানন্দ প্রায় আধ মন বরফ, কলিকাতা হইতে পদব্রজে নিজের হাতে করিয়া মঠে আনিয়াছিলেন। স্বামিজী শিষ্যের এই অসাধারণ কর্মশক্তিতে ও শ্রদ্ধায় প্রীত হইয়া সেদিন উক্তি করিয়াছিলেন: "ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ করে ধন্য হবে।" ভবিষ্যতে সে-দিন সত্যই আসিয়াছিল, যখন কল্যাণানন্দকে দেখিলে স্বামিজীর উক্ত আশীর্বাদের মর্ম বেশ অনুভব

করা যাইত। সেবা ও সাধনার দুইটি সমান্তরাল ধারা, তাঁহার জীবনকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই অপূর্ব সমন্বয়ই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের বৈশিষ্ট্য।

একদা স্বামিজী কল্যাণানন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানিস্? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে—সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যানধারণাদি করবে, তারপর যা ধ্যান করলে, practical field-এ (বাস্তব ক্ষেত্রে) তা কাজে লাগাবে।" কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে এইদিনের স্মৃতি-প্রসঙ্গে বলিতেন যে, কল্যাণ স্বামীকে ডাকিয়া স্বামিজী ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, "আসল ভাব হচ্ছে practical (কর্ম-পরিণত) বেদান্ত। শুধু theoretical (তত্ত্বীয়) নয়, বেদান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে।" স্বামিজী কল্যাণানন্দের সেবাপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া, সেবাকে বেদান্তেরই বাস্তব প্রয়োগরূপে তাঁহার মনেতে আঁকিয়া দিয়া শিষ্যের সেবাবোধকে আরও উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দের উত্তরজীবনে স্বামিজীর এই ইচ্ছা যথার্থই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ধ্যান-ভজন ও নারায়ণবোধে নরসেবা-ই ছিল তাঁহার জীবনের মূল সুর—তাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণ ও জীবনচর্যাতে ইহাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইত। যাহা হউক, শ্রীগুরুর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া, পুনরায় তিনি কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন মঠে বেশ কাটিল—এখন আবার কনখল। স্বামিজীর সহিত স্থূল-ভাবে ইহাই ছিল তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ। কল্যাণানন্দের কনখলে চলিয়া যাইবার মাত্র কয়েকদিন পরেই, স্বামিজীর মহাপ্রয়াণ হয়। কল্যাণানন্দও বাকী জীবন নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও তপস্যায় কনখলেই কাটাইয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশে আর তিনি নামেন নাই। কুম্ভমেলায় সেবাকার্য পরিচালনার জন্য কনখল হইতে দুইবার তিনি এলাহাবাদে গিয়াছিলেন মাত্র।

কনখলে আসিয়া স্বামিজীর আদর্শানুযায়ী সেবাশ্রমকে পুনর্গঠন করিবার কার্যে তিনি মনোনিবেশ করিলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত সহকারীর অভাবে শারীরিক পরিশ্রম প্রায় অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল। স্বামিজীরই ইচ্ছাতে এইকালে (১৯০৩-এর কোন সময়ে) যথার্থ সহযোগী একজন আসিয়া কল্যাণানন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি তাঁহারই অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। তখন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল এই

নিশ্চয়ানন্দই ছিলেন কল্যাণানন্দের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। এতদিনে কর্মের গতি একটি নির্দিষ্ট পথ করিয়া লইবার সুযোগ-সামর্থ্য লাভ করিল,—সেবাপ্রাণ নিশ্চয়ানন্দের সহায়তায় কল্যাণানন্দের হৃদয় যেন আরও প্রসারিত হইয়া উঠিল। হৃষীকেশের সেবা-কেন্দ্রটি পূর্ণোদ্যমে আবার চালু হইল। উভয় ভ্রাতাই মাধুকরী ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন। উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজে ক্রমেই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের কথা আলোচিত হইতে আরম্ভ করিল।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে, কলিকাতার জনৈক মহানুভব ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে কনখল পল্লীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে ১৫ বিঘা জমি দেড়হাজার টাকায় খরিদ করা হয়। জমি পাওয়া গেলেও, গৃহনির্মাণের সংস্থান কিছু ছিল না। তাই আপাততঃ তিনটি পর্ণকুটীর তৈয়ারী করিয়া সেবাশ্রমের কার্য সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। কল্যাণানন্দের খ্যাতি চিকিৎসকরূপেও বিদিত হইয়াছিল। দীন-দুঃখী অস্পৃশ্য চামারদের বস্তীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি রোগী দেখিতেন, শুশ্রূষাদি করিতেন। সাধুর কুঠিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল-পল্লীর ঝুপড়ি পর্যন্ত সর্বত্র সমান হৃদয় লইয়া সন্ন্যাসি-ভ্রাতৃদ্বয় ভ্রমণ করিতেন—পীড়িত ব্যক্তির মল-মূত্র নিজেরা পরিষ্কার করিয়া দিতেন, পথ্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন এবং ঔষধ দিয়া আসিতেন। গোঁড়া সন্ন্যাসীর দল, স্বামিজীর এই শিষ্যদ্বয়ের সেবা-শুশ্রূষায় বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে 'ভাঙ্গী-সাধু' আখ্যা দিয়া একটু হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহাদের মতে অন্যের মল-মূত্র পরিষ্কার করা 'ভাঙ্গী' বা মেথরের কার্য, সর্ব-কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে। বেদান্তের উচ্চতম আদর্শের কথা ইহারা শুধু মুখেই আওড়াইতেন, উহার কোন বাস্তব-প্রয়োগ অর্থাৎ সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা ইহাদের কাছে নিতান্তই একটা পরিহাসের বিষয় ছিল। নিজেরা পীড়িত হইলে অপরের সেবা ইহারা সাগ্রহে গ্রহণ করেন, কিন্তু অপরের সেবা করিবার কথায় ইহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় 'আত্মারাম' হইয়া অবস্থান করেন! সুতরাং গোঁড়া সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী কল্যাণানন্দের কার্যের মৌখিক সাধুবাদ জানাইলেও, আন্তরিক কোন সহানুভূতি ইহারা দেখাইতেন না।

তখন দশনামী সাধুদের মধ্যে খুবই সম্মানিত ছিলেন, হৃষীকেশস্থ কৈলাস

মঠের মণ্ডলীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী মহারাজ[১]। বিধাতার ব্যবস্থাপনায় এক অলৌকিক উপায়ে এই সন্ন্যাসিপ্রবরেরই মাধ্যমে গোঁড়া দশনামীদের উল্লিখিত ভ্রান্তি চিরতরে বিদূরিত হইয়াছিল। ধনরাজ গিরিজী তখন কনখলে সুরথ গিরির ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ভজনলাল লোহিয়া ও হরসহায়মল শুকদেবদাস নামক শেঠ-বন্ধুদ্বয় একদিন ধনরাজ গিরি মহারাজকে প্রণাম করিয়া, করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, তিনি অনুমতি করিলে তাঁহারা একটি মঠ বা ধর্মশালা তৈয়ারী করিয়া তাঁহারই সম্মানার্থে উৎসর্গ করিবেন। ধনরাজ গিরিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন যে, সত্যই যদি জনহিতার্থে তাঁহারা কিছু করিতে চান, তবে স্বামী বিবেকানন্দের দুইজন সন্ন্যাসি-শিষ্য কনখলে কী করিতেছেন, তাহা যেন একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। আর ঐ বিবেকানন্দ-শিষ্যদের কার্যে যদি শেঠদ্বয় কিছু সাহায্য করেন, তবে তাহাই হইবে মহত্তম দান, তাহাতেই তিনি সুখী হইবেন এবং দাতাদেরও ইহাতে মঙ্গল হইবে। গিরিজী মহারাজের নির্দেশমতো ধর্মপ্রাণ ভজনলাল ও তাঁহার বন্ধু কনখলে স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের কার্য দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রেমকে মানব-সেবায় নামাইয়া আনাইয়া, এবং মানব-প্রেমকে ভগবৎ-ভক্তিতে উন্নীত করিয়া, বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শকে কেমন বাস্তব করা চলে, উহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া শেঠ বন্ধুদ্বয় আনন্দে ও বিস্ময়ে উপলব্ধি করেন, ধনরাজ গিরিজী কেন তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদেরই বদান্যতায় কনখল সেবাশ্রমের স্থায়ী বাটী নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর প্রকল্পিত নক্শা অনুযায়ী, কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সেবাশ্রমের দুইটি প্রশস্ত ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৯০৪-এর শেষ দিকে। ১৯০৫-এর প্রথম ভাগে এক শুভদিনে নূতন গৃহে সেবাশ্রমের কার্য শুরু হয়।

বস্তুতঃ ধনরাজ গিরিজী মহারাজের স্বীকৃতির ফলেই উত্তরাখণ্ডের প্রাচীন-

---

১ স্বামিজী স্বয়ং হৃষীকেশে অবস্থানকালে কৈলাস মঠের শ্রীমৎ ধনরাজ গিরিজীর সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দজীও স্বামিজীর গুরুভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার সমীপে গিয়াছিলেন এবং কিছুকাল এই বিদগ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

পন্থী দশনামী সাধুদের সপ্রশংস দৃষ্টি কল্যাণানন্দের কার্যাবলীর উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। দশনামী সাধুদের ভাণ্ডারায় (সাধুমণ্ডলীর সমাবেশে) সর্বপ্রথম এই ধনরাজ গিরিজীই কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজেরই পার্শ্বে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সকলেরই চোখ খুলিল—নীরব সাধক এই সন্ন্যাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপযুক্ত মর্যাদা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিলেন।

কল্যাণানন্দকে স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন যে, ধ্যান ও সেবা এক-সঙ্গে একই তালে চলিবে এই সেবাশ্রম-কর্মীদের জীবনধারায়। কনখল সেবাশ্রমের নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে ইহা খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কল্যাণানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুর ঐ আদেশকে কিরূপ স্মরণে রাখিয়াছিলেন। সম্মুখে সেবা বিভাগ, উহারই পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির[১] ও তৎসংলগ্ন ধ্যানঘর, পাঠাগার এবং সাধুদের নিরালা বাসস্থান ইত্যাদি প্রকৃতই সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামিজী একদা কল্যাণানন্দকে ডাকিয়া তাঁহার কর্মপরিণত-বেদান্তসাধনার কেন্দ্রস্থাপনার জন্য যে আদর্শ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, উহাই সেখানে বাস্তবে রূপ লইয়াছে। কল্যাণানন্দের দূরদর্শিতা ও দক্ষতার ফলে কর্ম ও উপাসনার জন্য সত্যই একটি আদর্শ পরিবেশ কনখলে সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "যদিও কনখল সেবাশ্রমকে মিশনের শাখাকেন্দ্র বলা হয়, তথাপি এখানে মঠ ও মিশন উভয় বিভাগেরই কাজ চলে।" কর্মের সহিত জ্ঞান ভক্তি ও যোগের সমন্বয় সাধন করিয়া, স্বামিজী-প্রদর্শিত যুগধর্মকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। আর এই ভাবটিকে সেবাশ্রমের বাতাসে নিত্যপ্রবাহিত রাখিবার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের অনেককেই কনখল সেবাশ্রমে আহ্বান করিয়া আনিয়া, তাঁহাদের অধ্যাত্ম-প্রভাবের সুযোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কর্মীদেরও দিয়াছেন। মাঝে মাঝে স্বামিজীর বিশিষ্ট সন্তানদেরও আমন্ত্রণ করিয়া তিনি কনখলে আনিতেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, স্বামী শিবা-নন্দজী যখন উত্তরাখণ্ডের ঐসব অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কল্যাণা-নন্দের অনুনয়ে তিনি সেবাশ্রমের সেই অঙ্কুরাবস্থায় সেখানে কয়েকদিন গিয়া

১ তখন সাধুদের বাসভবনের একটি ছোট প্রকোষ্ঠ ঠাকুরঘররূপে ব্যবহৃত হইত।

বাস করিয়াছিলেন এবং কল্যাণানন্দের কার্যে খুব উৎসাহ ও সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইংরেজী ১৯০৩ সাল কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাসে অনেক কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। এই বৎসরেরই শেষার্ধে, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কাশীধাম হইতে কনখলে আগমন করিয়া সেবাশ্রমের একটি পর্ণকুটীরে প্রায় একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজজীর উপস্থিতিতে সেবাশ্রমের সাধুকর্মী-সেবক সকলেরই প্রাণে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল। মহারাজ প্রায়ই বলিতেন যে, বৃন্দাবন ও কনখল এই দুই স্থান তাঁহার বড় প্রিয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আর একবার কনখলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দজী, শিবানন্দজী, কেদারবাবা, রামলালদাদা এবং আরও কয়েকজন সাধু-ভক্ত। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী সদলে এই যাত্রায় প্রায় সাত মাস সেবাশ্রমে অবস্থান করিয়া, সেখানে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কনখল সেবাশ্রমের উহা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধিনায়ক এবং তৎসঙ্গী সাধু-মহাত্মা ও ভক্তদের উপস্থিতিতে হরিদ্বার-হৃষীকেশ অঞ্চলের সাধুসমাজে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। স্থানীয় বহু আশ্রমের মোহন্ত ও সাধুগণ তখন হইতে সেবাশ্রমের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। এই বৎসর ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনাইয়া, সেবাশ্রমে মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল সাধুদের সেবাশ্রমে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দজীরই আগ্রহে কল্যাণানন্দ সাধুদের জন্য সেবাশ্রমে বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারারও আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সাত মাস কল্যাণানন্দ ও তাঁহার সহযোগী নিশ্চয়ানন্দ অদ্ভুত নিষ্ঠা লইয়া উপস্থিত সাধু-সজ্জনদের সেবা করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সর্বদাই অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেবাশ্রমের যে বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাতে মুদ্রিত মহারাজজীর সারগর্ভ মুখবন্ধ সেবাশ্রমকে অশেষ গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। সেবাশ্রমকে তিনি আখ্যা দিয়াছিলেন: "...a great temple of the worship of the *Virat*, in the upraising of which, the helper, the worker and the helped will all

be blessed."—অর্থাৎ বিরাটের উপাসনা-মন্দির, যাহার উদ্বোধনে সেবক, কর্মী ও সেব্য সকলেই ধন্য হইবে।

স্বামী শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী পরে আরও কয়েকবার কনখলে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর এই কনখলের প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল—'কল্যাণ' ও 'নিশ্চয়' তাঁহার বড় স্নেহের জন ছিলেন। তুরীয়ানন্দজী যখনই সেবাশ্রমে থাকিতেন, কনখল সেবাশ্রম তখন যেন বেদান্তচর্চার পীঠভূমিতে পরিণত হইত। এই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া আশ্রমের সাধুদের ও স্থানীয় অধ্যাত্ম-পিপাসুদের প্রাণে অফুরন্ত শান্তির বন্যা ছুটিয়া চলিত তখন। তুরীয়ানন্দজী কখনও কখনও নির্জন গঙ্গাতটে একাকী অবস্থান করিয়া তপস্যাদি করিতেন। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, কল্যাণানন্দের সেবাপ্রবণ মনটি তুরীয়ানন্দজীর কাছে কাছেই ঘুরিয়া বেড়াইত। স্মরণযোগ্য যে, ১৯১০-এর মার্চে নাঙ্গোলে তপস্যার প্রচণ্ড কঠোরতায় তুরীয়ানন্দজীর শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তখন কল্যাণানন্দ নাজিমাবাদে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে কনখলে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর এইকালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি, স্বামী প্রেমানন্দজীও কাশীধাম হইতে অসুস্থ গুরুভ্রাতা হরি মহারাজকে দেখিবার জন্য কনখলে আগমন করিয়াছিলেন। দুইজন বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানকে একত্রে পাইয়া কল্যাণানন্দ প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়াছিলেন। উভয় মহাপুরুষের দিব্য-সংস্পর্শে কত নূতন নূতন আলোকের সন্ধানও তিনি এইকালে লাভ করিয়াছিলেন। গুরু বিবেকানন্দের এই দুই প্রিয় সহচরকে একই সঙ্গে নিভৃতে পাইয়া কল্যাণানন্দ যেন শ্রীগুরুরই সাক্ষাৎ সঙ্গ অনুভব করিতেন।

একদিন তুরীয়ানন্দজী স্বামিজীর প্রসঙ্গে খুব উত্তেজনার সহিত বলিতে-ছিলেন, "তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদান কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বালতি চায়।" বাবুরাম মহারাজ এই কথা শুনিয়া আবেগ-জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরা দু'জন মহাপুরুষ দেখেছি—আমাদের ঠাকুর ও স্বামিজী। তাঁদের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা হয় না।" কল্যাণানন্দ এই কথোপকথন শুনিতে শুনিতে

সেদিন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কত ঘটনা, কত স্মৃতিই কল্যাণানন্দের সারা জীবনের প্রেরণা হইয়া বুকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত ছিল। তুরীয়ানন্দজীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যের ফলস্বরূপ, কল্যাণানন্দের সমগ্র জীবন-সাধনায় সন্ন্যাসের ভাস্বর একটি চিত্র সর্বক্ষণের জন্য জলজল করিত। প্রচণ্ড কর্মমুখরতার মধ্যেও তাই প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত: "দেখ, আমার আর কী আছে? ঐ কমণ্ডলু, দণ্ড, আর ভিক্ষার সাপি!" সন্ন্যাসী কল্যাণানন্দের নিকট তুরীয়ানন্দজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে দৃপ্ত সিংহের ন্যায় তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন—কত কথাই তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন।

মহাপুরুষ শিবানন্দজী ১৯২৩ সালের ফেব্রুআরিতে পুনরায় যখন কনখলে আগমন করেন, তখন তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ। এই বৎসর তিনি কয়েকজন প্রার্থীকে এই সেবাশ্রমেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দের আকাঙ্ক্ষায় মহাপুরুষজী এবারও কনখল ও তন্নিকটবর্তী তীর্থস্থানসমূহ পুনঃদর্শনাদি করেন। তাঁহার মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের উপস্থিতিতেই সেবাশ্রমের দৈনন্দিন কর্মধারায় এক নবীন উদ্যম দেখা দিয়াছিল। 'কথামৃত'-কার মাষ্টার মহাশয়ও কিছুকাল কনখলে থাকিয়া সাধন-ভজন তপস্যাদি করিয়াছিলেন। মনে হয় উহা ১৯১২ বা '১৩ সালের কথা।

কল্যাণানন্দের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে এই সেবাশ্রমের কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। স্বামী বিরজানন্দ যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রচারোপলক্ষে ১৯০১-০২ সালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পর্যটন করিতেছিলেন, তখন কনখলে আসিয়া গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের বিস্ময়কর সেবা-উদ্যোগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দও তখন সেখানে ছিলেন। তিন গুরুভ্রাতার মিলনের পটভূমিকায় তদানীন্তন সেবাশ্রমে যে আনন্দোচ্ছল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। বিরজানন্দ সেবাশ্রমের কার্যে কল্যাণানন্দকে খুব উৎসাহ দিয়া, উহার জন্য অর্থসংগ্রহের কিছু দায়িত্ব নিজেও লইয়াছিলেন। আর একবার, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তখন কনখলে রহিয়াছেন। বিরজানন্দ মায়াবতী হইতে নামিয়া, কিছুদিন কনখলে থাকিয়া তপস্যাদি করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ ইত্যাদিতে তিনি তখন প্রায় সারাদিনই ডুবিয়া থাকিতেন।

মাধুকরী ভিক্ষায় কোনমতে আহার সারিয়া লইয়া, ধ্যান-ধারণাদি ও তুরীয়ানন্দজীর পুণ্য-সঙ্গেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ কাল কাটিত। বিরজানন্দের কঠোরতা দেখিয়া কল্যাণানন্দ খুবই চেষ্টা করিতেন, তাঁহাকে কোনমতে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় কিনা। যাহা হউক, কল্যাণানন্দ বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া অবশেষে সেবাশ্রমের রন্ধনশালা হইতে একটু সব্জী ভিক্ষা লইতে বিরজানন্দকে সম্মত করাইয়াছিলেন। পরে আরও দুই-একবার তিনি কনখলে আগমন করিয়া, গুরুগতপ্রাণ প্রিয় গুরুভ্রাতাকে সাহচর্য প্রদান করিয়াছেন। গুরুভ্রাতাদের আহ্বান করিয়া সেবা করা ও তাঁহাদের তপস্যাদির আনুকূল্য বিধান করা কল্যাণানন্দের একটি অতি প্রিয় কার্য ছিল। এতদ্ব্যতীত সঙ্ঘের আরও বহু ভজনশীল সাধুদের সেবাভার গ্রহণ করিতে তিনি সদাই প্রসন্নচিত্তে আগাইয়া আসিতেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের আন্তরিক উদ্যমে, সেবাশ্রমের কার্য উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে হইতে নানা বিভাগে-উপবিভাগে পূর্ণাঙ্গ হইয়া অচিরেই একটি বৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র পীড়িত সাধু, তীর্থযাত্রী ও দরিদ্র ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। সমগ্র উত্তরপ্রদেশের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই কনখল সেবাশ্রম একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কল্যাণানন্দের কর্মপরিধি শুধুমাত্র পীড়িতের সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেবামূলক নানা উদ্যোগ তাঁহার প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হইত। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনবার হরিদ্বারে কুম্ভ-সমাবেশ হয়—১৯০৩, ১৯১৫ এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। কল্যাণানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত এই কুম্ভমেলায় সেবাকার্য পরিচালনা অদ্যাবধি কনখল সেবাশ্রমের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সেবাশ্রমের রোগীদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যতীত, সাধারণের জন্যও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কল্যাণানন্দের জনসেবার আর একটি দিক। ১৯০৫ সালেই এই গ্রন্থাগারের কার্য শুরু হইয়াছিল। কনখল পল্লীর দরিদ্র শ্রমজীবীদের ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৯১৩ সালে সেবাশ্রমের মধ্যেই একটি নৈশবিদ্যালয় তিনি স্থাপনা করিয়াছিলেন। পরে এই বিদ্যালয়টিকে আরও সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিয়া মেথরদের বস্তীতেই স্থানান্তরিত করেন। তখনকার দিনে সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান

ভাঙ্গী-মেথর বা অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিশেষ ভাবিতেন না। এদিক দিয়া চিন্তা করিলে কল্যাণানন্দের এই প্রয়াসকে, স্বামিজীর শিষ্যের উপযুক্ত কার্যই বলিতে হইবে। এই নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শিশু-বৃদ্ধ সর্বসমেত প্রায় ১৪০ জন পর্যন্তও দেখা গিয়াছে। তদানীন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সত্যই বিস্ময়জনক। স্মরণ রাখা উচিত যে, গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের বহু পূর্বের কথা এইসব। অবহেলিত উপেক্ষিত মুচি, মেথর, ডোম ও পতিত চণ্ডালদের জন্য কল্যাণানন্দের ও নিশ্চয়ানন্দের হৃদয় সর্বদাই ব্যথিত হইত। স্বামিজীরই অনন্ত প্রেম-সত্তা যেন তাঁহার দুই শিষ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। সেবাশ্রমের নিকটবর্তী বাসিন্দা মুচি-ডোম প্রভৃতির জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কূপ খনন করাইয়া দেওয়া, তাহাদের সময়ে-অসময়ে অর্থ-সাহায্য করা, গৃহনির্মান করাইয়া দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ সেবায় দুই গুরুভ্রাতার উদ্যমের বিরাম ছিল না।

কল্যাণানন্দের সেবাময় জীবনটি ছিল যেন অনির্বাণ একটি দীপশিখার ন্যায়। সেবাশ্রমের সেই সূচনাকালের কপর্দকহীন অবস্থাতেও উহা যেমন দীপ্তিমান ছিল, আবার উত্তরকালের সহজ-সচ্ছল পরিবেশেও তাহা তেমনই প্রখর তেজোময় হইয়াছিল। জীবনের সর্বপ্রকার আবেষ্টনীর মধ্যে সন্ন্যাসি-সুলভ কঠোর নীতিপরায়ণতা ও আদর্শবোধ তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, আর ইহাই তাঁহাকে এত মহৎ করিয়া রাখিয়াছে। সেবাশ্রমের কোন কোন কর্মী একবার অন্যান্য হাসপাতালের অনুকরণে, কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দ তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দেখ, আমাদের তো আর হাসপাতাল নয়। স্বামিজী পাঠিয়েছেন সেবা করবার জন্য। এটা হচ্ছে সেবাশ্রম। এখানে বাপু ওসব ঘড়ি ধরে কাজ করা চলবে না। আমাদের হল সেবাভাব।" সেবাশ্রমটিকে তিনি জ্ঞান করিতেন সাধন-ক্ষেত্র—ভগবদুপাসনার স্থান। কাজেই উহার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার দিকে খুব নজর থাকিত তাঁহার। ফুলবাগান করিয়া সেবাশ্রমকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে তাঁহার কতই-না যত্ন ছিল। অতিরিক্ত ফুলগাছ হওয়াতে মশার উৎপাত বৃদ্ধি হইয়াছে, কেহ এরূপ মন্তব্য করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "সেকি? মশার কালে একটু তো মশা হবেই। তা' বলে স্বামিজীর আশ্রমে ফুল হবে না?"

স্বামিজীকে ঘিরিয়াই ছিল তাঁহার সকল সাধনা, সেবা, কর্ম, উপাসনা, সব কিছু। অসংখ্য কর্মের মাঝেও, কর্মযোগী কল্যাণানন্দ নৈষ্কর্ম্যের সৌম্য প্রতিমূর্তি ছিলেন। ধ্যান-জপ ও সেবা-সাধনার সকল স্রোতগুলিকে তিনি একটি মাত্র ধারায় প্রবাহিত করাইতেন—আর সে-ধারার গন্তব্য ছিল তাঁহার জীবনাদর্শের প্রতীক-বিগ্রহ স্বামিজী। স্বামিজীর কথা কখনও প্রকাশ্যভাবে বলিতে গেলে, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, স্বামিজীর কথা কী আর বলব? তাঁর কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না। আমি কখনও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। এমন **dazzling** (জ্যোতির্ময়) চোখ ছিল তাঁর—যেন জ্যোতিঃ ঠিকরে বেরুচ্ছে। কখনও যদি বা চোখে চোখে এক হয়ে গেছে, অমনি মাথা আপনি নীচু হয়ে যেত, মাটির দিকে চোখ করতাম। তিনি যখন ধ্যান করতেন, তা এক দেখবার মতো। যেন ঠিক পাথরের statue। আমরাও ঠাকুরঘরে ধ্যান করতাম—আমরা তো ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতাম, পাছে আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দেও তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন হয়। আহা কী মূর্তি! যেমন তোমরা ছবিতে দেখ—এক হাতের ওপর আর এক হাত রেখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তিন-চার ঘণ্টা তিনি রোজ সকালে ঠাকুর ঘরে একাসনে বসতেন।"

সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রতাময় জীবনযাপন ছিল কল্যাণানন্দের স্বাভাবিক জীবনচর্যা। কেহ কোন ভাল কম্বল, জামা বা কাপড় ইত্যাদি তাঁহাকে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা কোন দরিদ্র রোগীর জন্য পাঠাইয়া দিতেন। একবার জনৈক নবাগত ব্রহ্মচারী কনখলের প্রচণ্ড শীতে একটু কাতর হইয়া পড়েন। নূতন আসিয়াই পায়ে দিবার জন্য একজোড়া মোজা চাহিলে কল্যাণানন্দ ব্রহ্মচারীকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, সন্ন্যাসী হতে এসেছ, তা এখনই তোমার মোজা দরকার?" দশ আনা দামের জুতাই তিনি বরাবর ব্যবহার করিতেন। দারুণ ঠাণ্ডাতেও তিনি তুলার জামা পরিতেন। আহার-বিহার ও বেশ-ভূষায় সাদাসিধা ও বাহুল্যবর্জিত ভাব তিনি পছন্দ করিতেন—অন্যকেও ঐরূপ উপদেশ দিতেন।

দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রতা করার ফলে, জীবনের শেষ পনের বৎসর তিনি প্রায় ভগ্নস্বাস্থ্যই ছিলেন। অবশেষে ক্লেশকর বহুমূত্র রোগের আক্রমণে ক্রমেই তিনি দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। বহু অনুরোধ-

উপরোধ করিয়াও কলিকাতায় বা কাশীতে গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদির কোন ব্যবস্থায় তিনি সম্মত হন নাই। গরমের সময়ে কয়েকবার বায়ু পরিবর্তনের জন্য মুসৌরী, আলমোড়া বা কাশ্মীরের কোথাও তিনি কিছুদিনের জন্য গিয়াছিলেন মাত্র। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মায়াবতীতে গিয়াও কিছুকাল বিশ্রাম লইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রাণপ্রতিম গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ সহচর নিশ্চয়ানন্দ কনখলেই মহাসমাধিপ্রাপ্ত হন। কল্যাণানন্দের দক্ষিণহস্ত যেন দেহচ্যুত হইল—প্রচণ্ড এই আঘাতে তাঁহার ভগ্নদেহ আরও ক্ষতবিক্ষত হইল।

১৯৩৭-এর জুন মাসে চিকিৎসকদের পরামর্শানুযায়ী তিনি মুসৌরীতে যান। ছোট একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানেই চিকিৎসা-পথ্যাদির বন্দোবস্ত সব করা হইল। কনখলের সাধুরা আশা করিতেছিলেন, তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া আবার তাঁহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন এবং আগামী কুম্ভমেলার সেবাকার্যের নেতৃত্ব লইবেন। কিছুদিন সেখানকার জলবায়ু ও চিকিৎসায় সামান্য একটু উন্নতি দেখা গেলেও, কোন স্থায়ী উন্নতি কিছুই হইতেছিল না।

মহাপ্রাণ কল্যাণানন্দের অগাধ হৃদয়বত্তার পরিচায়ক একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য। চিকিৎসকগণ এইকালে তাঁহাকে আমিষ-আহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন—উহা তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল তখন। চিকিৎসকদের ব্যবস্থানুযায়ী সেবক প্রতিদিনই আমিষ-পথ্য মাছের ঝোল প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে পরিবেশনাদি করিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কল্যাণানন্দ অপরের মুখে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সেবক নিজে আবাল্য কঠোর নিরামিষাশী। অকস্মাৎ এই কথায় তিনি খুবই গম্ভীর হইয়া গেলেন—যেন অজ্ঞাতসারে কোনও কিছু একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইদিন হইতেই চিকিৎসকদের জানাইয়া দিলেন যে, আমিষ-পথ্য তাঁহার সহ্য হইতেছে না—উহা আর তাঁহার খাওয়া চলিবেনা। সহসা এইভাবে তাঁহার পথ্য পরিবর্তনের হেতু, সেবক কিন্তু তখনও জানেন না। পরে অবশ্য বিষয়টি আর গোপন থাকে নাই। ভক্তিমান সেবকের মনে এই ঘটনায় দারুণ আঘাত লাগিল। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে, যুগপৎ কল্যাণানন্দের দেবসুলভ অসাধারণ চরিত্র-মহিমায় তিনি অভিভূতও হইয়া পড়েন। শেষ পর্যন্ত ভালবাসারই

জয় হইল! সেবক স্বগতভাবে বিচার করিলেন—"যিনি আমার সামান্য একটা লৌকিক সংস্কারকে মর্যাদা প্রদান করিতে, নিজের মহামূল্য জীবনকে পর্যন্ত বিপন্ন করিতেছেন,—আর আমি কোন্ ছাই একটা নিরামিষ সংস্কারমাত্রকে বজায় রাখিবার জন্য এ-হেন প্রেমিক মহাত্মার সেবায় ত্রুটি করিতেছি? আজ হইতে আমিই বা কেন না পারিব এই তুচ্ছ একটা সংস্কারের গাঁটকে জলাঞ্জলি দিতে?" সেবক জিদ্ ধরিয়া বসিলেন, "মহারাজ, আপনি এ-ভাবে শরীর ত্যাগ করবেন, তা' আমি সইতে পারব না। ডাক্তাররা যেমন বলেছেন, আপনার পথ্য আমি সেই মতোই তৈরী করব—আর আজ থেকে আমিও আপনার প্রসাদী মাছ খাব।" শ্রদ্ধার শক্তি অপরিসীম—প্রেম সর্বাবগাহী, ইহাই আরও একবার প্রমাণিত হইল। সমস্যার সমাধান সহজেই হইয়া গেল,—কল্যাণানন্দ সেবকের সশ্রদ্ধ সপ্রাণ সেবাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই।

২০শে অক্টোবর সকাল হইতেই কল্যাণানন্দ শরীর বেশ অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। সারাদিন তাই অনাহারে থাকিয়া শয্যাতেই পূর্ণ বিশ্রাম লইলেন। বিকাল তিনটায় একবার চেয়ারে উঠিয়া বসিয়াছিলেন মাত্র, একটু দুধও পান করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকায় পুনরায় শয্যা লইতে বাধ্য হন। কিছুপরে শরীরে অসহ্য জ্বালা দেখা গেল। চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, প্রস্থানোন্মুখ সন্ন্যাসী স্মিতহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার কি আর হবে? I am dying, I am dying (আমি মৃত্যুর দিকে পা বাড়াচ্ছি)।" সেবক ও চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে থাকিল। কল্যাণানন্দের মুখে মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' এই অস্ফুট উচ্চারণ ছাড়া আর সবই শান্ত নীরব হইয়া আসিতে থাকিল। রাত্রি সাড়ে দশটায় সহসা শয্যাত্যাগ করিয়া আরাম-চেয়ারে বসিয়া দুই ঢোক জলপান করিলেন। রাত্রি ১১-১০ মিনিটে (২০শে অক্টোবর, ১৯৩৭) অতিশয় স্পষ্টভাবে তিনবার 'মা'-নাম উচ্চারণ করিয়া স্বামী কল্যাণানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। পরের দিন লোকান্তরিত সন্ন্যাসীর পূতদেহ কনখলে লইয়া আসা হয় এবং যথোচিত মর্যাদা-সহকারে জাহ্নবীগর্ভে সমাহিত করা হয়।

স্বামী কল্যাণানন্দ মরলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহতী কীর্তি কনখল সেবাশ্রম আগামী বহু বহু কাল ধরিয়া সেবাব্রতী মানুষের কাছে তাঁহার

সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সেবা-সাধনার ইতিহাসে কল্যাণানন্দ চির অমর। স্বামিজীর সেবাদর্শের তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু যাঁহারা, তাঁহারা নিশ্চিতই স্বামিজীর এই প্রিয় শিষ্যের জীবন পর্যালোচনা করিবেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে[১] বলা হইয়াছে, "স্বামী কল্যাণানন্দের জীবনে গুরুভক্তি ও সেবা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ কর্মযোগী এবং আচার্য বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার মতো মহাপ্রাণ সাধকের তিরোধানে শুধু যে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, দেশেরও প্রভূত ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।" অশেষ ক্ষতির মধ্যেও আমাদের ইহাই সান্ত্বনা যে, কল্যাণানন্দের দেহের সাথে তাঁহার আদর্শেরও বিলয় হয় নাই—উহা অনন্তকালের জন্য মানুষকে সেবাধর্মে উদ্বোধিত করিবে।

---

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪-এর 'উদ্বোধন' দ্রষ্টব্য।



স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

"স্বামিজী-প্রচারিত নরনারায়ণের সেবা দ্বারা তিনি সেই পদ লাভ করিয়াছেন, যে পদ জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, ভক্তেরা ভজনা দ্বারা এবং যোগীরা ধ্যান দ্বারা লাভ করেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে মহনীয় সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া একদা 'উদ্বোধন' এই মন্তব্য[১] করিয়াছিলেন, তিনি স্বামিজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দৃঢ়নিশ্চয়তার গুণে তিনি স্বীয় গুরুদত্ত নামের সার্থকতা জীবনে যথার্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগুরুর নির্দেশে সেবাধর্মের সাধনায় পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া, নিশ্চয়ানন্দপ্রমুখ স্বামিজীর শিষ্যগণ সনাতন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগোপযোগী এক নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, একথা বলিলে কিছু অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীনপন্থী সাধুদের মধ্যে মানবসেবার উচ্চ সাধনাদর্শটি বাস্তবিকপক্ষে তেমন আদরণীয় ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহৎ বার্তা, তত্ত্বান্বেষী মানবকে এক নূতন আলোকের সন্ধান আনিয়া দিয়াছে। নিশ্চয়ানন্দ ও তদীয় প্রিয় গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দের অক্লান্ত সেবা-সাধনা, এই অভিনব বার্তাকে উত্তরাখণ্ডের সনাতনপন্থীদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের পূর্বাশ্রম ছিল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় জানাঞ্জিরার নিকটবর্তী একটি ছোট গ্রামে। তাঁহার পূর্বনাম সুরজ রাও। আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে, দরিদ্র এক ছত্রী (ক্ষত্রিয়) পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। সাংসারিক অসচ্ছলতার দরুন ইংরেজী লেখাপড়ার সুযোগ বেশীদিন তিনি পান নাই। তবে মারাঠী ভাষা ভালই জানিতেন—দক্ষিণ-দেশীয় আরও দুই-একটি ভাষা তাঁহার জানা ছিল। পরবর্তী জীবনে বাংলা লিখিতে বা পড়িতে না পারিলেও, বলিতে ও বুঝিতে ভাল শিখিয়াছিলেন। পূর্বাশ্রমে তিনি রাওজী নামেই পরিচিত ছিলেন।

রাওজী বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে, ভারতীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যদিও আশৈশব তাঁহার মধ্যে সংসার-বিরাগ, হৃদয়বত্তা ও ব্যবহার-মাধুর্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত ছিল, তথাপি দারিদ্র্যের পীড়নে

১ 'উদ্বোধন', অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ দ্রষ্টব্য।

তাঁহাকে অনন্যোপায় হইয়া সৈনিকের জীবনই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। রাওজীর কর্ম ছিল সাউথ কর্ণাটিক পল্টনের অধীনে। তবে এই পল্টনের কার্যে, তাঁহার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পথ পাইয়াছিল প্রচুর। ছেলেবেলা হইতেই দেশভ্রমণ ও মন্দিরাদি পরিদর্শনের একটি ঝোঁক তাঁহার প্রবল ছিল। কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্ম হওয়ায়, তাঁহার সে সাধ পূরণের সুযোগ-সুবিধা খুব অল্পই ছিল। সৈনিকের কর্মোপলক্ষে পল্টনের সহিত নানা দেশে তাঁহাকে যাইতেই হইত। ফলে, ঐসব অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মন্দির বা তীর্থস্থানাদি দর্শনের সুযোগ কোন না কোনভাবে তিনি করিয়া লইতেনই। উত্তরজীবনে তিনি এইকালের নানা অভিজ্ঞতার কথা বেশ চমৎকার বলিতেন। একবার এইরূপ এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "রামায়ণে উল্লিখিত সরোবর দেখতে গেছলুম। দেখলুম দুটি হ্রদ পার্বত্য প্রদেশের মাঝে রয়েছে। একটির নাম 'পম্পা' ও অপরটির নাম 'ঋম্পা'। রামায়ণে উল্লিখিত সব ঘটনা স্মরণ হওয়ায় মনে নানা রকম ভাবস্রোত উঠল—মস্তিষ্ক আলোড়িত করে স্মৃতিপথে নানা তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগল। এমন আনন্দ জীবনে অল্পই পেয়েছি।" আবার দক্ষিণ দেশের বড় বড় মন্দির সম্বন্ধে বেশ বলিতেন, "এক একটি মন্দির, এক একটি কেল্লা বা নগরের মতো।" নানা রাজ্যের নানা আচার-আচরণ, রীতি নীতি এ-সবও তিনি লক্ষ্য করিতেন, এবং তাহাও নিখুঁত বর্ণনা করিতেন। রাওজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞানস্পৃহার পরিচয়, তাঁহার উক্ত বর্ণনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইত।

রাওজী এই সৈন্যবিভাগের কর্মব্যপদেশে ব্রহ্ম, শ্যাম, জিব্রালটার, মাল্টা প্রভৃতি দেশেও ব্যাপক ভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আন্দামানের আদিম জাতির লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া, তাহাদের শিক্ষা-সভ্যতাবিহীন জীবনযাপন-প্রণালীর বহু বিচিত্র সংবাদ তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সৈনিক হিসাবে রাওজীর দক্ষতা তাঁহাদের পল্টনে সুবিদিত ছিল। লক্ষ্যভেদ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা এতদূর ছিল যে, শোনা যায় তাঁহার বন্দুকের গুলি নাকি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। লক্ষ্যভেদের বিষয়ে সৈনিক বিভাগের পরীক্ষাদিতে তিনি বরাবরই উচ্চস্থান লাভ করিতেন। ব্রহ্মদেশে থাকিতেই তিনি একটি ছোট বাহিনীর নায়ক (Lance-Corporal)-এর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী পরিব্রাজক-জীবনের কোন সময়ে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর অঞ্চলে পর্যটন করিতেছিলেন। রাওজীও তখন সরকারী কার্যে রায়-পুরে ছিলেন। ঘটনাচক্রে সেখানে নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকারই রাওজীকে ভগবৎ-পথের সন্ধান প্রথম আনিয়া দিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ত্যাগী সন্তানের সংস্পর্শে সৈনিক সুরজ-রাওর চিত্তেও ত্যাগের অগ্নি-উত্তাপ না লাগিয়া পারে নাই। নিরঞ্জনানন্দজীর মুখেই তখন সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মনে ব্যাকুলতা দেখা দিলে, তিনি সুযোগের অপেক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর সাহচর্যই বস্তুতঃ রাওজীর জীবন-গতির লক্ষ্যকে পরিবর্তিত করিয়াছিল।

বিদেশে স্বামিজীর বেদান্ত-বার্তা তখন প্রত্যেক সংবাদপত্রেই নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছিল। রাওজী খুব আগ্রহসহকারে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, স্বামিজীর বাণী আহরণ করিতেন—আর যতই তিনি স্বামিজীর কথা জানিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকিলেন। এই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। এমন সময়ে সংবাদ প্রচারিত হইল যে স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং রামনাদ হইতে পরমকুড়ি, মনমদুরা ও কুম্ভকোণম্ হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে রাওজী তখন মান্দ্রাজ শহরেরই অনতিদূরে একটি গ্রামে ছিলেন।

১৮৯৭-এর ফেব্রুআরি তখন। কুম্ভকোণম্ হইতে একখানি বিশেষ ট্রেনে স্বামিজী মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছেন। পথে প্রায় সকল স্টেশনেই অপেক্ষমান জন-মণ্ডলী তাঁহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ স্টেশনের জনসমষ্টি খুবই বিস্ময়কর হইয়াছিল—ষ্টেশন প্লাটফর্মের উপরই একটি অভ্যর্থনাসভায় স্বামিজী সমবেত জনতার সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শী এক উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি বিশেষ কিছু বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে-কেহ ইহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রভু যাহা আমাকে করিতে পাঠাইয়াছিলেন আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া আসিয়াছি। আমার ক্ষুদ্রশক্তি যে আপনাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই

আমি ধন্য।” “জয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজী কি জয়”—শত কণ্ঠের জয়-ধ্বনির মধ্যে স্বামিজীর ট্রেন মান্দ্রাজের দিকে রওনা হইল আবার। অতঃপর মান্দ্রাজের মধ্যবর্তী আর কোন ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইবেনা ইহাই স্থির ছিল।

স্বামিজী এত নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহাদের ভাগ্যে দর্শন মিলিবেনা, এই চিন্তা রাওজীকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এদিকে শত শত গ্রামবাসী রেললাইনের ধারে এবং অখ্যাত ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির প্লাটফর্মের উপর আসিয়া ভিড় জমাইতেছিল, একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য। রাওজীও ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। সৈনিক সুরজরাও অধৈর্য হইয়া দর্শনার্থী জনতার একটি বিরাট বাহিনী সংগঠন করিয়া স্থির করিলেন, যে-কোন প্রকারেই হউক স্বামিজীর চলন্ত ট্রেনকে থামাইতেই হইবে। তাঁহারা ষ্টেশনমাষ্টারকে অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য গাড়ীকে দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিতে থাকিলেন। কিন্তু গাড়ী থামাইবার ক্ষমতা ষ্টেশনমাষ্টারের ছিল না। অবশেষে রাওজী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবনপণ করিয়া, অর্থাৎ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িয়া তাঁহারা স্বামিজীর গাড়ীকে থামাইবেনই। স্বামিজীর ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিবার পূর্বে সত্যই দেখা গেল উন্মত্ত জনসমুদ্র রেল লাইনের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং অসংখ্য মানুষ লাইনের উপর শায়িত হইয়া আছে। অগত্যা ট্রেন থামিতেই বাধ্য হইল। গার্ডসাহেবের ব্যাপারটি বুঝিতে বিলম্ব হইল না। উৎফুল্ল জনতা স্বামিজীকে দর্শনের জন্য তাঁহার কামরার দিকে তখন ছুটিতে থাকিলেন। স্বামিজীও তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া মিনিট কয়েকের জন্য কামরার দরজায় দাঁড়াইয়া করজোড়ে জনসঙ্ঘের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং বিদায়কালে হাত উঠাইয়া সকলের প্রতি তাঁহার আশিস্ বর্ষণ করেন। স্বামিজীর প্রথম দর্শন রাওজীর ভাগ্যে এইভাবেই হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষণিকের এ-দর্শন তাঁহার দর্শন-তৃষ্ণাকে আরও বিক্ষুব্ধই করিয়াছিল।

সুরজ রাও সৈনিক—দমিবার বা পশ্চাতে হটিবার লোক নহেন। ফিরিয়া না গিয়া, মান্দ্রাজের দিকেই যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ লইয়া বাহির হন নাই, তাই পদব্রজেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলিয়াছেন—এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন, তাই দ্রুত

হাঁটিতেছেন। সমুদ্রতীরে সারি সারি জেলেদের ঘর—সহসা রাওজী দেখিলেন অসংখ্য দীপমালায় অন্ধকার সমুদ্রতটে যেন আলোকের উৎসব শুরু হইয়াছে। গৃহে গৃহে প্রদীপশ্রেণী সাজানো হইয়াছে, জেলেদের শিশুরাও আনন্দে মাতিয়াছে। উৎসব-মত্ত একদল বালককে রাওজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এখানে কিসের উৎসব?" বালকরা জবাব দিলে, "জান্‌তা নহী, জগদ্‌গুরু আ গিয়া?" আহা, মাদ্রাজের অশিক্ষিত ধীবররা পর্যন্ত জগদ্‌গুরুর আগমনে আনন্দোৎসব করিতেছে! রাওজীর বুঝিতে আর বাকী থাকিল না—কে এই জগদ্‌গুরু? বিশ্বপূজ্য এই জগদ্‌গুরুই যথার্থ জনগণ-মন-অধিনায়ক, ইহাও সম্যক অনুভব করিলেন।

রাওজী অবশেষে মাদ্রাজে আসিয়া পৌছিলেন বটে, কিন্তু তখন গভীর রাত্রি। মাদ্রাজের রাস্তাঘাট তাঁহার পরিচিত ছিল না, তাহাতে আবার এত পথশ্রান্ত ছিলেন যে ঐ রাত্রিতে বেশী চলা আর সম্ভব হইল না। জনৈক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বামিজীর বাসস্থানের ঠিকানা জানিতে পারিলেন—আরও জানিলেন যে, তিনি ভুলক্রমে শহর হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। নিরুপায় হইয়া একটি পুষ্করিণীর ধারে, একখানা গামছা বিছাইয়া বসিয়া বসিয়া পরম নিশ্চিন্তে বাকী রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় ও পথশ্রমে অবসন্ন হইলেও, রাওজী বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম হন নাই। রাত্রি প্রভাত হইলেই, পুনরায় তাঁহার পথ চলা শুরু হইল। স্বামিজী তখন বিলগিরি আয়েঙ্গারের 'ক্যাস্‌ল্ কার্নান' (Castle Kernan) ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা সাতটা নাগাদ রাওজী আসিয়া 'ক্যাস্‌ল্ কার্নান'-এর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন বহু দর্শনার্থী অপেক্ষারত ছিলেন—রাওজীও তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষার পর আন্দাজ বেলা বারোটার সময়, তিনি স্বামিজীর চরণসমীপে যাইবার সুযোগ পাইলেন। রাওজীর চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সত্যই কি তিনি জগদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন আজ! আনন্দে আবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, চুপ করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিলেন। একে একে সকলেই প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিলেন, সুরজ রাও কিন্তু এক ঠাঁই বসিয়াই থাকিলেন। স্বামিজীর স্নেহদৃষ্টি এইবার ভাবী শিষ্যের দিকে পড়িল—

'কি নাম', 'কোথা হইতে আসিয়াছ', 'কি চাও', 'স্নানাহার হইয়াছে কিনা' ইত্যাদি টুকিটাকি জিজ্ঞাসাবাদের পর, স্বামিজী তাঁহাকে আপাততঃ আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। রাওজীও স্বামিজীর আদেশ পালন করিয়া, বিশ্রামাদি করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। পরে আবার স্বামিজীর কাছে গিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। স্বামিজী কৃপা করিয়া যদি তাঁহাকে চরণাশ্রয় দান করেন, তবে কৃতকৃতার্থ হইবেন তিনি। কিন্তু স্বামিজী রাওজীকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "না, এখন নয়। পরে তুমি আমার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করো।" রাওজীর সে-যাত্রা আর সংসার-ত্যাগ হইল না। যাহা হউক, মান্দ্রাজে দিনকতক থাকিয়া, স্বামিজীর বক্তৃতাদি শুনিবার সুযোগ তিনি ছাড়েন নাই।

রাওজীকে স্বামিজী কলিকাতায় দেখা করিতে বলিয়াছেন সে 'দেখা' কবে হইবে ইহারই প্রতীক্ষায় তিনি দিন গণিতে লাগিলেন। দিন, মাস, বৎসর গড়াইয়া চলিল,—তবে মনে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন যে, স্বামিজীর পদপ্রান্তে তাঁহার আশ্রয় মিলিবেই—সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ তিনি করিবেনই। সৈন্যবিভাগের কর্মই এখন তাঁহার পথের প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল। সুস্থদেহে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করা সামরিক আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। রাওজী যে-কোন দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি উহার বিনিময়ে তাঁহার কর্মবন্ধন ঘুচিয়া যাইবার উপায় হইত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে—দণ্ডও লইতে হইবে, কর্মত্যাগও চলিবে না। ইহা এক নূতন সমস্যা—সংসার-বিরাগী সৈনিককে এখন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। এদিকে তাঁহার ক্রমবর্ধমান অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য দেখিয়া পদস্থ সামরিক কর্মচারীরা তাঁহার মস্তিষ্কে নিশ্চিতই কোন বিকার হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই মস্তিষ্কবিকারের চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া দিলেন। বিধির বিধানে, ইহাই হইল রাওজীর পক্ষে পরম আশীর্বাদস্বরূপ। সৈন্যবিভাগের চিকিৎসকমণ্ডলী অপূর্ব এই উন্মাদকে লইয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। ব্যবস্থা হইল, প্রতিদিন সুরজ রাওর মাথায় আধমন হইতে একমন বরফ চাপাইয়া রাখা হউক, তবেই তাঁহার মাথার গোলমাল সারিবে। অদ্ভুত রোগের অদ্ভুত চিকিৎসাই বটে! চিকিৎসার জটিলতা যতই বাড়িতে লাগিল, রাওজীর 'বাতুলতা'ও ততই বৃদ্ধি পাইতে

থাকিল। হায়, চিকিৎসকরা তো জানিতেন না যে, এ বাতুল 'চৈতন্যের বাতুল'! মস্তিষ্ক-পীড়ার বাতুলকে চিকিৎসায় সারানো সম্ভব, কিন্তু চেতন বাতুলের চিকিৎসা নাই। জাগিয়া যে ঘুমায় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে কে? অবশেষে ব্যাধি দুরারোগ্য বুঝিয়া তাঁহারা 'উন্মাদ' সুরজ রাওকে বরখাস্ত করিলেন। কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, রাওজীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এখন তাঁহার লক্ষ্য হইল কলিকাতা। জীর্ণ-একখানি কম্বলমাত্র কাঁধে ফেলিয়া, দীন অকিঞ্চন বেশে স্বামিজীর চরণ-দর্শনের উদ্দেশ্যে রাওজী কলিকাতার পথে যাত্রা করিলেন।

তখন ইংরেজী ১৯০১। স্বামিজীর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না—তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। একদিন মধ্যাহ্নে তিনি আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে সেবক গিয়া সংবাদ দিলেন যে, একটি মারাঠী যুবক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। যুবক আর কেহই নহেন,—সুরজ রাও। স্বামিজী বলিয়া পাঠাইলেন, "আচ্ছা, এখন তাকে স্নানাহার সেরে নিতে বল। আমি পরে দেখা করব।" স্বামিজীর সেবক নীচে আসিয়া এই কথা জানাইলে, রাওজী বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি স্নান-আহারের প্রত্যাশী নই। আমি বহুদূর থেকে এসেছি। স্বামিজীকে দর্শন করতেই এসেছি। তাঁকে প্রণাম না করে স্নান-আহার আমি করব না। আমি এখানেই বসে থাকব।" যুবকের এই দৃঢ় উক্তি স্বামিজীর কানে গেলে, তিনি অগত্যা নীচে নামিয়া আসিলেন। স্বামিজী আসিতেই, যুবক তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। রাওজীর মনস্কাম এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। স্বামিজীর দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া করজোড়ে তাঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন। স্বামিজীও আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও?" সুস্পষ্ট জবাব হইল, "কিছুই চাই না। শুধু আপনার দাস হতে চাই।" যুবকের সরল উক্তিতে স্বামিজী প্রীত হইয়া তাঁহাকে মঠবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর কিছুদিন পরে রাওজীর জীবনের বহুবাঞ্ছিত শুভদিনটি সমাগত হইল—স্বামিজী তাঁহাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিলেন। সৈনিক সুরজ রাওর নবজন্মলাভ হইল—গুরুদত্ত নাম হইল স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। শিষ্যের দৃঢ় নিশ্চয় স্মরণ করিয়াই স্বামিজী তাঁহার ঐরূপ নামকরণ করিয়া-

ছিলেন। নিশ্চয়ানন্দের পরবর্তী জীবনও নিঃসন্দেহে তাঁহার নামের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে।

মঠে বাস করিবার মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ানন্দ প্রাণ ভরিয়া গুরুসেবা ও সাধন-ভজন করিতে থাকিলেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবার নানাবিধ কার্যেও তাঁহার নিষ্ঠা ছিল প্রবল। শ্রীগুরুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ তাঁহার ভাবী অধ্যাত্ম জীবনের বনিয়াদকে দিন দিনই শক্ত-সুঠাম করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। নিশ্চয়ানন্দের গুরুভক্তি অননুকরণীয়। স্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবাধিকার লাভ করিয়া নিশ্চয়ানন্দ নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অপূর্ব গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য :

মঠে তখন একটি গাভী কেনা হইবে স্থির হইয়াছে। গাভীটি আসিবে দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহ নিবাসী কোন গোয়ালার নিকট হইতে। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের উপর গাভীটি আনিবার ভার পড়িল—সঙ্গে যাইবেন স্বামিজীরই শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও অন্য আর একজন সাধু। তখন তো আর বালীতে বিবেকানন্দ-সেতু তৈয়ারী হয় নাই, নৌকাতেই গঙ্গা পারাপার করিতে হইত। স্বামিজী নিশ্চয়ানন্দকে বার বার বলিয়া দিলেন, "গরুর দড়িটা কিন্তু হাতে ধরে থাকবি। তাহলে পালাতে পারবে না।" যাহা হউক নিশ্চয়ানন্দ সঙ্গীদের লইয়া নির্দিষ্ট দিনে আড়িয়াদহে গেলেন—গরুও কিনিলেন। বর্ষাকাল তখন, গঙ্গায় স্রোতের টান প্রচণ্ড। গঙ্গা পার হইবার জন্য গাভীটিকে লইয়া তাঁহারা নৌকায় চড়িয়াছেন, এমন সময়ে জল-স্রোত দেখিয়া ভয় পাইয়া সহসা গাভীটি গঙ্গায় লাফাইয়া পড়ে। গরুর দড়ি তো নিশ্চয়ানন্দের হাতে, তিনিও অগত্যা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। গঙ্গায় তখন ভীষণ ভাটার টান। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন মাত্র, কাহারও কিছু করিবার ছিল না। ঐ ভীষণ স্রোতের টানে গরুসহ নিশ্চয়ানন্দ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নিশ্চয়ানন্দের কর্ণে বোধ হয় তখনও স্বামিজীর কথাই ধ্বনিত হইতেছিল। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে ছুটিতে ছুটিতেও, তাঁহার গুরুবাক্যে নিশ্চয়-বিশ্বাস তখনও অটুট। ভাসিতে ভাসিতেও এক হাতে গরুর দড়ি দৃঢ়মুষ্টিতে আকর্ষণ করিয়া, অন্য হাতে গরুটির চোখে-মুখে জল ছিটাইয়া তাহাকে তীরের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সালখিয়ার কাছে আসিয়া গঙ্গার পশ্চিমতটে উঠিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, তথাপি দারুণ কাদা ভাঙ্গিয়া গরুটিকে কূলে উঠাইতে তাঁহার যেন প্রাণ নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, তীরস্থ কাঠ-বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে ও আরও কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে শেষ পর্যন্ত গরুটিকে তিনি ডাঙ্গায় উঠাইয়াছিলেন। হাতের দড়ি কিন্তু তাঁহার হাতেই ছিল—কোন অবস্থাতেই উহা তিনি ছাড়েন নাই, কারণ স্বামিজীর আদেশ ছিল, "গরুর দড়িটা কিন্তু হাতে ধরে থাকবি।" গাভী লইয়া যখন মঠে পৌছিলেন, তখন মঠের সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। নির্ভয়ানন্দ ও তাঁহার সঙ্গী সাধুর মুখে ইতঃপূর্বেই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া, মঠের সকলেই দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলেন—উদ্বেগে আতঙ্কে তাঁহারা পথের দিকে তাকাইয়াছিলেন। স্বামিজীও খুব ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দকে পাইয়া স্বামিজী পরম আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু আবার সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই মূর্খের মতো গরুর জন্য জীবনটা দিতে যাচ্ছিলি কেন?" শিষ্য যুক্তকরে উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে গরু আনতে পাঠিয়েছিলেন, কেমন করে আমি গরু ছেড়ে চলে আসি?" স্বামিজীও তাহাতে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠিক ঠিক! আমি গরু আনতে বলেছি, কেন তুমি তাকে ছেড়ে আসবে! তোমার পক্ষে তা তো সম্ভবই নয়।" নিশ্চয়ানন্দের আন্তরিকতায় ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, স্বামিজী সেদিন কতই না আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ধন্য নিশ্চয়ানন্দ! ধন্য তাঁহার গুরুভক্তি!! নিজের জীবন অপেক্ষাও গুরুর আদেশ পালন করা ছিল তাঁহার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।

একান্ত-সাহচর্যের সুযোগে স্বামিজীর নিকট হইতে নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বহু পথনির্দেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার পরবর্তী জীবনে ঐসকল নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। একদা সন্ধ্যায় স্বামিজী তাঁহার ঘরে একা বসিয়া ছিলেন,—নিশ্চয়ানন্দকে কাছে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কোনও ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করলেই প্রতিদান দিতে হয়। সাধুসমাজ অন্যের অন্ন খেয়ে খেয়ে জড় হয়ে গেছে। অপরের উপর নির্ভর করতে করতে, তাদের উন্নতি না হয়ে, ঘোর অবনতি হয়েছে। তুমি কখনও যেন এমন

কর না। যদি কাজ কিছু করতে না-ও পার—ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে, তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে অপরের অন্ন খাওয়া অতি দূষণীয়।” স্বামিজীর এই শিক্ষাকে নিশ্চয়ানন্দ কতখানি গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরজীবন পর্যালোচনা করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। বলিতে গেলে, তাঁহার সমগ্র জীবনটিই ছিল স্বামিজীর উক্ত আদর্শের একটি জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ।

জাপানী মনীষী ওকাকুরা স্বামিজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ানন্দ মঠেই ছিলেন। ওকাকুরা কিছুদিন বেলুড় মঠে বাস করিয়াছিলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তাঁহার জাপান পরিদর্শন হয় নাই। এইকালের অনেক স্মৃতিকথা নিশ্চয়ানন্দের মুখে পরে শোনা যাইত। প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনা তিনি বলিতেন: একবার কয়েকজন জাপানী প্রতিনিধি মঠে আসিয়া স্বামিজীর নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা বড়ই আগ্রহশীল এবং তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার জাপান সরকার সানন্দে বহন করিবেন। শুধু স্বামিজীর ব্যক্তিগত খরচই নহে; তাঁহার অভিপ্রায় মতো ভারতের যে-কোন কার্যের জন্য জাপান সরকার অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত, যদি তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে সকল কার্য করেন। স্বামিজী জাপানীদের এই প্রস্তাবে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সরাসরি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, “আমি যাব না।” তাঁহার এই অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, নিশ্চয়ানন্দকে সেদিন স্বামিজী বলিয়াছিলেন, “দেখ নিশ্চয়, বিবেকানন্দ কি বাজারের জিনিস যে টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায়?” ঘটনাটি ওকাকুরার ভারত-আগমনের পূর্বের অথবা পরের, কিছু সঠিক জানা যায় না।

নিশ্চয়ানন্দের মারাঠী শরীর ছিল—তাই শিবাজী-চরিত্রের প্রতি তাঁহার একটি সহজাত টান ছিল। শিবাজীর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তাঁহার শৌর্য, বীর্য, দেশাত্মবোধ, ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক দৃঢ়তার প্রশংসায় নিশ্চয়ানন্দ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। লোকমান্য তিলককেও তিনি বেশ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তিলক যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন মঠে আসিয়া তিনি স্বামিজীকে

দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ তখন মঠেই ছিলেন। তিলকের প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "তিলক আগে শুধু মারাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানা প্রচেষ্টা করছিলেন। স্বামিজী বুঝিয়ে দিলেন যে একটা জাতকে তুলতে হলে, জাতের মাত্র এক অংশকে তুললে হবে না। গরীব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও না তুললে জাত উঠবে না। স্বামিজীর সংস্পর্শে এসেই তো তিলকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও নানা কাজ করতে শুরু করেন।"

স্বামিজী মহারাজের লীলাবসানের পর হইতে, নিশ্চয়ানন্দেরও জীবন-নাট্যের পট-পরিবর্তন হয়। শ্রীগুরুর অদর্শনে সমগ্র বিশ্বসংসারই যেন তাঁহার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিতেছিল। ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর মহাসমাধি-দিবস,—উহার কয়েকদিন পরেই এক বৈকালে স্বামী সারদানন্দজী ভারাক্রান্ত চিত্তে মঠ-বাড়ীর একতলায় দক্ষিণদিকের রোয়াকের উপর (মাঠের দিকে) বসিয়া আছেন, সহসা নিশ্চয়ানন্দও সেখানে আসিয়া নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলেন। একটু পরেই সহসা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সারদানন্দজীর কাছে নিবেদন করিলেন, "আমি যাঁর সম্পর্কে এখানে এসেছিলাম, তিনিই যখন চলে গেছেন—তখন আর এখানে থাকতে চাই না। এখান থেকে চলে যাওয়াই আমি স্থির করেছি।" শোকতপ্ত নিশ্চয়ানন্দকে সারদানন্দ মহারাজ নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—অনেক প্রবোধ দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দিকে যেতে ইচ্ছা কর?" নিশ্চয়ানন্দ বলিলেন, "যে দিকে দুচোখ নিয়ে যায়।" সারদানন্দজী তবুও অনেক অনুরোধ করিলেন, অবশেষে বলিলেন, "অন্ততঃ আর একটি মাস মঠে থেকে যাও—নতুবা নানা লোকে নানা রকম ভাববে।" যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত আর একমাস মাত্রই মঠে থাকিতে তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। এবং যেদিন ঠিক ত্রিশটি দিন পূর্ণ হইয়াছিল, সেই দিনই পরিব্রাজক বেশে তিনি মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ আর মঠে আসেন নাই—বাংলা দেশ হইতেও ইহাই তাঁহার শেষ বিদায়।

পরিব্রাজক নিশ্চয়ানন্দ অতঃপর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—অনুকূল পরিবেশ পাইলেই সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ধ্যান-তপস্যাদি করিতেন। শরীরধারণের জন্য এখন হইতে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইল মাধুকরী। এইভাবে 'রমতা সাধু'র ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে

১৯০৩-এর কুম্ভমেলায় তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানেও তিনি মাধুকরী মাত্র অবলম্বন করিয়া সাধুদর্শন, সাধুসেবা ও ভজন-সাধন লইয়া আনন্দে কাটাইতে থাকিলেন। তাঁহার অতি মলিন ও জীর্ণ বেশ-বাস দেখিয়া তাঁহাকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও ছিল না—অসংখ্য সন্ন্যাসি-ফকিরের মধ্যে একজন সাধারণ ভিক্ষাজীবী বৈরাগী বলিয়াই তাঁহাকে অনেকে মনে করিতেন। একদিন জনৈক যুবক সাধুর সহিত তাঁহার নানা সৎপ্রসঙ্গ হইতে হইতে স্বামিজীর কোন কথা উত্থাপিত হয়। অপরিচিত ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর কথাবার্তায় নিশ্চয়ানন্দের বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, তিনি অবশ্যই স্বামিজীর কৃপাপ্রাপ্ত। সুদূর এই তীর্থক্ষেত্রে এতদিনে একজন মনের মানুষ পাইয়া নিশ্চয়ানন্দ খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভাবের লোক মিলিয়া যাওয়ায় নিঃসঙ্গ নিশ্চয়ানন্দ প্রাণ খুলিয়া স্বামিজীর প্রসঙ্গাদি করিতে থাকিলেন। যুবক সাধুটির প্রতি তিনি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন—উত্তরোত্তর তাঁহাকে বড় আপনজন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় একটি সঙ্গীতের কয়েকটি কলি তখন নিশ্চয়ানন্দের স্মরণে আসিতেছিল কিনা কে জানে?

"মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা;
সে দু এক জনা।.........
মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,
ও সে কয় না কথা; ভাবের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।
(মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।)"

'উজান পথে' দেখা-হওয়া নিশ্চয়ানন্দের এই 'ভাবের মানুষ'টির নাম স্বামী কল্যাণানন্দ—স্বামিজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য।

কল্যাণানন্দ তদীয় আচার্যের নির্দেশানুসারে, ১৯০১-এর জুন মাস হইতে হরিদ্বারের অদূরে কনখলে একটি সেবাশ্রম স্থাপনা করিয়া পীড়িত ও বৃদ্ধ সাধুদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ানন্দের হৃদয়েও সেইকালে অহর্নিশ শ্রীগুরুর সেই বাণী অনুরণিত হইতেছিল: "যদি বড় কাজ কিছু না-ও করতে পার—ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে।" কল্যাণানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় গুরুদত্ত

ঐ মন্ত্রের সাধনার উপযোগী একটি প্রকৃষ্ট পথ যেন এতদিনে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন। এই পথের সন্ধানেই তিনি এতদিন ঘুরিতেছিলেন। এইবার ঘোরাঘুরির অবসান হইল—নিশ্চয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে আসিয়া কল্যাণানন্দের কার্যে সহযোগী হইলেন। তখন (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল এই সেবাশ্রমই হইল নিশ্চয়ানন্দের সাধনক্ষেত্র।

নিশ্চয়ানন্দের ন্যায় সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে সহায়করূপে পাইয়া কল্যাণানন্দের আনন্দের সীমা থাকিল না। সেবাশ্রমের কার্যের প্রসার বস্তুতঃ এইকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের পর্ণকুটীরে নিজেদের বাসস্থান ও আর্ত-পীড়িত নারায়ণদের সেবার সর্ববিধ বন্দোবস্ত করিয়াও, উভয় গুরুভ্রাতা হরিদ্বার ও হৃষীকেশের সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া বৃদ্ধ ও রুগ্ন সাধুদের পরিচর্যা করিতেন। নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে একটি ঔষধের বাক্স এবং পথ্যাদির জন্য কিছু জিনিষের একটি পুঁটলি কাঁধে লইয়া কনখল হইতে প্রায় আঠার মাইল পথ পদব্রজে গিয়া হৃষীকেশের সাধুদের সেবা করিতেন। অসমর্থদের নিজের হাতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করাইয়া, যাঁহাকে যাহা আবশ্যক ঔষধ ইত্যাদি দিয়া এবং যথাকর্তব্য শুশ্রূষাদি করিয়া, দিনান্তে তিনি মাধুকরী করিতে যাইতেন, বা ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অপরাহ্নে আবার সকলের খোঁজখবর লইয়া, কনখলে প্রত্যাবর্তন করিতেন। দিনের পর দিন, রৌদ্র-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম মাথায় লইয়া এই ভাবেই তিনি দৈনিক ছত্রিশ মাইল পথ হাঁটিয়া সেবাযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঔষধ-পথ্যাদির জন্য ভিক্ষা করিয়া অর্থ বা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তো ছিলই। রোগীর মলমূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শুশ্রূষার যাবতীয় কার্যই উভয় গুরুভ্রাতা পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিজেরা করিতেন। আবার কোন সাধুর দেহান্ত হইলে, দুই জনে মিলিয়াই শবদেহটিকে বহন করিয়া গঙ্গার নীলধারায় সলিল-সমাধি দিয়া আসিতেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত বন্ধুর উপলরাশির উপর দিয়া নগ্ন পদে মাত্র দুই জন ব্যক্তির পক্ষে একটি ভারি শবদেহকে বহন করিয়া চলা যে কতখানি কষ্টকর, তাহা অনুমান করা মোটেই শক্ত নহে।

নিশ্চয়ানন্দ অনলস এই সেবা-তপস্যার মধ্য দিয়া যেন স্বামিজীরই প্রত্যক্ষ সন্নিধি অনুভব করিতেন। জীবমাত্রকেই নারায়ণ বলিয়া বোধ না হইলে এমন আশ্চর্য নিষ্ঠা কীভাবে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে—

ইহা তদানীন্তন সাধুসমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতিশয় গোঁড়া দশনামী সাধুর দল ঘৃণায় ও ঈর্ষায় তখনও মুখ ফিরাইয়া ছিলেন। জীবের দুঃখবেদনায় তাঁহারা বলিতেন, 'প্রারব্ধ্ ভোগ কর্‌তা হৈ।' তাঁহাদের অপূর্ব 'বেদান্ত' ছিল: 'জগৎ তো তিন কাল্‌মে হোতা নহী, হুয়া নহী, হোগা নহী, হোনেকা সম্ভবভী নহী হৈ।' আবার সেই মুখেই গৃহস্থকে অভিশাপ বর্ষণ করিয়া বলিতেন, 'রোটী খিলাও তো খিলাও, নহী তো শির তোড় দেঙ্গে।' নিশ্চয়ানন্দ বা কল্যাণানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র ভাব তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করিতেন না। শ্লেষ বর্ষণ করিয়া সেবাকার্যকে এই সব বেদান্তীরা বলিতেন, 'ভাঙ্গীকা কাম' অর্থাৎ মেথরের কার্য। 'সর্বকর্মত্যাগী' ইঁহারা আত্মতৃপ্ত ছিলেন এই ভাবিয়া—'বির্‌জা হোম্ কর্ লিয়া তো সব করম্ খতম্ হো গয়া।' সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থীরা যখন গোঁড়ামির বশে বেদান্তের এই প্রকার অপব্যাখ্যাতেই মশগুল ছিলেন—যাঁহাদের সন্ন্যাসাদর্শ ছিল: 'দাল রোটী খাও ঔর মৌজমে রহো', সেইকালে স্বামিজীর দুইজন ত্যাগী শিষ্য 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই সম্মুখে জীবব্রহ্মের সেবায় প্রাণপাত করিতেছেন, ইহা সত্যই তদানীন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর ইতিহাস। উত্তরাখণ্ডের কোন কোন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী কিন্তু স্বামিজী-প্রবর্তিত বেদান্তের এই কর্ম-পরিণত আদর্শকে সূচনা হইতেই খুব সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেছিলেন—বস্তুতঃ তাঁহাদেরই সমাদরের ফলে পশ্চিমী দশনামীরা স্বামিজীর ভাবকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলেন। হৃষীকেশস্থ কৈলাস-মঠের মণ্ডলীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী মহারাজের নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ধনরাজ গিরিজী হৃষীকেশে অবস্থানকালে, একদিন নিশ্চয়ানন্দকে কৈলাস-মঠে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার মুখে স্বামিজীর আদিষ্ট সেবাকার্যের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গিরিজী মহারাজ স্বামিজীর প্রতি পূর্ব হইতেই খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ও ব্যবস্থায় নিশ্চয়ানন্দ কৈলাস-মঠেই নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। শোনা যায়, একবার ধনরাজ গিরিজী তাঁহার মণ্ডলীসহ কিছুদিনের জন্য যখন অন্যত্র গিয়াছিলেন, যাইবার সময়ে মঠের নূতন কুঠারীকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন, "কনখল হইতে যে মহাত্মা নিত্য সাধুসেবা করিতে হৃষীকেশে আসেন, তাঁহাকে

যেন সমাদর করিয়া ভোজন করানো হয়।" কৈলাস-মঠে সাধারণতঃ অজ্ঞাত-পরিচয় বাহিরের কাহাকেও ভোজন করাইবার রীতি নাই। গিরিজীর অনুপস্থিতিকালে নিশ্চয়ানন্দ কৈলাস-মঠে প্রথম দিন যাইতেই বুঝিলেন যে কুঠারী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশ্য চিনিবার কথাও নহে—কারণ নগ্নপদ নিশ্চয়ানন্দের দীন-হীন মলিন বসন, তাহাতে আবার ঔষধের একটি ভাঙ্গা বাক্স কাঁধে, ইহা দেখিয়া কে-ই বা তাঁহাকে সম্মান করিবে! কুঠারী নূতন লোক,—তাঁহার কি-ই বা দোষ! তিনি কাঙ্গালিবেশী সাধুটিকে জানাইয়া দিলেন, "কৈলাসে বাহিরের সাধুকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা নাই।" অভিমানশূন্য নিশ্চয়ানন্দ অম্লান বদনে ফিরিয়া গিয়া কালীকমলী ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আর কোনদিন তিনি কৈলাস-মঠে যান নাই। কিছুদিন পরে ধনরাজ গিরিজী ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিলেন যে নিশ্চয়ানন্দ কৈলাসে আর ভিক্ষা লইতে আসেন না, তখন কুঠারীকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। কুঠারীকে তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ করেন, ছত্রের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিশ্চয়ানন্দকে চিনিয়া লইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কৈলাস-মঠে আনিতে হইবে। যথা আদেশ কুঠারী কালীকমলী ছত্রের দরজায় গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। সেখানে নিশ্চয়ানন্দের সহিত দেখা হইলে, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অপরাধের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করেন। নিশ্চয়ানন্দ তো মহা অপ্রস্তুত হইয়া, কুঠারীর অনুরোধে পুনরায় কৈলাস-মঠে গেলেন এবং সেইদিন হইতে পূর্ববৎ কৈলাসেই ভিক্ষা লইতে লাগিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর প্রতি নিশ্চয়ানন্দের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল—ব্রহ্মনিষ্ঠ এই মহাপুরুষকে তিনি নিজের গুরুর প্রতিনিধি জ্ঞানেই ভক্তি করিতেন। তুরীয়ানন্দজী যখন উত্তর-কাশীতে তপস্যারত ছিলেন, তখন তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য, এবং তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ানন্দও উত্তর-কাশীতে গিয়াছিলেন। উহা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময় হইবে। তুরীয়ানন্দজী তখন উত্তর-কাশীর উজলী-অঞ্চলে মহাত্মা দেবী গিরিজীর আশ্রমে একটি কুঠিয়াতে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ কনখল হইতে পদব্রজে দেরাদুন হইয়া, মুসৌরী পাহাড় অতিক্রম করিয়া বিপদসঙ্কুল পার্বত্য পথে চড়াই উত্‌রাই করিতে করিতে তুরীয়ানন্দজীর সান্নিধ্যে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। উত্তর-কাশীতে গুরুকল্প এই বরিষ্ঠ আচার্যের

প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বৈরাগ্যবান নিশ্চয়ানন্দের তপস্যার জীবন বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল।

উত্তর-কাশীতে একটি ঘটনা, তুরীয়ানন্দজীর সহিত নিশ্চয়ানন্দের সম্পর্ক, তথা তাঁহার নিজের গুরুর প্রতি প্রবল বিশ্বাস-ভক্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তুরীয়ানন্দজী মাত্র একখানি পাতলা চাদর ও কৌপীনমাত্র তখন ব্যবহার করিতেন—অতিরিক্ত অন্য কোন কাপড় জামা বা চাদর তিনি সঙ্গে রাখিতেন না। একদিন গঙ্গায় স্নানান্তে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া তুরীয়ানন্দজী ঐ চাদরখানি ধুইতেছিলেন—অদূরে নিশ্চয়ানন্দও স্নান করিতেছিলেন। হঠাৎ তুরীয়ানন্দজীর হাত হইতে চাদরখানি জলে পড়িয়া গিয়া, প্রচণ্ড স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। "আরে নিশ্চয়, চাদরটা গেল গেল!" তুরীয়ানন্দজী এইরূপ বলিবামাত্রই নিশ্চয়ানন্দ বরফগলা ঐ শীতল স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। ভীষণ-স্রোতা গঙ্গার পার্বত্যরূপ যাঁহাদের দেখা আছে, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে নিশ্চয়ানন্দের অবস্থা কী হইয়াছিল তখন। মুহূর্তের মধ্যে জলের টানে কোথায় তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া দিল—চাদরের তো কথাই নাই। খণ্ডিত পর্বত ও শিলায় শিলায় আঘাত খাইয়া নিশ্চয়ানন্দের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে থাকিল—কিন্তু চাদর তিনি তুলিয়াই আনিলেন। তুরীয়ানন্দজী তটে দাঁড়াইয়া বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন—যাহা হউক, চাদরসহ নিশ্চয়ানন্দকে পাইয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। দুঃসাহসের জন্য একটু তিরস্কারও করিলেন তিনি—"সামান্য জিনিষের জন্য প্রাণ দিতে গিছ্‌লে তুমি?" আহত নিশ্চয়ানন্দ নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিলেন, "আপনি বললেন, 'নিশ্চয়, ঐ গেল!' আমি তাতে স্থির থাকতে পারলাম না। আমি কাছে থাকতে আপনার চাদর চলে যাবে, তা কিছুতেই হয় না।" তুরীয়ানন্দজী শিশুপ্রতিম নিশ্চয়ানন্দের দৃঢ়-নিশ্চয় মনোভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন—খুব আশীর্বাদও করিয়াছিলেন। বেলুড়-মঠে অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইসব ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ানন্দের বিশ্বাস-ভক্তির গভীরতার আভাস পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তুরীয়ানন্দজীর শেষ অসুখের সময়েও, নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কনখল হইতে ছুটিয়া কাশীধামে গিয়া তাঁহাকে শেষ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ

বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ানন্দ মাত্র এই দুইবারই কনখল হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন।

সেবাপ্রাণ নিশ্চয়ানন্দের জীবন ছিল কর্ম ও ধ্যানের সমবায়ে গঠিত। বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইবে তিনি মহা কর্মবীর—জীবসেবায় সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত একজন আদর্শ কর্মযোগী। সেবাশ্রমের সহকারী প্রধান হইয়াও, অহর্নিশ যে ভাবে পরিশ্রম তিনি সারাজীবন করিতেন তাহাতে আপাতদৃষ্টে তাঁহাকে ঐটুকুই মনে হওয়া স্বাভাবিক। গৃহাদি নির্মাণের তদ্বির, উদ্যান-পরিচর্যা, সেবাশ্রমের হিসাব সংরক্ষণ, রোগী-নারায়ণদের সেবা চিকিৎসা, ইত্যাদি নানা কাজে তিনি প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু নিশ্চয়ানন্দের পরিচয় শুধু এইমাত্রই নহে—তিনি ছিলেন ধ্যানী এবং জাপক। কর্মাবসানে গভীর নিশীথে, নিশ্চয়ানন্দ তখন ধ্যান-তন্ময় যোগী। 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—গীতোক্ত এই আদর্শই তাঁহার জীবনে ব্যঞ্জিত হইত। একবার 'কথামৃত'-কার শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় কনখল সেবাশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দের প্রকৃতির সহিত তত বেশী পরিচিত তখনও তিনি হইতে পারেন নাই। তাই একদিন বলিয়া বসিলেন. "দেখ নিশ্চয়, ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর-লাভই সাধু-জীবনের উদ্দেশ্য। কাজকর্মই সাধু জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে।" শ্রীভগবানের একজন অন্তরঙ্গের মুখে এই কথা শুনিয়া নিশ্চয়ানন্দ মৌন থাকিলেন। মাষ্টার মহাশয় এইরূপ আরও দুই-একবার ঐ কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় তৃতীয় বারও যখন একদিন আবার ঐ কথা তুলিলেন, নিশ্চয়ানন্দ আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই—করজোড়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, "দেখুন আমি স্বামিজীর গোলাম। সাধন-ভজন কিছুই জানি না। তাঁর কাজ করাই আমার জীবনব্রত।" নিশ্চয়ানন্দের অতুলনীয় গুরুভক্তি দেখিয়া শ্রীম মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সাধন-ভজন কিছুই করতে হবে না। গুরুকৃপাতেই তোমার সব হয়ে যাবে।" মাষ্টার মহাশয় ক্রমে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া ও প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিজের পূর্বোক্ত উপদেশের জন্য নিজেকে বড়ই কুণ্ঠিত বোধ করিতেন। মাষ্টার মহাশয় পরে নিশ্চয়ানন্দের অনবদ্য কর্ম ও সাধনার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকের কাছে বলিতেন। কল্যাণানন্দ ও

নিশ্চয়ানন্দের কথায় তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিতেন।

নিশ্চয়ানন্দের বিশ্বাস-ভক্তি, বিচার-দৃষ্টি ও ভাব নিকটবর্তী সকলের কাছে সত্যই প্রেরণাপ্রদ ছিল। সেবাশ্রমের নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্যে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু উহার মধ্যেও অনাথ দীন দুঃখী কাহাকেও দেখিলে তিনি যেন পরমাত্মীয় জ্ঞানে তাহার সেবায় লাগিয়া যাইতেন। মুচি-চামার বা মেথরকেও নিজ হাতে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সেবা করিতেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। নিজেই তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন—যেন তাহারা কতই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! 'দরিদ্রদেবো ভব'—স্বামিজীর এই বাণী যেন তাঁহার জীবনে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। কর্ম তো অনেকেই করেন, কিন্তু ইষ্টবুদ্ধিতে কর্মকে অবলোকন করিতে পারেন কয়জন? কনখল সেবাশ্রমের নবীন সাধুকর্মীদের লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ানন্দ বলিতেন, "সেবাশ্রমের এক একখানি ইট আমাদের বুকের পাঁজরা, যেন ঠাকুর-স্বামিজী। ঠাকুর-স্বামিজী এখানে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন। তাই তোমরা কিছু নষ্ট করলে বা অবহেলা দেখালে আমাদের বুকে বড় লাগে।" তাঁহার কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনধারায় কাঠিন্য থাকিলেও, শুষ্কতা কিন্তু ছিল না। বরং খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে উহার মধ্যে একটি অনবদ্য মাধুর্য ধরা পড়িত। দড়ির একটি খাটিয়ার উপর কম্বল—ইহাই ছিল তাঁহার শয্যা-উপকরণ। অবশ্য রাত্রে শয়নের প্রয়োজন তাঁহার খুবই সামান্য ছিল – বেশীর ভাগ সময় জপধ্যানাদিতেই কাটাইতেন। খাটিয়াতে আবার সহস্র ছারপোকার আশ্রয় ছিল—কিন্তু আশ্রিতবৎসল নিশ্চয়ানন্দ উহার একটিকেও কখনও নিরাশ্রয় করেন নাই। রাত্রে মশারি কোন কালেই ব্যবহার করিতেন না, সারারাত্রি অসংখ্য মশাকে রক্তদান করিয়া সেবা করিতেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে নিশ্চয়ানন্দ সাধুজীবনের সূচনা হইতেই নিরামিষাশী ছিলেন এবং কৃচ্ছ্রতাময় জীবন যাপন করিতেন। বেলুড় গ্রামের বড় বড় মশা তাঁহার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিলেও তিনি মঠে কখনও মশারি বা কোনও প্রকার আচ্ছাদনী ব্যবহার করিতেন না। শয্যায় রক্তের চিহ্ন দেখিয়া, একদিন স্বামিজী তাঁহাকে এই অতিরিক্ত কঠোরতার জন্য তিরস্কারও করিয়াছিলেন। উত্তরে সেদিন বিনীতভাবে ও করজোড়ে

নিশ্চয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী আমি তো ভোগ করতে আসিনি, ত্যাগ করতেই তো এসেছি।" বৈরাগ্যবান শিষ্যের অন্তরকে বুঝিয়া লইয়া, স্বামিজী তখন সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "বেশ, এখন তবে এমনই চলুক। তবে যখন প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু মশারি ব্যবহার করবে এবং মাছও খাবে।" ব্যাধি-পীড়িত অন্তিম জীবনেও তাঁহার উক্ত কঠোরতাময় জীবনচর্যায় ছেদ পড়ে নাই। —চিকিৎসকরা অনুরোধ-উপরোধ করাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দ স্বামিজীর নির্দেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে তিনি কিছু নরম হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব হইতে মাছ খাইতে ও মশারি ব্যবহার করিতে শুরু করেন। এইটুকু শিথিলতাও নিজের জন্য নহে—স্বামিজীর আদেশ পালনরূপ সাধনার জন্য।

প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ কালে একটি গামছা দিয়া মুখ ঢাকিয়া তিনি বাহিরে আসিতেন। সোজা স্বামিজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—স্বামিজীকে দর্শন করিয়া তবে মুখের ঢাকা খুলিতেন—অন্য কাজে যাইতেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ানন্দের দৃষ্টিতে আগে স্বামিজী, পরে তাঁহার কর্ম;—আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ; এই ভাবটিই দৃঢ়বদ্ধ ছিল।

নিশ্চয়ানন্দ বয়সের হিসাবে কল্যাণানন্দ অপেক্ষা কিছু বড়ই ছিলেন। কিন্তু তিনি কল্যাণানন্দকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান দিতেন। এই উভয় ভ্রাতার পরস্পরের সম্পর্ক কত যে মধুর ছিল, তাহা ঐ কালে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। কল্যাণানন্দ এবং নিশ্চয়ানন্দকে 'বড় স্বামী' ও 'ছোট স্বামী' বলিয়া তখন হরিদ্বার-হৃষীকেশ অঞ্চলের সকলেই জানিতেন।

অত্যধিক পরিশ্রম ও কঠোরতার ফলে নিশ্চয়ানন্দের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অথচ কোন সাধু-ব্রহ্মচারীর সেবা পারতপক্ষে তিনি লইতেন না। অবশেষে ইংরেজী ১৯৩২ সালের বর্ষাকালে, তিনি দারুণ পীড়িত হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন, জটিল অন্ত্রক্ষত (gastric ulcer) হইয়াছে। সেই সময়ে আবার কল্যাণানন্দও কিছুদিনের জন্য মায়াবতীতে ছিলেন, তাই সেবাশ্রমের সম্পূর্ণ কার্যভার নিশ্চয়ানন্দকেই বহন করিতে হইতেছিল। ব্যাধির জটিলতা

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও, নিশ্চয়ানন্দ 'স্বামিজীর কর্ম' হইতে স্বেচ্ছায় ছুটি লন নাই। দেহত্যাগের দুই সপ্তাহ পূর্বেও তিনি মোটা একখানি কম্বলে পা দুটি ঢাকিয়া বসিয়া, সেবাশ্রমের হিসাবপত্র দেখিতেন। অসুস্থ শরীরেও বিশ্রাম লইতেছেন না, কেহ এইরূপ অনুযোগ করিলে, সহাস্যে তিনি উত্তর দিতেন, "এ তো ঠাকুরের সেবা। স্বামিজীর কাজ। আমাদের এখনও তো সব কর্ম ক্ষয় হয়নি। মাটি কাদা অবস্থায় থাকলে সবটুকু ওঠে না—কিন্তু শুকিয়ে গেলে সব আপনিই খসে যাবে।" হিসাবপত্রাদি সংরক্ষণ-প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য। আশ্রমের তহবিলে একদিন একটি আধলা বা আধ পয়সা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। তহবিল-রক্ষক সাধুকর্মীটিকে নিশ্চয়ানন্দ এই আধলার হিসাবটিও প্রতি মাসে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করিতেন।

অসুস্থাবস্থাতে নিশ্চয়ানন্দের নানা অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি নিকটবর্তী সাধু-সেবকদের বিস্মিত করিয়া তুলিত। একবার তিনি সেবাশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার চারিদিকে আজ ভাল করে ধূপধুনা দাও। আর বাইরে ঐ বড় বাড়ীর (যক্ষ্মা বিভাগের) সামনের জমিতে চেয়ার সাজিয়ে রাখ—সেখানেও ধূপধুনা দিও। সেবাশ্রমে আজ আমার গুরুদেব আসবেন—আমি তাঁকে দর্শন করতে যাব।" অকস্মাৎ এই প্রকার উক্তিতে সকলেই বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন শরীর-ত্যাগেরই সূচনা হয়তো ইহা। অজানা আশঙ্কায় সাধু-সেবকরা সকলেই তাঁহার ঘরে আসিয়া সমবেত হইলেন। নিশ্চয়ানন্দ সমাগত সকল সাধুকে করজোড়ে নমস্কার করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "আমায় নিয়ে চলো, নিয়ে চলো এইবার—বাইরে যেখানে চেয়ার রেখেছ সেখানে নিয়ে চলো। স্বামিজী এসে সেখানে বসেছেন আমার জন্য।" অগত্যা সেবকগণ তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া সেখানে লইয়া গেলেন। চেয়ারের কাছে গিয়াই তিনি দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণত হইলেন—কিছুক্ষণ ঐ ভাবে থাকিবার পর উঠিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। অনেক সময় এই ভাবে কাটিলে পর, চোখ মেলিয়া বলিলেন, "স্বামিজী চলে গেছেন, আমি এবার ঘরে যাব।" সেবকরা পুনরায় তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। ইহা ১৯৩৪-এর কোন সময়ের ঘটনা।

ঐ বৎসরের অক্টোবরেই শরীরের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিল। অথচ

স্বাধীনচেতা স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী বাহ্যে-প্রস্রাব করিতে নিজেই উঠিতেন—কাহারও সাহায্য না লইয়া দেওয়াল ধরিয়া টলিতে টলিতে শৌচাগারে যাইতেন। এই-রূপ অবস্থায়ও একদিন রাত্রি দুইটা আড়াইটার সময় ধড়মড় করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া, একখানি কম্বল হাতে লইয়া আমতলার দিকে ছুটিতে থাকেন। গভীর রাত্রিতে ধড়মড় শব্দে সেবকরাও জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকেন—অথচ কেহই তাঁহাকে ধরিতে বা বাধা দিতে সাহস পাই-তেছেন না। সহসা "চেয়ার নিয়ে আয়, চেয়ার নিয়ে আয়, স্বামিজী এসেছেন," সাধুদের মধ্যে অনেকেই এই আওয়াজ পাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। জনৈক সেবক একখানি চেয়ার লইয়া অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়িতে থাকিলেন। হাতের কম্বলখানি দ্রুত আমগাছের তলায় বিছাইয়া দিয়া, উহার উপর নিজের পরিধানের বহির্বাসটি পাতিয়া, নিশ্চয়ানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। মুখে শুধু শোনা গিয়াছিল: "একটু দাঁড়ান, প্রণাম করি।" ভূলুণ্ঠিত হইলেন—কিন্তু প্রায় পনের মিনিট কাটিয়া যায়, তবুও আর ওঠেন না দেখিয়া স্বামী জগদানন্দ নিকটবর্তী একজন সেবককে বলিলেন, "কি করছ তোমরা? ধীরে ধীরে তোল, ঘরে নিয়ে যাও।" সেবকরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে নিয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলেন। পরের দিন বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত ঐ ভাবেই শয্যাতে পড়িয়াছিলেন। পরে যখন উঠিলেন, তখন সারাদিন এত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিলেন যে, কেহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পান নাই। বৈকালের দিকে স্বামী জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার? আপনার এ-রকম অসুখ, ডাক্তার আপনাকে বিছানা থেকে নামতে নিষেধ করেছেন, আপনিও নামেন না। হঠাৎ এ-কী কাণ্ড হ'ল?" নিশ্চয়ানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি এমন অসুস্থ, ভুগছি—তাই তো স্বামিজী আমায় দেখতে এসেছিলেন। আমার বিছানার কাছে গিয়ে তিনি আমায় দেখছিলেন। প্রণাম করবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি—তিনি বললেন, "থাক্, আমি এখন আসি।" স্বামিজী চলে যাচ্ছেন—আমিও তাঁর পিছনে পিছনে না ছুটে পারলাম না। শেষে ঐ ওখানে গিয়ে তাঁকে ধরতে পেরেছি—তাঁর চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে প্রণাম করেছি! আমি তাঁর চরণ স্পর্শ না করে থাকব কি-ভাবে? তাই তো না উঠে পারিনি।"

অবশেষে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নিশ্চয়ানন্দকে শয্যাগ্রহণ করিতেই হইল—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তিম শয্যা। প্রাণাধিক গুরুভ্রাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় কল্যাণানন্দ একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই নিশ্চয়, ঠাকুরের কৃপায় তুমি আরোগ্যলাভ করে ওঠ।" জনৈক সেবকের উত্তর জীবনে অঙ্কিত একটি স্মৃতি চিত্র: "শরীর যাইবার চারপাঁচদিন আগে তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন। সেবক কাপড়-চোপড় ধুইবার জন্য অন্য বাড়ীতে গিয়াছে। বেলা তখন নয়টা-সাড়ে নয়টা। সংবাদ গেল, 'ছোট স্বামিজী'[১] ডাকিতেছেন। সেবক ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তিনি শুইয়া আছেন। সেবককে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'তিনটে চেয়ার পাশাপাশি সাজিয়ে রাখো, ধূপ জেলে দাও,—আর আমাকে বিছানায় বসিয়ে দাও।' সেবকও তাহাই করিল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। কল্যাণ মহারাজ-প্রমুখ সব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইলেন। 'ছোট স্বামিজী' বিছানায় বসিয়া প্রথমে চেয়ার তিনটির দিকে হাত জোড় করিয়া তিনবার প্রণাম করিলেন। পরে দেওয়ালে ঝোলানো স্বামিজীর ধ্যান-মূর্তিকে প্রণাম করিলেন ও চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট এইভাবেই গেল, তারপর শুইয়া পড়িলেন।

"ইহার পর অন্য দিনের মতো দিনগুলি চলিতে লাগিল। কল্যাণ মহারাজ এই চেয়ার সাজানোর ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর, মা, ও স্বামিজী আমাকে দেখতে এসেছিলেন—তাঁদের জন্য আসন দিয়েছিলাম'।"

সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর—১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৫ই কার্তিক। দেওয়ালে রক্ষিত স্বামিজীর ধ্যানমূর্তির দিকে অপলক নেত্রে নিশ্চয়ানন্দ তাকাইয়া ছিলেন—উজ্জ্বল চোখের পাতাদুটিতে একটুও যেন স্পন্দন ছিল না। নিকটবর্তী সেবককে নির্দেশ দিলেন, ঠাকুরের চরণামৃত আনিতে। উহা আনিয়া তিনবার পান করানো হইল। সকাল দশটা তখন। সহসা দ্বিপ্রহরের দিকে সেবককে বার বার ইঙ্গিত করিতে-

১ কনখল সেবাশ্রমে নিশ্চয়ানন্দজীকে 'ছোট স্বামিজী' বলিয়া সকলে ডাকিতেন। কল্যাণানন্দজীকে সকলে বলিতেন 'বড় স্বামিজী'।

ছিলেন, তুলিয়া বসাইয়া দিবার জন্ত। বালিশ ইত্যাদি ঠেস দিয়া বসিবার মতো ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে তুলিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। স্বামিজীর ছবিখানির দিকে দুই হাত বাড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—তাই ছবিখানি দেওয়াল হইতে নামাইয়া তাঁহার সম্মুখে একটি বালিশের উপর স্থাপন করা হইল। শ্রীগুরুর প্রতিকৃতিকে বক্ষের কাছে রাখিয়া, নিশ্চয়ানন্দ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন—এই ধ্যানই মহাধ্যানে পরিণত হইল। সেই ধ্যান আর ভাঙ্গে নাই। বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। প্রিয়তম সহচরের মহাযাত্রার ক্ষণে কল্যাণানন্দ নীরব অশ্রুর উপহার প্রদান করিলেন। সৈনিক নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার সেনাপতি বিবেকানন্দের আহ্বানে অনন্ত কালের জন্ত অন্ত লোকে প্রয়াণ করিলেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় সহযোগীকে হারাইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল একদিনও বিশ্রাম না লইয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা আছে, 'মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।' ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল নিশ্চয়ানন্দের অভূতপূর্ব সেবাময় জীবন। তাঁহার মৃত্যুও তেমনি ধ্যান করিতে করিতে পদ্মাসনে বসিয়া হইয়াছিল।" স্বামিজী-প্রবর্তিত সেবাধর্মের যথার্থ অনুশীলনের দ্বারা, এক জীবনেই যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়সাধন সম্ভব এবং উহারই ফলস্বরূপ মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির কত উচ্চ স্তরে পৌঁছিতে পারে, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ নিজ সাধনার দ্বারা ইহাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' পুস্তিকার প্রারম্ভীতে ঠিকই লিখিয়াছেন:

"কথিত আছে পুরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনের এই সকল কর্মীরাও ইষ্টকের পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-সুরকীর পরিবর্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্বামিজী-প্রণোদিত এই সকল কর্মিগণ পুরাকালের দধীচি মুনি হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।"

স্বামী অচলানন্দ

"না মশাই, সুবিধা হবে না। লেখকের যা কট্‌মটে ভাষা! কিছুই নেই ওতে।"—কাশীতে জনৈক তরুণ পুলিশ-কর্মচারীর নিকট, তাঁহার কোন বন্ধু 'উদ্বোধন'-পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামিজীর রচিত প্রস্তাবনাটি পাঠ করিতেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশ বন্ধুটিকে ঐ পত্রের গ্রাহক করা। কিন্তু স্বামিজীর 'কট্‌মটে' ভাষায় তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হয় সেদিন ব্যর্থই হইয়াছিল—পুলিশ কর্মচারীটি উপেক্ষাভরে উল্লিখিত ঐ মন্তব্য করিয়াছিলেন। পুলিশের কর্মে তিনি নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন,—তখনও শিক্ষানবিশ। বলিষ্ঠ দেহ ও উন্নত চরিত্রবলের অধিকারী ছিলেন,—কিন্তু জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ তখনও জানিতেন যে, পদস্থ পুলিশ কর্মচারীর দোর্দণ্ড প্রতাপে, দেশের অনাচার-অবিচার নিজ বাহুবলে অপসারিত করিয়া, সমাজের একজন রক্ষাকর্তা হইবেন তিনি। বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসিতেছেন। স্পর্ধিত এই রাজপুরুষের জীবন-গতিকে কালচক্র সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবর্তিত করিয়াছিল। পরিণত জীবনে তাই তাঁহারই মুখে শোনা যাইত: "স্বামিজীর ভালবাসার কথা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না—আমার সে শক্তি নাই। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্তি।" 'কট্‌মটে' আবরণ ভেদ করিয়া এই অনন্ত প্রেমের সন্ধান তিনি কী উপায়ে পাইয়াছিলেন, ইহাই আজ অনুধ্যানের বিষয়। তরুণ সেই রাজকর্মচারীটির নাম কেদারনাথ মৌলিক। অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া ইনিই স্বামী অচলানন্দ নামে স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম রূপে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনিই বহুমানিত 'কেদারবাবা'। ভক্তি-বিশ্বাসের ঘনীভূত প্রতিমূর্তি কেদার বাবা অসংখ্য জিজ্ঞাসু-ভক্ত ও সাধু-ব্রহ্মচারীর জীবনে প্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিলেন। আদর্শ সন্ন্যাসিরূপে তিনি সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরকালই স্মরণার্হ।

কেদারনাথের জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা উত্তর-প্রদেশের বারাণসী তীর্থক্ষেত্রে। তাঁহাদের বাড়ী ছিল কাশীর সোনারপুরা পল্লীতে। তাঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র মৌলিক। শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতামহ রামচন্দ্র মৌলিকের সস্নেহ তত্ত্বাবধানেই তিনি মানুষ হন। পূর্বাশ্রমের সম্পর্কে তিনি এতই নীরব ছিলেন চিরকাল যে, তাঁহার জন্ম-তারিখ বা পিতৃকুলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু



স্বামী অচলানন্দ

জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। পশ্চিমে মানুষ হইয়াছেন বলিয়া বাংলা বলিতে বা বুঝিতে পারিলেও, লিখিবার অভ্যাস তেমন করেন নাই। তবে ফারসী ভাষায় তাঁহার দখল ছিল প্রচুর। ফারসী কাব্যের অনেক বয়েত তিনি মুখে মুখে সুন্দর আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ প্রবেশিকা পর্যন্তই চলিয়াছিল। শৈশব হইতেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া জীবনের গতি-প্রকৃতি ঠিক তাঁহার স্ব-ভাব অনুযায়ী পরিচালিত হইতে পারে নাই। তাই অধ্যাত্ম-জগতের এত বড় একজন পুরুষেরও বাল্যজীবনে দেখা যায়, রেলের অথবা পুলিশের একজন পদস্থ, কর্মচারী হইবেন, ইহাই মাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।

স্বগৃহে কেদারনাথের একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ছিল—তাহাতে তদানীন্তন বহুপ্রকারের মাসিক ও পাক্ষিক পত্রাদি, যেমন 'হিন্দু', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' প্রভৃতিও রাখা হইত। কোন দেব-দেবী বা মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল না—সেখানে ছিল রাজা-রাজড়ার মূল্যবান চিত্র। মোট কথা, বাল্যে ও যৌবনে কেদারনাথ তাঁহার পরিবার-পরিজনদের তরফ হইতে ভাবী জীবনের জন্য তেমন কোন আনুকূল্য পান নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া, তিনি পুলিশ বিভাগের কর্মে নিযুক্ত হইয়া, উহারই জন্য শিক্ষানবিশী করিতে শুরু করেন। এই সময়ে কয়েকজন চরিত্রবান ও আদর্শবাদী যুবকের সাহচর্য, তাঁহার জীবনধারার গতিমুখ পরিবর্তন করিয়া দিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল।

কেদারনাথের বন্ধুদের মধ্যে চারুচন্দ্র দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারুচন্দ্রই ছিলেন তাঁহাদের দলপতি—উত্তরকালে যিনি স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য শুভানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন। কেদারনাথের বা চারুচন্দ্রের বাড়ীতেই প্রধানতঃ এইসব যুবকদের আড্ডা ছিল। কেদারনাথের নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকাতে, যুবক বন্ধুদের আকর্ষণ তাঁহাদের বাড়ীতেই বেশী ছিল। গ্রন্থাগার হইতে নানা সৎগ্রন্থাদি—মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী বা ঐ জাতীয় ভাল কোন বই লইয়া তাঁহারা পাঠ-আলোচনা করিতেন। উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তখনও পর্যন্ত তাঁহাদের কাহারও মধ্যে দেখা না গেলেও, স্ব স্ব নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে সকলেরই তীব্র

প্রচেষ্টা ছিল। এই ভাবেই বারাণসীতে একটি আদর্শ তরুণদল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বন্ধু চারুচন্দ্রের সহিত স্বামী শুদ্ধানন্দের ইতঃপূর্বেই পরিচয় হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কাশীতে 'উদ্বোধন' পত্রের কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য শুদ্ধানন্দ চারুচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি ঐ পত্রও তাঁহাকে দিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র একদিন হরিনাথ[১] নামে জনৈক বন্ধুর হাত দিয়া কেদারনাথের নিকট একখানি 'উদ্বোধন' পাঠাইয়া দেন এবং অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন উহার একজন গ্রাহক হন। 'উদ্বোধন'-এর সেই প্রথম সংখ্যাতে প্রস্তাবনা লিখিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামিজী। কেদারনাথের চোখে তখনও বোধহয় উচ্চাভিলাষী রাজকর্মচারীসুলভ স্বপ্নঘোর লাগিয়া ছিল। তাই স্বামিজীর লেখা সেদিন তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। এই সংবাদ চারুচন্দ্রের কাছে গেলে, তিনি নিজে পরে আর একদিন আসিয়া কেদারনাথকে স্বামিজীর লিখিত প্রস্তাবনাটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাহাতে কেদারনাথের মন স্বামিজীর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইল। স্বামিজীর রচনা অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়া পূর্বে যে ধারণা তিনি পোষণ করিতেন এবং যে-সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলেন তখন। নিজের নাম না হইলেও পিতামহ রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের নাম 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-তালিকাভুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে তিনি চারুচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, আর নিজের জন্য স্বামিজীর 'রাজযোগ' একখানি আনাইয়া দিতে বলিলেন। কেদারনাথের ঘরে স্বামিজীর প্রথম পদক্ষেপ এই ভাবেই সূচিত হইল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের স্মৃতি-কথা :

"তাঁর (চারুচন্দ্রের) ঐরূপ আগ্রহ দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামিজীর লেখাটি শুনতে রাজী হলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে প্রস্তাবনাটি ইতিপূর্বে আমার কাছে ভয়ানক খটমটে লেগেছিল, চারুবাবুর মুখ থেকে সেই একই প্রস্তাবনা শুনে আমার এমন চমৎকার লাগল, কি বলব! আমি মনে মনে খুবই লজ্জিত

১ হরিনাথ গুহ দেদার (ভক্তরাজ)—পরবর্তিকালে স্বামী সদাশিবানন্দ।

হলাম, এই ভেবে যে, এমন একটা সুন্দর জিনিষ আগে অপছন্দ করেছিলাম। …সেই থেকেই 'উদ্বোধন' রাখতে শুরু করলাম। তারপর থেকে রোজ রাত্রে ঐ Library-তে আমাদের মধ্যে ঐ বিষয়েই চর্চা চলতে লাগল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট পরিকরগণের অন্যতম স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী তখন কাশীতে সোনারপুরাতে বংশীদত্তের বাগানে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। চারুচন্দ্রই এই সংবাদ কেদারনাথকে ও অন্যান্য বন্ধুদিগকে প্রথম বলিয়াছিলেন। সকলের আগ্রহ হইল, একদিন তাঁহাকে এই গ্রন্থাগারের আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রণ করিলে বেশ হয়—তাঁহার মুখে নিশ্চয়ই অনেক ভাল ভাল কথা শোনা যাইবে। কেদারনাথ তো ইহাতে খুবই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ এরূপ একজন মহাপুরুষ ব্যক্তি তাঁহারই বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন, তাহাতে গৃহেরও অশেষ মঙ্গল হইবে এই ভাবিয়া। যাহা হউক, নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত দেখাশোনা করিয়া দিন-তারিখ তো সব ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু এক মুশকিল দেখা গেল, কেদারনাথের গ্রন্থাগারে একজন সাধুর আগমন হইবে, অথচ সেখানে দেওয়ালে টাঙ্গানো যে-সব ছবি আছে, তাহা এই উপলক্ষে বড়ই বেমানান। অবশেষে স্থির হইল, চারুচন্দ্রের কাছে নিরঞ্জনানন্দজীরই উপহৃত একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ছিল, সেইখানা কেদারনাথের গ্রন্থাগারে ঐ দিন আনা হইবে। কেদারনাথ ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ছবি কোথাও দেখেন নাই। প্রস্তাবটিতে সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন। নিরঞ্জনানন্দজী সন্ধ্যার পরে আগমন করিবেন, সুতরাং তৎপূর্বেই ছবি আনিয়া একটি সুসজ্জিত স্থানে রাখা হইল। যুবকরা সকলেই ফুল-মালা সংগ্রহ করিতে বা অভ্যর্থনাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিতে এদিক-ওদিক চলিয়া গিয়াছেন—কেবলমাত্র কেদারনাথই ঘরে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতির সম্মুখে ধূপ-দীপ জ্বালিবার ভার লইয়াছেন। আলেখ্যখানির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই কেদারনাথ কী যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দীপ হস্তে কেদারনাথ প্রতিকৃতির দিকে নিস্পন্দ অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। তাঁহার সেই আনন্দ-অনুভূতির কথা উত্তরকালে তিনি নিজমুখে যেরূপ বলিতেন, সেইরূপই এখানে প্রকাশিত হইতেছে :

"ছবিখানি দেখে আমার এত ভাল লাগল—কি বলব! আমার মনে

হল, যেন আমার বহুকালের ও অতি পরিচিত আপনার। ওঁরা ছবি রেখে মালা আনতে গেছেন, আমি Library-তে একলাটি বসে ছবিটির দিকে বার বার তাকাচ্ছি। মনে হল, যেন ছবিটি জীবন্ত—আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন। আমি যেদিকে মুখ ফেরাচ্ছি, সেইদিকেই যেন মূর্তিটি এসে আমার সামনে বসছেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ চলার পর, আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। তিনি যে ভগবান, কি মহাপুরুষ—এইসব ভাবনা তখনও আমার মনে মোটেই উদয় হয়নি, কেবল মনে হল, আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের দর্শন পেয়ে আজ যেন কৃতকৃতার্থ হলাম।"

কেদারনাথের 'বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন' সেইদিন হইতেই তাঁহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। সত্য বলিতে কি, তখন হইতেই তাঁহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-লক্ষ্য সবই যেন এক নূতন রূপে তাঁহার কাছে ধরা দিতে থাকিল। রাত্রের দিকে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী আসিয়া কেদারনাথের গ্রন্থাগার-কক্ষে পদার্পণ করিলেন। কেদারনাথই লণ্ঠন হাতে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ঘরে আনিয়া বসাইয়াছিলেন। যুবকগোষ্ঠীর সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না—শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সাক্ষাৎ পার্ষদকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের মধ্যে পাইয়া, যুগাবতারের অনেক কথা তাঁহার মুখে শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইয়াছিল। উন্নতদেহ সৌম্য-সুদর্শন সেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই কেদারনাথ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যাঁহার প্রতিকৃতি মাত্র দর্শন করিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাঁহারই একজন সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, যেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণেরই একখানি সজীব প্রতিচ্ছায়া বলিয়া অন্তরে অনুভব করিলেন। জীবনের সেই পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করিয়া বৃদ্ধবয়সেও তাঁহাকে রোমাঞ্চিত হইতে দেখা যাইত। তাঁহার স্মৃতিপ্রসঙ্গ এইরূপ:

"নিরঞ্জন স্বামীকে দর্শন করে আমার বেশ লাগল। লম্বা-চওড়া, গৌরবর্ণ চেহারাখানি! গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল! গেরুয়া রঙের লম্বা একটি আলখাল্লা গায়ে। দেখতে কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল। প্রথম দর্শনেই মনে হল,—বাঃ বেশ সাধু তো! শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য তো বেশ সুন্দর! তাঁকে দর্শন করেই ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা হল।"

স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী যুবকদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বলিয়া তাঁহাদিগকে খুবই মাতাইয়া দিলেন। কেদারনাথ তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণের দিকেই উত্তরোত্তর

অগ্রসর হইতে থাকিলেন। সংসার ও সরকারী কার্য ক্রমশঃই পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছিল। ছবিখানি কিন্তু আর ফেরৎ দেওয়া হয় নাই—কেদারনাথেরই অন্তর-দেবতা হইয়া তাঁহার গ্রন্থাগার-কক্ষে বিরাজিত থাকিল। নিত্য সন্ধ্যায় ধূপ দীপ দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আলেখ্যের সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গভীর রাত্রেও উহারই সম্মুখে ধ্যান করিতেন। নিরঞ্জনানন্দজীও তখন হইতে প্রত্যহ সকালে একবার করিয়া কেদারনাথের কক্ষে আসিয়া খুব উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়া যাইতেন। কেদারনাথের ধ্যান-ধারণাদির আগ্রহ বাড়িয়াই চলিল। কিন্তু অন্তরে বড়ই এক অস্বস্তি তিনি বোধ করিতে আরম্ভ করিলেন—আফিসের কাজকর্ম চুকাইয়া দিনান্তে গৃহে আসিয়া যখন ধ্যান-চিন্তা করিতে বসিতেন, তখনও মনের মধ্যে আফিসের কাগজপত্র-জঞ্জাল ভাসিয়া ওঠে। একদিকে একান্ত ভগবচ্চিন্তার জন্য ব্যাকুলতা, আর অন্যদিকে সরকারী কার্যের দায়িত্ব-ভাবনা,—এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে তরুণ কেদারনাথ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অগত্যা সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়া, নিজেকে সবতোভাবে অধ্যাত্ম-চর্চাতেই নিয়োজিত করিতে মনস্থ করিলেন। নিরঞ্জনানন্দজীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্চর্য ত্যাগ-বৈরাগ্যোজ্জ্বল কাহিনী নিত্য শুনিতে শুনিতে, কেদারনাথের চিত্তেও ক্রমশঃ বিষয়-বৈরাগ্যের ছাপ পড়িতে থাকিল। এই ভাবেই কেদারনাথ মৌলিকের মনের পট হইতে মোহকর পুলিশী জলুস অদৃশ্য হইয়া, উহাতে ত্যাগের গৈরিকাভা ফুটিয়া উঠিতে থাকিল।

কয়েক দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের পুণ্য তিথি সমাগত হইল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কথাই হইতেছে। কেদারনাথ ও তাঁহার বন্ধুরা ইচ্ছা করিলেন যে, নিরঞ্জনানন্দজীর পবিত্র সান্নিধ্যে তাঁহারা ঐ শুভদিনটি উদ্‌যাপন করিবেন। নিরঞ্জনানন্দজীও যুবকদের আগ্রহ দেখিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন। কেদারনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা উৎসাহান্বিত হইয়া ঠাকুরের পূজা-উৎসবের সকল আয়োজন করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে পূর্বোক্ত সেই গ্রন্থাগার-কক্ষেই অপূর্ব এক আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-তিথিপূজা সম্পন্ন হইল। স্বয়ং নিরঞ্জন মহারাজ ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম ইত্যাদি করিলেন। বস্তুতঃ বারাণসীধামে ইহাই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ সন্তানের পৌরোহিত্যে কেদারনাথের ভবনেই উহা সম্পন্ন

হয়। স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী পূজাশেষে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তরুণ ভক্তরা ও সমাগত সকলেই সেদিন খুব উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রসাদবিতরণও হইয়াছিল।

কাশীধামে কিছুদিন তপস্যাদিতে অতিবাহিত করিয়া নিরঞ্জন মহারাজ হরিদ্বারে চলিয়া যান। কেদারনাথের মনে ওত দিনে বৈরাগ্যের অনল জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাগারের সেই বন্ধু-সমাবেশে তখন হইতে নিয়মিত সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা এবং স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ' ইত্যাদি পাঠ হইত। ঠাকুর-স্বামিজীর কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয় আর যুবকদের মনে স্থান পাইত না। কেদারনাথও খুব তীব্র অধ্যবসায় লইয়া ধ্যান-চিন্তা ও স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এতদিনে তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছেন বলা চলে। ঐ কালের আর একটি ঘটনা-পারম্পর্য বড়ই তাৎপর্যময়। স্বামিজীর প্রিয়শিষ্য কল্যাণানন্দ তখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে কাশীধামে আসিয়াছিলেন। মঠ হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ একখানি পরিচয়-লিপি তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দের নিকট শুদ্ধানন্দ স্বামীর পরিচয়-পত্র দেখিয়া কেদারনাথ তাঁহাকে স্বগৃহে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেদারনাথের বাড়ী সত্যই তখন একটি আশ্রমে পরিণত হইল। তাঁহার সঙ্গীদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা ইহাতে খুব বৃদ্ধি পাইল। কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া, তদীয় আচার্য স্বামিজীর কথা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার মুখে শুনিবার সুযোগ পাইয়া, কেদারনাথের বৈরাগ্য তখন চরমে উঠিয়াছিল। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবনকে উৎসর্গ করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, স্বামিজীর এই বাণী কল্যাণানন্দের কাছে অহর্নিশ শুনিয়া, কেদারনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন—সংসার-জাল হইতে বহির্গত হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কল্যাণ স্বামীর নিকট হইতে স্বামিজীর সেবাদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া, কেদারনাথ ও যামিনী মজুমদার-প্রমুখ তাঁহার সঙ্গীরা মিলিয়া আর্ত অসহায় ও পীড়িতের সেবায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। পথের ধারে একদিন একটি অনাথা বৃদ্ধাকে মরণোন্মুখ দেখিয়া তাঁহারা নিজেরাই ডুলি করিয়া বহন করিয়া ভেলপুরার হাসপাতালে লইয়া যান। বৃদ্ধার অবস্থা

এতই শোচনীয় ছিল যে সেই হাসপাতাল তাহাকে ভর্তি করিতে রাজী হইল না, নিরুপায় যুবকগণ পুনরায় ডুলি করিয়া বৃদ্ধাকে চৌকাঘাট হাসপাতালে ভর্তি করিয়া, সেবা-শুশ্রূষার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অনাথ আতুর দেখিলেই তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া সেবা করিতে লাগিয়া যাইতেন, প্রয়োজনক্ষেত্রে এই সেবার জন্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারে ভিক্ষাও করিতেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকিল, কেদারনাথ ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন।

একদিন হঠাৎ চারুচন্দ্র কেদারনাথকে বলিয়া বসিলেন, "আর কেন? এবার বেরিয়ে পড়ুন না!" কেদারনাথের প্রাণে কথাটা খুব লাগিয়া গেল। চারুচন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়া, স্থির করিয়া ফেলিলেন, আর দেরী করা চলে না। কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন? কে দিবেন পথের সন্ধান? মনে পড়িয়া গেল, হরিদ্বারে তো নিরঞ্জনানন্দজী আছেন—তিনিই তো সর্বপ্রথম বৈরাগ্যের বার্তা কানে দিয়াছিলেন। স্মরণ হইল, নিরঞ্জন মহারাজ একদিন খুব উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে তখন অনেক সব ভক্তরা যাতায়াত করতেন—তাঁদের মধ্যে যাদের অল্প বয়স, ভক্তিমান, সরল প্রকৃতির,—যাদের মনে সংসারের কোন রকম ছাপ পড়েনি, তাদের মধ্যে যদি কেউ বলত—'আমি বিয়ে করব না,' তা তিনি শুনে এতই খুশী হতেন যে তাকে কাঁধে করে আনন্দে নাচতেন।" সুহৃদ চারুচন্দ্রের কাছে কেদারনাথ তাঁহার মনোগত ভাবটি প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। চারুচন্দ্রও ইহাতে আনন্দিত হইয়া বন্ধুর জন্য নিরঞ্জনানন্দজীকে হরিদ্বারে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন! নিরঞ্জন মহারাজ প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও, চারুচন্দ্র পুনরায় লেখাতে এবং কেদারনাথের বৈরাগ্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে স্বয়ং নিঃসংশয় হইয়া, পরে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কেদারকে সঙ্গে একখানি গেরুয়া কাপড় ও একটি কমণ্ডলু লইয়া যাইতেও তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে কেদারনাথ সকলের অগোচরে একদিন হরিদ্বারের পথে যাত্রা করিলেন। ১৮৯৯-এর আগষ্ট মাসের কোন এক দিন তিনি নিরঞ্জন মহারাজের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াই বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছি।" হরিদ্বার ষ্টেশনেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—নিরঞ্জনানন্দজী স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন কেদারনাথকে লইয়া যাইতে।

হরিদ্বারের অদূরে কনখলে বর্তমান মহানন্দ মিশনের বিপরীত দিকে একটি জীর্ণ দোতালা বাড়ীর একটি ঘরে নিরঞ্জনানন্দজী থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন। কেদারনাথও ঐ বাড়ীতে তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইলেন। পৌঁছিবার পরের দিনই, নিরঞ্জনানন্দজী কেদারনাথকে ডাকিয়া ঠাকুরের চরণামৃত পান করাইয়া, একখানি গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "ঠাকুরের নাম জপ করো।" নিরঞ্জনানন্দজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিতেও কেদার শিখিয়া লইলেন। তবে নিরঞ্জন স্বামীর শরীর তখন বিশেষ ভাল যাইতেছিল না—পাঁচ-সাত দিন পরেই তাঁহাকে নামিয়া কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। কেদারনাথ তখন একাই ছিলেন। একদিন দুপুরে ছত্রে ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন—ছত্রের কুঠারী তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়া বসিলেন, "বসে থাকো এখন। সাধুদের ভিক্ষা দিয়ে যদি কিছু বাঁচে তো, কাঙ্গালীদের দেবার সময় পাবে।" কুঠারীর এই উক্তিতে কেদারনাথের মনে হইল, সামান্য দুইটুকরা রুটির জন্য অবশেষে কাঙ্গালীর দলে ভিড়িতে হইবে! অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল সেদিন। নিরঞ্জন মহারাজও কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন—সুতরাং নিঃসঙ্গ সাধুজীবনের একটি লাঞ্ছিত বেদনা যেন বুকের মধ্যে বার বার মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। সেদিন ছত্র হইতে ভিক্ষা না লইয়াই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—প্রায় পাঁচ-ছয়দিন আর তিনি ছত্রে যান নাই। কয়েকজন ভক্ত এই অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে কয়দিন ভোজন করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরে আবার যখন ছত্রে গিয়াছিলেন, তখন আর কোন অসুবিধা হয় নাই। হরিদ্বারে জমাট বাঁধা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কেদারনাথের মন উত্তরোত্তর শান্তিতে ভরিয়া উঠিতে থাকিল। নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান-ধারণাদি করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন। উত্তরকালে এই দিনগুলি স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেন :

"হরিদ্বার-কনখলের atmosphere আমার খুব ভাল লাগছিল। লোকজন খুবই কম। এদিকে গঙ্গা কুলকুল বইছে। সামনে হিমালয়। মন স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হয়ে যায়। আমি থাকতাম সেই বাড়ীটির সবচেয়ে উপরের ঘরটিতে। ওখান থেকে চারধার বেশ সুন্দর দেখাত। আর বেশ মনোরম নির্জন স্থান। আমি ঐ ঘরটিতে বসে ধ্যান করতাম—আর আমার যেন মনে হত এখানে

পাঁচ বৎসর তপস্যা করলে ভগবান লাভ নিশ্চয়ই হবে। সত্যি বলছি, আমার তখন ঐ রকমই মনে হত।"

প্রায় আড়াই মাস এইভাবে কনখলে থাকিয়া সাধন-ভজন চলিল। কেদারনাথ হঠাৎ সংবাদ পাইলেন নিরঞ্জনানন্দজী কলিকাতায় রক্তামাশয় রোগে দারুণ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। নিরঞ্জনানন্দজী পত্র দিয়া জানাইলেন, "আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেবাদির অসুবিধা হইতেছে—তুমি চলিয়া আসিলে ভাল হয়।" কেদারনাথ অস্থির হইয়া কলিকাতাতে ছুটিয়া আসিলেন। কাশীতে ষ্টেশনে আসিয়া চারুচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। কাশী হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত দুই বন্ধু একসঙ্গেই আসিয়াছিলেন—পরে কেদারনাথকে কলিকাতার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, চারুচন্দ্র কাশী ফিরিয়া গিয়াছিলেন।[১] নিরঞ্জন মহারাজ তখন ভবানীচরণ দত্ত লেনে মাষ্টার মহাশয়ের একখানি ভাড়াবাড়ীতে থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী-প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণই তাঁহার চিকিৎসাদির তদারক করিতেন। কেদারনাথ এই বাড়ীর দরজায় পৌছিতেই, যিনি তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে নিরঞ্জনানন্দজীর কক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই 'কথামৃত'-কার শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়। কেদারনাথকে পাইয়া নিরঞ্জন মহারাজ খুব খুশী হইয়াছিলেন। কেদারও প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা—কেদারনাথ এখানেই সর্বপ্রথম স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপূর্ব ভাবমণ্ডিত রূপ কেদারনাথকে বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোন অছিলায় যদি তাঁহার সঙ্গে একটু আলাপ করিবার সুযোগ হয়। সুযোগ অবশেষে একদিন মহারাজ নিজেই দিলেন। নিরঞ্জন মহারাজের পাশে একটি তক্তাপোশের উপর শয়ন করিয়া একদিন তিনি নিজেই ডাকিলেন, "আচ্ছা, আমার শরীরটা একটু টিপে দাও তো দেখি।" কেদারনাথ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন—খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজের গা-হাত-পা টিপিয়া দিতে থাকিলেন। মহারাজ সহসা

১ তখন Oudh Rly-ছিল। কলিকাতা হইতে একটানা দেরাদুন পর্যন্ত তখনও রেল হয় নাই

তাঁহার একখানি হাত টানিয়া, নিজের হাতের উপর রাখিয়া ওজন করিয়া কি দেখিলেন—পরে বলিলেন, "বাঃ, বেশ বেশ। একটু কিছু করলেই হবে।" মহারাজের এই অযাচিত আশীর্বাদ স্মরণ করিয়া তিনি পরে প্রায়ই বলিতেন, "গা টিপিবার অছিলা করে নিজের কাছে টেনে নিলেন, আর অল্পক্ষণের ঐ ভালবাসা দিয়ে আমায় তিনি চিরতরে বেঁধে ফেললেন।"

নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের দীর্ঘকালস্থায়ী কঠিন রোগের চিকিৎসা এবং তাঁহার দুর্বল শরীরের সেবা-শুশ্রূষাদির সব ভার কেদারনাথের পক্ষে দিবারাত্রি বহন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। মঠ হইতে স্বামী বোধানন্দ আসিয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অখিল মিস্ত্রী লেনের একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, নিরঞ্জন মহারাজকে সেখানে রাখিয়াই চিকিৎসা করাইবার বন্দোবস্ত হইল এবং অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দজী তাঁহার সেবাদির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।। বোধানন্দ ও কেদারনাথ তখন বলরাম-মন্দির হইয়া মঠে ফিরিয়া গেলেন। এই বলরাম-মন্দিরেই কেদারনাথ স্বামী সারদানন্দজীকে প্রথম দর্শন করে। সারদানন্দজী ঠিক সেই সময়ে বরিশাল যাইবার জন্য যাত্রা করিতেছিলেন। মঠে গিয়া কয়েকদিন বাস করিয়া, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতি লইয়া কেদারনাথ কিছুদিনের জন্য আবার কাশীতে গিয়াছিলেন।

গৈরিক বসনে কাশীতে গেলে, বাড়ীর লোকজন অকারণ হৈ-চৈ করিবে—এই ভাবিয়া কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া গেরুয়া পরিবর্তন করিয়া সাদা ধুতি পরিধান করিয়াছিলেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিলে, পিতা ও পিতামহ এবং বন্ধুরা খুব আহ্লাদিত হইলেন সন্দেহ নাই। তবে বাড়ীর আত্মীয়-পরিজনরা কেহ কেহ তাঁহাকে তিরস্কারও করিলেন। কেদারনাথ বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিবার পরেই, কিন্তু হাঁপাইয়া উঠিলেন। পুনরায় নিরঞ্জন মহারাজকে পত্র দিয়া মানসিক বৃত্তান্ত সব খুলিয়া জানাইলেন। উত্তরে তিনি কেদারনাথকে জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনিও তদনুযায়ী শ্রীধাম কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটীতে গিয়া জগজ্জননীর চরণসকাশে উপনীত হইলেন। মাতৃ-সন্নিধিতে কেদারনাথ পরম আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া দুইমাস

অতিক্রান্ত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা কেদারনাথকে দেখিয়াই নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এ ছেলেটি সাধু হবে।"

জয়রামবাটী হইতে কাশীর পথে আবার তিনি কলিকাতা আসিলেন। নানা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কেদারনাথ তখনও বোধহয় স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়ঃ, অথবা ব্রহ্মচারীর ব্রত ধারণ করিয়া সংসারের মধ্যেই থাকা ভাল। সাদা কাপড় পরিয়া একদিন বলরাম-মন্দিরে গিযা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করিতেই, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ বেশ। কখনও লাল, কখনও সাদা। এ বেশ!—কি বল?"

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন। কেদারনাথ আবার কাশীতেই ফিরিয়া আসিলেন। সকলেই আবার তাঁহাকে পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন—যুবক-গোষ্ঠীর তো কথাই নাই। এদিকে বন্ধু যামিনী ও চারুচন্দ্রের উৎসাহে কাশীতে রীতিমতো একটি সেবা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল। কাশীতে তখন ধর্মশালা-ওয়ালা পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের প্রতি বড়ই নির্মম ব্যবহার করিত। যতক্ষণ কাহারও সামর্থ্য ও অর্থ থাকিত, ততক্ষণ তাঁহাকে খুব আদর যত্ন দেখাইত ও ধর্মশালায় রাখিত। আর যখনই কোন বিদ্যার্থী বা তীর্থবাসী অসুস্থ হইয়া পড়িতেন, তখনই পাণ্ডারা রোগীর পয়সা-কড়ি সব কাড়িয়া লইয়া, একেবারে নিঃসম্বল করিয়া তাঁহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিত। কাশীতে তীর্থবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। সুতরাং এইসব অসহায় রোগীর মর্মন্তুদ অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তখনকার দিনে কাশীর পথে-ঘাটে এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রায়শঃই সকলের চোখে পড়িত—এক ফোঁটা জলের জন্য বা একটু পথ্যের জন্য মানুষ রাস্তায় পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে, কেহবা মৃত্যুকেই বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কেদারনাথ ও তাঁহার সহযোগী বন্ধুরা দীন-দরিদ্র বা আর্ত-পীড়িত কেহ কোথাও অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছেন শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ইহার জন্য নিয়মিত ভাবে একটি সংগঠনকার্য, সকলের অজ্ঞাতেই গড়িয়া উঠিতেছিল—আর সংগঠন-কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় হইল কেদারনাথেরই গ্রন্থাগার-কক্ষ। সংগঠনের জন্য মূল কার্য ছিল তিনটি—প্রথমতঃ, নিয়মিতভাবে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী হইতে পাঠ-আলোচনা, ও ধ্যানধারণাদি সহায়ে সেবার মূল আদর্শটিকে স্ব স্ব জীবনে

উদ্দীপিত রাখা , দ্বিতীয়তঃ, নরের মাঝেই নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, এই তত্ত্বটির বাস্তব প্রয়োগ, অর্থাৎ নররূপী নারায়ণের সেবায় নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ করা ; এবং তৃতীয়তঃ, স্বামিজী-প্রচারিত এই সেবাদর্শের প্রচারণা ও উহাকে কার্যকরী করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ ও সহানুভূতি ভিক্ষা।

তাঁহাদের সেবাসমিতিটি প্রথমে 'Home of Relief' (সাহায্যাশ্রম) নামেই পরিচিত ছিল—পরে ধীরে ধীরে সংগঠিত হইয়া নাম হইয়াছিল 'Poor Men's Relief Association' (অনাথাশ্রম)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে সমিতির জন্য ডি ৩২/৮২ জঙ্গমবাড়ীতে মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়ায় তিনখানি ঘর লওয়া হইল। এখন হইতে অনাথাশ্রমের কার্যালয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়, রোগীদের জন্য সেবায়তন ইত্যাদি ঐ ঘর তিনটির মধ্যেই পরিচালিত হইতে থাকিল। কাশীধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ইহাই হইল অঙ্কুরাবস্থা। কেদারনাথের গ্রন্থাগার-কক্ষে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, উহাই অঙ্কুরিত-পল্লবিত হইয়া, শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া কাশী সেবাশ্রম (Home of Service) রূপে কালে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ইতোমধ্যে কেদারনাথের গৃহাকাশে বেশ একটু অশান্তির কালো মেঘ কিছুদিন ধরিযাই আনাগোনা শুরু করিয়াছিল। অবশ্য তাহাতে কেদারনাথের জীবনে বৈরাগ্যের প্রচণ্ড বর্ষণই আনয়ন করিয়াছিল। একদিন বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন যে, বৃদ্ধ পিতামহের পূজার আসনে আলো জালিবার লোক নাই এই অজুহাত ধরিয়া তাঁহার এক জেঠতুত ভাই বাড়ীতে বেশ গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন। কেদারনাথের সংসার ঔদাসীন্য, অনাথাশ্রমের কাজে যোগদান, এবং ধ্যান-ভজনে সময় অতিবাহিত কবা, বাড়ীর পরিজনদের নিকট চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল। জেঠতুত ভাইটি ইহা লইয়া তুমুল বাধাইয়া কেদারনাথের বিমাতার সহযোগে তাঁহার পিতাকে খুবই উত্তেজিত করিয়া তোলেন। পিতা সেদিন পুত্রকে সোজাসুজি জানাইয়া দিলেন যে, গৃহে থাকিয়া এরূপ চালচলন চলিবে না, এরূপ করিতে হইলে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। কেদারনাথও মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেওয়াল হইতে সেই ঠাকুরের ছবিখানি খুলিয়া সঙ্গে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেইরাত্রে কোথায় আর যাইবেন—বন্ধু চারুচন্দ্রের বাড়ীতেই আসিয়া উঠিলেন। কেদারনাথের ইহাই হইল সংসার হইতে চিরবিদায়। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "ভেবেছিলাম

আমার আর সাধু হওয়া হবে না। বিয়ে-থা না করে, সংসারে স্বাধীনভাবে সদালোচনা নিয়ে দিন কাটিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবলে কি হবে? ঠাকুর আমায় এমন এক পরিস্থিতিতে ফেললেন যে আমায় বাধ্য হয়ে সংসারের বাইরে আসতে হল। বাস্তবিকই ঐ রকম ঘটনা না ঘটলে হয়তো স্বামিজী মহারাজের কৃপালাভ আমার ভাগ্যে হত না।"

অতঃপর কাশীধামেই ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ভগ্ন শিব মন্দিরে বাস করিয়া কেদারনাথ আপন সাধন ভজন লইয়া নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সঙ্গে আনীত ঠাকুরের ছবিটি বসাইয়া, অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়া তিনি নিত্য পূজা করিতেন, আরতি করিতেন ও প্রার্থনা-ভজনাদিতে পরম আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। আবার নিয়মিতভাবে অনাথাশ্রমের কাজেও গিয়া বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেন। তখন তো মেথর রাখিবার সঙ্গতিও তাঁহাদের ছিল না —নিজেরাই রোগীদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন, পথ্য প্রস্তুত করিতেন, ঔষধ সেবন করাইতেন।

এদিকে তখন রাজপুতানার কিষেণগড়ে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। স্বামী কল্যাণানন্দ সেখানে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের সেবা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায়, লোকাভাবে সেখানকার সেবাকার্যের বিঘ্ন সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইতেছিল। চারুচন্দ্রকে তিনি এই সংবাদ জানাইলে, তিনি ক্ষেমেশ্বর ঘাটে ছুটিয়া আসিয়া কেদারনাথকে ঐ পত্র দেখান। কেদারনাথ কিষেণগড়ে গিয়া কল্যাণানন্দের কার্যে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করিয়া, চারুচন্দ্রকে বলিলেন যে, তিনি যেন কল্যাণ স্বামীকে লিখিয়া দেন যে, কাশী হইতে লোক যাইতেছে।

কেদারনাথ এইবার কল্যাণানন্দের বাহিনীতে কিষেণগড়-সেবাকার্যে আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু সেখানকার প্রচণ্ড পরিশ্রমে কিছুদিন পরেই তাঁহার শরীর খুব ভাঙ্গিয়া পড়িল—খারাপ ধরনের রক্তামাশয় রোগে তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কল্যাণানন্দ তো মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন—কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া কেদারনাথকেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাশীতে তাঁহার পিতাকে তার করা সঙ্গত কিনা। কেদারনাথ জানাইলেন যে, চারুচন্দ্রকেই সংবাদ দেওয়া হউক। চারুচন্দ্র কাশীতে এই সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়েন। মহানন্দ কবিরাজ নামে অনাথাশ্রমেরই এক হিতৈষী

কর্মি-কবিরাজের কিছু ঔষধ তিনি ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন। যাহা হউক, সেই ঔষধ সেবনেই কেদারনাথ আরোগ্যলাভ করেন। কিষেণগড়ে বসিয়া কল্যাণানন্দ ও কেদারনাথ খবর পাইলেন যে কাশীতে ক্ষেমেশ্বর ঘাটের সেই পুরাতন আস্তানাটিতে শুদ্ধানন্দপ্রমুখ আরও কে কে আসিয়া দুর্গাপূজা করিতেছেন। এই সংবাদে ইহারাও উৎসাহিত হইয়া কিষেণগড়ে ঘটস্থাপনা করিয়া অনাথ শিশুদের লইয়া দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। ক্রমে কিষেণগড়ের সেবাকার্য সমাপ্ত হইলে, কেদারনাথ জয়পুর, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে করিতে কাশীতে ফিরিয়া আসেন। কল্যাণানন্দও বৃন্দাবন পর্যন্ত একই সঙ্গে আসিয়াছিলেন—পরে তিনি পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থান ও হরিদ্বার হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। কেদারনাথ বৃন্দাবনে থাকিতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কল্যাণানন্দকে মঠ হইতে সারদানন্দজী পত্র লিখিয়াছিলেন: "স্বামিজীকে ইচ্ছা করিলে তোমরা এখন দর্শন করিতে পার। কেদারও আসিতে পারে।"

কাশীতে আগমন করিয়া কেদারনাথ দেখিলেন, অনাথাশ্রমের কাজ বেশ আগাইয়া চলিয়াছে। ক্রমে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টি যুবকদের সেবাব্রতের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কাশীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে সভাপতি করিয়া যুবকগণ ইতোমধ্যে একটি কার্যনির্বাহক সমিতিও গঠন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেদারনাথ এই সমিতির একজন বিশিষ্ট অঙ্গ ছিলেন। বন্ধু চারুচন্দ্রের অক্লান্ত উত্তম ও প্রচেষ্টা দেখিয়া কেদারনাথ স্থির করিলেন যে, এই সময়ে মঠে যাওয়া অপেক্ষা কাশীতে থাকিয়া চারুচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করাই বেশী কর্তব্য। সুতরাং কল্যাণানন্দ মঠে চলিয়া গেলেও, কেদারনাথ অনাথাশ্রমের কার্যে কাশীতেই থাকিয়া গেলেন। তাঁহাদের সকলেরই অতন্দ্র সেবানিষ্ঠার ফলে অনাথাশ্রমও ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইতে থাকিল। ১৯০১-এর ফেব্রুআরি মাসে তাই স্থান সঙ্কুলানের জন্য উহাকে ২২৭, দশাশ্বমেধ রোডের একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। মাসিক ভাড়া স্থির হইয়াছিল ১২ টাকা। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কার্যকে এখানেও আবদ্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরবর্তী জুন মাসেই তাই উহাকে ডি ৩৮।১৫৩ রামাপুরাতে একটি পুরাতন কিন্তু প্রশস্ত ভবনে আবার স্থানান্তর করা হইল। বর্তমান বাড়ীতে

দশ-বারো জন রোগীর জন্য ব্যবস্থা ভালই চলিত। উপরতলায় কেদারনাথ ও আর আর সেবক-কর্মীরা থাকিতেন। জানা যায়, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও শিবানন্দজী এই বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া যুবকদের খুব উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াছিলেন।

স্বামিজী তখন বেলুড়মঠে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর সেবাব্রতী যুবকগণ তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া কেমন আশ্চর্য সব কার্য সেখানে করিতেছেন, এ-সংবাদ নানা সূত্রে তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। কাশী হইতে কেহ মঠে গেলে, তিনি খুব আগ্রহ সহকারে এই নবীন অনুরাগীদের খোঁজখবর লইতেন, তাঁহাদের কার্যেরও প্রশংসা করিতেন। এই তরুণদলের অন্যতম যামিনী মজুমদার একদা স্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে গিয়াছিলেন। যামিনীর সহিত কথা বলিয়া, তাঁহার আদর্শানুরাগ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। যামিনীর মুখে স্বামিজী কাশীর অনাথাশ্রম ও কর্মী ছেলেদের সম্পর্কে সবিশেষ সব শুনিয়া খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন আশ্রম ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।" স্বামিজীর কৃপাদৃষ্টি এই যুবকদের উপর এতখানি বর্ষিত হইয়াছিল যে, মঠ হইতে একবার নির্মলানন্দকে প্রেরণ করিয়া কাশীর অনাথাশ্রম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত সব সংবাদ লইয়াছিলেন। আর একবার তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার Spirit-এ কিছু কাজ করছে।" কাশীতে যুবকগণ এতদিন যাঁহাকে শুধু কল্পনার বিগ্রহ করিয়াই রাখিযাছিলেন, এখন যেন তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাঁহাদের সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। "যাঁরে না দেখে নাম শুনেই কানে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল।" না-দেখা সেই আশ্চর্য বৈদ্যুতিক আকর্ষণ কেদারনাথকেও এবার বেলুড়ের দিকে নিশ্চিতই টানিল—তিনি অনাথাশ্রম হইতে দুই সপ্তাহের অবকাশ লইয়া বেলুড়ে চলিয়া আসিলেন। তখন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। শারদীয়া মহাপূজার ষষ্ঠীর দিন কেদারনাথ মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কেদারনাথ মঠে আগমন করিলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া স্বামিজীর কাছে পরিচয় করাইয়া দিলেন। মঠবাড়ীর ভিতরে

স্বামিজী নিজের ঘরেই তখন ছিলেন—কেদারনাথ তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মুণ্ডিতশির, কেবলমাত্র কৌপীনধারী, অনঙ্গভূষণ, জ্যোতির্ময় সদাশিবের মতো স্বামিজীর সেদিনের দিব্যমূর্তি কেদারনাথের মানসপটে নিত্যকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মুখে কেদারনাথের পরিচয় শুনিয়া, খুব প্রসন্ন মুখে তাঁহাকে নানাবিধ কুশল-প্রশ্নাদি ও কাশীর সব সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর ইচ্ছানুযায়ী বেলুড়মঠে সেইবারেই সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেদারনাথের জীবনে ইহাও এক সৌভাগ্যের পরিচায়ক যে, স্বামিজীর উপস্থিতিতে তিনি মঠে মহামায়ার অর্চনা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই কালের অনেক স্মৃতি-কথা তাঁহার মুখে পরে শোনা যাইত। পূজার মধ্যে স্বামিজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন—অষ্টমী পূজার দিন হইতেই জ্বর খুব বৃদ্ধি পায়, বোধহয় ১০৫° পর্যন্ত উঠিত। কিন্তু আশ্চর্য এই, ব্যাধির সাধ্য ছিল না যে তাঁহার মুখের আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্নতাকে কিছুমাত্র ম্লান করিয়া দেয়। দুর্গাপূজা-লক্ষ্মীপূজা অন্তে যথাকালে কালীপূজাও অনুষ্ঠিত হইল। কেদারনাথের জীবনে এই দিনের স্মৃতিচিত্রটি একটি অবিস্মরণীয় ধ্যানের বস্তু ছিল। তাঁহার স্বলিখিত স্মৃতি: "সে-বার কালীপূজায় যে আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কালীপূজার দিন প্রথম রাত্রে—তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই—স্বামিজী পূজা-মণ্ডপে ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিল না। অনেকক্ষণ এই ভাবে চলিবার পর স্বামিজীর সংজ্ঞা ফিরিতেছে না দেখিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাঁহার কানে বারবার ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।" কেদারনাথ সমাধির কথা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমাধি স্বচক্ষে দেখিবার সুকৃতি ইতঃপূর্বে কখনও হয় নাই।

কেদারনাথ পরম আনন্দে স্বামিজীর পবিত্র সান্নিধ্যে মঠবাস করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও তাহার ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে একটু বিশেষ স্নেহই দেখাইতেছিলেন। আদর করিয়া তাঁহাকে তিনি 'কেদার-বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। কাশী হইতে মাত্র দুই সপ্তাহের কথা বলিয়া কেদার-বাবা মঠে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর ভালবাসার টানে দুই সপ্তাহ কবে

উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিছুই ঠিকঠিকানা ছিল না—স্বামিজীও অনুরক্ত ভাবী শিষ্যকে নিজের কাছে আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। কেদারবাবার এই যাত্রা প্রায় নয় মাস মঠবাস হইয়াছিল। স্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবাধিকারলাভও তাঁহার এই কালের অতিশয় স্মরণীয় ঘটনা। কেদার-বাবা পরবর্তী জীবনে অতীতের এই দিনগুলি স্মরণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইতেন। স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া যাইতে দেখা যাইত। তাঁহার স্বামিজীর স্মৃতি-প্রসঙ্গ হইতে কিছু উদ্ধৃতি :

"পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের আমাদের প্রতি যে কী গভীর ভালবাসা ছিল—তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়। আমার পক্ষে তাহার গভীরতার পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।...তাহা মুখে বা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কেবল অনুভব করা যাইতে পারে।...শ্রীশ্রীমার পরে স্বামিজী মহা-রাজের ভালবাসা আমাকে অভিভূত করিয়াছিল।...তাঁহার ভালবাসা কেবল-মাত্র মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও তাঁহার কী গভীর ভালবাসা ছিল!"

মঠে থাকাকালে কেদারবাবা একবার সামান্য অসুস্থ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। স্বামিজীর কাছে তাই দুই চার দিন আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি স্বামিজীর কী অহেতুক স্নেহ ছিল! অন্য সেবকের হাত দিয়া কেদারবাবার জন্য বেদানা বা কোন ফল পথ্য নিজেই পাঠাইয়া দিতেন। হয়তো আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে মনে পড়িয়া গিয়াছে, অমনিই সেই খাবার কোন সেবকের হাতে পাঠাইয়া, কেদারবাবাকে দিয়া আসিতে বলিতেন। স্বামিজীর এই শিষ্যবৎসলতার কথা স্মরণ করিয়া কেদারবাবা পরে একদা বলিয়াছিলেন, "একটি ঘটনার দ্বারা তাঁহার ভালবাসার উদাহরণ দিতেছি। একবার কানাই মহারাজ (নির্ভয়ানন্দ) তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে স্বামিজী অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে শান্ত হইয়া শুইয়া থাকেন। পরে কানাই মহারাজ আপনা হইতে নিদ্রোত্থিত হইলে, তবে তিনি উঠিলেন।"

স্বামিজী একদিন কেদারবাবাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা তুই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারিস? তুই যা চাস্, তোকে আমি তাই দেব।"...স্নেহমাখা এই উক্তিগুলির মধ্যে একটা গভীর প্রাণস্পর্শ অনুভব করা যায়—যাহা কেদার-

বাবাকে নিশ্চিতই অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামিজী ছিলেন অহেতুক কৃপাসিন্ধু। একদিন মঠবাড়ীর একতলার বারান্দায় তিনি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন—কাছেই স্বামী শিবানন্দজীও ছিলেন। কেদারবাবা সম্মুখে যাইতেই, স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, "যা তোর কিছুই করতে হবে না। তোর সব আপনি আপনি হয়ে যাবে।" জীবনের অন্তিমে কেদারবাবা একদিন এই ঘটনাটিকে প্রকাশ করিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "তাই আজ তাঁর কৃপায় একটু আধটু বুঝতে পারছি। তাঁর কথা তো এমনি যাবে না। স্বামিজী যাকে যা বলেছেন সবই ফলছে দেখছি।…কালীকৃষ্ণ মহারাজকে স্বামিজী খুব আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। তাই তো তাঁর মধ্যে আজ এত শক্তির বিকাশ দেখা দিয়েছে।"

কেদারবাবা তাঁহার মঠবাসের স্মৃতিকথা-প্রসঙ্গে একবার এইরূপ বলিয়াছিলেন —"আমি স্বামিজীর খুব কাছাকাছি থাকতুম—কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতুম না। কতলোক সব আসছেন—নিবেদিতা, ওলি বুল, ওকাকুরা প্রভৃতি—কত সব কথা হচ্ছে। আমি মুখ্যু লোক, অত বুঝতুম না। স্বামিজী যখন তাঁর গুরু-ভাইদের নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি বা কখনও বকাবকি করছেন, আমি তখন হাতের কাজ সেরে রাখতুম। হয়তো বা তিনি দুই-একবার নিজেই বলতেন, 'কেদার-বাবা, তামাক নিয়ে আয়', নয়তো সবই তাঁর ইঙ্গিতে বুঝে নিতুম। আহা, মাকে দেখলুম, আবার স্বামিজীকেও দেখলুম! সবাই যাকে পোছে না, তাঁরা তাকেই বেশী ভালবাসেন। তার খবরই বেশী নিতেন, যত্ন নিতেন। দেখ, আমার কি গুণ আছে? আমার দ্বারা তাঁদের কোন কাজই হবার নয়। অথচ তাঁদের এত অহৈতুকী স্নেহ-ভালবাসা কেন জানি না! আমাদের মধ্যে কী যে দেখেছেন তাঁরা তাও বুঝি না।…স্বামিজীর প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ অনুভব করি যে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর এতটুকু সেবা করবার জন্য মন তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা লাফিয়ে লাফিয়ে করতুম।…একদিন —বাবু আমাকে খুব উৎসাহিত করছেন তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-তীর্থে যাবার জন্য। আমি তো মহারাজকে না বলে কিছুই করি না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বললেন, 'আরে বলছ কি! স্বামিজী রয়েছেন মঠে। তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে? দক্ষিণেশ্বর চিরকালই থাকবে—ওসব পরে ঢের হবে, এখন থাক।' সত্যিই মহারাজই আমার চঞ্চল মতিকে স্থির

রেখে আজ আমায় স্বামিজীর কৃপালাভে ধন্য করেছেন। তা' না হলে সন্ন্যাসও হত না, আর কোথায় গিয়ে কোন ভাগাড়ে পচে মরতুম কে জানে! তখন সকাল থেকে রাত দশটা অবধি স্বামিজীর কাছেই থাকতুম। দিনে বিশ্রাম করতুম না—স্নান করতে, খেতে যা একটু সময় নষ্ট হত।"

ঐ বৎসরের জানুআরি-ফেব্রুআরির কয়েকদিন স্বামিজী বোধগয়া পরিদর্শন করিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ফেব্রুআরির শেষের দিকেই, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসবের কিছু পূর্বে স্বামিজী বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। স্বামিজী মঠে প্রত্যাবর্তন করায় কেদারবাবার সেবাদি কার্য যথারীতি আবার চলিতে থাকিল। সকল কার্যের মধ্যেও সাধুদের শাস্ত্রচর্চা ও ধ্যানধারণাদির দিকে স্বামিজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। কেদারবাবা বলিতেন, "ধ্যানধারণা সম্বন্ধে স্বামিজী খুব Strict ছিলেন।...প্রত্যেককেই ভোর চার ঘটিকায় উঠিয়া ঠাকুরঘরে আসিয়া ধ্যান করিতে হইত। তিনি নিজেও আসিয়া বসিতেন।......কেহ না আসিলে তিনি প্রথম প্রথম বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেন,—'ওহে সন্ন্যাসিবাবুরা, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাবে? তিনি ধ্যানধারণা সম্বন্ধে এত Strict ছিলেন যে, ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যান-ধারণা না করিলে কড়া শাসন করিতেন।......তিনি নিজেও শেষকাল পর্যন্ত খুব ধ্যানধারণা করিতেন। অসুস্থ হইলেও বাদ দিতেন না।"

স্বামিজীকে কতভাবে কতরূপেই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সকল বর্ণনা সম্ভব নহে। একদিন স্বামী প্রেমানন্দজী পূজার আসনে বসিয়াছেন, এমন সময়ে স্বামিজী গিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, নিজেই আসনে বসিলেন। সচন্দন পুষ্পার্ঘ্য ঠাকুরের পাদপদ্মে দুই-একবার মাত্র অর্পণ করিয়াই, তিনি স্ব-মস্তকে অর্ঘ্য স্থাপনা করিলেন কয়েকবার। এইরূপ করিতে করিতেই তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যান। দীর্ঘ সময় অন্তে ধ্যান ভাঙ্গিলে পর, যখন ধীরে ধীরে তিনি আসন ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আরক্তিম নয়নযুগলের জ্যোতিঃতে কী অপরূপ তাঁহাকে দেখাইতেছিল, কেদারবাবা তাহা কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। ঠাকুরঘরের বাহিরে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতেই, সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আর একটি স্মৃতি: স্বামিজী সেদিন খুব উচ্চভূমিতে রহিয়াছেন। কেদারবাবা শুনিলেন, ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন, "দু'শ

বছর পরে বিবেকানন্দের এক একটি চুলের জন্য লোক অস্থির হয়ে পড়বে।"

স্বামিজীর অগ্নিময় সংস্পর্শে বাস করিতে করিতে বৈরাগ্যের উত্তপ্ত প্রেরণা কেদারবাবাকে অধিকদিন আর নীরব থাকিতে দেয় নাই। স্বামিজীকে একদিন একান্তে পাইয়া, তাঁহারই পদপ্রান্তে আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সন্ন্যাসের জন্য তিনি মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামিজী বলিলেন, "দশবাড়ী ভিক্ষা করে খেতে পারবি?" কেদারবাবা যুক্তকরে উত্তর দিলেন, "আপনার আশীর্বাদ হলেই পারব।" উত্তর শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা এখানেই পড়ে থাক্—সব ঠিক হয়ে যাবে।" অবশেষে পরবর্তী বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমাতে (মে, ১৯০২) স্বামিজী কেদারবাবার মনস্কাম পূর্ণ করেন। স্বামী বোধানন্দকে স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসানুষ্ঠানের আবশ্যকীয় সব ব্যবস্থাদি করিতে। নির্দিষ্ট সেই রাত্রে আনন্দে ও উদ্বেগে কেদারবাবার চোখে ঘুম নাই—রাত্রি ২-২০ মিনিটেই ভোর হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, নিশ্চয়ানন্দ স্বামীকে ঘণ্টা বাজাইতে বলিয়াছিলেন। নিশ্চয়ানন্দও তাঁহার কথায় ঘণ্টা দিলে, বোধানন্দ উঠিয়া ঠাকুরঘরের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামিজী খোঁজ লইয়াছিলেন, "এত রাত্রে ঠাকুরঘরে কে যায় রে?" বোধানন্দ যখন ঘণ্টার কথা বলিলেন, তখন স্বামিজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "ছোঁড়াটা খুব nervous হয়ে পড়েছে।" যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী স্বয়ং ঠাকুরঘরে গিয়া যথানির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া কেদারবাবাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করিয়া, তাঁহার নরজন্ম সার্থক করিয়া দিলেন। শিষ্য বিরজা-হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবার পরে, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য তাঁহাকে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ করিলেন। জগতে কেদারনাথের নূতন জন্ম হইল। অচলা ভক্তি-বিশ্বাসের আশীর্বাদ প্রদান করিয়া শ্রীগুরু তাঁহার নাম দিলেন অচলানন্দ। অচলানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিতেই, স্বামিজী বলিলেন, "আজ হতে তোর সমস্ত সাংসারিক কর্ম নাশ হয়ে গেল।" স্বামী অচলানন্দই স্বামিজীর শেষ সন্ন্যাসি-শিষ্য—অতঃপর তিনি আর কাহাকেও সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন নাই।

মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরের রোয়াকের উপর একদিন স্বামিজী বসিয়া আছেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সহসা অচলানন্দকে যাইতে দেখিয়াই, স্বামিজী ডাকিলেন, "এইদিকে আয়। যা, ফুল তুলে নিয়ে আয়।" অচলানন্দও ছুটিয়া গিয়া কয়েকটি ফুল তুলিয়া আনিলেন। শিষ্যের হাতে ফুল দেখিয়াই স্বামিজী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "নে, আমাকে পূজা কর্—নিত্য পূজা করবি।" অচলানন্দ তো প্রাণ ভরিয়া শ্রীগুরুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তিনি নিজে কৃপা করিয়া ডাকিয়া পূজা গ্রহণ করিলেন—ইহা ভাবিয়া অচলানন্দ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, "যা, আর একবার ফুল তুলে আন।" ফুল আনিবার পর বলিলেন, "এখন অধ্যক্ষের পূজা কর্। গুরু আর অধ্যক্ষ এক জানবি।" সঙ্ঘাধ্যক্ষ যে শ্রীগুরুরই প্রতিনিধি, এই ভাবটিকে শিষ্যের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্যই স্বামিজী এই ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ঐদিন আরও উপদেশ দিয়াছিলেন, "সব ব্যাপারে অধ্যক্ষের কথা মান্‌বি।" অচলানন্দের জীবনে দেখা যায়, শ্রীগুরুর নিকট লব্ধ এই শিক্ষাকে তিনি আমরণ স্মরণে রাখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উত্তরজীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে স্মরণ করা অসমীচীন হইবে না:

অচলানন্দ যাহা কিছু করিতেন, মঠাধীশ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী করিতেন। যখন তিনি উত্তরাখণ্ডের স্বর্গাশ্রমে থাকিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে বেশী কঠোরতা করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু মহারাজের নিষেধ না মানিয়া তুরীয়ানন্দজীর অনুকরণে তখন প্রচণ্ড কঠোরতা করিতেছিলেন। প্রায় ছয় মাসের অমানুষিক কঠোরতা তাঁহার অতবড় বলিষ্ঠ শরীরকেও একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছিল। একদিন অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিতে গিয়া মাথা টলিতে থাকে। পরে আর একদিন গঙ্গার জলে নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই ভীত হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজ তখন বোধহয় পুরীতে বা ভুবনেশ্বরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়াই, অচলানন্দকে তাঁহার নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠান। মহারাজ তাঁহার অস্থিচর্মসার চেহারা দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা কেদারবাবা, তুমি হরি ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে, অমন সবল সুস্থ দৃঢ় শরীরখানি একেবারে নষ্ট করে ফেললে। যাক্ যা হবার হয়েছে। এখন আমার কাছে থাক।" অচলানন্দের শরীরে এই যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, উহা

আর সুস্থ হয় নাই কোন দিন। তিনি তাই প্রায়ই বলিতেন, "হায় রে আমার অদৃষ্ট! স্বামিজীর নির্দেশ সত্ত্বেও আমি সেই ভুলটি করলুম। আরও দুঃখ হয় এই ভেবে যে, জীবনের সকল ব্যাপারে সব কাজে মহারাজের নির্দেশ ছাড়া চলি না। আর এক্ষেত্রে কী ভয়ানক ভুল করলুম। হরি মহারাজ যা পারেন, তা আমি পারব কেন? তাঁর সঙ্গে কি মানুষের তুলনা? আমি মহারাজের নিষেধ শুনিনি—গুরুবাক্য লঙ্ঘন করেছি। তাই আমার শরীরের এত দুর্দশা!" এই তপস্যা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিজমুখের আরও উক্তি: "হরি মহারাজের মুখে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার এমনি তীব্র প্রেরণা পেলাম যে, স্বর্গাশ্রমে গিয়ে তপস্যায় ডুবে গেলাম। কোনদিকে লক্ষ্য করিনি, দুনিয়া আছে কি নেই। মজবুত স্বাস্থ্য পেয়েছিলাম বটে! কাজেই দৈহিক ক্লেশ অপরে যত তাড়াতাড়ি অনুভব করেন, স্বামিজীর কৃপায় আমি অত তাড়াতাড়ি অনুভব করতুম না।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পরবর্তী অধ্যক্ষগণের প্রতিও অচলানন্দের শ্রদ্ধা-ভক্তি সত্যই অনুকরণীয়। জীবনের প্রান্তে আসিয়া, যখন তিনি নিজেও সহকারী সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে সকলেরই ভক্তিভাজন হইয়াছেন, তখনও সঙ্ঘাধ্যক্ষের প্রতি তাঁহার বিনম্র আনুগত্য ও আন্তরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। মঠাধীশ স্বামী বিরজানন্দজীকে গুরুপূর্ণিমার দিনে তিনি যখন পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিতেন; কাশীতে বা বেলুড় মঠে যেখানেই হউক তাঁহাকে যখন গলবস্ত্রে দর্শনাদি করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন; বিরজানন্দজীর কাছে সাশ্রুনয়নে করজোড়ে যখন কিছু নিবেদন করিতেন; অথবা তাঁহার যাত্রাপথে বারাণসী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, যখন অচলানন্দ কাশী সেবাশ্রম হইতে আসিয়া ধূপ-মাল্যাদি হস্তে সঙ্ঘগুরুকে দর্শন করিতেন;—সে-সকল দৃশ্য যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি স্বামিজীর উক্ত সেই শিক্ষাকে কিরূপ অন্তরের সহিত পালন করিতেন। বিরজানন্দজীর উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।"

যাহা হউক, আমরা অচলানন্দের মঠজীবনেই ফিরিয়া যাইতেছি। কাশীতে ভিঙ্গার রাজা স্বামিজীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে বৈদিক সংস্কৃতির পীঠস্থান বারাণসীতে বেদান্ত প্রচারের জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা তিনি করেন। স্বামিজী মঠ হইতে স্বামী শিবানন্দজীকে ঐ কার্যের জন্য

ানীত করেন। শিবানন্দজীরই ইচ্ছানুসারে, অচলানন্দকেও কর্মিরূপে মিজী তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে বা ২৬শে জুন মিজীর আশীর্বাদ লইয়া তাঁহারা মঠ হইতে কাশীর পথে যাত্রা করেন। মিজীর সহিত অচলানন্দের স্থূলভাবে ইহাই শেষ দেখা। নয় মাস শ্রীগুরুর ' করিয়া যে অমূল্য পাথেয়রাশি তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হৃদয়ের মণি-গাঠায় তাহাই তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। এত বিরাট ব্যক্তিত্বের ়র্তের সংস্পর্শে আসিলেই জীবের অশেষ দুর্গতি মোচন হয়, আর অচলানন্দের য় মাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কতখানি ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহে নুভবগম্য বিষয়। তাই জানা যায়, তুরীয়ানন্দজী কাশীতে যাইয়া াচলানন্দের প্রথম পরিচয় পাইয়া যখন শুনিয়াছিলেন যে, নয় মাস স্বামিজীর ঙ্গলাভ করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল, তখন স্বামিজীগতপ্রাণ ‍ুরীয়ানন্দজী নাকি একদৃষ্টে অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দুইটি দিয়া অচলানন্দের দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে বার বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "নয় মাস!"

মহাপুরুষজীর সহিত অচলানন্দ কাশীর অনাথাশ্রমেই আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিলেন। পরে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই, মাসিক দশটাকা ভাড়ায় লাক্সা মহল্লায় 'খাজাঞ্চি বাগিচা' নামক একটি উদ্যানবাটীতে স্বামিজী-প্রকল্পিত বেদান্ত-সাধনার জন্য আশ্রম স্থাপিত হইল। কিন্তু পরের দিনই রাত্রে দুঃসংবাদবাহী তার আসিল—স্বামিজীর মর্ত্যলীলার অবসান হইয়াছে। শিবানন্দজী ও অচলানন্দের তদানীন্তন মানসিক অবস্থা ভাষা দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাহা হউক সিদ্ধান্ত হইল, এই শিবক্ষেত্র কাশী হইতেই স্বামিজীর উদ্ভব, আর এই বিশ্বনাথের পুরীতেই তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী বেদান্ত-ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল,—এবং তিনি মর্ত্যধামে থাকিতে থাকিতেই ইহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারিয়াছে, ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং মহাপুরুষ মহারাজ স্থির করিলেন, প্রাণাধিক প্রিয়তমের আজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে কাশীধামে এই আশ্রমের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিবেন। অচলানন্দও সর্বতোভাবে তাঁহার সহায়ক হইলেন। আশ্রমের নাম রাখা হইল 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রম।' অচলানন্দের মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার সেই ঠাকুরের ছবিটির কথা। ছবিটি তখন তাঁহার কোন বন্ধুর গৃহে রক্ষিত ছিল। রথযাত্রার দিনে সেই ছবিটি আনিয়া আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মহাপুরুষজী প্রস্তাব করেন, "ঠাকুরের সঙ্গে স্বামিজীকেও এখানে স্থাপন করা হোক।" অচলানন্দের কাছে স্বামিজীর পরিব্রাজক-বেশের একখানি আলোকচিত্র ছিল—উহাই ঠাকুরের সঙ্গে স্থাপিত হইল।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রমই অচলানন্দের সাধন ও কর্মক্ষেত্র। বক্তৃতাদির দ্বারা বেদান্ত প্রচার অপেক্ষা, নিজ জীবনের দ্বারা বেদান্ত-তত্ত্বকে লোকের কাছে তুলিয়া ধরাই শিবানন্দজীর ভাব ছিল। সুতরাং ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, জপ আলোচনা ইত্যাদিতেই তাঁহার মনোযোগ ছিল বেশী। অচলানন্দেরও ইহা খুব অনুকূল হওয়ায়—উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক পথে তিনি সানন্দেই অগ্রসর হইতে থাকিলেন। আবার সেবাশ্রমের যুবক কর্মীরাও মহাপুরুষ মহারাজের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে এবং অচলানন্দের সক্রিয় উদ্যমে খুবই উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতেন। স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, অনাথাশ্রমের নাম পরিবর্তিত হইয়া স্বামিজীরই নির্দেশে উহা 'সেবাশ্রম' (Home of Service) হইয়াছিল। যাহা হউক, এইকালে শিবানন্দজীর ধ্যাননিষ্ঠ জীবনের প্রভাব অচলানন্দের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভূত প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে রাজা মহারাজ বৃন্দাবনের পথে কাশীতে নামিয়া প্রায় মাসখানেক অদ্বৈত-আশ্রমেই ছিলেন। এই আশ্রমে তিনি একজনকে কৃপা করিয়া দীক্ষাও প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অচলানন্দ মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট কর্মিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১১ মাস সেখানে রামকৃষ্ণানন্দজীর পবিত্র সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কাশী সেবাশ্রমের কার্যেই আত্মনিয়োগ করেন। জিতেন[১], খগেন ও গিরিজা নামে তিনটি তরুণ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র লাভ করিয়া, মায়েরই আদেশে কাশীধামে আসিয়া স্বামী শিবানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেন। যথাক্রমে ইহাদের নাম হইয়াছিল বিশুদ্ধানন্দ, শান্তানন্দ ও গিরিজানন্দ। এই তিনটি বৈরাগ্যবান নবীন সন্ন্যাসীকে অচলানন্দই সঙ্গে করিয়া ভিক্ষার জন্য ছত্রে লইয়া যাইতেন—কিছুদিন কিছুদিন করিয়া এক একটি ছত্রে তাঁহারা ভিক্ষা

---

১ উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী।

করিতেন। সন্ন্যাস আশ্রমে অনভিজ্ঞ এই সাধুত্রয়কে তখন অচলানন্দ নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সেবাশ্রমের তখনও পর্যন্ত নিজস্ব ভবন ছিল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে লাক্‌সা পল্লীতে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া যায়। বদান্য কোন কোন ব্যক্তির দানে, স্বামী সারদানন্দজীর অনুমোদনে ও উপস্থিতিতে ঐ জমিই অবশেষে সেবাশ্রমের জন্য কেনা হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নূতন জমিতে সেবাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন। অতঃপর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পরিকল্পিত নক্‌শা অনুযায়ী গৃহাদি নির্মাণের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন অচলানন্দ। স্বামী সচ্চিদানন্দও ঐ কার্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। অচলানন্দ রাজা মহারাজেরই আদেশে সেবাশ্রমের জন্য অর্থভিক্ষা ও গৃহনির্মাণাদির কার্য দেখাশোনার ভার শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করিয়াছেন। অচলানন্দের সাধন-তপস্যার জন্য তীব্র অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া মহারাজ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই wardগুলি তৈরী হয়ে গেলেই তুমি ছুটি পাবে।" অচলানন্দও গুরুবাক্যজ্ঞানে গৃহনির্মাণের কাজগুলি দ্রুত যাহাতে শেষ হয়, তাহার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে, অচলানন্দ ফুল-চন্দন-বিল্বপত্রের অর্ঘ্য সহ মহারাজজীর করকমলে সেবাশ্রমের নবনির্মিত ভবনগুলিকে সমর্পণ করেন। নব-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া মহারাজও আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ব্যস্‌, কেদারবাবা, এবার তোমার ছুটি।" মহারাজ তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলেন, "তবে দেখ কেদারবাবা, সেবার মধ্য দিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সব কাজের মধ্যে নামের চাকাটি যেন ঠিক ঘুরতে থাকে।"

অতঃপর স্বামী অচলানন্দকে আমরা দেখি কোঠারে শ্রীশ্রীমার পুণ্য-সান্নিধ্যে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মা তখন দক্ষিণভারতের তীর্থদর্শনে যাত্রার পথে উড়িষ্যার কোঠারে দুই মাস ছিলেন। তারপর পুরীতে কিছুদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সাহচর্যে থাকিয়া সাধন-ভজন করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ যখন তুরীয়ানন্দজী, শিবানন্দজীপ্রমুখ তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া কল্যাণানন্দের আহ্বানে কনখল সেবাশ্রমে গিয়াছিলেন, অচলানন্দও তখন তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর (শ্যামাপূজার পরদিন) সেবাশ্রমের ইতিহাসে একটি পুণ্যদিবস। ঐ দিন সকালে শ্রীশ্রীমা

সেবাশ্রমে পদধূলি প্রদান করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় বা শ্রীম-ও তখন কাশীতে আছেন। অচলানন্দ শ্রীশ্রীমার পালকির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁহাকে সেবাশ্রমের নবনির্মিত গৃহগুলি সব দেখাইয়াছিলেন। সেবাশ্রমের অবস্থান ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া মা অচলানন্দকে বলিয়াছিলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" অচলানন্দ বিনয়বশতঃ মাকে জানাইলেন, "দীননাথ মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ বা বুড়ো বাবা) এসব বাড়ী-ঘরের কাজ তদারক করেছেন।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন মার কাছে বলেন, "কেদারবাবারই অক্লান্ত পরিশ্রম আর যত্ন এ সকলের মূলে।" যাহা হউক, এখন হইতে অচলানন্দকে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর তপস্যা ও ধ্যান-ভজনের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। প্রকাশ্য কোন কর্মক্ষেত্রে আর তিনি অবতরণ করেন নাই। কিন্তু কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তাঁহার দেহ অকালেই দুর্বল ও ভগ্ন হইয়া যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি একটানা ভগবদ্‌ভাবেই অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট হইতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টী (Trustee) মনোনীত হইয়াছেন। সেদিক হইতে বলা যায়, সঙ্ঘের বৃহত্তর কর্মপরিধির মধ্যে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার পরিরক্ষণ ও প্রসারণের ক্ষেত্রেই অচলানন্দের তপোময় জীবনের অবশিষ্টাংশ নিয়োজিত হইয়াছিল।

হৃষীকেশ-স্বর্গাশ্রম প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার তপস্যাদির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কাশীতেও তিনি সেবাশ্রমের অদূরে একটি টিলায় বাস করিয়া দীর্ঘকাল একান্তচিত্তে সাধন-ভজন করিয়াছেন। তীর্থদর্শনাদি উপলক্ষে খুব অল্পদিনের জন্য মাঝে মধ্যে তিনি কাশী হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে শ্রীশ্রীমার চরণদর্শনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি আর একবার জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন। সে-যাত্রায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন বিশুদ্ধানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা তখন আসন্ন। তাঁহাদের আগ্রহ ছিল, মাতৃ-সন্নিধানে বাস করিয়া, ঠাকুরের তিথিপূজা দর্শন করেন। তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। জননীর অপার্থিব স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতি অচলানন্দের জীবনে মহামূল্য সম্পদস্বরূপ ছিল। একদিন আহারাদির

পরে, সকলেই ঘরে গিয়া শুইতে যাইবেন, এমন সময়ে মা কাহাকে দিয়া কেদারবাবাকে ও বিশুদ্ধানন্দকে ডাকিয়া পাঠান। উভয়ে গিয়া দেখেন মা দুই হাতে দুই গেলাস গরম দুধ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসি-পুত্রদ্বয়কে দেখিয়াই মা বলিলেন, "খাও।" জয়রামবাটীতে তখন অনেক ভক্ত-সমাগম। কাহারও জন্য তো দুধের ব্যবস্থা নাই, অথচ ইঁহাদের জন্য মা দুধ লইয়া এই গভীর রাত্রে স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—এই ভাবিয়া তাঁহারা বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্কোচের কারণটি ধরিতে পারিয়াই মা বলিলেন, "বাবা ওরা (গৃহস্থ-ভক্তগণ)-তো বাড়ীতে কত খেতে পারে, তোমাদের আর কে খাওয়াবে বল ?" সন্ন্যাসি-সন্তানদ্বয় জননীর এই কথায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অচলানন্দ যেখানেই যখন বাস করিতেন, সেখানেই বেশ একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইত। সাধু-ব্রহ্মচারী, জিজ্ঞাসু-ভক্ত সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী অধ্যাত্মপথের নির্দেশ তাঁহার কাছে পাইতেন। নিজের ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, সমীপাগত অধ্যাত্ম-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে, অচলানন্দকে একদিনের জন্যও কাতর দেখা যাইত না। বার্ধক্য-পীড়িত দেহেও ইহার কোন ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই। সন্ন্যাসীর জীবন শুধু 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নহে, উহা 'জগদ্ধিতায়' উৎসর্গীকৃত—স্বামিজীর এই আদর্শকে স্মরণ করিয়া, যতদিন দৈহিক সামর্থ্যে কুলাইয়াছে, ততদিনই তিনি মানুষের প্রাণে শান্তি প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। একদিন স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, আমার তো এখন ইচ্ছা হয়—এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকব। একজন খাবার দিয়ে যাবে। চারটি খাব আর তাঁর নাম নিয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকব। কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই কেবল কথা বলতে হয়। একবার কাশীতে কিছুদিন তাঁর ভাব নিয়ে ছিলাম। সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতাম। একটা টিলায় থাকতাম—খাবার সময়ে চারটি খেয়ে সর্বদা তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকতাম। যাক, স্বামিজী বলেছেন—সন্ন্যাসী পরের জন্য। তাই কি করব, যতদিন আছি মহাপুরুষদের কথাই বলছি।"

তাঁহার রুগ্ন শরীর সম্পর্কে নিজেই বহুবার বলিয়াছেন, "হরি মহারাজের সঙ্গে দুই-আড়াই বৎসর কঠোরতা করায় এ শরীরটা ভেঙ্গে গেছে।" শরীর

ভাঙ্গিলেও তাঁহার আত্মিক শক্তি এত প্রচণ্ড ছিল যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের কাছে অতি বড় বলশালীকেও মাথা নত করিয়া থাকিতে হইত। নিঃসম্বল সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি, তাহাতে আবার ভগ্ন দেহ,—কিন্তু সন্ন্যাসীর আদর্শ অপরিগ্রহ তিনি আক্ষরিক অর্থেই সারাজীবন পালন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, "কারও কাছে হাত পাতব না।" অথচ আশ্চর্য এই যে, তাঁহার 'যোগক্ষেম' শ্রীভগবানই যেন স্বয়ং বহন করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে গীতোক্ত ভগবদ্-বাক্যে যথার্থই বিশ্বাস হইত। একবার কাশীর জনৈক ব্রহ্মচারী মঠে গিয়া মহাপুরুষ মহারাজের কাছে জানান যে, কেদারবাবা বড়ই কষ্টে আছেন, কারও কাছে হাত পাতবেন না এই তাঁর সঙ্কল্প। মহাপুরুষজী সব শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "না, ওর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কষ্ট হবে না।" ইহা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অতঃপর সত্যই অপ্রত্যাশিত নানা সূত্রে কেদার-বাবার সেবার জন্য অর্থ ও আবশ্যকীয় সব ব্যবস্থাদি আসিয়া পড়িত। একবার তাঁহার সেবক অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায়, স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তুমি কিছু ভেবো না। তোমার কাজ ঠিক চলে যাবে। দেখবে তোমার কাজ ভূত এসে করে দিয়ে যাবে।" অচলানন্দ এই সকল আশীর্বাণী স্মরণ করিয়া পরে বলিতেন, "সত্যিই এখন তাই দেখছি।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে অচলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেন। সঙ্ঘের এত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, তাঁহার কৃচ্ছ্রতাময় জীবনযাপনপ্রণালী ও সহজ-সুমিষ্ট ব্যবহার-রীতি ছোট বড় সকলকেই সমান আকর্ষণ করিত। তাঁহার অনাড়ম্বর সাদাসিধা আচরণের আড়ালে যে প্রচণ্ড পৌরুষব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বটি বিরাজ করিত, উহার সংস্পর্শে তরুণ বা বৃদ্ধ যে কেহই আসিয়াছে, তাহারই জীবনগতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পিতামহতুল্য এই বৃদ্ধ তাপসকে তাই সঙ্ঘের নবীন সাধু ও আদর্শবাদী যুবকগণ চিরকালই তাঁহাদের পরম বন্ধু, বুদ্ধিদাতা ও পথপ্রদর্শক (friend, philosopher and guide) জ্ঞান করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি স্মৃতি-চিত্র :

উচ্চশিক্ষিত জনৈক উদ্যমী যুবক একদা খবর পাইয়াছেন যে, বেলুড় মঠে স্বামিজীর একজন সাক্ষাৎ-শিষ্য, স্বামী অচলানন্দজী আসিয়াছেন। যুবকটি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য খুবই উৎসাহী হইয়া ওঠে—ঠাকুর-স্বামিজীর

ভাবালোকের স্পর্শ সে সবেমাত্র পাইতেছিল। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট কলেজের ছাত্র সে। মঠে আসিয়া কাহারও নিকট জানিয়াছে যে, কেদার-বাবা 'লেগেট্ হাউস্'-এ আছেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে গিয়া যুবকটি এদিক-ওদিক খুঁজিয়াও মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ মহারাজকে দেখিতে পাইল না। দেখিল, একজন কৌপীনধারী বৃদ্ধ সাধু—দীর্ঘাকার কিন্তু কৃশ চেহারা, গলায় ছড়া দুই রুদ্রাক্ষের মালা, দুইহাত দিয়া কাঁধের উপর একটি মোটা তোয়ালে ধরিয়া, পাদচারণা করিতেছেন। মনে হইল, যেন তিনি স্নান করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। উৎসুক যুবকটি নিঃসঙ্কোচে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া জানিতে চাহিল, পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ কেদারবাবা কোন্ ঘরে থাকেন। সরাসরি কোন উত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। সপ্রতিভ তরুণের জিজ্ঞাসু চোখ দুইটির দিকে সস্নেহে তাকাইয়া সন্ন্যাসী পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কোথায় থাক ভাই?", "কী জন্য এসেছ?", ইত্যাদি। যুবককে পরমাত্মীয়ের ন্যায় 'ভাই' বলিয়া কাছে টানিয়া, বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে লইয়া বসাইলেন। যুবকটি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে—এমন প্রাচীন সন্ন্যাসী একজন, তাহার মতো একটি নগণ্য ছোকরার গলা জড়াইয়া 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুবকটির আপাদমস্তক অতি স্নেহভরে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—সহসা তাহার হাত দুইটি ধরিয়া অতি করুণ মিনতির স্বরে বলিলেন, "ভাই, কত জন্ম চলে গেছে—স্বামিজীর জন্য একটা জীবন দিতে পারবে না? একটা জন্ম স্বামিজীর কাজে তাঁর সেবায় নিবেদন করতে পারবে না ভাই? স্বামিজী যে বাঙ্গলার যুবকদের কত করে ডেকেছেন—এই আদর্শ-পথ ধরে তারা চলুক, এই চেয়েছেন। পারবে না ভাই? কি হবে, দিয়ে দাও একটা জীবন তাঁর কাজে, তাঁরই সেবায়।" কলেজে-পড়া আধুনিক যুবক তো বৃদ্ধের আবেদন-মিনতি দেখিয়া স্তম্ভিত। স্বামিজীর ডাকে কে সাড়া দিল বা না দিল, তাহাতে এই সাধুর কী এমন আসে যায়! বার বার সেই একই ভাবে আবেগভরা আবেদন: "পারবে না ভাই, একটা—মাত্র একটা জীবন স্বামিজীর জন্য উৎসর্গ করতে? কত জন্মই তো গেছে কত ভাবে! এসো, চলে এসো—স্বামিজী তোমাদেরই চেয়েছেন, কত করে ডেকেছেন। এসো ভাই, এসো।" শীর্ণদেহ বৃদ্ধের নয়ন দুইটি হইতে তখন এক আশ্চর্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। এমন প্রাণভরা আবেদন কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে? সত্যই সেদিনের

সেই যুবকটি কিন্তু সরল প্রেমিক সাধুর প্রাণমাতানো ডাকে সাড়া না দিয়া পারে নাই। তাহার ইহাও বুঝিতে আর বাকী থাকে নাই যে, এতক্ষণ সে যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, ঘটনোক্ত এই বৃদ্ধ তিনিই—স্বামিজীর সন্তান অচলানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ।

উপরোক্ত ঘটনাটির মতো এমন আরও বহু ঘটনাই তাঁহার জীবনেতিহাস হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, তিনি কত মহৎ ছিলেন, এবং এত মহৎ ছিলেন বলিয়াই প্রেমের দ্বারা, স্নেহের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সমীপাগত ক্ষুদ্র নগণ্য মানুষের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি নিজে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, বিরাট রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ভালবাসার দ্বারাই গঠিত। প্রসঙ্গতঃ, ইংরেজী ১৯৪৬ সালে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের ত্রৈবার্ষিক সাধুসম্মেলনে পঠিত তাঁহার অভিভাষণলিপির কিছু অংশ খুবই অনুধাবনযোগ্য :

"এই সঙ্ঘের মূলভিত্তি—শ্রদ্ধা ও প্রেম। পূজনীয় মহাপুরুষ বলতেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ভালবেসে একত্র করেছিলেন এবং এই ভালবাসার বন্ধনেই এই বিরাট সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। যতদিন এই বন্ধন অটুট থাকবে, ততদিন সঙ্ঘও সুন্দররূপে চলবে।' আমার নিজের কথা বলছি যে, বিবেক-বৈরাগ্যের প্রেরণায় যতটা না হোক পূজ্যপাদ স্বামিজী ও অন্যান্য মহারাজগণের অপার্থিব ভালবাসার টানেই আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে আসতে পেরেছি এবং সেই ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েই তাঁদের চরণতলে পড়ে আছি। এ বিষয়ে কোন মতভেদ আছে বলে আমার মনে হয় না।...যদি আমরা পরস্পরের সহিত শ্রদ্ধা-ভালবাসার ভাব রক্ষা করতে না পারি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। সঙ্ঘের কাজকর্ম কেবলমাত্র কঠোর আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে না হয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ সেবকদের অসন্তোষ ও অপ্রীতির ভাব বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ভাব আসে এবং কর্ম সাধনের অঙ্গ না হয়ে, কঠোর নীরস কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়; কর্ম-যোগ না হয়ে, কর্ম-ভোগ হয় মাত্র।......এইজন্যই মঠ-মিশনের কর্তৃপক্ষ এবং শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও পরিচালকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁরা আইন-কানুনের সঙ্গে ভালবাসার ভাব দিয়ে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন, এবং সাধারণ সেবকদেরও আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ

করছি, যেন তাঁরাও গুরুজনদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাবান হয়ে, কাজকর্ম সমস্তই ঠাকুর-স্বামিজীর, এই ভাব সব সময়ে মনে রেখে নিজ নিজ কাজ করেন। তাহলেই আমাদের জীবন মধুময় হবে এবং সঙ্ঘও সুন্দররূপে চলবে।"

কেদারবাবাকে দেখিলে উক্ত এই শ্রদ্ধা-ভালবাসারই প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হইত। যেমন জিজ্ঞাসু ভক্তদের প্রতি, তেমন সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁহার স্নেহশীল সতর্ক দৃষ্টি সমান জাগ্রত ছিল। নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বার বার এই ভাবটিকেই জোর দিয়া বলিতেন যে, নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐকান্তিক ধ্যান-ভজন না থাকিলে অধ্যাত্মরাজ্যের পথচলা বড়ই বিপজ্জনক। এই প্রসঙ্গে তাঁহার স্মরণীয় উক্তি[১]: "আধ্যাত্মিকতাই সঙ্ঘের প্রাণশক্তি। পূজ্যপাদ স্বামিজী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এই সঙ্ঘ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'ভগবান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' কর্ম কখনও উদ্দেশ্য হতে পারে না—কর্ম একটি উপায় মাত্র। স্বামিজী কর্মের কথা বলতেন বটে, কিন্তু নিয়মিত ধ্যান-ভজনের জন্য সর্বদাই উৎসাহ দিতেন।...পূজনীয় মহারাজ বলতেন, 'স্বাভাবিক প্রেরণাবশে সকলেই তো কর্ম করবে, কিন্তু ধ্যানজপ সাধন-ভজন করতে চায় কয়জন? সেইজন্যই আমি সর্বদা সাধন-ভজনের কথা ছেলেদের বলে থাকি।' পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, 'ধ্যানজপের importance অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ধ্যানজপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামিজীর ideal অনুযায়ী work can never be done। Work and worship একসঙ্গে চালাতে হবে।' এইভাবে আমাদের গুরুস্থানীয়গণ সকলেই কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো সাধন-ভজনের কথা বলে গেছেন এবং আমরাও একথা প্রাণে প্রাণে বুঝি।...আপনারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত সন্তান। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছেন, বাহ্যিক ঐশ্বর্যে ও চাকচিক্যে বা কর্মকোলাহলে সেই উদ্দেশ্য ভুলবেন না। আদর্শলাভের জন্য দৃঢ়চিত্ত ও বদ্ধপরিকর হয়ে প্রাণপণ করুন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই ভাব নিয়ে অদম্য উৎসাহে ঠাকুর-স্বামিজীর আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীশ্রীপ্রভু সহায়।"

---

১ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ত্রৈবার্ষিক সাধু-সম্মেলনে পঠিত স্বামী অচলানন্দজীর অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।

সমস্যা-জর্জরিত গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতিও তাঁহার উপদেশগুলি লক্ষ্য করিলে, ঐ একই সুরের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সংসারের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও, জীবনের মূল লক্ষ্যকে কেহ যেন না ভুলিয়া যায়, এই দিকেই তিনি সর্বদা অনুপ্রেরণা দিতেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার ঐ সকল উক্তির মধ্যে সংসারকে একটি নূতন দৃষ্টিতে অবলোকন করিবার শিক্ষাও আমরা পাই। বাংলা ১৩৫০ সালে দেশব্যাপী মন্বন্তরের কালো মেঘে যখন আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন, তখন জনৈক গৃহী-ভক্তকে কেদারবাবা পত্রে লিখিয়াছিলেন, "কলিকাতার অন্নসমস্যার সংবাদে বড়ই দুঃখ হয়। বাংলা, চাউলের জন্মভূমি—সেখানেই এই দুরবস্থা। সত্যই এ সবই মহামায়ার ইচ্ছা ব্যতীত কিছু নহে। মানুষের মন যত বহির্মুখী ও ভোগমুখী হয়, ততই তিনি কঠোর হইতে কঠোর আঘাত দিয়া সেই মন নিজ পদে ফিরাইয়া আনিতে সুযোগ দেন। যে এইটি বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করে, সে আনন্দে ডুবিতে পারে। আর যে অহংবুদ্ধিতে প্রতিকার করিতে চায় এবং হাঁকপাঁক করে, তাহার দুঃখ বাড়িয়াই চলে। সুখও যেমন দীর্ঘকাল থাকে না, দুঃখও তাহাই—সুতরাং যে বুদ্ধিমান সে উভয় অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া জগজ্জননীর চরণ শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে।... শরণাগত হইয়া যাও—আর কোন ভাবনা থাকিবে না। তাঁহারই ইচ্ছায় সব হইতেছে এইটি যথার্থ বোধ কর—তাহা হইলেই হইল।"

কেদারবাবার শিক্ষাদানের রীতিই ছিল অনবদ্য এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য ও প্রীতিতে পূর্ণ। তাঁহার মুখের 'ভাই' সম্বোধন শুনিয়া কাহারও পক্ষে দূরে সরিয়া যাওয়া সহজ ছিল না। নবীন সাধুদের তিনি বলিতেন, "দেখ ভাই, সব সময়ে বৈরাগ্য জাগিয়ে রাখবে। তুমি বাড়ী ছিলে, সেখান থেকে মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনদের কাঁদিয়ে এসেছ কেন? তাঁকে পাবার জন্যই তো? তাহলে এখন যাতে তাঁকে পাও সে চেষ্টা যদি না কর, তবে এখানে এসে লাভ কি? এখানে যেমন যেমন দুঃখ-কষ্ট, সংসারেও সেইরূপ দুঃখ-কষ্ট আছে। তবে তফাৎ কি?—না, তফাৎ এই: সংসারে অনিত্য বিষয়ের জন্য সুখদুঃখ, আর এখানে নিত্য বিষয়ের জন্য। দুঃখ-কষ্ট যখন ভোগ করতেই হবে, তখন অনিত্যের জন্য না করে নিত্যের জন্যই করা ভাল।" আবার তরুণ সাধুদের শিথিল বৈরাগ্য দেখিলে আক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত: "বেশ Grand Trunk Road ধরে সোজা ভগবানকে পেতে চায় এরা।

অথচ মহাপুরুষরা ও শাস্ত্রকাররা বলেছেন—রাস্তা অতীব জটিল, ক্ষুরের ধারের মতো। শশী মহারাজ বলতেন, 'ধর্মরাজ্যের রাস্তা কি রকম জান? কেদার-বদরী যেতে যেমন চড়াই-উতরাই—সেই রকম এই রাস্তা। পর পর ভয়ঙ্কর জটিল। একেবারে সোজা রাস্তা নয়। ভীষণ struggle করতে হয়। স্বামিজী মহারাজ বলতেন, 'Struggle is life'। যেখানে struggle সেখানেই চৈতন্যের প্রকাশ। কিন্তু আমরা চাই easy-going life—বেশ আরামে চলে যেতে।" এত তিনি নিরভিমান ছিলেন যে, নিতান্ত বালকদের কাছেও তাঁহাকে অতি বিনয় সহকারে বলিতে শোনা যাইত, "কর, নিশ্চয় হবে। আমার নিজের কথা তো কিছুই নেই। স্বামিজী এবং মহারাজরা যা বলেছেন তাই তোমাদের বলছি।"

তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচারপ্রণালীও খুব লক্ষ্য করিবার বিষয়। সচরাচর দেখা যায়, মানুষ যাঁহাকে কোন কারণে শ্রদ্ধা করে, তাঁহাকে এক নিঃশ্বাসে পৃথিবীর যে-কোন মহামানবের সঙ্গে সমতুল করিয়া ফেলে। কোন মহাপুরুষের বা শাস্ত্রের কথাকে নিজের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া অথবা ঐসব বাক্যের পূর্বাপর কোন পারম্পর্যের দিকে না তাকাইয়া আপন তৃপ্তিকর ভাষ্যরচনার দ্বারা আমরা সর্বদাই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। অচলানন্দজী কিন্তু এই ধরনের অভ্যাসকে অপছন্দ করিতেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন পুরীতে আছেন, তখন একদিন সকালে স্থানীয় কোন বিশিষ্ট সাধুর লোকান্তরগমনের সংবাদ লইয়া আলোচনা হইতেছিল। উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গে, মহাপুরুষদের দেহত্যাগকালের অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলিতেছিলেন। পরিশেষে জনৈককে উদ্দেশ করিয়া বেশ কয়েকটি মূল্যবান কথা তিনি সেদিন বলিলেন: "তা বলে তুমি যদি এখন ঐ সাধুর সঙ্গে মহাপুরুষদের তুলনা কর—তাহলে অন্যায় হবে। তুলনা করা ঠিক নয়। একদিন জ্ঞানেশ্বর হরি মহারাজের নিকট স্বামিজী ও মহারাজের তুলনা করে বলেছিল, 'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমা-সকলের চেয়ে বড়'—স্বামিজী নিজেই এরকম বলেছিলেন। তাই জ্ঞানেশ্বর বললে,—মহারাজ বড় ছিলেন। হরি মহারাজ তা শুনে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'সাবধান, আর কোনও দিন এ রকম তুলনা করতে যেও না। স্বামিজী কি ভাব থেকে কি বলেছেন, তা না জেনে ওসব কখনও বলো না।'···

স্বামিজী সকলকেই বড় চক্ষে দেখতেন। বড় গাছের ছায়ায় গাছ বড় হয় না, তিনি কিন্তু নিজে সরে গিয়ে সকলকে বড় করে ধরতেন। হরি মহারাজ যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন প্রত্যেক চিঠিতেই স্বামিজীকে লিখতেন—কি ভাবে কি করব ইত্যাদি। স্বামিজী উত্তরে লিখেছিলেন—হরি ভাই, তুমি যা ভাল বোঝ করে যাও। এখন থেকে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। তা না হলে তোমার growth হবে না।"

সর্ববিষয়েই যে কেদারবাবার একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এ-সম্পর্কে আরও দুই-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার দৃষ্টির প্রভায় অন্যের চোখেও যেন আলোক ফুটিত। জনৈক সাধু মঠের হিসাবপত্রের কার্যে সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্মী সাধুটিকে কেদারবাবা স্নেহ করিতেন—তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া খুব মজা করিয়া লিখিয়াছিলেন[১]—"একটা কথা তোমাকে লেখা হয় নাই—কথাটা প্রাণে আসিয়াছে তাই লিখিলাম। তোমার টাকার হাতযশ আছে বলিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিরাট সঙ্ঘের হিসাব-নিকাশ খতিয়ানের ভার কার্যতঃ তোমার হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তোমার হাত দিয়াই শ্রীমন্দিরের দেনাটা যদি শোধ হইয়া যায়, তবেই বুঝিব যে তুমি হাতযশে 'সিদ্ধ'। তুমি যে কাজ করিতেছ ইহা একটা মস্ত বড় সাধন—তাহা আমি বেশ প্রাণে অনুভব করি। ইহার ভিতর দিয়াও তুমি তাঁহার অশেষ কৃপা লাভ করিবে।" সঙ্ঘের সকল কর্মই যে ঠাকুরের সেবা, এই ভাবটি কী সুন্দর সরস করিয়া তিনি অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতেন! শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণের দরুন যে বিপুল ঋণ তখন মঠকে বহন করিতে হইয়াছিল, উহার জন্য সহাধ্যক্ষ স্বামী অচলানন্দের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। অথচ সেই ঋণ-পরিশোধের ব্যাপারে কোনও প্রকার একটু সাহায্য করাকে তিনি শ্রীভগবানেরই পূজা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ঔষধ-পথ্যাদির খরচের জন্য সামান্য কিছু অর্থও কেহ ভালবাসিয়া তাঁহাকে দিলে, উহা হইতে নিয়মিত কিছু কিছু তিনি মঠে পাঠাইয়া দিতেন মন্দিরের ঋণশোধের জন্য। অথচ এই অর্থপ্রেরণের মধ্যেও তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও দীনতা লক্ষণীয়। মঠের হিসাব-পত্র দেখেন যে

১ পত্রটি ৩।৯।৩৯ তারিখে কাশী হইতে লিখিত।

সাধু-কর্মী, তাঁহাকে একবার (১৯।৫।৪৪) কাশী হইতে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীস্বামিজীর কল্পিত, তাঁহার সাধের ঠাকুর-মন্দির—তাঁহার সেবায় আমার **personal**-ভাবে সাধ্যমতো 'বিদুরের খুদকুঁড়া' দিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। সুতরাং এই টাকা পাঠাইতেছি।" কথাগুলি খুবই ছোট ছোট—ঘটনাগুলিও হয়তো সাধারণ দৃষ্টিতে এমন কিছুই নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক-মাধুর্যে এগুলি বড়ই মনোরম।

অচলানন্দজীর বার্ধক্য-জীর্ণ দেহটি জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর বড়ই কষ্ট ভোগ করিয়াছে। দেহ হইতে মুক্তিলাভের জন্যও তাই ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। সঙ্ঘগুরুকে তিনি শ্রীগুরুরই প্রতিমা জ্ঞান করিতেন—একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সর্বদাই 'ছুটি'র জন্য প্রার্থনা জানাইতেন। কাশীতে একবার একটি বড়ই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। বিরজানন্দজী কাশী সেবাশ্রমের অম্বিকা-ধামে অবস্থান করিতেছেন। কেদারবাবা গলবস্ত্র হইয়া অতি শান্ত-ধীরপদে সসম্ভ্রমে মঠাধীশ মহারাজকে দর্শন করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। "এসো, কেদারবাবা এসো", বলিয়া বিরজানন্দজী আহ্বান করিতেই, কেদারবাবা ভক্তিনত-ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণামান্তে সন্তর্পণে উঠিয়া, নতজানুভাবে বসিয়া, করজোড়ে সঙ্ঘগুরুর কাছে আর্তি জানাইতে থাকিলেন, "এ জীর্ণ শরীরটি আর বইতে পারছি না। আপনি কৃপা করলে আমার এখনই ছুটি হয়ে যায়।" বিরজানন্দজী শান্ত-সুমিষ্ট ভাষায় প্রিয় গুরুভ্রাতাকে কতই সান্ত্বনা দিতেছিলেন, "দেখ কেদারবাবা, ঠাকুর-মা-স্বামিজী—এঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হলেই তো আমাদের মঙ্গল।" ইত্যাদি। কেদারবাবার গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে,—তখনও কাতর মিনতি জানাইতেছেন, "তা আমি বুঝি না। আপনার ইচ্ছা ও তাঁদের ইচ্ছা আলাদা নয়। আপনি ছুটি দিলেই আমার ছুটি হয়ে যায়। আর যে এই ভাঙ্গা শরীর দিয়ে চলছে না। আপনি কৃপা করুন।" সেই স্বর্গীয় দৃশ্য যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন যে, কেদারবাবার আকাঙ্ক্ষিত 'ছুটি'র বোধহয় আর বেশী দেরী নাই। প্রিয়জন-বিয়োগের আশঙ্কায় তখন নিশ্চিতই সকলের বুক দুরদুর করিয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে, জনৈককে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মঠে যাওয়া হইল না, আর কোনদিন হইবে সে

আশাও নাই। বিশ্বনাথের দরবারে শেষ কটা দিন কাটাতে পারলেই ধন্য হব।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, কেদারবাবার স্বাস্থ্য ততই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে হাঁপানি, জ্বর এবং বার্ধক্যসুলভ নানা উপসর্গ একটার পর একটা আসিয়া শরীরটিকে ঘিরিয়া ধরিল। তাঁহার অবস্থার অতি দ্রুত অবনতি হইতে থাকায়, সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিরজানন্দজী মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। তখন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ। কাশী হইতে ক্রমাগত কেদারবাবার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। চিকিৎসক-বৈদ্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ভগ্ন দেহটিকে কিছুমাত্র আরাম দিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন ১১ই মার্চ। এদিকে তখন মঠে বিরজানন্দজী সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ বুকে কী একটা বেদনা অনুভব করেন। দুপুরের দিকে কাশী সেবাশ্রম হইতে দুঃসংবাদ আসিল, সকাল ৮-২৫ মিনিটে স্বামী অচলানন্দজী মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল আনুমানিক ৭১ বৎসর। বিরজানন্দজীর (১১ই মার্চ ১৯৪৭-এর) দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়: "দুপুরে টেলিগ্রামে খবর পাইলাম কেদারবাবা আজ সকালে ৮-২৫ মিনিটে শরীররক্ষা করিয়াছে। ঠিক ঐ সময়ে আমি বুকের মধ্যে একটি চাপ অনুভব করিয়াছিলাম এবং মনে হইয়াছিল কেদারবাবা চলিয়া গেল।"

কেদারবাবার তিরোধানে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীরা এবং অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হইতে বঞ্চিত হইলেন। জীবন-গঠনে ইচ্ছুক যুবকগণ তাঁহাদের একজন উৎসাহদাতা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছেন। জীবনের অন্তিমভাগে কোন সাধুকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন (কাশী, ১৬।৪।৪৪): "লিখিয়াছ আমি মঠে গেলে কত লোকের কল্যাণ হয়, ইত্যাদি। কল্যাণ যিনি করিবেন, তিনিই দেখিতেছেন।... তবে আমার এখন ভাল লাগে এই যে, যদি কেহ সত্য সত্য 'life' গঠন করতে চায়—তবে তার সঙ্গে প্রাণের কথা বলি এবং আনন্দলাভ করি। শুষ্ক প্রণাম আর দেখাশোনায় কিছু নাই, ইহাই দৃঢ় ধারণা আমার। যে spirituality এই সঙ্ঘের মেরুদণ্ড তাহাকে খুব জোরের সহিত দৃঢ় রাখা দরকার—সেদিকে দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে ও হইবে।"

ব্রহ্মলীন অচলানন্দের এই কথা কয়টিকে স্মরণ করিলেই, তাঁহার জীবন্ত সান্নিধ্য আমরা অনুভব করি।

কেদারবাবা বহু জীবনকে উদ্দীপিত করিয়া গিয়াছেন—ভক্তি-বিশ্বাস ও ত্যাগ-বৈরাগ্যে অনেকের মনকে রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল জাগে, যে-শিখাটির স্পর্শে এত দীপ জ্বলিল, সে-শিখার স্বকীয় দীপ্তি ও তেজ, তবে কতখানি ছিল! এ কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার শক্তি আমাদের নাই। তথাপি তাঁহার ব্যক্তিগত দিনলিপির দুইটি ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা হইতে, তাঁহারই স্বহস্তলিখিত দুই-একটি পংক্তি প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা হইতেছে:

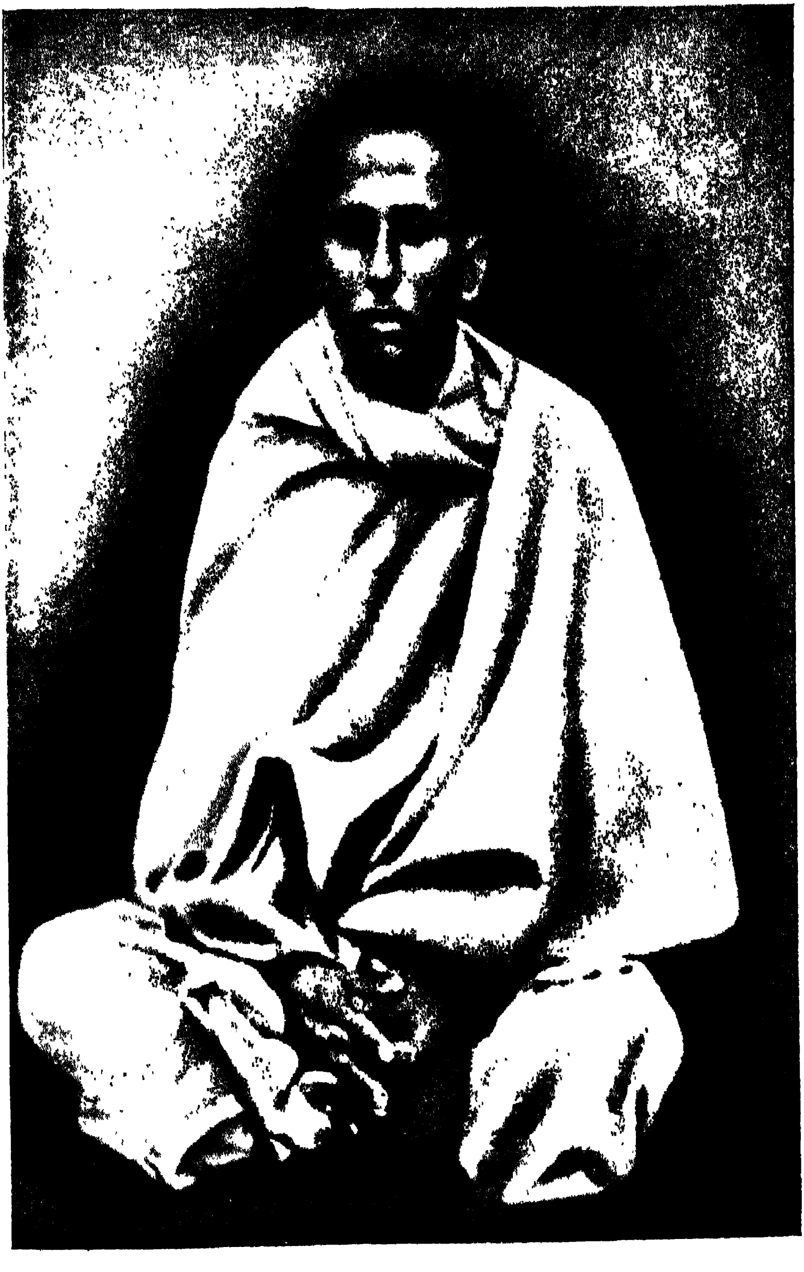
"...পূর্ব-পূর্ব জীবনে ও ইহজীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে সমস্তই শ্রীপ্রভুর মায়ার খেলা, অর্থাৎ তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির খেলা। এইটি শ্রীপ্রভু দৃঢ়ভাবে অন্ত জানাইয়া দিলেন।"

"...আজ এই ক্ষুদ্র আমি শ্রীপ্রভুর চরণে সম্পূর্ণ লয়। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তিনিই সব—সবই তিনি।"

স্বামী শুভানন্দ

কাশী সেবাশ্রমের অন্যতম স্থাপয়িতা 'চারুবাবু'-ই উত্তরকালে স্বামী শুভানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল চারুচন্দ্র দাস। কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনে তাঁহাদের বাড়ী ছিল—যদিও তাঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান চব্বিশ পরগণার ইছাপুরে। চারুচন্দ্র পিতার চতুর্থ পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্যামাশঙ্কর দাস। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, চারুচন্দ্র যখন কলিকাতার রিপন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন হইতেই তাঁহার মন জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে শুরু করে। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাদির প্রভাবই অবশ্য ইহার প্রথম কারণ বলা যায়। ক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনাদি শুনিতে এবং পাঠ করিতে আগ্রহশীল হন। এইকালে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া একান্তে ভগবচ্চিন্তা ও পরিচিত বন্ধু-ভক্তদের লইয়া সৎ-প্রসঙ্গাদি করিতেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র তাঁহার সমবয়সী বন্ধুদের লইয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকটও গমনাগমন করিতেন—তথায় ভাগবত-পাঠ ও সংকীর্তনাদিতে যোগদান করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিতেন। এইভাবেই উত্তরোত্তর তাঁহার মনে সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য এবং অর্থকরী লেখাপড়ায় অমনোযোগ দেখা দিতে থাকে। ফলে কলেজের পড়াশোনা ঐখানেই স্থগিত হইয়া যায়।

চারুচন্দ্রের কয়েকজন ধর্মবন্ধু ছিল—তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিয়মিত সৎচর্চা ও সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করা তাঁহার একটি নিয়মিত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাতা-পিতা ও আত্মীয়-পরিজনরা ইহাতে বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার নানা চেষ্টা—বিবাহাদি দিয়া ঘরে আবদ্ধ করিবার অনেক কৌশল মাতা-পিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হয়। অবশেষে সোইন্‌হ এণ্ড চন্দ্র (Soinha & Chandra) নামে একটি সলিসিটর (Solicitors) আফিসে তাঁহার জন্য একটি কর্ম ঠিক করা হইল। চারুচন্দ্র বরাবরই স্বাধীন মনোবৃত্তির লোক ছিলেন। ভাবিলেন, যাহা হউক, স্বাধীনভাবে তো থাকা যাইবে। তাই ঐ কেরানীর কর্ম স্বেচ্ছায় স্বীকার



স্বামী শুভানন্দ

করিয়া লইলেন। সকাল দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত আফিসের কাজে নিযুক্ত থাকিলেও, বাকী সময় পূর্বের মতোই কাটাইতে লাগিলেন। উৎসাহী যুবক বন্ধুরাও তাঁহার খুবই অনুরাগী হইয়া উঠিতে থাকিলেন। তাঁহাদের লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাধন-ভজন ও পাঠ-আলোচনা বেশ জমিয়া উঠে এইকালে। বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীনভাবে বন্ধুবান্ধব লইয়া এইসব অনুষ্ঠান করা অসুবিধা, তাই বাড়ীর কাছেই একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া সেখানেই ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি লইয়া সময় কাটাইতেন। ক্রমে বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু মাত্র ভোজনের সময়েই থাকিল,—অন্য সময়ে ঐ ছোট ঘরটিতে বাস করিতেন, এমনকি রাত্রেও সেখানেই থাকিতেন। ১৮৯৫-এর কোন সময়ে বোধহয় দুই-একজন বন্ধুকে লইয়া তিনি কেদার-বদরী দর্শনে গিয়াছিলেন। হরিদ্বার কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থগুলিও ঐবারে দর্শন করিয়া আসেন। যাহা হউক, ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত চারুচন্দ্রের জীবনধারা এইরূপই চলিতেছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুআরি, স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত-প্রচারের প্রথম পর্ব শেষ করিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহাকে সংবর্ধনার জন্য যে বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল, উহাতে চারুচন্দ্রও যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার উৎসাহী যুবকরা স্বামিজীর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীর ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরাই স্বামিজীর গাড়ীখানিকে টানিয়া, ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজভবন পর্যন্ত আনিয়াছিল। চারুচন্দ্রও ঐ উদ্বেলিত জনসমুদ্র ঠেলিয়া, স্বামিজীর গাড়ী টানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেদিন কী অননুভূত আনন্দেই যে তিনি ভরিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া চলে। ইতঃপূর্বে তিনি পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, আজ যেন উহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। তিনি বোধ করিয়াছিলেন, "এই তো সেই বিশ্বপ্রাণ শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথখানি আমি টানিতেছি।" স্বামিজীর দিব্যদর্শন চারুচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিন শোভাযাত্রা অন্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া ছিল স্বামিজীরই চরণপ্রান্তে। পরের দিনই আবার সুযোগ করিয়া কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাড়ীতে গিয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিলেন।

এই সময় হইতেই চারুচন্দ্র যেন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন।

আলমবাজার মঠে এবং পরে বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলীর সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের ফলে তিনি উত্তরোত্তর মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যকে যেন স্পষ্টতরভাবে দেখিতে শিখিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দই তখন চারুচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ-কৃপা প্রদর্শন করিতেন। মঠের সংস্রবে যতই আসিতে থাকিলেন, নিরঞ্জনানন্দজীপ্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তাঁহার অন্তরে ধর্মলাভের জন্য একটি আন্তরিক আকুতি ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে তখনও বেশী যাইতে পারেন নাই, তথাপি দিবানিশি তাঁহারই উদ্দীপনাময় জীবনকাহিনী, মঠের সাধু-মহাত্মাদের মুখে তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন। নিরঞ্জনানন্দজী চারুচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি লিথোগ্রাফ ছবি উপহার দিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রও পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঐ চিত্রখানি নিজে ঘরে বসাইয়া, ধ্যান-ধারণাদি করিতেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্রের মাতাপিতা বারাণসীধামে বিশ্বনাথের আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন, এই অভিপ্রায় লইয়া কাশী যাত্রা করেন। চারুচন্দ্রও এই সুযোগ বুঝিয়া সকলের অজ্ঞাতেই একদিন সলিসিটর আফিসের কর্মে ইস্তফা দিয়া বসিলেন। অতঃপর নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গ লইয়া জীবনটা কাটাইয়া দিবেন, এইরূপই মনস্থ করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় মন বসিতেছিল না—তাই সঙ্গে কয়েকখানি বই আর ঠাকুরের সেই ছবিটি লইয়া তিনিও কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীতে গিয়া সেখানকার পবিত্র পরিবেশে তাঁহার অস্থির মন বহুলাংশে শান্ত হইল। নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন, সাধন-ভজন ইত্যাদি লইয়া কাশীতে তিনি বেশ আনন্দেই কাটাইতে থাকিলেন। এইসব করিয়া, বাকী সময় বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবাতেই নিয়োজিত থাকিতেন। বিশ্বনাথের পুরীতে আসিয়া চারুচন্দ্র অনুভব করিলেন, এতদিনে তিনি তাঁহার মনোমত রাজ্যেই আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রসন্ন মৈত্রের বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকতার কর্মও সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মধ্যাহ্নের ভোজন ঐ বিদ্যালয়েই সমাধা করিতেন। বিদ্যালয় হইতে কোন বেতন তিনি লইতেন না।

একদিন কাশীর পথে চলিতে চলিতে তিনি স্বামিজীর বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে দেখিতে পান। শুদ্ধানন্দ তখন মাধুকরীতে যাইতেছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার পূর্বেই কলিকাতায় পরিচয় হইয়াছিল—

সুতরাং কাশীধামে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ায় চারুচন্দ্র খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দ তখন সম্প্রতি কৈলাস ও মানস সরোবর তীর্থ দর্শনান্তে কাশীতে আসিয়া, নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের সহিত সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাগানে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজনে রত ছিলেন। চারুচন্দ্র সুযোগ লাভ করিয়া ঐ বাগানে গিয়া নিরঞ্জন মহারাজের ও শুদ্ধানন্দের সঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই অসুস্থ হইয়া পড়ায়, শুদ্ধানন্দকে বেলুড়ে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই অসুস্থাবস্থায় চারুচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ লইয়া সেবাশুশ্রূষাদি করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৯৮-এর শেষ দিকের কথা।

শুদ্ধানন্দ মঠে চলিয়া গেলেও, চারুচন্দ্র নিয়মিত তাঁহার সহিত পত্রাদির দ্বারা যোগাযোগ রাখিতেন। ১৮৯৯-এর জানুআরিতে 'উদ্বোধন'-পত্র প্রথম প্রকাশিত হইলে, উহার কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে অনুরোধ করেন এবং কয়েকখানি নমুনা 'উদ্বোধন'ও পাঠাইয়া দিলেন। চারুচন্দ্রের ইতোমধ্যেই স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে বেশ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল—কয়েকজন তো তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুমহলে তখন 'উদ্বোধন' লইয়া বেশ একটু আলোড়ন দেখা দিল—বন্ধুদের সহযোগিতায় 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকও কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সূত্রে যাঁহাদের সঙ্গে হৃদ্যতা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইলেন কেদারনাথ মৌলিক—উত্তরকালে যিনি স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী অচলানন্দ নামে সুপরিচিত হইয়াছেন।

কেদারনাথের গৃহেই ছিল চারুচন্দ্রের বন্ধুবর্গের প্রধান মিলনকেন্দ্র। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে মিলিত হইয়া তাঁহারা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামিজীর রচনাবলী খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। যুবকগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন চারুচন্দ্রই। তাঁহারই উৎসাহে ক্রমে কেদারনাথের বাড়ীর সান্ধ্য আসরে নিয়মিত কোন না কোন সৎগ্রন্থাদি পাঠ আলোচনা শুরু হয়। স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ একটির পর একটি নিয়ম করিয়া পাঠ হইত। চারুচন্দ্রই ছিলেন উদ্যোগী পাঠক, অপর সকলেই নিষ্ঠাবান শ্রোতা।

এইকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর পবিত্র উৎসাহ ও সাহচর্য যুবকদিগকে

খুবই অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। কেদারনাথের বাড়ীতে তিনিও প্রায় নিত্যই আসিয়া যুবকদিগকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবাদর্শে খুব মাতাইয়া তুলিলেন। তাঁহাকে লইয়া চারুচন্দ্রেরা একবার শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবও উদ্‌যাপন করেন। চারুচন্দ্র কর্তৃক আনীত পূর্বোক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতিতে স্বয়ং নিরঞ্জনানন্দজী সেদিন পূজা করিয়াছিলেন। কেদারনাথের বাড়ীতেই এই উৎসব হয়। যাহা হউক, নিরঞ্জনানন্দজী পরে হরিদ্বারের দিকে চলিয়া যান। স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য কল্যাণানন্দ যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে কাশীধামে আসিয়া কেদারনাথেরই অতিথি হইয়াছিলেন, তখন চারুচন্দ্রপ্রমুখ যুবকরাও তাঁহার সাহচর্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর সেবাদর্শের অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বটি, সম্ভবতঃ কল্যাণানন্দের সঙ্গগুণেই তাঁহারা প্রথম অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দও আদর্শবাদী যুবকদলকে পাইয়া স্বামিজীর ভাবে তাঁহাদিগকে খুব সতেজ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের প্রতি কল্যাণানন্দের একটা আস্থার ভাব বরাবরই ছিল। পরে দেখা যায়, তিনি যখন কিষেণগড়ে সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন উপযুক্ত কর্মীর অভাব হওয়ায় তিনি কাশীতে চারুচন্দ্রের কাছেই পত্র দিয়া জানাইয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া চারুচন্দ্রেরই বন্ধু কেদারনাথ তখন কিষেণগড়ে গিয়াছিলেন কল্যাণানন্দের কর্মিরূপে।

চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে তখন কাশীতে একটি যুবক-সঙ্ঘ সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতেই গড়িয়া উঠিতেছিল। ইঁহারা স্বামিজীর ভাবকে স্ব স্ব জীবনের অবলম্বন করিয়া, পরহিত-ব্রতকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেদিন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন—কলিকাতা হইতে ডাকযোগে 'উদ্বোধন' আসিয়া চারুচন্দ্রের হাতে পৌঁছাইল। 'উদ্বোধন' খুলিয়াই চারুচন্দ্রের চোখে পড়িল, স্বামিজী-রচিত অগ্নিগর্ভ কবিতা 'সখার প্রতি'। বার বার কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি চারিটি তিনি পড়িতে লাগিলেন :

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

কবিতার প্রতি ছত্র চারুচন্দ্রের ভাবজগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করিল।

পড়িতে পড়িতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব পুলক অনুভব করিলেন। স্বামিজীর আহ্বানে তিনি শিহরিয়া উঠিতেছিলেন—আনন্দের আতিশয্যে অস্থির হইয়া 'উদ্বোধন'-খানি হাতে লইয়া জনৈক বন্ধুর গৃহে তখনই ছুটিয়া যান। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল তখন। বন্ধুটি তাঁহার ঘরের কোণে বসিয়া একান্তে ভগবচ্চিন্তা করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই তাঁহাকে আসন হইতে তুলিয়া, পঠিত 'উদ্বোধন'-এর সেই পৃষ্ঠাটি খুলিয়া উদাত্তস্বরে তাঁহার কাছে পাঠ করিতে থাকিলেন। আনন্দে আবেগে বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "আরে স্বামিজীর কথা শোন। কি তুমি ঘরের কোণে চোখ বুজে আছ! এই শোন স্বামিজীর বেদান্তবাণী। ঐ যে সম্মুখে ব্যাধি-পীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্রদের দেখছ,ওরাই আমাদের ঈশ্বর—আমাদের নারায়ণ—আমাদের শিব।" চারুচন্দ্রের এই বন্ধুটির নাম যামিনীরঞ্জন মজুমদার। উভয় বন্ধুই যেন তাঁহাদের বহুপ্রতীক্ষিত আদর্শ-পথকে এতদিনে খুঁজিয়া পাইলেন। চারুচন্দ্র আবার বলিতে থাকিলেন, "শোন যামিনী, স্বামিজী বলেছেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই জগতের প্রত্যেক জীবের মধ্যেই অধিষ্ঠান করছেন! সর্বভূতে ব্রহ্ম রয়েছেন—এই ভাবটিকে জাগিয়ে তোলাই সকল ধর্মের, সকল সাধনার এবং সকল কর্মের সারকথা। আজ স্বামিজী আমাদের এই কথাই বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা।" যামিনীরও প্রতি শিরায় শিরায় তখন বিবেকানন্দ-তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে শুরু করিয়াছিল। স্বামিজীর ভাবাদর্শে দীক্ষাগ্রহণ চারুচন্দ্রের এইভাবেই হইয়াছিল।

অবিমুক্ত বারাণসী—সনাতন ভারতের প্রাচীনতম তীর্থ। যুগ যুগ ধরিয়া এই তীর্থভূমিতে কত মানুষের ভিড়—কত সাধু সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের আনাগোনা এখানে চলিতেছে! মুক্তিকামী অসংখ্য নরনারী জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার চরণ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন। তখনকার দিনে সুবিধাবাদী পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করিত। যাত্রীদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে তাহার টাকাকড়ি সব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় ধর্মশালা হইতে পথে বাহির করিয়া দিত। যাত্রীটি যদি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হইতেন, তবে তাঁহার যে কী শোচনীয় পরিণতি হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। অসহায় এইসব যাত্রীরা পথে পড়িয়াই মরিতেন।

চারুচন্দ্রের পূর্বোক্ত বন্ধু যামিনীরঞ্জন অনুরূপ একটি বৃদ্ধাকে পথের ধারে মরণোন্মুখ দেখিয়া, স্বহস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেদিন ছিল ১৩ই জুন—অর্থাৎ চারুচন্দ্রের মুখে 'সখার প্রতি' আবৃত্তি শুনিবার ঠিক পরের দিন। যামিনী ছত্রের ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেন, আর নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাদর্শন এবং সাধন-ভজন লইয়াই দিন কাটাইতেন। সেদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে ফিরিবার পথে, মুমূর্ষু এই বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মৃতপ্রায় বুড়ীর সর্বাঙ্গ মল-মূত্রে ঢাকিয়া ছিল—যামিনীরঞ্জন বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে তাঁহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, পরম যত্নে তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া একটি রোয়াকে শোয়াইয়া দিয়া পথ্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। পথ্য সংগ্রহ তিনি করিবেন কোথা হইতে? তিনি নিজে তো ভিক্ষাজীবী। তাই পথচারী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হাত পাতিয়া চার আনা পয়সা ভিক্ষা লইয়াছিলেন—উহা দিয়া একটু গরম দুধ কিনিয়া বুড়ীর মুখে দিয়া তখনকার মতো তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য অনেক চেষ্টায়, অনেক বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাকে ভেলুপুর হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিয়া শুশ্রূষাদির ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। নিজেরাই চাঁদা তুলিয়া হাসপাতালের ঔষধ-পথ্যাদির খরচ বহন যামিনীপ্রমুখ যুবকরাই করিয়াছিলেন। যামিনীর এই সেবাকার্যে সেদিন চারুচন্দ্রই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। যামিনীর পশ্চাতে চারুচন্দ্র, কেদারনাথ প্রভৃতি যুবকরা আসিয়া একে একে দাঁড়াইতেই, তাঁহারও বুকে বল-ভরসা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, যামিনীরঞ্জনের উদ্যোগে ও চারুচন্দ্র-কেদারনাথের মিলিত উৎসাহ ও সমর্থনে এবং তাঁহাদের আর আর যুবক বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় সেদিনের এই ক্ষুদ্র সেবানুষ্ঠানেই বর্তমান কাশী সেবাশ্রমের বিরাট সেবাযজ্ঞের সূচনা। সেদিক দিয়া বলা যায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন সেবাশ্রমের প্রারম্ভ-দিবস। আর ভিক্ষালব্ধ ঐ চার আনাই উহার প্রথম মূলধন। পথিপার্শ্বের সেই বৃদ্ধা, যিনি সেবাশ্রমের সেবা সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নৃত্যকালী দাসী।

সেবাব্রতধারী চারুচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম উৎসাহের সহিত বারাণসীর গলিতে গলিতে ঘুরিয়া আর্ত, পীড়িত, অসহায়, কাহাকেও দেখিলে; প্রাণপণ করিয়া নারায়ণজ্ঞানে তাঁহার সেবাদি করিতে আরম্ভ করিলেন।

নিয়মিত সৎপ্রসঙ্গ, এবং স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ ব্যতীত, যুবগোষ্ঠীর ইহাই হইল নিয়মিত কর্মসূচি। অনাথাশ্রম বা Poor Men's Relief Association নামে একটি সমিতি এইভাবেই ধীরে ধীরে চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হইয়া উঠিল। নিজেরা চাঁদা দিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া রোগী-নারায়ণদের জন্য ঔষধ-পথ্য ও বিছানা-কম্বল এবং হাসপাতালের খরচ ইত্যাদি নির্বাহ করিতেন। কেদারনাথের বাড়ীতেই এই সমিতির কার্যালয় ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় রামাপুরায় ডি ৩২।৮২ জঙ্গমবাড়ীতে একটি ঘরে এবং পরে ক্রমান্বয়ে কার্যের পরিবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ২২৭ দশাশ্বমেধ ঘাটে (১৯০১-এর ১৯শে ফেব্রুআরি), ও ডি ৩৮।১৫৩ রামাপুরায় (১৯০১-এর ২রা জুন) উহা স্থানান্তরিত হয়। অনাথাশ্রম সমিতির কার্য ক্রমশঃ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। চারুচন্দ্রও সংসারের সংশ্রব ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া অনাথাশ্রমের সেবাকার্যেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে ওকাকুরা প্রভৃতিসহ স্বামিজী যখন বারাণসীতে আগমন করিয়াছিলেন, তখনই চারুচন্দ্রের জীবনচক্র উপযুক্ত গতিবেগ আহরণ করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিল। স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চারুচন্দ্র তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া নিরঞ্জনানন্দজী ও শিবানন্দজীর সহিত মোগলসরাই ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। নিরঞ্জনানন্দজী ও শিবানন্দজী স্বামিজীর আগমনের কিছুদিন পূর্বেই কাশীতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী তখন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চারুচন্দ্র প্রতিদিনই স্বামিজীর কিছু-না-কিছু সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি এক একদিন স্বামিজীকে আহারাদি করাইয়া অধিক রাত্রি হইয়া গেলে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে স্বামিজীরই পাশের ঘরে তিনি রাত্রি কাটাইতেন। স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাঁহাদের সেবাকার্যের উদ্দেশ্য ও ভাব আরও সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের উপলব্ধিতে আসিয়াছিল। স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "সেবাধর্ম সহায়ে সর্বভূতের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য সহজে অনুভবগম্য। তোমরা কিন্তু তোমাদের কর্মজীবনে *দয়াকে উচ্চ স্থান নির্দেশ করেছ। মনে রেখো, দয়া প্রদর্শনের অধিকার তোমাদের নেই। যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর তিনিই দয়া প্রদর্শনের অধিকারী।*

যে দয়া করতে চায়, সে নিশ্চয়ই গর্বিত ও অহঙ্কৃত। কারণ সে অপরকে নিজের চেয়ে নীচ ও হীন মনে করে। দয়া নয়—সেবা-ই তোমাদের জীবনের নীতি হোক। দেবমূর্তিজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কর্মকে ধর্মে পরিণত কর। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ জীবের দুঃখ দূর করতে পারে না। তোমরা Poor Men's Relief কি করবে? False colours-এ march করোনা। তোমাদের সমিতির নাম কর Home of Service—সেবাশ্রম।" চারুচন্দ্র-প্রমুখ যুবকদের চোখ খুলিল—তাঁহারা সমিতির নাম স্বামিজীর নির্দেশমতো রাখিলেন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—Ramakrishna Home of Service। সেবাশ্রম তখনও মিশনের হাতে যায় নাই।

একদিন স্বামী শিবানন্দজী চারুচন্দ্রের ও তাঁহার দুই একটি বন্ধুর জন্য স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া যুবকগণকে দীক্ষা প্রদান করেন। স্বামিজীও প্রসন্ন হইয়া চারুচন্দ্রকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। কাশীতে স্বামিজীর উপস্থিতি স্বল্পকালের জন্য হইলেও, চারুচন্দ্রপ্রমুখ যুবকদের অন্তরে উহার প্রভাব দূর প্রসারী হইয়াছিল। কাশীত্যাগের পূর্বে চারুচন্দ্রপ্রমুখ যুবকগণের অনুরোধে সেবাশ্রমের সাহায্যার্থ জনসাধারণের নিকট একটি আবেদন[১] (Appeal) স্বামিজী স্বয়ং ইংরেজীতে বলিয়া দিয়াছিলেন—নিকটবর্তী কেহ উহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে স্বয়ং স্বামিজী-প্রচারিত এই আবেদনটির নিশ্চিতই একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। মূল আবেদনটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ:

প্রিয়…

ইহার সহিত ৺কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গত বৎসরের একটি কার্যবিবরণী গ্রহণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

এই পুণ্যতীর্থে যে সকল ব্যক্তি, সাধারণতঃ বৃদ্ধ নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে পাইবেন।

বর্তমান শিক্ষার জাগরণ ও জনমতের অভ্যুত্থানের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ,

---

১ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, (Vol. V) Published by Advaita Ashrama দ্রষ্টব্য।

াহাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে াই। এই তীর্থ হিন্দুদিগের নিকট পবিত্রতম, তাই ইহার সমালোচনাও ঠোরতম।

অন্যান্য তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপ-মোচনের উদ্দেশ্যে যায়। সেজন্য সগুলির সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক—মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু ার্য সভ্যতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে—এই নগরে—বৃদ্ধ ও রাগ্রস্ত নর-নারীগণ বিশ্বনাথের মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করিয়া যাহাতে চরম মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সেজন্য দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় থাকেন।

ইহা ছাড়াও, যাঁহারা জগদ্ধিতায় সর্বত্যাগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও শৈশবের সকল সম্পর্ক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও এ শহরে বাস করেন। মানুষের সাধারণ নিয়তি—দৈহিক রোগাদির দ্বারা তাঁহারাও আক্রান্ত হন।

শহরের ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোহিতবর্গের উপর সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচনা বর্ষিত হয়, হয়তো তাহাও সত্য। তথাপি ভুলিলে চলিবে না—জনসাধারণ যেমন, পুরোহিতও তেমনি। যদি লোকে জোড়হাতে কেবল একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও দুঃখের এই দুর্বার স্রোত —যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা, সন্ন্যাসি-গৃহস্থ সকলকেই অসহনীয় দুর্ভোগের আবর্তে টানিয়া ফেলিতেছে—কেবল দেখিতেই থাকে এবং ঐ প্রবাহ হইতে কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্যায় কার্যের শুধু বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনা করে, তাহা হইলে এই দুর্ভোগের এক কণাও কমিবে না, বা কেহই উহাতে উপকৃত হইবে না।

প্রশ্ন এই—শিবের এই চিরন্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে চাই? যদি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বৎসরের পর বৎসর এখানে আসিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। দুঃখিগণের মোক্ষলাভের এই চিরন্তন ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য।

যে-সব দুঃখার্ত ব্যক্তি এইস্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহারা নিজ নিজ জন্মস্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহারা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহাদের যে কী অবস্থা হয়, তাহা অনুভব করিবার ভার, ও হিন্দু-হিসাবে আপনারা উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার ভার, আপনাদের বিবেকের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ! অন্তিম বিশ্রামের প্রস্তুতির এই অদ্ভুত স্থানের আশ্চর্যকর আকর্ষণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনারা কি চিন্তা করিতে পারেন না? মৃত্যুর মধ্য দিয়া মোক্ষের দিকে গমনশীল তীর্থযাত্রীদের এই অবিরাম প্রবাহ আপনাদিগকে কি বিস্ময়ান্বিত শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যদি করে, তবে আসুন আমাদিগের এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত করুন।

আপনাদের দান হয়তো সামান্য, আপনাদের সাহায্য হয়তো নগণ্য, তবুও কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। সেই প্রাচীন প্রবাদ—তৃণগুচ্ছগুলি একত্র করিয়া রজ্জু করিলে প্রচণ্ড মদমত্ত হস্তীকেও উহার দ্বারা বাঁধিয়া রাখা যায়।

বিশ্বনাথাশ্রিত সর্বদা আপনাদেরই

বিবেকানন্দ

স্বামিজীর নাম-স্বাক্ষরিত উক্ত আবেদনটি প্রচারিত হইলে, উহা সত্যই যেন মন্ত্রের মতো কার্য করিয়াছিল। দেশবাসীর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামবাহী এই সেবাশ্রমের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর সেবাশ্রমের সেবকগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণ কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরীর হলে মিলিত হইয়া, সেবাশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আরও স্থির হয় যে, ইহা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (Ramakrishna Mission Home of Service) নামেই অতঃপর অভিহিত হইবে।

সেবাশ্রমের উপর স্বামিজীর স্নেহাশিস্ বর্ষিত থাকার ফলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, সারদানন্দজী, শিবানন্দজীপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণেরও সতর্ক দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ক্ষুদ্র বীজাকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে বৃহৎ মহীরুহে পরিণত করিতে, এই সকল মহাপুরুষদের প্রেরণা ও শুভেচ্ছা লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়া করিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহার শ্রীগুরুর

আশীর্বাদপুষ্ট এই সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন; এবং লেখনী ধারণ করিয়া ও বক্তৃতাদি দিয়া ইহার ভাব ও আদর্শকে শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রচারে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন।

স্বামিজীর আদেশে শিবানন্দজী কর্তৃক কাশীতে অদ্বৈত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহা সেবাশ্রমের ত্যাগী কর্মীদের পক্ষে এক নূতন সুযোগ ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই, চারুচন্দ্র যখন কলিকাতার এক বন্ধুর নিকট হইতে তারে সংবাদ পাইলেন যে গতরাত্রে স্বামিজী মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন—তখন তিনি বজ্রাহতের মতো ছুটিয়া গিয়া ঐ তার-বার্তাটি মহাপুরুষজীকে দেখাইয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ইতঃপূর্বেই মঠ হইতে ঐ দুঃসংবাদ পাইয়াছিলেন। সজলচক্ষে চারুচন্দ্র ও উপস্থিত অন্যান্য সেবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী কখনও কখনও বলতেন কাশীর কাজই আমার শেষ কাজ। দেখ তাঁর কথা কেমন আশ্চর্যভাবে ফলে গেল। কয়েকমাস পূর্বে তিনি তোমাদের অন্তরে সেবাধর্মের বীজ বপন করে গেলেন—আবার তাঁরই ইচ্ছানুসারে গতকাল[1] অদ্বৈত-আশ্রমের প্রতিষ্ঠার দিনেই তিনি মহাসমাধিমগ্ন হলেন। এই ঘোর বিপদ দ্বারা ভারতের কি কল্যাণ সাধিত হবে কে জানে? ঠাকুর ও স্বামিজী যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন, তাই ভারতের প্রত্যেক নরনারীর কল্যাণকর গন্তব্য পথ।" স্বামী শিবানন্দজীর উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সেবাশ্রমের কর্মিগণকে তখন যথেষ্ট শক্তি দিয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কনখলের পথে সুবোধানন্দজী সহ যখন কাশী অদ্বৈত-আশ্রমে আগমন করেন, তখন তিনিই সেবাশ্রমের জন্য স্থায়ী গৃহনির্মাণের উপযোগিতা সম্পর্কে চারুচন্দ্র প্রভৃতি কর্মীদিগকে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখন হইতেই সেবাশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমির অনুসন্ধান করা হইতেছিল। আরও স্মরণীয় যে স্বয়ং মহারাজই তখন কাশীর নানা স্থানে ঘুরিয়া জমির খোঁজ লইয়াছিলেন।

---

১ ৪ঠা জুলাই, ১৯০২, স্বামিজীর মর্ত্যলীলার অবসান দিবসেই কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাশীর লাক্‌সা পল্লীতে সেবাশ্রম স্থাপনার উপযুক্ত সুবিস্তৃত পাঁচ বিঘা জমি অবশেষে সংগৃহীত হইল। কলিকাতার শ্রীউপেন্দ্র-নারায়ণ দেব ও হুগলীর শ্রীভবতারিণী পাল জমি ক্রয়ের জন্য সমগ্র অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে স্বামী সারদানন্দজী তখন কাশীতে উপস্থিত থাকায়, তাঁহার ও শিবানন্দজীর অনুমোদন লইয়া ঐ জমি মিশনের নামে ক্রয় করা হয়। পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী নূতন জমিতে সেবাশ্রমের প্রকল্পিত গৃহাদির জন্য ভিত্তিস্থাপনা করেন এবং আরও প্রায় দুই বৎসর পরে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে মহারাজই নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও পরিকল্পনাতেই সেবাশ্রমের নূতন ভবনগুলি নির্মিত হইয়াছিল। সেবাশ্রমের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিবস সন্দেহ নাই। চারুচন্দ্রের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করিল। সেবাশ্রমের নূতন গৃহাদিতে, ছয়টি সাধারণ রোগীর এবং তিনটি সংক্রামক রোগীর জন্য—মোট নয়টি বিভাগে ৪৬ জন রোগীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বহির্বিভাগে (outdoor) ঔষধ বিতরণের স্থান, ঔষধালয় ও পাঠাগার ইত্যাদির জন্যও আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দেশের বদান্য ব্যক্তিদের দান ও সাহায্যেই, সেবাশ্রমের কর্মীরা চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রাণমন ঢালিয়া নর-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লাক্‌সা পল্লীতে নূতন সেবাশ্রমের কার্য শুরু হইলে, বারাণসীর তদানীন্তন শাসক শ্রীগ্যাস্‌কেল স্থানীয় পৌর-সমিতি হইতেও বার্ষিক ১২০ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সরকার বা সরকার-অনুমোদিত কোন সংস্থার তরফ হইতে সেবাশ্রমের কার্যের প্রতি কার্যকরী সহযোগিতা এইভাবেই প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিদিত প্রতিষ্ঠান, বহু ঐতিহ্যের ধারক, বহু পুণ্যস্মৃতির স্মারক, বিশিষ্ট সেবানিকেতন—কাশী সেবাশ্রমের ইহাই সংক্ষিপ্ত পুরাতন ইতিহাস।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর, চারুচন্দ্রের তথা সেবাশ্রমের পক্ষে একটি মহা পুণ্য দিন। ঐদিন জগজ্জননী সারদা দেবীর পদধূলিতে সেবাশ্রম তীর্থে পরিণত হইয়াছে। মা সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া চারুচন্দ্রের নিকট তাঁহার আশীর্বাদ-স্বরূপ একখানি দশ টাকার নোট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, "এই জায়গা আমার এত ভাল লাগছে যে, এখানেই স্থায়িভাবে

থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।" শ্রীশ্রীমার নিজ মুখের কথা ব্যর্থ হইবার নহে—স্থূলতঃ না হইলেও, সেবাশ্রমে জগন্মাতা অন্নপূর্ণার সেবামূর্তি নিত্য বিরাজিতা ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। জগন্মাতার আশিস্‌রূপে সেই দশটাকার নোটখানি অদ্যাবধি সেবাশ্রমে সযত্নে রক্ষিত আছে।

সেবাশ্রমের কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। চারুচন্দ্র সর্বদাই নিজেকে সকল সেবকের সেবক মনে করিয়া সেবাশ্রমের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্মের স্বাভাবিক গতি সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, সেবাশ্রমের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা কিছু হয় নাই। নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম উহাকেও করিতে হইয়াছে। আর সকল ক্ষেত্রেই চারুচন্দ্রের আশ্চর্য ধৈর্য, সহনশীলতা, পরিচালন-দক্ষতা, এবং সর্বোপরি আদর্শনিষ্ঠা সেবাশ্রমের অগ্রগমনের সহায়ক হইয়াছে। কর্মের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় নানা অলৌকিক উপায়ে সহায়তাও ততই আসিতেছিল। ধীরে ধীরে সেবাশ্রমের আয়তনও স্ফীত হইতে থাকে। শুধু মাত্র পীড়িতের সেবার মধ্যেই চারুচন্দ্রের কর্মশক্তি আবদ্ধ থাকে নাই, দরিদ্র শিশুদের জন্য এবং অনাথা বৃদ্ধাদের জন্যও পৃথক পৃথক আশ্রম তাঁহারই উদ্যমে স্থাপিত হইয়াছিল।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কাশীতে আগমন করিয়া সেবাশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। মহারাজেরই উৎসাহে এইবার অদ্বৈত-আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজের উপস্থিতি চারুচন্দ্রপ্রমুখ সেবাশ্রম-কর্মীদের অধ্যাত্ম-জীবনের বড় সহায়ক হইয়াছিল। মহারাজই স্বয়ং সেবাশ্রমকে নানা বৃক্ষ-লতায় সুসজ্জিত করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে চারা ও বীজ আনাইয়া যথাস্থানে রোপণ করিয়া সেবাশ্রমের আশ্রম-শ্রী তিনিই প্রদান করিয়াছিলেন। পুরী হইতে নানা বর্ণের সামুদ্রিক ঝিনুক ও কড়ি আনাইয়া সেবাশ্রমের প্রধান প্রবেশপথের দুই স্তম্ভের গায়ে খচিত করাইবার ব্যবস্থাও মহারাজই করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাই এখনও সেবাশ্রমকে 'কৌড়ী হাসপাতাল' বলিয়া থাকে। সেবাশ্রমের একটি বেলগাছকে দেখাইয়া মহারাজ একবার বলিয়াছিলেন, "ঐ বেলগাছে একজন সূক্ষ্মদেহী আছেন, কারুর অনিষ্ট করেন না।" ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী প্রেমানন্দজী ও স্বামী শিবানন্দজী কিছুকাল সেবাশ্রমে বাস করিয়া চারুচন্দ্রকে উৎসাহিত

করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী সেবাশ্রমে একাধিকবার আগমন করিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তো জীবনের অন্তিমভাগ কাশী-ধামেই অতিবাহিত করেন। কাশী সেবাশ্রমের নাম এই পুরুষশ্রেষ্ঠের পুণ্য-নামের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হইয়া আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি হইতে জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর কাল তিনি সেবাশ্রমেই ছিলেন। তুরীয়ানন্দজী বলিতেন, "সেবাশ্রমের রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয়। শিবাবতার স্বামিজীর বাক্যে বিশ্বাস কর্, সেবাশ্রমে শিবের সেবায় লাগ্, মুক্ত হয়ে যাবি। পূর্ব-পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাধনা।" সেবাশ্রমের সেবকমণ্ডলীকে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য তিনি জোরের সহিত বলিতেন, "তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।" এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সস্নেহ লালন-পালনে এবং চারুচন্দ্রপ্রমুখ অক্লান্তকর্মা সেবকদের অতন্দ্র উদ্যমে সেবাশ্রম যথার্থই একটি সেবা-সাধনার পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, চারুচন্দ্র অবশেষে যেন সর্বকর্মের পারে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুআরি, তাঁহার পরমারাধ্য আচার্য স্বামিজীর আবির্ভাব-তিথির পূর্ব-রাত্রে সহসা চারুচন্দ্র জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, 'কাল হইতে আমার ছুটি এবং বোধ হয় ইহাই আমার শেষ ছুটি।" রাত্রি প্রভাত হইতেই তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে, তথা কর্ম হইতে অবসর লইয়া একাকী প্রয়াগতীর্থে চলিয়া যান। প্রয়াগের নিকটবর্তী ঝুসিতে থাকিয়া তিনি এইকালে কিছুদিন তপস্যায় মগ্ন হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজী তখন কাশীধামে আগমন করিয়াছেন। সেদিন ছিল মহারাজেরই জন্মতিথি—চারুচন্দ্র সেইদিনই প্রয়াগতীর্থ হইতে কাশীধামে ফিরিয়া আসিয়া, মহারাজকে তাঁহার জন্মদিনের প্রণতি নিবেদন করেন। প্রায় মাসখানেক পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতে মহারাজও কর্মত্যাগী চারুচন্দ্রের কর্মবন্ধন নিঃশেষে মোচন করিয়া দিয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করেন। জগতে কর্মী চারুবাবুর মৃত্যু হইল—তাঁহার শরীরে নবজন্ম লাভ হইল সন্ন্যাসী শুভানন্দের।

স্বামী শুভানন্দ অতঃপর নিঃসম্বল পরিব্রাজকের মতো কিছুকাল উত্তরাখণ্ডের তীর্থাদি পর্যটনে ও তপস্যায় রত ছিলেন। তীর্থপর্যটন ও তপস্যাকালে তিনি মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা উদরপূর্তি করিতেন। এইকালে অকিঞ্চন-দীনবেশে ভগবানের নামমাত্র সম্বল করিয়া, সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণাদিতেই মনের সকল শক্তি তিনি প্রয়োগ করেন। যখন তিনি কর্মের মধ্যে ছিলেন সর্বশক্তি কর্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন, আবার যেদিন হইতে কর্মত্যাগী হইয়াছেন, সেদিন হইতে নিরালম্ব সন্ন্যাসী তিনি। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়া, শ্রীগিরীশ্বর-মন্দিরে বাস করিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমে গিয়া বাস করিবার জন্য বহু অনুরোধ-উপরোধ করা হইলেও, তিনি তপস্যার জীবন আর ত্যাগ করেন নাই।

যাহা হউক, সেবাশ্রমাধ্যক্ষ কালিকানন্দের আগ্রহে তিনি পুনরায় কিছুদিনের জন্য সেবাশ্রমে যদিও আসিয়াছিলেন, তথাপি কর্মে প্রবেশ আর করেন নাই। দেরাদুনের নিকটে কিষেণপুরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-কুটীর' ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শুভানন্দেরই পরামর্শানুযায়ী সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষ স্থাপনা করেন। 'সাধন-কুটীর' নামটি স্বামী তুরীয়ানন্দজী দিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের সাধু-কর্মীরা কর্মক্লান্ত হইয়া পড়িলে, 'সাধন-কুটীরে' গিয়া কিছুকাল একান্তবাস ও ভজন-সাধন করিয়া মানসিক ও শারীরিক উন্নতি করিবে—ইহাই ছিল শুভানন্দের আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষাটি তুরীয়ানন্দজী জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি খুব আনন্দিত যে, শুভানন্দ এই রকম একটি আশ্রম স্থাপন করিতে চায়। আশ্রমের নাম 'সাধন-কুটীর' রাখা উচিত। তোমাদের শুভ সঙ্কল্প অচিরে সিদ্ধ হোক।" স্বামী সারদানন্দজীও শুভানন্দের এই প্রস্তাবে খুব খুশী হইয়াছিলেন। কিষেণপুরে 'সাধন-কুটীর' প্রতিষ্ঠিত হইলে শুভানন্দ আরও কয়েকজন সেবক-সাধুকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া কিছুদিন তপস্যাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কঠোরতা সহ্য হইল না—পুনরায় চিকিৎসার্থ কাশীতেই নামিয়া আসিতে হইল।

রুগ্ন দেহেও কাহারও সেবা তিনি গ্রহণ করিতেন না—ফলে শরীরের যাতনা বাড়িয়াই চলিতেছিল। স্বামী সারদানন্দজী অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, মঠে লইয়া গিয়া চিকিৎসাদি করাইবেন। মঠে একবার গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশীদিন থাকেন নাই। শুভানন্দ সঙ্কল্প লইয়া বসিলেন যে, কাশীতেই শরীর-

ত্যাগ করিবেন। কিন্তু কাশীর গরম অসহ্য হইয়া ওঠায়, তাঁহাকে কনখলে লইয়া যাওয়াই স্থির হয়। কনখল যাইবার ব্যবস্থাদি যখন সব হইয়া গিয়াছে, তখন একদিন সারদানন্দজীর একখানি পত্র মাথায় ঠেকাইয়া শুভানন্দ বলিয়াছিলেন, "ভেবেছিলাম, নশ্বর দেহটি কাশীর গঙ্গাতেই বিসর্জন দেব। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা অন্যরূপ দেখছি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি কনখলেই যাব।"

ইংরেজী ১৯২৬ সালের এপ্রিল। স্বামী শুভানন্দজী কনখলের জলবায়ুতে একটু হয়তো ভালই বোধ করিতেছিলেন। হিমালয়ের পবিত্র আবেষ্টনীতে তাঁহার মানসিক প্রফুল্লতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সহসা নববর্ষের প্রথম প্রভাতে (১লা বৈশাখ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিতে হয়। ঘটনাটি তাঁহারই জনৈক সেবকের লিখিত একখানি পত্রে বিস্তৃত বর্ণিত আছে[১]: "আজ (১লা বৈশাখ) প্রায় এক মাইল বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় তিনি (স্বামী শুভানন্দ) স্নান করিবেন বলিয়া ক্যানেলের (গঙ্গা হইতে কাটা খাল) একটি ঘাটে গায়ের কাপড় ও জুতা রাখিয়া জলে নামিলেন। আশ্রমে গিয়া কাপড় গামছা লইয়া আসি এই ভাবিয়া আশ্রমে আসিলাম এবং তাঁহার কাপড় লইয়া ১০।১২ মিনিটের ভিতর সেখানে ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু গিয়া দেখি—উপরে গায়ের কাপড় ও জুতা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি নাই। ইহা দেখিয়াই আমি স্রোতের দিকে ছুটিতে লাগিলাম ও যাহাকেই সম্মুখে পাইলাম তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন সাধুকে কেহ জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছে কিনা। এইরূপভাবে ছুটিতে ছুটিতে 'পাঞ্জাবী সত্রের' কাছে গিয়া শুনিলাম, তথাকার কয়েকটি সাধু ক্যানেলে একটি সাধুকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তুলিয়াছিলেন এবং যখন জল হইতে তুলিয়াছিলেন তখনও দেহে প্রাণ ছিল বলিয়া তাঁহাদের মনে হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে বাঙ্গালী হাসপাতালে (সেবাশ্রমে) লইয়া গিয়াছেন। ঐ সংবাদ পাইয়াই আমি আশ্রমে ছুটিয়া আসি ও দেখি যে, তিনিই আমাদের শুভানন্দজী। আশ্রমের সকলে যথোচিত প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন; জল

১ 'উদ্বোধন', জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩৩, দ্রষ্টব্য।

সমস্তই বাহির হইল। কিন্তু ধমনীতে আর প্রাণের স্পন্দন হইল না। চেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল হইল না। চেহারা অবিকৃত ছিল ও মুখে এমন এক শান্ত ও জ্যোতির্ময় ভাব হইয়াছিল যাহা জীবনে ভুলিব না। এবার কাশী হইতে আসিবার সময় আমাকে গাড়ীতে বলিয়াছিলেন, 'কাশীপ্রাপ্তি তো হোল না হরিদ্বারপ্রাপ্তিই হবে।' তাহাই দেখিতে পাইতেছি সত্য হইল। মা গঙ্গাকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, সেই-জন্য গঙ্গাহীন দেশে থাকিতে চাহিতেন না। তাই বুঝি মা গঙ্গা তাঁহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন।"

স্বামী শুভানন্দ একজন আদর্শ কর্মী ছিলেন—তাঁহার সেবানিষ্ঠা, ও পরদুঃখ-কাতরতা চিরকালই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে। কাশীতে তিনি যখন সেবাশ্রমের সর্বময় অধ্যক্ষ, তখনও নিজের সম্পর্কে বলিতেন, "আমি সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধান করি মাত্র, কর্তা আমি নই।" প্রত্যহ বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা ও গঙ্গা-দর্শন তাঁহার অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আর গঙ্গার তটে কিছুক্ষণ বেড়ানো ও স্বামিজীর প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা ইহাও ছিল তাঁহার খুব প্রিয় অভ্যাস। এই সব উদ্দেশ্যেও যখন পথে বাহির হইতেন, তখনও কিছু চাল, ডাল, বা কোন না কোন খাদ্যবস্তু কিছু সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। কাহাকেও অভুক্ত দেখিলে তাহাকে নিজহাতে উহা প্রদান করিতেন। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, শুভানন্দ স্বীয় বুকের শোণিত মোক্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রীগুরুর নিকট লব্ধ সেবাদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'উদ্বোধন'[১]-এর ভাষা পুনরুক্তি করিয়া আমরাও বলি, সেবাশ্রমগৃহের প্রত্যেক ইষ্টকফলকে এবং মৃত্তিকার প্রতি রেণুতে স্বামী শুভানন্দের শোণিত বিন্দু মিশিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাহা থাকিবে; সেবাশ্রমের মৌনব্যথা চিরকাল তাঁহারই জয় ঘোষণা করিবে।

---

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

স্বামী পরমানন্দ

গভীর রাত্রি। লণ্ঠনহাতে চৌকিদার গ্রামের পথে পথে হাঁক দিয়া ফিরিতেছে। সকলেরই চোখে ঘুম আছে, দুরন্ত একটি শিশু কিন্তু তখনও জাগিয়া আছে। মাকে বলিয়া রাখিয়াছে—"চৌকিদার যখন হাঁক দেবে, আমায় তুমি জাগিয়ে দিও, মা।" সারা গ্রামের ঘুম-ভাঙ্গানো ঐ উচ্চ হাঁক শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগে—তাই রোজই সে অপেক্ষা করে, কতক্ষণে রাত্রি গভীর হইবে, কখন সেই লণ্ঠনধারী লোকটি তাহার হুঁশিয়ারি আওয়াজ জানাইবে। চৌকীদারকেও সে মনে মনে একজন মস্ত ব্যক্তি জ্ঞান করে। শিশুটির চোখে ঘুম কম,—বড় হইয়াও সে কমই ঘুমাইয়াছে। আর চৌকীদারের হাঁকও তাহার বরাবরই প্রিয় ছিল। লণ্ঠনধারী এক চৌকীদারের ডাকেই তো সে বড় হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিল। অবশ্য সে-চৌকীদার কিন্তু তাহার গ্রামে চৌকী দিত না—ঘুমন্ত বিশ্বমানব তাঁহার কম্বুধ্বনিতে জাগিয়া ওঠে, তাঁহার সতর্কবাণীতে আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পায়। লণ্ঠনও আছে তাঁহার হাতে—তবে উহাতে বিবেকের উজ্জ্বল শিখা।

শিশুটির নাম সুরেশচন্দ্র। বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র গুহঠাকুরতা স্বধর্মনিষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। সুরেশচন্দ্র মাতা-পিতার কনিষ্ঠ সন্তান, তাই সকলেরই বড় আদরের। তবে মাত্র নয় বৎসর বয়সেই সে মাতৃহারা হয়। এই মাতৃশোকই সংসারের মায়াপাশ ছেদনের উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা আনিতে তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। তাই কিশোর সুরেশকে সংসার বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই,—তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল অন্যভাবে—স্বামী পরমানন্দ নামে।

সুরেশচন্দ্রের গৃহে দেবসেবা ছিল। পিতার ধর্মানুরাগ ও পরহিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ সুরেশের মধ্যেও শৈশবকাল হইতে সংক্রমিত ছিল। তাঁহাদের স্বগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতে এবং আরও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহার পিতা পল্লীর মধ্যে একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা কিছুকাল কলিকাতায় এবং পরে ঢাকায় বসবাস করেন। সুরেশচন্দ্র শৈশব হইতেই



স্বামী পরমানন্দ

তীক্ষ্ণধী ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আদৌ তিনি মনোযোগী ছিলেন না। খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং বালকোচিত চপলতা ও দুরন্তপনাতেই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, ইত্যাদিতে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম। একবার ফুটবল খেলার শেষে, বাড়ী ফিরিবার পথে একটি বিষাক্ত সাপ দেখিয়া, অন্যান্য বালকেরা যখন ভয়ে চীৎকার করিতেছিল, সুরেশ তখন পরম আহ্লাদে জীবন্ত সাপটিকে লেজে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে মৃতপ্রায় করিয়া দূরে বাগানের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন। অভয় ও বিনয়, এবং পৌরুষ ও মাধুর্য তাঁহার মধ্যে সমভাবেই প্রকাশিত ছিল।

বৃদ্ধ পিতাকে সুরেশ ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। বালকের কণ্ঠও ছিল মিষ্ট। তাই পিতাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভজন গাহিয়া শোনানও তাঁহার একটি নিত্যকর্তব্য ছিল। পিতাকে শোনাইবার জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' তাঁহাকে পড়িতেই হইত। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-উদাহৃত 'সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন' কথাটি বালক সুরেশের মনে গভীর রেখাঙ্কন করিয়াছিল। রোজই পিতার কাছে বসিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পড়িতে পড়িতে, বালকের মনে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা দানা বাঁধিতে থাকে। এইকালে স্বামী নিত্যানন্দ নামে স্বামিজীর একজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের সংস্পর্শও বালক সুরেশের মনে জগতের অনিত্যতাবোধ আনয়ন করিতে অনেকখানি সহায়ক হইয়াছিল। একটি স্বপ্ন-দর্শনের স্মৃতিও নাকি তাঁহাকে এইকালে খুব ত্যাগের পথে প্রেরণা দিয়াছিল। যাহা হউক, বালক সুরেশ একদিন সংসারত্যাগের জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। বৃদ্ধ পিতা তো ইহা শুনিয়াই সুরেশকে প্রথমে খুব তিরস্কার করিলেন, পরে অনেক করিয়া বুঝাইয়া সংসারে ফিরাইবার জন্য বারবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি-মার্চ মাসের কোন সময়ে এক গভীর রাত্রিতে সুরেশ সকলের অজ্ঞাতসারে, গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সুরেশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে বেলুড় মঠেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র যখন মঠে আসিয়া যোগ দিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এত ছোট ছেলেকে মঠে যোগদান করিতে দেওয়া সমীচীন হইবে

কিনা, ইহা লইয়া মঠের সাধুরা একটু সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। বালক সুরেশচন্দ্রও ইহাতে বড়ই নিরাশ হইয়া, মঠের প্রথম রাত্রি বিনিদ্র যাপন করিলেন। মন তাঁহার দুঃখে ও অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার বালকবয়সই তাঁহাকে জীবনের পরমবাঞ্ছিত পথে চলিতে বাধা সৃষ্টি করিবে! যাহা হউক, দুশ্চিন্তার নিশা অবসান হইলে, মলিনমুখে তিনি অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। মনে মনে শ্রীভগবানের কাছে কাতরে জানাইতেছিলেন—"হে ঠাকুর তোমার অভয় আশ্রয়ে একটু স্থান দাও। আমি ছোট বলিয়াই কি তোমার চরণে ঠাঁই পাইব না? তুমি কি শুধু বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নও?" এমন সময়ে সহসা স্বামিজী তাঁহাকে ডাক দিলেন—"হ্যাঁরে, তুই গান গাইতে জানিস? গা তো একটা গান।" সুরেশের বুক হইতে যেন পাষাণভার খসিয়া পড়িল। স্বামিজীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াই, প্রাণ ঢালিয়া গান ধরিলেন—

"চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই।
(আমি) সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই॥
দিগন্তপ্রসার অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই।
(আমি) তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে কে ডাকে শুনিতে পাই॥
আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই।
আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই॥
কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে কারে শুধাই।
না জানি সন্ধান, যোগ ধ্যান জ্ঞান, প্রাণে মত্ত হয়ে ধাই॥"

স্বামিজী অদ্ভুত এক কৌশলে সুরেশের মনের কথাগুলি জানিয়া লইয়াছিলেন। হৃদয়ের সবটুকু ভাবের সহিত চোখের জল মিশাইয়া সুরেশও স্বামিজীর কাছে এইভাবেই তাঁহার প্রাণের কথা নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বামিজী বালকের আর্তিতে প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে মঠে থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং গুরুভ্রাতাদের ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিলেন, "এই ছেলেটি মঠে থাকবে।" স্বামিজীর অনুমতি হওয়াতে, অন্যান্য সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া, বালক সুরেশকে পরম-স্নেহভরে মঠে থাকিবার ব্যবস্থাদি সব করিয়া দিলেন। স্বামিজীর পদপ্রান্তে স্থান পাইয়া, সুরেশও সেই দিন হইতে নূতন জীবন লাভ করিলেন। উদ্বেগ-সমস্যা ও ভাবনা-চিন্তার অবসান হওয়াতে

বালকের মুখে চোখে অদ্ভুত এক মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, শীতের জড়তাশেষে সগুসমাগত বসন্ত-ঋতুর মলয়-স্পর্শে তাঁহাতে যেন নবীন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাই তাঁহাকে আদর করিয়া নাম দিলেন 'বসন্ত'। এই নামকরণের পশ্চাতে সুরেশের প্রতি মহারাজের একটি স্নেহাশীর্বাদও প্রচ্ছন্ন ছিল। ব্রহ্মানন্দজী বলিতেন, "শঙ্কর কি বলেছেন জানিস্ তো? তিনি বলেছেন, 'শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।' 'শান্ত মহান্ সাধুব্যক্তিরা সংসারে থেকে বসন্তঋতুর মতো লোককল্যাণে নিরত থাকেন—তাঁরা যেখানে যান, সেখানেই বসন্তসমাগমের আনন্দ।"

মঠে যোগদানের কিছুকালের মধ্যেই, বসন্ত মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট প্রেরিত হইলেন। বৈরাগ্যবান সুদর্শন বালককে দেখিয়া রামকৃষ্ণানন্দজীও সস্নেহে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীরই শিক্ষা-প্রভাবে বসন্তের ভাবী সাধুজীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতৃহারা বসন্ত এতদিনে আবার লোকপূজ্য এই বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীর মধ্যেই তাঁহার জননীকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। মাদ্রাজে আসিয়া বসন্ত রামকৃষ্ণানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ছয়মাস যাইতে না যাইতেই একটি অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া বসন্তের শান্ত জীবনকে কিছু বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। কলিকাতা হইতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ, তাঁহাকে নাবালক বলিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। মহারাজও নানাদিক বিবেচনা করিয়া, বসন্তকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দজীকে পত্র দিয়াছিলেন। বসন্তও তদনুযায়ী মাদ্রাজ হইতে বেলুড়ে চলিয়া আসিলেন।

বসন্ত মঠে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। বসন্তও অন্য সব চিন্তা ছাড়িয়া, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মহারাজও বসন্তের সেবায় খুব খুশী হইয়াছিলেন। একদিন সকালে স্বামিজী মঠের একতলার বারান্দায় প্রেমানন্দজীসহ বসিয়া আছেন, বসন্তকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, "খোকা, তুই আমার জন্য ভিক্ষা করে আনতে পারবি?" বসন্ত সানন্দে সম্মতি জানাইল। স্বামিজী তাঁহার ভাবী শিষ্যকে হয়তো বা এইভাবেই সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত করাইতেছিলেন। বসন্ত

ভিক্ষায় যাইবার জন্য উদ্যত হইলে, স্বামিজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "বাঃ বেশ। তোমার হাতের ভিক্ষান্ন পেলে আমি যে কত খুশী হব, তা তুমি জান না। তোমাকে আমি ভিক্ষুর বেশেই দেখতে চাই।" পরেই আবার বলিলেন, "দাঁড়াও, তোমাকে প্রথম ভিক্ষা আমিই দেব।" এই বলিয়া ভাণ্ডার হইতে একমুষ্টি চাল ও দুই একটি সব্জী আনিয়া নবীন ভিক্ষুকে স্বামিজী নিজ হাতে ভিক্ষা প্রদান করিয়া, খুব আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। বসন্তও স্বামিজীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এদিকে স্বামিজী বসন্তের জন্য পথ চাহিয়া অনাহারে বসিয়া আছেন। অনভ্যস্ত বসন্ত যখন ভিক্ষা লইয়া মঠে ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী তো আনন্দে প্রেমানন্দজীকে বলিয়া উঠিলেন, "ভিক্ষার অন্ন বড় শুদ্ধ। তাই ঠাকুর ভিক্ষার অন্ন পছন্দ করতেন। বাবুরাম, আমি বসন্তের ভিক্ষান্নই আজ গ্রহণ করব।" এই কথা বলিয়াই বসন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রান্না, রাঁধতে পার?" বসন্ত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে পারে। বসন্ত সেদিন স্বহস্তে স্বামিজীকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। স্বামিজীও বেলা দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, বসন্তের সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বসিয়াছিলেন। বসন্তের রন্ধিত অন্ন তিনি স্বয়ং পরম আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সাধুকেও দিতে বলিয়াছিলেন। স্বামিজী বারবার সেদিন বলিতেছিলেন, "শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারীর ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র।" বসন্তও সেদিন স্বামিজীর প্রসাদ ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

বসন্তের বাড়ী-ঘরের কথা কিন্তু এতদিন সকলে ভুলিয়াই ছিলেন। স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভ ও তাঁহার কিছু কিছু সেবাধিকার পাইয়া বসন্তও তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল, বসন্তের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিধবা হওয়ায়, তাঁহাদের বৃদ্ধ পিতা শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এই সংবাদ শুনিয়াই শোকসন্তপ্ত পিতার সান্ত্বনার জন্য, অবিলম্বে বসন্তকে তাঁহার পিতার নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন।

বসন্ত বাড়ীতে আসিয়া, পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিলে, পিতার প্রাণ শীতল হইল। পরিজনরাও তাঁহাকে বুঝাইয়া সংসারে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বসন্ত পিতাকে পূর্বের ন্যায় সেবাশুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যেমন ভজন-সঙ্গীত গাহিয়া শোনাইতেন, যেমন তাঁহার কাছে বসিয়া ধর্মপুস্তকাদি পাঠ করিতেন, তেমনই আবার সব করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-পরিজনরা বসন্তকে সংসারে বাঁধিবার জন্য বহুবিধ কৌশল ফাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু বিধাতা উপরে হাসিতেছিলেন। বসন্ত পিতাকে ক্রমে ক্রমে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিয়া, মঠে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার হাতে একখানি চিঠি আসিল—লিখিয়াছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী। কোন জরুরী প্রয়োজনে, রামকৃষ্ণানন্দজী কিছুদিনের জন্য বেলুড়ে আসিয়াছেন। সেখান হইতেই এই চিঠি লিখিতেছেন। চিঠিতে তিনি বসন্তকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামিজী তাঁহার খোঁজ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণানন্দজীকে ডাকিয়া নাকি স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'ছোকরা এতদিন বাড়ীতে বসে আছে কেন?' এই চিঠি পাইয়া বসন্তের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হইল না। পিতাকে স্পষ্টভাবে সব বলিয়া, তাঁহার পূর্ণ অনুমোদন ও আশীর্বাদ লইয়া বসন্ত পুনরায় বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর তখন। বসন্ত একদিন নীরবে একান্তে একটি গাছের তলায় আপন মনে বসিয়া আছেন, স্বামিজী সহসা তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, সন্ন্যাসী হতে চাস?" বসন্ত আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। পরবর্তী পূর্ণিমাতেই স্বামিজী তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি। পূর্ণিমা-রাত্রির শেষ প্রহরে স্বামিজী বসন্তকে জগদ্ধিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করিলেন। সন্ন্যাস-দীক্ষাপ্রাপ্ত বসন্তের নাম হইল স্বামী পরমানন্দ। পরমানন্দের সন্ন্যাসানুষ্ঠানে বিরজা-হোমে আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী।

স্বামিজী তখন বোধগয়া ও বারাণসী দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পরমানন্দকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল তাঁহার। কিন্তু মান্দ্রাজে কর্মীর অভাব থাকায়, পরমানন্দের আর স্বামিজীর সঙ্গে যাওয়া হয় নাই। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত পুনরায় তিনি মান্দ্রাজেই চলিয়া যান। স্বামিজীর সঙ্গে পরমানন্দের চর্মচক্ষে আর দেখা হয় নাই।

মান্দ্রাজে আসিয়া, পরমানন্দ ধ্যানজপ শাস্ত্রাদি পাঠ ছাড়াও, রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট সকলপ্রকার লৌকিক শিক্ষাও গ্রহণ করিতে থাকেন। কারণ তিনি

এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন যে, কোন উপযুক্ত অভিভাবকের সাহায্য বাড়ীতে বড় বেশী পান নাই। এখন হইতে রামকৃষ্ণানন্দজীই হইলেন একাধারে তাঁহার অভিভাবক, শিক্ষক, আচার্য এবং বন্ধু। পরমানন্দ মান্দ্রাজ চলিয়া আসিবার অল্প কিছুদিন পরেই তাঁহার শ্রীগুরুর মহাসমাধিলাভ হয়। সুতরাং তরুণ সন্ন্যাসীর বক্ষে সে-অভাব কতখানি বেদনাদায়ক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ যখন প্রচার সফরে মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন, তখন পরমানন্দ তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া, স্বামিজীর প্রসঙ্গ শুনিতেন। নিবেদিতার এবং সদানন্দের মুখে স্বামিজীর কথা শুনিতে শুনিতে পরমানন্দ যেন অন্তরে স্বামিজীরই সান্নিধ্য অনুভব করিতেন। নিবেদিতা তরুণ পরমানন্দকে আদর করিয়া ডাকিতেন 'বেবী স্বামিজী' (Baby Swamiji)। রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছেও কৌতূহলী পরমানন্দ স্বামিজীর বিষয়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। স্বামিজীর উপযুক্ত গুরুভ্রাতার মুখে, তাঁহার অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে পরমানন্দ রোমাঞ্চিত হইতেন।

রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট প্রত্যহ মধ্যাহ্নে দুইঘণ্টা তিনি শাস্ত্রপাঠ করিতেন। ইহা ছাড়া যাবতীয় কার্যে রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকায়, পরমানন্দের জীবন অতি স্বাভাবিকভাবেই ভক্তিতে জ্ঞানে ও কর্মে ফুটিয়া উঠিতেছিল। পরমানন্দের সেবাপরায়ণতা ও পরদুঃখকাতরতার বৃত্তিগুলি রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গগুণে আরও বিকশিত হইয়াছিল। আশ্রমে কেহ অসুস্থ হইলে, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে পরমানন্দকে দেখা যাইতই। রামকৃষ্ণানন্দজী বলিতেন, "পরমানন্দের পবিত্র ছোঁয়া লেগেই যেন লোকের ব্যাধির আরাম হত।" একবার রামকৃষ্ণানন্দজী পরমানন্দকে শীতের উপযোগী একখানি ভাল চাদর দিয়াছিলেন। প্রচণ্ড শীতেও তাঁহার গায়ে কোন চাদর না দেখিয়া, রামকৃষ্ণানন্দজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার চাদর গায়ে দাওনি কেন?" পরমানন্দ জবাব দিয়াছিলেন, "আমার তত শীত লাগে না।" রামকৃষ্ণানন্দজী পরে জানিতে পারেন যে, জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির শীতে গায়ে দিবার মতো কিছুই নাই দেখিয়া, পরমানন্দ চাদরখানি তাহাকেই দিয়াছে। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী তৎক্ষণাৎ মঠে প্রেমানন্দজীকে লিখিয়া খুব ভাল একখানি চাদর কলিকাতা হইতে আনাইয়া পরমানন্দকে আবার দিয়াছিলেন। পরমানন্দ এই

চাদরখানি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বহুকাল ব্যবহার করিয়াছেন, বিদেশেও লইয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত বিদেশ যাত্রার পূর্বে মাদ্রাজ মঠে আসিয়া কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাতীত স্বামীর সঙ্গে কোন বিছানাপত্র ছিল না। পরমানন্দ তাঁহার নিজের বিছানা ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে শয়ন করিতে দিয়া, মেঝেতে শয়ন করিতেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া, একদিন পরমানন্দ ঘরে আসিবার পূর্বেই একটি খালি তক্তার খাটের উপর শুইয়া পড়েন। পরমানন্দ তো ঘরে আসিয়া, এই কাণ্ড দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া, ত্রিগুণাতীত স্বামীকে বিছানায় শুইবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ কিছুতেই সম্মত হইতেছিলেন না। অবশেষে পরমানন্দ ত্রিগুণাতীত মহারাজকে দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া, একপ্রকার কোলে করিয়াই বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। স্মরণ থাকা দরকার যে ত্রিগুণাতীত স্বামীর দেহ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ, আর পরমানন্দের ছিপছিপে গড়ন ছোটখাটো শরীর। যাহা হউক, ত্রিগুণাতীত স্বামী অবশেষে একজন তরুণের সেবা-ভক্তির কাছে পরাস্তই হইলেন।

মাদ্রাজের গরমে পরমানন্দের শরীর প্রথম দিকে তেমন ভাল চলিতেছিল না। এই সময়ে রামকৃষ্ণানন্দজী জনৈক ভক্তের সাহায্যে, পরমানন্দকে কিছুকালের জন্য কাবেরীর তীরে তাঞ্জোরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস যে, ঋষি অগস্ত্য নাকি সেখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং লোককল্যাণসাধনের জন্য লোকান্তরিত ঋষি এখনও সূক্ষ্মদেহে ঐ পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। পরমানন্দ এই পবিত্র তীর্থে প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। ভজনানুকূল পরিবেশ পাইয়া, তিনি এই স্বল্পসময় ধ্যানধারণা লইয়াই কাটাইতেন। গভীর রাত্রিতে তিনি কাবেরীর তটভূমিতে বসিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া ধ্যান করিতেন। তাঞ্জোরের স্মৃতিপ্রসঙ্গে পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেখানে এক রাত্রে তাঁহার কোন বিশেষ দিব্যানুভূতি হইয়াছিল। ঐ তীর্থ যে খুব জাগ্রত অতঃপর তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরমানন্দ রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর মঠে থাকিয়া, পুনরায় তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া যান।

পরমানন্দকে রামকৃষ্ণানন্দজী কী স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গলাদেশে আসিবার সময়ে ট্রেনে, তাঁহারা যে কামরাটিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, উহার সংশ্লিষ্ট কলঘরের (washroom-এর) দরজার ছিটকিনিটি খারাপ ছিল। রামকৃষ্ণানন্দজী একবার ভিতরে আছেন, এমন সময়ে কলঘরের দরজাটি এরূপভাবে আটকাইয়া যায় যে, কোনমতেই আর খোলা যাইতেছিল না। বলিষ্ঠদেহ রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ভিতর হইতে বহু চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারিলেন না। পরমানন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া বাহির হইতে এত জোরে দরজাটিতে ঘা মারিলেন যে ছিটকিনিটি এক ধাক্কাতেই খুলিয়া যায়। কিন্তু প্রচণ্ড বেগে দরজাটি গিয়া রামকৃষ্ণানন্দজীর বুকে আঘাত দেয়। কাজেই দরজা খুলিবার আনন্দ অপেক্ষা, রামকৃষ্ণানন্দজীর অঙ্গে আঘাত লাগায়, পরমানন্দের লজ্জা ও ক্ষোভই বেশী হইল। মনে হইতেছিল, হায় ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ আঘাত তাঁহার নিজের বক্ষে এখনই কেন লাগিতেছে না? রামকৃষ্ণানন্দজী কিন্তু পরমানন্দকে কত বুঝাইলেন যে, না এমন কিছু তাঁহার লাগে নাই, ইত্যাদি। অবশেষে, পরম স্নেহে খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, "তোমার দ্বারা কি কেউ আঘাত পেতে পারে? কাউকে তুমি ব্যথা দিতে পার না—পারবেও না। তুমি জগতে এসেছ 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'।" পরমানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণানন্দজীর এই উক্তি শুধু নিছক স্নেহালাপই নহে, অনুগত সেবকের প্রতি ইহা তাঁহার আশীর্বাণী।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে কলম্বোতে আসিলে, পরমানন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত কলম্বো পর্যন্ত গিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সিংহল এবং দক্ষিণভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, মাদ্রাজেই আবার ফিরিয়া আসেন। পরে অভেদানন্দজীর সহিত ব্যাঙ্গালোরে যান। দাক্ষিণাত্যের তীর্থাদি ভ্রমণ শেষ করিয়া তাঁহারা পুরীধামে গমন করেন। সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, প্রেমানন্দজী ও শিবানন্দজী আসিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টেশন হইতে সোজা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া যান। একসঙ্গে এতজন মহাপুরুষের সাহচর্যে শ্রীমন্দিরে গমন, পরমানন্দের জীবন-স্মৃতিতে একটি স্মরণীয় আলেখ্য। দুই-চারিদিন পরে মাদ্রাজ হইতে রামকৃষ্ণানন্দজীও আসিয়া পুরীতে ইঁহাদের

সহিত মিলিত হইলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর পরমানন্দ অভেদানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন মঠে অবস্থান করিয়া তাঁহারা পাটনা, কাশী, আগ্রা, আলোয়ার ও আহমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই পৌছিলেন। সঙ্ঘের আদেশে পরমানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারক-রূপে গমনের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ১০ই নভেম্বর (১৯০৬) স্বামী অভেদানন্দজীর সহিত তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র বাইশ বা তেইশ বৎসর হইবে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পরমানন্দ অভেদানন্দজীর সহিত নিউইয়র্কে পৌছেন। পরমানন্দ প্রথমে নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতিতে অভেদানন্দজীর সহকারিরূপে কার্য আরম্ভ করেন। এখানে বেদান্ত সমিতির অনুরাগীদের নির্জনবাসের জন্য পাহাড়ের উপরে একটি আশ্রম ছিল। পরমানন্দজী নিয়মিত বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াও, মাঝে মাঝে কিছুদিন করিয়া এই বেদান্ত-কুটীরে গিয়া নির্জনে ধ্যান-ভজন করিতেন—একটানা কখনও কখনও মৌনাবলম্বন করিয়া ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বোষ্টনে আসিয়া তিনি শ্রীমতী ওলিবুলের অতিথিরূপে থাকিয়া, স্থানীয় বেদান্তানুরাগীদের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে থাকিলেন। একদা স্বামিজীও বোষ্টনে আগমন করিয়া ওলিবুলেরই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে ওলিবুলের নাম অবিস্মরণীয়,—বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও তাঁহার অবদান প্রচুর। বোষ্টন আমেরিকার বহুঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন শহর। স্বামিজীর বড় সাধ ছিল সেখানে বেদান্ত প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওলিবুলের অর্থানুকূল্যে এবং স্বামিজীর সন্তান পরমানন্দের অক্লান্ত শ্রমে ও দক্ষতায় বোষ্টন শহরে অবশেষে ১৯০৯-এর ডিসেম্বরে বেদান্ত-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। এই বোষ্টনই ছিল পরমানন্দের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

পরমানন্দের মনীষা, বাগ্মিতা ও সাধুতা অচিরেই তাঁহাকে মার্কিন রাজ্যে বেশ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ছয় মাস ধরিয়া ইয়োরোপের ফ্লোরেন্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি স্থানেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন। 'The Message of the East' নামে একটি বেদান্ত বিষয়ক পত্রও তাঁহার সম্পাদনায় বোষ্টন হইতে

প্রকাশিত হইতেছিল। পরমানন্দের উচ্চচিন্তার সহিত অপূর্ব সাহিত্য-কুশলতা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। 'Path of Devotion', 'Vedanta in Practice', 'The way of Peace and Blessedness' প্রভৃতি পুস্তকাবলী পরমানন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার রচিত 'The Vigil,' 'Rythm of Life' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থগুলিও ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে অনবদ্য। তাঁহার কোন কোন রচনা 'ব্রেইল' অক্ষরে অন্ধ পাঠকদের জন্যও ছাপা হইয়াছে। পরমানন্দের অনূদিত 'গীতা' ও 'উপনিষদ্'.আমেরিকার পণ্ডিতসমাজে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে বোষ্টন বেদান্ত-কেন্দ্র নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইলে, পরমানন্দের কার্য আরও দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৩ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইবার তিনি ইয়োরোপে প্রচার সফরে গিয়াছিলেন। প্যারিস ও জেনেভাতে তাঁহার বেদান্ত-বক্তৃতা স্থানীয় বুধমণ্ডলীতে যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকার লস্ এঞ্জেলিস্ শহরে তাঁহার পাঁচ মাস মাত্র অবস্থানের ফলস্বরূপ ঐ বৎসরের আগস্টেই সেখানে বেদান্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইভাবে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে তিনি পরিব্রাজক-প্রচারকের মতো অবিরাম পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তাকে প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন। পরমানন্দের কর্মদক্ষতার ফলে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে, দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার লা ক্রেসেণ্টাতে বোষ্টন বেদান্ত-কেন্দ্রেরই অধীনে 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি মনোরম আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৯ সালে তিনি বোষ্টন হইতে ২৩ মাইল দূরে আতলান্টিক মহাসাগরের তীরে কোহাসেট নামক স্থানে আর একটি বেদান্ত-কুটীর স্থাপনা করেন। বৃক্ষলতাদি-বেষ্টিত এই আশ্রমটি মুখ্যতঃ তপস্যার জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। পরমানন্দ প্রতি বৎসর ৪ঠা জুলাই তাঁহার শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণদিবসে, এখানে আসিয়া নির্জনে মৌন থাকিয়া ধ্যানজপ করিতেন। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, পরমানন্দের তিরোধানের পর হইতে, বোষ্টন, লা ক্রেসেণ্টা, এবং কোহাসেট কেন্দ্রত্রয় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কর্তৃত্বাধীনে আর নাই।[১]

১ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে, স্বামিজীর পুণ্য-স্মৃতিজড়িত বোষ্টনে স্বামী অখিলানন্দ কর্তৃক বেলুড় মঠের নিয়ন্ত্রণাধীনে পৃথক বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পরমানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজে এডেন ছাড়িয়া কিছুদূর আসিয়াই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রামকৃষ্ণানন্দজী ২১শে আগস্ট মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। কলম্বোতে কাষ্টমস্ হাউসে (Customs House-এ) আসিয়া রামকৃষ্ণানন্দজীর মহাপ্রয়াণবার্তা সবিশেষ জানিয়া, সেখানেই তিনি মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি ঐভাবে স্তব্ধ হইয়া সেখানে বসিয়াছিলেন। শোনা যায়, সেখানে নাকি তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর হাস্যোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় কোন মূর্তি দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মান্দ্রাজ হইয়া বেলুড় মঠে আসেন। রামকৃষ্ণানন্দহীন মান্দ্রাজ পরমানন্দের কাছে শূন্যপুরী মনে হইয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, মঠ ও মিশনের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের সময়েও তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং মঠে বাস করিয়া মহাসম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতাব্দী-জয়ন্তী উৎসবেও তিনি মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে কলিকাতার টাউন্ হলে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে আরও দুইবার (১৯৩৩ এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও তাঁহার ধর্মপ্রসঙ্গ ও ভাষণাবলী সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত।

পরমানন্দের জীবনের অধিকাংশ কালই আমেরিকার মাটিতে কাটিয়াছে, তথাপি সেখানেও তাঁহার ভজনশীলতা, পরার্থপরতা ও কর্মকুশলতা সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরমানন্দের সর্বদা আনন্দপূর্ণ ভাব,—নির্দোষ আমোদপ্রিয়তা ও প্রাণখোলা হাসি-খুশী মেজাজ সত্যই তাঁহার গুরুদত্ত নামের সার্থকতা আনিয়া দিয়াছিল। তিনি বলিতেন, "আমি কাউকে নিন্দা করতে পারি না—নীচতম ব্যক্তিকেও না। আমার কাজ তাকে ভালবাসা ও সেবা করা। সমালোচনা ও নিন্দার স্থান ধর্মজীবনে নেই।···অপরের কল্যাণ চিন্তা এবং সেবা করাই আমার জীবনের সাধনা।"

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন। পরমানন্দ বোষ্টন হইতে আসিয়া একাকী পাহাড়ের উপরে কোহাসেট আশ্রমে তাঁহার ধ্যান-কুটীরে চলিয়া যান। বেশ কিছুক্ষণ পরে নীচের কুটীরে ফিরিয়া তাঁহার অনুরাগী-ভক্তদের বলিলেন, "আমি

অন্য লোকে চলে গিয়েছিলাম…।" বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ দুইহাত বাড়াইয়া মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। শেষ কথা উচ্চারিত হইল—"না, না—আমায় এখন ধরো না।" অকস্মাৎ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সন্ন্যাসী পরমানন্দ তৃণশয্যাতেই তাঁহার শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল সহায়ে, এবং আত্মবিশ্বাস ও সাধনার দ্বারা, একটি ক্ষুদ্র বালকও কালে কত বড় শক্তিধর হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুরুষাবতার স্বামিজীর আশ্রিত সন্তান স্বামী পরমানন্দ। নির্ভীক পরমানন্দ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। একদা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী জনৈক বিদেশী অভ্যাগতের কাছে পরমানন্দের পরিচয় দিতে গিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "**Here is a boy who is absolutely fearless** (এই একটি ছেলে, যে সম্পূর্ণ নির্ভীক)।" জীবনে কখনও কোন কাজকে তিনি ভয় করেন নাই। কাজের বোঝায় একদিনও তিনি অবসন্ন হন নাই—বরং গুরুভার বহনের শক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন। জীবনে যতই দুঃখ থাকুক, যত কষ্টই হউক,—যদি উহা দ্বারা একজন কাহারও মঙ্গল হয়, তাহা তিনি প্রসন্নচিত্তে বার বার স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার মতে, একটা জীবনকে নষ্ট করা সহজ, কিন্তু একটা মহৎ আদর্শের জন্য বা পরহিতায়, উহা যাপন করাই তো কঠিন সাধনা। পরমানন্দ তাই বলিতেন, "I do not ask to have my burden lightened. All I ask is to have the strength to carry it. Life has given me great worries and troubles, yet I am glad to take it up again and again as long as I feel that it benefits or is useful to others. It is easier to lay your life down than to live for the Ideal and for humanity."

এক কথায় পরমানন্দের সমগ্র জীবনটি ছিল স্বামিজীর আদর্শেরই অনুরণন : 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

পাঠশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১	হইয়াছল	হইয়াছিল
২১	২৮	স্বামিজী	স্বামিজী
৩৮	২৭	দর্শন-গ্রন্থ	দর্শন গ্রন্থ
৪৩	২৫	উপসনার	উপাসনার
৪৬	১১	পুত্রবধূরূপে	পুত্রবধূরূপে
৫৫	৪	স্বামী।	স্বামী
৫৫	৫	লইয়	লইয়া
৫৬	৬	নিরঞ্জনান্দজীর	নিরঞ্জনানন্দজীর
৭০	২২	ব্যাক্তিগত	ব্যক্তিগত
৭১	৫	নারায়নগঞ্জের	নারায়ণগঞ্জের
৭৮	১৪	ঢেলে	ঢেলে
৮২	৩	বিরাজনন্দজী	বিরজানন্দজী
৮৩, ২৮৮	১৫, ২	মাধুকরী	মাধুকরী
৮৬	৬	নাগাধীশ	নগাধীশ
৯১	১০	সংজ্বের	সজ্বের
৯২	১	দিয়ালিছ	দিয়াছিল
৯৯	১৪	মুল্যবান	মূল্যবান
১০৩	২	পরিক্ষায়	পরীক্ষায়
১০৬	৭	জানা গেলে	জানা গেল
১২৭	২৬	tho	the
১৫০	২৭	নিশ্চিত	নিশ্চিন্ত
১৬০	২৬	জাজ্বল্যামান	জাজ্বল্যমান
১৬৭	১৩	ক বিতে	করিতে
২৬২	২৩	পরিচালনায	পরিচালনায়
২৬৮	২১	সাধূদের	সাধুদের
২৭৮	২৬	বন্ধুকের	বন্দুকের
২৯২, ৩২৩	১৪, ৭	মূহুর্তের	মুহূর্তের